ফিরে দেখা
প্রণব সেনগুপ্ত

ফিরে দেখা

প্রণব সেনগুপ্ত

ফিরে দেখা

প্রণব সেনগুপ্ত, এম.এ, এল.এল.বি, জার্নালিজম (ডিপ্লমা)

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ গৌর দাস
মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, রাণীরবাজার

প্রকাশক ঃ পূর্ণিমা পাবলিসার্স
পূর্ণিমা সেনগুপ্ত
অফিসটিলা, বিশালগড়, ত্রিপুরা (পঃ)

প্রকাশ কাল ঃ জানুয়ারী ২০১০ ইং

মুদ্রণে ঃ রামকৃষ্ণ অফসেট প্রেস
আমতলী, রামকৃষ্ণালয়, এ. বি. রোড
ফোন -২৩৭৫৮৭৯

প্রাপ্তি স্থান ঃ সরস্বতী বুকডিপো
ওরিয়েন্ট চৌমুহনী , আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা ।

মূল্য ঃ ২৫০ টাকা
(দু'শো পঞ্চাশ টাকা)

PHIRE DEKHA

FOREWORD

'Phire Dekha' *is a literary piece of work which consists of 52 old and new short stories , 25 poems and 11 articles . This is a sincere effort of the author to make the door open for the readers to visualize the vividness of human life . This book will cater the need of society which is based on the economic principle of 'demand and supply'.People at large like to entertain the situation which satisfies their ego. There are abundance of situations in the life where sometimes , one finds frustration and at other times easy vintage to go ahead. The chemistry of life never goes in an even manner . Greatness lies with the person who makes helps to entertain the people with the spell of their magic. Here is a model role of literary genre that comes in a big way in the life of common men . Any author , poet or essayist is successful when he and his writings becomes the domain of commonality because one of the objectives of literature is the extension of services for the greater need of society . The literature fills the gap of human race of development . It motivates the mindset of people to remain energized throughout their life .*

When the demand of masses is translated in the supply of literary expression , one is bound to purchase the commodity according to their need and necessity . Purchasing becomes more viable and interesting when it serves the demand of people in many ways. Today , men have become virtually a slave of situations. Time is always constraint for them. Men need such instrument which can supply the situation of pain , pleasure , horror , imagination , and all such ethos that constitutes the need of day to day life . Phire Dekha of pranab Sen Gupta is such a literary piece of work which contains all the ingredients of tasty food. Readers are compelled to search their food which will fulfill their hunger. With sincere endeavor Sir Sen Gupta wants to convey the message that

life is full of eventuality and one should take lesson from each of them . The kaleidoscopic of such event of life forms the peripheral part of " phire Dekha". Life in totality becomes a lively show , if one turns the pages of the book named as " ***Phire Dhekha."***

The stories like " Bhuler Absan" gives the message of 'self realization'., " Oara poner Bali" reminds the atrocities of dowry death.," Pahare Bukphata kanna" depicts the love of tribal society for their missing son which never lasts despite the passage of time.," Aami Anath" narrates the positive perspective of life and makes help to believe that good people always exists in the society., the poems like" Path Shishu" epitomizes the life of children on the pavements as " beggars." " Meyen" is an expression of the present condition of children where they have no choice to develop their destiny according to their caliber . " Aami Baddo Ekka" is a life in solitary , the articles like " Shramik Malik Sampraka is a depiction of exploitation and hegemony of one class over others. " Nari Ekal Sekal " is a beautiful presentation of the change and development in the life of women . The entire presentation is a piecemeal of human progress.

I express my deep concern for the wider publicity of this book . I also hope that ' ***Phire Dekha'*** *will succeed all the expectation of readers.*

Satyadeo Poddar 30.9.2009

(Dr.Satyadeo poddar)
(Mahatma Gandhi Professor of History,
&
Head , Department of History,
Tripura University.

ফিরে দেখা

- প্রণব সেনগুপ্ত

অতীত কথা বলে । ভবিষ্যতের রাস্তা দেখায় মানুষের অব্যক্ত ভাষাগুলো ফুটে উঠে । লুপ্ত ঘটনা সুপ্ত কাহিনী , সমস্যা সঙ্কুল ধারাবাহিক জীবনপথ , ক্ষমতাবানদের অর্থের প্রাচুর্য ,ক্ষমতার অপব্যবহার উদ্ধত আচরণ , প্রতিবাদ কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়া , ভয়লেশহীন জীবনমায়া ত্যাগ করে রুখে দাঁড়ানো এ যে খন্ড খন্ড জীবনের ইতিহাস , ফিরে তাকালেই অতীত বাতলে দেয় ভবিষ্য -এর নতুন রাস্তা । কেউ বা দরিদ্র ছিল বলে তাকে আজীবন দারিদ্রতার বোঝা বহন করতে হবে - এ আবার কেমন কথা । অশিক্ষা , ভূমিহীন ছিল বলে তাকে কেনই বা বংশ পরম্পরা অভিশাপের বোঝা বহন করতে হবে ।ওদের টাকা নেই , থাকলেও তা যৎকিঞ্চিৎ , জীবন তৈরীতে ঘন ঘন হিসেব কষলে অন্যের আপত্তি থাকবেই বা কেন ? দরিদ্র মানুষদের জীবনের হিসেব সত্যিই আলাদা , কোথাও মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে , কোথাও বা আলো ঝলসানো রাতে বাবুদের আনন্দের সুরা - কাবাবের নৃত্যের আসর ।

ক্ষুর্ধাত মানুষদের দীর্ঘশ্বাস - এতো স্বাভাবিক দুঃখ , যন্ত্রণা , নিপীড়ণ , শোষণ নায্যপ্রাপ্তি , ঘৃণা অহঙ্কার অত্যাচার , প্রতিবাদ , প্রতিরোধ , সামাজিক আন্দোলন এতো সমাজের সষ্টি লগ্ন থেকেই ছিল , তা বলে সমস্ত লিপিবদ্ধ হয় না বা গণপ্রচারের আলোতেও আসে না । সমাজের সামাজিক নিষ্ঠুর পরিবেশে নির্ভেজাল সহজলভ্য কিছু মানুষ পরিস্থিতির শিকার হয় । সুতরাং সেই মানুষগুলোর রাগ , দুঃখ কষ্ট , যন্ত্রণা , অসন্তুষ্টি , পরিণাম না ভেবে অনেক সময় প্রতিবাদ আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের রূপ নেয় । হয়ত পরিণতি হয় ভয়ঙ্কর । ওই মানুষদের ইস্পাত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি বাস্তবের রাস্তা ভেঙ্গে সমুদ্রের অতলে ডুবে যায় , শোষণ , বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই ছিল , আছে , হয়ত কিছু সচেতন মানুষের হাত ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে , চলবে ও । তবে সত্য হল , এই মানুষগুলোর ফেলে আসা পথ আগামীকে রাস্তা দেখাবে এ পথ উত্তরণের গৃহশত্রুরা কখনও নীরব থেকে কখনও প্রকাশ্যে দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে ঢালি সাজাতে চেষ্টা করে , আগুন ছড়িয়ে দিতে । শত্রুরা আশেপাশে আছ , সজাগ হতে হবে সমাজকে । নয়তো আগুন নেভানো যাবে না । নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে , ওকে হুকমি দিচ্ছে কেন ? ব্যাপারটা কি ? জানার লোক নেই , কেন ? অসত্য মিথ্যা , বাতেলাবাজ নাটুকে ধান্দাবাজ লোকগুলো সবসময় সুযোগসন্ধানী । সত্যি সত্যি প্রতিবাদ প্রতিরোধ হলে ওদের হিম্মত উবে যায় , ওরা গর্তে লুকিয়ে যায় । যুগে যুগে ওরা তথাকথিত অভিজাত ,

অত্যাচারী সামন্তদের পদলেহক হয় থাকে , মর্যাদা রক্ষার অধিকারের সংগ্রামেই পথ দেখিয়ে দেবে ঘুরে দাঁড়ানোর । তার জন্য কিছু লোককে ত্যাগ , তিতিক্ষাসহ করতেই হয় । যুগের ইতিহাস ফিরে তাকালেই দেখা যায় স্বাধীনতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শত শত মানুষের আত্মহুতি দিয়েছেন , কোথাও বা আজও দিয়ে চলেছেন । সেই বীরদের কথা স্মরণ না করলে ইতিহাস যে আমাদের ক্ষমা করবে না। আক্রমণকারী আর আক্রান্ত কখনও এক মানদন্ডে আর আক্রান্ত কখনও একমানদন্ডে দেখা ঠিক নয়। আক্রান্তের পাশে দাঁড়িয়ে আক্রান্তের প্রতি মানবিক আচরণ দেখিয়ে যদি শাস্তি পেতে হয় , আতঙ্কে মরতে হয় , তবে তো সবাই অমানবিকের দিকে ঝোঁকবে , মানবিকতার অবলুপ্তি ঘটবে । তবে এই জীবনের মানে কি ? জীবন তো আর ভেড়া , মোষের মতো খুঁটিতে বাধা থাকতে পারে না । প্রকৃতির নিয়মেই জন্মালে মরতে হবে । তাহলে ভয় কিসের ? আমাদের রাজ্যের এক সময় বিভেদকামী শক্তি রক্তের নেশায় মত্ত হয়ে প্রতিদিন খুন করছে । মহল্লায় মহল্লায় নিজের খুশীমতো মানুষের উপর কর ধার্য করেছে । অত্যাচারে , স্বজন হারানোর যন্ত্রণার গৃহহীন হয়ে রাস্তায় দিনাতিপাত করেছে । অগণিত মানুষ খুন হয়েছে বিশ্বাসের খেসারত দিতে গিয়ে যারা বেঁচে ছিল অন্ধকার ঘরে তাদের শিরদাঁড়া দিয়ে হিমস্রোত বয়ে যেত । যেন তারা জীবন্মৃত কোন মহিলাকে ডাইনী আখ্যা দিয়ে মাথা ন্যাড়া করে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়েছে। হত্যা ও হয়েছে দেওয়ালে পিঠ ঠেকা মানুষগুলোর দুর্বার প্রতিরোধ , রক্তপিপাসুরা শব সাধনা ছেড়ে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে, জীবন বাঁচাতে । ওরা গণবর্জিত । এ রাজ্যে ওরা চোরাগোপ্তা ছায়াযুদ্ধ চালিয়েছিল , খুন রাহাজানি , লুট , জুলুমবাজি , গৃহদাহ , সমস্ত অত্যাচার করেছে , ওদের আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে নিরীহ অস্ত্রহীন মানুষের বাক্‌রুদ্ধ হয় । বুকফাটা যন্ত্রণা , অকুন্ট অত্যাচার তবু ও মুখে ভাষা ফোটে নি । কিন্তু এ রাজ্যের ইতিহাস , রাজ্যের মানুষ জগদ্দল পাথরের ন্যায় চুপ করে থাকেনি। রাজ্যের মানুষের প্রতিজ্ঞা এ রাজ্যকে গণকবর আর বানাতে দেবো না । মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের পরিণাম ওরা পেয়েছে উৎকৃষ্ট উত্তর ।

ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা হয়ে চুপ করে বসে থাকলে সুদিন আসতো না । সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এ রাজ্যের মানুষ ভেদাভেদ ভুলে সংঘবদ্ধভাবে লড়েছে , মহীরুহ বিষবৃক্ষের পতন ঘটিয়ে উড়িয়েছে শান্তির বিজয় কেতন , স্বাক্ষী ইতিহাসের পাতা , কিছু যুবককে লোভ দেখিয়ে বিপথগামী রাস্তা দেখিয়ে ভাল কাজ করা যায় না । ইতিহাসের প্রতিক্রিয়ায় পুনরুভ্যুত্থান ঘটে । ধন ঐশ্বর্য্যের চেয়ে মানুষের সৃষ্টির মূল্য অনেক বেশী । জীবনের কর্মভূমি বিশাল , কিন্তু জীবনের পরিধি সীমিত । তার মাঝেই টেনশান , চাপ হতাশা কাটিয়ে সময়কে কাজে লাগানো সত্যিই জীবন্ত মানুষের কর্মসাধনা , জীবনের মূল্যবোধ এবং ইস্পাতের ইচ্ছাশক্তি জীবনের সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যায় বাস্তবের রূঢ় রাস্তা দিয়ে । যন্ত্রণার ভাষা অনেক সময় মুখে আসে না , অভিশাপের বিনিদ্র রজনী কাটে অভিমানে অশ্রুসিক্ত হয়ে । নেড়ী কুকুরের মতো মানুষকে যেন উচ্ছিষ্ট হাড়ের জন্য লড়তে না হয় । মানবতা

যেন হেরে না যায় । মানুষ যেন ভ্রাম্যমান পরিযায়ী পাখীর মতো উচ্ছেদ না হয় । তার বাসস্থানের যেন গ্যারান্টি থাকে , খাদ্যের জন্য মানুষের যেন হিংস্র মাংসাশী প্রতিযোগীতা শুরু না হয় মানুষকে তার ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না , নীদ হীন বলে কেনই বা তার কণ্ঠস্বর রোধ করা ?

তোষামোদ দিয়ে জীবনের কোন বৃহৎ কাজ সম্পাদন হয়নি , হয়ত আপাত সুন্দর , আপাত মধুর। আবারো বলি " ফিরে দেখা" ইতিহাস বলে অতীতের পিছে ফেলে আসা পথ আগামীর রাস্তা দেখায় । জন্ম মৃত্যু , উত্থান পতন কালের নিয়মে ঘটবে কিন্তু সৃষ্টি ধ্বংসহীন । অতীতকে " ফিরে দেখা" নবজীবনের পথ ।

আমাদের সমাজের ঘটে যাওয়া বিক্ষিপ্ত ঘটনাসমূহ , উত্থান , পতন , পুনসংযোগ , আবিষ্কার , সমস্যা , নানাহ ঘটনাবলী নিয়ে পুরানো - নতুনের মিলিত ৫৪ খানি গল্প , ২৫ খানি কবিতা , ১১ খানি প্রবন্ধের নতুন নামকরণ ও সংযোজনে সম্মিলিত বই " ফিরে দেখা" লেখাতে বুলভ্রান্তি হয়তো আছে। ছাপাতে ও অক্ষর বিন্যাসেও কিছু ভুল থাকতে পারে , তাই আপনাদের কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো পাঠক / পাঠিকারা মার্জনা করে দেবেন , আপনাদের দেওয়া সম্মানই আমার কাছে সব থেকে মূল্যবাণ প্রাপ্তি ।

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই গুলি

সংবাদপত্র বিষয়ক(গবেষণামূলক)

১) স্মৃতির রোমন্থন সংবাদপত্র (১৯৮৭ -২০০৪)

২) সংবাদ সংস্কৃতি

৩) অধিকার

অপরাধ/সন্ত্রাস/ঐতিহাসিক

১) অপরাধ অনুসন্ধান ও শাস্তি

২) রক্তাক্ত টাকারজলা

৩) সবুজ পাহাড়ের অভিযান

৪) অস্তিত্বের সংগ্রামে চাকমা জাতি ।

৫) My experience about Police work

কবিতা

১) রক্তচোখ

২) প্রলয়

৩) আক্ষেপ

৪) দুঃস্বপ্ন

৫) অব্যক্ত আর্তনাদ

৬) লেখার পেছনে

৭) জীবন প্রান্তরে

৮) ছবি কবিতা

প্রবন্ধ

১) নিরন্তর

২) ছায়াপথ

৩) সীমান্ত সম্পর্ক

গল্প

১) উৎসর্গ

২) মুখোশ

৩) জীবন সংঘর্ষ

৪) সমাজের কান্না

৫) নীরব মরুদ্যান

৬) ভাঙ্গাঘর

সূচী

গল্প

সূচী

গল্প

সূচী

কবিতা

সূচী

প্রবন্ধ

গল্প

বাকশক্তিহীন পর্বতদুহিতার অসাড় প্রতীক্ষা

পাহাড়ী জনপদ, প্রত্যন্ত গ্রহন অরণ্যঘেরা পাহাড়ী গ্রাম , গন্ডাছড়া থেকে পায়ে হেঁটে আনুমানিক চল্লিশ কিলোমিটার , ছড়া নালা, নিঃঝুম অন্ধকার জঙ্গলের পথে পাহাড়ের বুক বেয়ে পাশাপাশি গ্রাম তকুরাই ও সুকুরাই হয়ত বা প্রাচীন কোন গ্রাম বুড়োর নামে পাশাপাশি দুটো গ্রামের জন্ম । যে গ্রামের লোক বিদুৎবাতি কি জানে না । গাড়ী ঘোড়া, যানবাহন তো দেখা দুরের কথা , শব্দও শুনেনি । লেখাপড়ার ভরসা ছিল একটী অঙ্গনওয়াড়ী স্কুল । যা আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে নির্বাক সমাপ্তি টেনেছে । হাট বাজার , জন কোলাহল শূন্য । পাশাপাশি দুটি গ্রাম , স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে গ্রাম্য ওঝাদের ঝাড়ফুঁক ও পূজা পার্বন , যা ওই গ্রামের স্বাস্থ্য পরিষেবা ।

পাহাড় ঘেরা গন্ডগ্রাম তকথুরাই এ জন্মগ্রহণ করে কসমলা ত্রিপুরা , নাম লিখতে জানে , কারণ

শৈশবে অঙ্গনওয়াড়ী স্কুলটা চালু ছিল আর এই গ্রামেই আজকের পর্বত দুহিতা কৌচাংতির কাটে পাহাড়ের গায়ে খেলাধূলা করে । গ্রামের এপার ওপার ছুটাছুটি করে বৃদ্ধাদের কাছ থেকে পুরানো সর্দ্দারিদের বীরত্বের কাহিনী শুনে । ওরা নিজেরাও জানে না ওরা বর্তমানে দেশের কোন প্রান্তে আছে। পাহাড় , অরণ্যে ধুলোবালি লুকোচুরি খেলাতে খেলতে উভয়ে যৌবনে পা বাড়াল । ক্রমে ক্রমে উভয়ের প্রতি উভয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা । মনে মনে স্বপ্ন ঘর সাজাবে । কৌচাংতি কসমলা ডুম্বুরে মেলা দেখতে যায়। উভয়ের মনই আনন্দে আট খানা । উচ্ছ্বাসিত যৌবন, ফুলের গন্ধ বাহার ছড়ায় , কিন্তু কৌচাংতি ককবরক ছাড়া অন্য ভাষা জানেও না বুঝে ও না । এরই মাঝে যানবাহনের শব্দ , বিদুৎতের আলো উভয়কে উল্লসিত করে তোলে । কৌচাংতি কসমলার কাছে বিদুৎবাতি কেনার জন্য আহ্লাদ করে, যা দিয়ে ওরা নিজেদের নতুন ঘর সাজাবে পাহাড়ী জনপদে । জুমের চাল ও ভুট্টা বিক্রি করে যে পয়সা নিয়ে কসমলা এসেছিল সে পয়সা থেকে সে ফিতা , আলতা ও কৌচাংতির কথা মত কিছু বিদ্যুৎ এর তার ও দুটি বিদ্যুৎ (বাল্ব) কিনেছিল । গভীর রাত্রে অরণ্য ঘেরা পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উভয়ে অবশেষে নিজ গ্রাম তকুরাই এসে পৌঁছাল । আহ্লাদ । কৌচাংতি কসমলার ঘরে এল এবং কসমলা বিদ্যুৎ এর তার দিয়ে কোন ক্রমে বিদ্যুৎবাতি এটে দিয়ে দেই কিন্তু বিদ্যুতের আলো যে তাতে আসে না । কৌচাংতি কসমলাকে বলল - হয়ত ঈশ্বর আমাদের উপর রাগ করেছেন তাই বিদ্যুৎবাতি আর জ্বলছে না । এমনিতেই বহু কষ্ট করে পাহাড়ের গাছ , বাঁশ , চুন দিয়ে কসমলা মনের মতো করে স্বপ্নের ঘর বেঁধেছিল । যাই হোক কসমলা ও কৌচাংতির কথার মাঝেই কসমলার ঘরের বাঁশের তৈরী দরজায় যেন কিসের শব্দ শুনতে পেল , তার পরই কসমলাকে কারা যেন দরজা খুলতে নির্দ্দেশ দিল , কসমলা দরজা খুলতে না খুলতেই বাইরে থেকে ৭/৮ জন লোক জোর করে দরজা খুলে ঢুকতেই কৌচাংতি মাটির তেলের বাঁশের তৈরী চুঙ্গা বাতিতে দেখতে পেল ৭/৮ জনে রই হাতে বন্দুক , তারা জোর করে কসমলাকে নিয়ে যেতে চায় । কৌচাংতি বহু অনুরোধ করেও লাভ হলো না । বন্দুকধারী জঙ্গলদুস্যরা তাকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে গেলো কৌচাংতিকে পদাঘাত করে । সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথে কৌচাংতি বনে পাহাড়ে জঙ্গলে হন্যে হয়ে পাহাড়ের এপার ওপারে ঘুরতে থাকে তার ভালবাসার ফুলের সন্ধানে। কিন্তু কোথাও কসমলার কোন সন্ধান পায়নি। অবশেষে গ্রামে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায় , কিন্তু জঙ্গল দস্যুদের এত পরাক্রম কেউমুখ খুলতেও নারাজ , খুঁজে বের করা তো দুরুহ ব্যাপার , কৌচাংতির বুকে আর্তনাদ , মুখে ভাষাহীন ,নিস্তব্দ পাথর। বন - পাহাড় সবই যেন তার কাছে শ্মশানভূমি । যাই হোক পাহাড় ছিল একদা তার কাছে যৌবনের উপবন , আজ প্রত্যাশাহীন জড়ো পাথর । অন্ধকারে পুনরায় শব্দ শুনতে পেল - কে যেন তাকে বাইরে থেকে ফিস ফিস ডাকছে । জীবনের প্রতি নৈরাশ্য তাকে এমনিতেই বেপরোয়া বানিয়েছিল ,

তার উপর দরজায় করাঘাত । তাই কিছু চিন্তা না কেরই দরজা খুলে ফেলল কাঁচাংতি এবং খুলতেই সে ভাবতে লাগল সে কোন স্বপ্নে বিভোর কিনা অর্থাৎ তার কসমলা তার সামনে দাঁড়িয়ে । আলিঙ্গনে অনুভব করল সত্যিই সে তার হারিয়ে যাওয়া কসমলাকে খুঁজে পেয়েছে । কাঁচাংতির ভালবাসার স্পর্শে কসমলা আর গ্রাম ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী নয় । জঙ্গলে দুস্যদের নির্ম্মম অত্যাচার অমানবিক জীবনপথ তার কাছে ঘৃনার ও অস্বস্তিকর ,কিন্তু কি যে করবে কসমলা ভেবে উপায় পাচ্ছে না , কারণ জঙ্গলদস্যুরা তাকে তাদের দলে সামিল করার জন্য নিয়ে গিয়েছিলো । যেহেতু তার দেহ সুঠাম ছিল তাই । সে দুস্যদের নিদ্রার সুযোগ তাদের ডেরা থেকে পালিয়ে আসে পাহাড়ে কাঁচাংতির ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যে । কয়েকদিন পর কসমলা কাঁচাংতিকে নিয়ে জুমে যায় , পাহাড়ী ফুলের গায়ে গা এলিয়ে পিঠে খাড়া নিয়ে জুমফুল ও কাঠ সংগ্রহের জন্য । জুমে যাওয়া পথে পাহাড়ের গায়ে সবুজ পাতায় ছোপ ছোপ রক্তের দাগ দেখে কাঁচাংতি ও কসমলা থমকে উঠে, একটু সামনে পা বাড়িয়ে উভয়ে হতবাক নিঃস্তব্দ । দেখতে পায় সামনে তরতাজা রক্তাপ্লুত দুই যুবকের মৃতদেহ । দেহগুলি গুলির আঘাতে ঝাঝরা । ওই গহন অরণ্যেও লোক কোথায় ? কি ভাবে কাকে বলতে হয় কি করতে হয় তাও জানে না । খবর নিয়ে কসমলা জানতে পারল দুইদলজঙ্গলদস্যুদের লড়াইয়ে এই দুই যুবক বলি হয়েছে । পরদিন নিরাপত্তা বাহিনীর বিশাল দল ২টি মৃতদেহ দেখতে পেয়ে দেহগুলি নিয়ে যায় । কসমলা কাঁচাংতিকে বলে উঠল, চল আমরা এ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই , নয়তো কখন আবার জঙ্গল দুস্যরা তোর কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে । দেখ , কাঁচাংতি , আমি তোকে ছাড়া আর এক পলকও থাকব না । সন্ধ্যায় পাহাড়ের ঢালে তৈরী কুঁড়ে ঘরে উভয়ে যখন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় মত্ত ঠিক তখনই জঙ্গল দস্যুদের দল সামনে এসে হাজির । কসমলাকে এবার জোর করে নিতে চাইল। পর্বত দুহিতার অগ্নিমূর্তি । আমি কসমলাকে নিতে দেবনা , দীর্ঘক্ষণ কসমলাকে নিয়ে যেতে চাইল , কসমলার প্রচন্ড বাধা , সে যেতে নারাজ । নাছোড়বান্ধা জঙ্গলদস্যুরা তাকে জোর করেও নিতে পা পেরে মাঝপথে তাকে নিম্মর্মভাবে গুলি করে , কসমলা গুলি খেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সুখের নীড়ের দিকে ধাবমান । কুঁড়েঘরের দরজায় কাঁচাংতির কোলেই জীবনের শেষ নিশ্বাস ,পর্বত দুহিতা নবযৌবনা কাঁচাংতি যৌবনেই জড়পাথব নির্ব্বাক , নিস্তব্দ - তার ভালবাসার অপমৃত্যু । তবুও প্রতীক্ষায় ।

ওরা চলমান সমাজের পথপ্রদর্শক

পায়ের নীচে অল্প কতক জমি , একটি কুড়েঘর , শুধুই মাথা গোঁজার জায়গা । তার মাঝে রায়ধনের পরিবার । বহুদিন পরে পথম সন্তান জন্মায় , তাই সোহাগ করে ছেলের নাম রাখে প্রদীপ অর্থাৎ সেই রায়ধনের সংসারে আলো ফোটাবে । রায়ধনের স্ত্রী কনক আহ্লাদে আটখানা । কনকরাণী স্বামী রায়ধনকে আহ্লাদ করে বলে দু তিনটে দিন রিক্সা চালাতে যেওনা , প্রয়োজনে ছাগলটা বিক্রি করে ফেল। যাই হোক প্রদীপ বুঝতে পারল , ওকে ঘিরে মা - বাবার অনেক প্রত্যাশা । হবেই না বা কেন , প্রাইমারী ক্লাশ থেকে শুরু করে সব সময় ক্লাশে প্রথম হয়ে অতি সহজেই মাধ্যমিকের গন্ডি প্রথম বিভাগে তিনটা লেটার সহ পেরিয়ে গেল যা রায়ধনের পরিবারে কেউ কখনও পারেনি । রায়ধনের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রদীপের জন্ম । কিন্তু রায়ধন বহুদিন থেকে মনে ভেবে রেখেছিল যদি কোন দিন ওর স্ত্রী কনকরাণী সন্তানের জন্ম দেয় তো সে যেন ছেলে হয় । যদি ও রায়ধন কোন দিনই মুখ ফুটে প্রকাশ করেনি । ক্রমে কনকের গর্ভে পুত্র সন্তানের জন্ম হয় রায়ধনের মনস্কামনা কনকের অজান্তেই পূরণ হয়েছিল । ছেলের নামকরণের সময় কারো কোন কথা না শুনে নিজেই ছেলের নাম রেখেছিল " প্রদীপ"। ক্রমে প্রদীপ এক পা - দু'পা করে বড় হতে লাগল এবং রায়ধনের আকাঙ্খা অনুযায়ী লেখাপড়ায়ও কৃতিত্ব দেখাতে শুরু করল। রায়ধন কখনো প্রদীপকে সুক্ষ নজরে দেখে ।

রায়ধন সারাদিন আগরতলার রাজপথে রিক্সা টেনে , হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে রাত্রে বাসে করে গ্রামের বাড়ীতে যায় সাথে সারাদিনের উপার্জ্জনের পয়সা । এর থেকে মালিককে ভাড়া বুঝিয়ে দিয়ে যৎসামান্য টাকা , তার থেকেও আগুন ও অন্যান্য সামগ্রিাদি কেনার পরও কেনে ছেলের জন্য খাতা কলম । হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম রায়ধনকে বয়সের তুলনায় অনেক বেশী বুড়ো বানিয়ে ফেলে তার মধ্যে অর্দ্ধাহার রোদ বৃষ্টি ভিজে পরিশ্রম , উদ্দেশ্য প্রদীপকে বি.এ .এম.এ পাশ করাবে । কখনো স্ত্রী কনক বারণ করে বলে - একদিন অন্ততঃ জিরিয়ে নাও , কিন্তু কে শুনে ? রায়ধনের ভাব - আমার ছেলের মাথায় তো ষাঁড়ের গোবর নয় , সুতরাং সে মানুষ হবেই আমার পরিশ্রমও দূর হবে। টানাটানির মাঝে ও ছিল রায়ধনের সুখের সংসার । একদিন দুপুরে উত্তপ্ত রোদ্দুর রায়ধন রিক্সা চেপে এক বাবুকে নিয়ে যাচ্ছিল , এমন সময় ওই বাবু রিক্সা থেকে "উনার এক সহকর্মীকে ডেকে বললেন উনার ছেলে পাশ করেছে "রায়ধন কৌতুহলবশতঃ বাবুকে জিজ্ঞাসা করালো বাবু কি পরীক্ষা , বাবুমশাই সহাস্যে বললেন - আজ মাধ্যমিক ফল বেরিয়েছে । রায়ধন ব্যাতিব্যাস্ত হয়ে বাবুকে পৌঁছে দিয়ে দ্রুত গৃহমুখে ধাবমান হলো । বিকেলে ঘরে পৌঁছার পূর্বেই রায়ধন রাস্তায় জেনে ফেলল লোকদের মুখে - যে তার ছেলে খুব ভাল পাশ করেছে । খুশীতে গ্রামের দোকান থেকে জিলিফি কিনে ঘরে ঢুকতেই প্রদীপ বাবাকে প্রণাম করে বললো - বাবা আমি ফার্ষ্ট ডিভিশন পেয়েছি ৩ টি লেটার সহ । রায়ধন অতকিছু বুঝে না ,তবে এটুকু বুঝে তার ছেলে ভালভাবে পাশ করছে । এ খুশিতে আবেগে রায়ধন চোখের জল ধরে রাখতে পারল না । ঘরে খুশীর জোয়ার বইলো । ঐ রাত্রিতেই রায়ধনের হঠাৎ খুব জ্বর এলো , বললো - শরীর অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি প্রচন্ড কাঁশি এবং কাঁশির সাথে সাথে তাজা তাজা রক্ত । প্রদীপ তোর বাবার প্রচন্ড ব্যামো হয়েছে কাল তোর বাবাকে জি.বি হাসপাতালে নিয়ে যাবি । অমনিতেই রায়ধনের সংসারে দিন আনি দিন খায় । তার উপরে ছিল ছেলের লেখাপড়া , যাই হোক প্রদীপ গ্রাম ঘুরে ঋণ করে পঞ্চাশ টাকা জোগাড় করে বাপকে নিয়ে যায় জি.বি হাসপাতাল , ডাক্তারবাবু দেখার পর একটী ঔষধের ফর্দ্দ ধরিয়ে দিল । কিছু হাসপাতালে পাওয়া যাবে , কিছু কিনতে হবে ঔষধের দোকানে । প্রদীপ জানলো ঔষধ কিনতে কমপক্ষে আটশ টাকার প্রয়োজন । কোথায় পাব টাকা । প্রদীপ বুঝতে পারল জীবন সহজ নয় , বড়ই জটিল । সে তার বাস্তববোধ ও বুদ্ধি দিয়ে প্রদীপ বুঝতে পেরেছে । ঘরে মা একা , রাত্তিতে প্রদীপ ঘরে ফিরে এলো এসে শুনতে পারল , মা গ্রামের চৌধুরী বাড়ীতে ঝি এর কাজ নিয়েছে । যদিও রায়ধন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতো , কিন্তু কখনো কনককে ঝিএর কাজ করতে দেয় নি। যাই হোক টানা পোড়নে পেট চললেও কিন্তু কোন ভাবেই রায়ধনের চিকিৎসার খরচ চালানো সম্ভব হচ্ছিল না । ক্রমে ক্রমেই রায়ধন নিথর হয়ে মহাকালের কোলে শুয়ে পড়ল তাও যেন সমস্যা , বস্তুত যা ঘটে , মাও ছেলে রায়ধনের নিথর দেহ বটতলা মহাশ্মশানে নিয়ে এলো শেষকৃত্যের উদ্দেশ্যে , সেখানে বিস্তর এলাকার মানুষজনের শেষকৃত্য

সম্পন্ন হবার পূণ্যভূমি , কিন্তু সেখানেও যে দরিদ্রতা অভিশাপ্ত , অর্থবিহীন সংস্কারে অনেক সময়ই জীবন প্রাণ থেকেও মূল্যহীন।

যাই হোক বন্ধু কাঠ খড় পুড়িয়ে কতিপয় শুভাকাঙ্খী লোকের বদান্যতায় রায়ধনের নিথর দেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। গ্রামের লোকের সহায়তায় শেষ অব্দি প্রদীপ পিতার ক্রিয়াকর্ম্ম করে কিন্তু প্রদীপ তাও বুঝতে পারে , বোঝা হয়ে বেশি দিন বাঁচাও সম্ভব না, থাকাও সম্ভব না । লেখাপড়া তো উঠেই গেছে পাশাপাশি কনক তার শেষ সম্বল প্রদীপকে চোখের আড়াল করতেও নারাজ- কারণ প্রদীপই এখন কনকের শেষ সম্বল । এর মধ্যেই প্রদীপ একদিন হন্যে হয়ে বের হয়ে পড়লো কাজের সন্ধানে । ভাগ্যদেবী সন্তুষ্ট হয়ে প্রদীপকে আসাম- আগরতলা রোডের পাশে একটি হোটেলে পরিচারকের কাজ জুগিয়ে দিলেন । পরিচারকের থেকে প্রদীপ ক্রমেই উত্তীর্ণ হয়ে মালিকের স্নেহধন্য হয়ে হিসাবরক্ষকের মূল্যবান দায়িত্ব পেল । মা কনকের দুর্দশাও ক্রমশ ঘুচতে লাগলো , কিন্তু ভাগ্য যার অপ্রসন্ন , একদিন সকালে খবরের কাজগে প্রদীপ দেখতে পেলো কোন বিত্তবান ব্যাক্তির একমাত্র পুত্রের জন্য কিডনি ,ও বি-নেগেটিভ রক্তের প্রয়োজন কাতর অনুরোধ । পরোপকার যার নেশা , প্রদীপ ঠিকানাটুকু সংগ্রহ করে মালিকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে রাজধানীর বুকে হন্যে হয়ে সারা দিন ঘুরে সন্ধ্যায় বাড়ীর ঠিকানা পেল। ঐ বাড়ীতে যাওয়ার পর প্রথমে প্রদীপকে আপ্যায়ণ তো দূরে থাকুক শুধু ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করাটাই ছিল বাকী । প্রদীপ যখন খবরের কাগজটুকু বের করে এই ঠিকানাই কিনা জানতে চাইল তখন বাড়ীর কর্তাদের সম্বিত ফিরে এল সাথে শুরু হলো প্রদীপের প্রতি অসাধারণ আপ্যায়ণ এবং জানতে চাওয়া হলো প্রদীপের শর্তগুলো , প্রদীপ নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিল তার পরোপকার শর্তবিহীন । পিতাকে তো বাঁচাতে পারেনি তাই সে চায় না বিনা চিকিৎসায় যে কোন প্রাণ অকালে যেন না ঝরে । উপরন্তু ধনী ব্যাক্তির একটি ছেলে মাত্র । বিবেকের তাড়নায় তার ছুটে আসা । সব শুনে গৃহকর্তা খুশীতে আটখানা। ঐরাত্রেই ব্লাডটুকুও টেষ্ট হলো । ভাগ্যেরই পরিহাস । প্রদীপের ব্লাডগ্রুপও " বি" নেগেটিভ এলো । মা কনকরাণীর কাছে গোপন রেখে প্রদীপ নিদিষ্ট সময়ে নিদিষ্ট স্থানে রক্ত ও মূল্যবান একটা কিডনী তার দেহ থেকে খুলে দিল । বড়কর্তার সন্তান তো রক্ষা পেল । প্রদীপ কিছুদিন বাদে ফিরে গেল কর্মস্থল , সেই রাস্তার পাশের হোটেলে । হোটেল মালিক দেখতে লাগলেন , ক্রমেই প্রদীপের শরীর হলুদ হয়ে যাচ্ছে । হোটেল মালিক সাধ্যমতো চিকিৎসা করেও ফল পেলেন না । প্রদীপও মুখ খুলে কিছু প্রকাশ না করে শুধু বলল , মালিক , শেষ সময়টুকু মার কাছে পাঠিয়ে দিন । প্রদীপের ইচ্ছানুযায়ী হোটেল মালিক প্রদীপকে মার কাছে পাঠিয়ে দেন । মার কাতর অনুরোধ সত্যটুকু গোপন না রেখে মাকে খুলে বলে ফেলল তার অসুখের কারণ । অস্থির অসহায় মা বাবুদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াল , ২০০ টাকা সাহায্য ব্যাতীত কিছুই জুটল না । বাবুদের আর প্রদীপের প্রয়োজন নেই । অবশেষে প্রদীপের দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলো । অসহায় মা কনকরাণী স্বামী পুত্র হারিয়ে আজ রাজপথের উন্মাদিনী , তবুও বলতে হয় রায়ধন , প্রদীপ ওরা এ সমাজের জন্য বেচেঁ থাকবে ।

ফেরীওয়ালার স্বপ্ন

প্রতি সপ্তাহে ২/১ বার ফেরী করতে করতে রাজধানীর অভিজাত গলিতে ঢুকে পড়ে শ্যাম নগরের ভিটেমাটি ছাড়া বাসিন্দা ভুবনেশ্বর , আর বকবক করে ডাকাডাকি করে - হরেকমাল তিনটাকা , তিনটাকা । বকবক করে ক্লান্ত হয়ে রাজপথের পাশে কোন গাছের নীচে বসে নিবিড়ে বিড়িতে সুখটান দেয় এবং সাথী কোন মনের মানুষ মিললে ঘরোয়া গল্প পারিবারিক অভাব - অনটনের কাহিনী বলে শোনায় । পাশাপাশি আরো বলে - বাপ জ্যাঠারা ওপার বাংলা ছেড়ে এ পারে এসে কত কষ্টে দিনাতিপাত করেছিল । জীবনের প্রতি মূহুর্তে জীবনের সাথে কত যুদ্ধ করে এই শ্যামনগর কলোনী গড়ল, বাপ - জ্যাঠারাও মরল , তারা কি জানত এই শ্যামনগরও একদিন বধ্যভূমিতে পরিণত হবে ? তাহলে হয়ত তারা এখানে কলোনীও গড়ত না। বাপ মারা যাওয়ার পর ভুবনেশ্বর গ্রামে চায়ের দোকান খুলল। লেখাপড়া শিকেয় উঠে গেল । জ্যাঠারা জায়গা - জমি আত্মসাৎ করে ভুবনেশ্বরকে ঠকিয়ে দিয়েছে এবং অল্প ভূমি দিয়ে পৃথক করে দিয়েছে । অবিবাহিত বোন ও বুড়ি পিসি এসে পড়েছে ঘাড়ে , তারই মধ্যে কষ্ট করে বোনকে বিয়ে দেওয়া নিজেরও বিয়ে করা , তার পরই ছেলের জন্ম ।

ফেরী করতে করতে এমনি ভাবেই পরিচয় হয় শহরের জয়নগরের বাসিন্দা ইঞ্জিনিয়ারবাবুর স্ত্রী পারমিতার সাথে । প্রায়শই শুনতে শুনতে ভুবনেশ্বরের কথা বেশ ভাল লাগে পারমিতার । তার প্রতি দয়া হয় , শিহরণ জাগে । ভাবে - কত কষ্ট করেই না ভুবনেশ্বর বেঁচে আছে । প্রতিনিয়ত জীবন যুদ্ধ করে । সপ্তাহ দুয়েক বাদে ভুবনেশ্বর এই গলি দিয়ে যাচ্ছিল । গেইটে দাঁড়ানো পারমিতা দেখল ফেরীওয়ালা যেন আজ একটু বিমর্ষ । নীরবেই যেন প্রাণচঞ্চল লোকটি চলে যাচ্ছিল , হঠাৎ পারমিতার দয়া হল ডাক দিল 'ভুবন' বলে । ডাক শুনেই ভুবেনেশ্বর ঘুরে দাড়িয়েছে এবং এক পা দু'পা করে পারমিতার সামনে এল, জিজ্ঞাসায় পারমিতাকে বিমর্ষ মুখে বলল - দিদিমনি ছেলে জয়ন্তটাকে নিয়ে বড় ভাবনায় আছি ।

কৌতুলহী পারমিতার প্রশ্ন কেন , কি হয়েছে তোমার ছেলের ?

মনে হচ্ছে আমি আর ওর পড়াশুনা চালাতে পারব না । এবার পরীক্ষায় ভাল ফল করে ক্লাস টেনে (দশম) উঠল । পাঁচ / সাতশো টাকার বই খাতা কিনতে হবে । স্কুল ড্রেস তৈরী হবে , কীভাবে যে কী করি । সারাদিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খেটে বড়জোর চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা রোজগার , তার উপরে চারটি পেট । শ্যামনগর কলোনীতে যখন ছিলাম তখন পরের জমিতে বর্গা চাষ করে অন্তত বছরের ধানটুকু সংগ্রহ করতে পারতাম, আজ আর এ কথা বলেও লাভ নেই । শ্যামনগর স্বপ্নই থাকুক, কারণ ওখানে আর যেতে পারব না । যদি যাই হয়ত স্ত্রী , পুত্রকেও খোয়াতে হবে উগ্রপন্থীদের দৌরাত্মে । শ্যামনগরবাসী এখন কে কোথায় তাও বলা মুস্কিল । কাঁচা পাঁকা , খোঁচা খোঁচা দাড়ি , মাঝ ময়সী রুগ্ন লম্বাটে লোকটার দীর্ঘশ্বাস। দিদিমনি আমার ছেলের ব্রেনটা খুব ভাল ছিল । ছোটবেলা থেকেই স্কুলের স্যাররা বলত , জয়ন্ত তুই তোর বাবার নাম উজ্জ্বল করবি । স্কুলের স্যারদের বাড়ীতেও ছেলেটা তার পড়াশুনা বুঝিয়ে দেন কারণ তাঁরা জানেন আমার তো সামর্থ্য নেই । অনেক বই টইও দেন কিন্তু কত দিন । নিজেরই মাথা গুজবার ঠাঁই নেই তবুও ইচ্ছে ছিল যদি ছেলেটা .... ।

এসব শুনে মায়ের মন বলে কথা, পারমিতার মন গেল । কারণ গত বছর পারমিতার ছেলে সৌগত রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে স্টার পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছে। কিন্তু মিশন স্কুলের ইংলিশ বইতো নিশ্চয়ই ফেরীওয়ালার ছেলের চলবে না । তাই কিছু না ভেবেই হঠাৎ বলল ভুবন তুমি একটু দাড়াও, এই বলে ঘরে গিয়ে দুটি একশ টাকার নোট নিয়ে এল ভুবনেশ্বরকে দিয়ে বলল - ভুবন আপাতত এই দুশো টাকা রাখো । পরে দেখি তোমাদের বাবুকে বলে তোমাকে আর কোন সাহায্যে করা যায় কিনা।

ফেরিওয়ালা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল, পৃথিবীতে সবার মন যদি এত বড় হত। সামান্য হরেক মাল নিয়েই কত লোক কত কথা শোনায় আর ইনি এত দয়ালু আমাকে ছেলের লেখা

পড়ার জন্য দুশো টাকা দিয়ে দিল । আপন মনে গুনগুন করতে করতে ভুবনেশ্বর রওয়ানা হল এবং সবাইকে বলতে বলতে চলল দিদিমনি বড় ভালো মানুষ, টাকা দিয়েছে । দুশো টাকাই হোক না কেন অন্ততঃ ভুবনের কিছু দুঃখ ঘোচাবে ।

এমন করে ২/৩ বছর কেটে গেল । ফেরীওয়ালা এখন আর গলিতে গলিতে হরেকমাল তিন টাকা করে চিৎকার করে না । সে ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনীতে রিক্সা ভ্যানে করে চা- বিস্কুট বিক্রি কবে, সাথে পান সিগারেটও । অফিসের বাবুরা চা -পান সিগারেট খান । আগের তুলনায় ভুবনেশ্বরের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতিও হয়েছে । খুব সকালে দোকান খুলে অফিস ছুটির পরে সে রিক্সা সাথে নিজের বাড়ির দিকে ধাবমান ।

ইত্যবসরে ভুবনেশ্বরের ছেলে জয়ন্ত মাধ্যমিকে অতুলনীয় ফলাফল করে এবং শিক্ষকদের সক্রিয় সহযোগীতায় ভুবনেশ্বরের ছেলে জয়ন্ত ন্যারিষ্টে সুযোগ পেয়ে নর্থইষ্ট রিজিওনাল ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স এ ভর্তিহয়ে যায় । শিক্ষকরাও আর্থিক সহায়তায় এগিয়ে আসেন । ভুবনেশ্বরও একবার শিক্ষকদের আনুকুল্যে অরুণাচল প্রদেশে গিয়ে নির্জুলীতে তার ছেলের সাথে দেখা করে, প্রাণপ্রনে আর্শীবাদ দিয়ে আসে ভাল করে লেখাপড়া করার জন্য ও ইঞ্জিনীয়ার হয়ে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য । ছেলেকে তাও বলে আসে - বাবা শিক্ষাই জীবনের মূলমন্ত্র । তুই পড় । আমার রক্ত মাংস যতক্ষণ আছে আমি তোকে পড়াবই । এদিকে জয়ন্তর সাথে সৌগতের পরিচয় । ওরা একই কলেজে পড়ে এবং সৌগত ওই কলেজের সিনিয়র স্টুডেন্ট । সবাই জয়ন্তকে ভালবাসে । ছেলেরা সবাই জানে ওই কলেজের জয়ন্ত খুবই গরীব ঘরের ছেলে, তাই জয়ন্ত সবার কাছেই সহানুভূতি পায় । ক্রমে জয়ন্ত থার্ড ইয়ার এ উঠে এবং ছুটিতে বাড়ীতে আসে, সিনিয়র সৌগতের বাড়ীতে যায় কিন্তু সৌগতের মা পার মিতা জানে না এই সেই জয়ন্ত যে নাকি ফেরীওয়ালা ভুবনের ছেলে । যাই হোক পরদিন জয়ন্ত সন্ধ্যায় তার বাবাকেবলে আমি সৌগতদার বাড়ী থেকে এসেছি । জিজ্ঞাসায় ভুবনেশ্বর জানতে পারে সৌগতের বাড়ী জয়নগর । তখন পরিচয় পেয়ে ভুবনেশ্বর বুঝতে পারে । তাহলে সৌগতই পারমিতা দিদিমনির ছেলে । ছেলেকে বলে কাল আমাকে পারমিতা দিদিমনির বাড়ীতে যেতেই হবে ।

পরদিন বিকেলে হঠাৎ ফেরীওয়ালা ভুবন আবেগমিশ্রিত চোখে মুখে পারমিতা দিদিমনির বাড়ীতে এসে হাজির । হাতে নিয়ে এসেছে ঘরের তৈরী ক্ষীরের সন্দেশ । গদগদ কণ্ঠে বলল, দিমিনি আপনার আর্শীব্বাদে আমার ছেলেটা মাধ্যমিকে খুব ভাল রেজাল্ট করেছে এবং স্কুল শিক্ষকদের সহায়তায় এখন অরুণাচলে ন্যারিষ্টে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারীং পড়ে সেখানে আপনাদের রাজা অর্থাৎ সৌগতও পড়ে এবং আরো বলল ওরা একে অপরকে চিনে । সব কথা শুনে পারমিতা চমকে গেল

এবং চোখ বড় করে বলল ও তাই নাকি ! যাক তুমি ফেরী করলেও ছেলেটা কিন্তু কাজে লাগল । বা বেশ ভাল , খুশী হয়েছি। ভুবনেশ্বর বলল দিদিমনি আমি খেয়ে না খেয়ে প্রয়োজনে ভিক্ষা করে যেভাবেই হোক ওকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করাবই - আপনাদের ছেলের মত । এ কথা শুনে পারমিতার ঈর্ষা হল । ভাবল , সামান্য ফেরীওয়ালা সমকক্ষ হতে চায় যাই হোক ক্ষোভটুকু কিছু সময়ের জন্য চেপে রাখল কিন্তু তা যে সম্ভব নয় । আভিজাত্যর মাঝে যেন ভয়ংঙ্কর আঘাত , তাই ভুবনেশ্বর পিছু ফিরে যেতেই পারমিতা ভুবনেশ্বরের দেওয়া সন্দেশের প্যাকেটটুকু সামনের নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। হীরা ছাই চাপা দিয়ে রাখা যায় না , প্রমাণিত সত্য ।

****

নিষ্ঠুর বাস্তব

ত্রিপুরা থেকে আগত ছোট্ট খামে রেজিষ্টার্ড চিঠি । ঠিকানায় নিচে লেখা প্রেরকের নাম পরেশ মামা । ওরা আমার ঠিকানা পেল কোত্থেকে । অবাক মণিশঙ্কর । ২৫/৩০ বছর তো হবেই বা আরও বেশী সময় হতে পারে । ওর বিশাল চেম্বারে একজিকিউটিভ টেবিলে অন্য চিঠির সাথে এ চিঠিটাও পড়ে ছিল । কালো কালিতে বাংলায় লেখা ঠিকানা ।

রিসিপসনিষ্ট খামের মুখটা খুলে দিলেন মণিশঙ্করবাবুকে । চিঠিটা হাতে নিতেই হাত যেন একটু কাঁপছে । জীবনে এত সুপ্রতিষ্ঠিত সফল মানুষটির যেন বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে । ভাবতে লাগল জাগ্রত স্মৃতি ,বিস্মৃতি লুকিয়ে থাকা পাহাড় জুরে যেন ধ্বস নামবে এক্ষুনি । তাই তৎখনাৎ খামের ভেতরে লুকানো চিঠিটা আর পড়ার সাহস পেলো না মণিশঙ্করবাবু। এত বছর পর এমন একটা চিঠি যা ওর কাছে অভাবনীয় । একলা , কোন ও দুর্বল মূহুর্তে , কিংবা হঠাৎ কোন ও কারণে নিজ গ্রাম কলকলিয়ার কথা মনে পড়লেও মণিশঙ্কর ভেবেছিলেন জীবনের বাল্য , কৈশোরের সেই ১৮ টি বছর হয়ত পৃথিবী থেকে মুছে গেছে । প্রতিষ্ঠা ও জীবনের আর্থিক প্রাচুর্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে তার শৈশব , কৈশোরের সেই গ্রাম । অতীতের এই ইতিহাসকে তিনি কলকলিয়ার গ্রামেই ফেলে এসেছেন । এখন অর্থ ও যশের মাঝেই তার আসন । কিন্তু এই একটি সামান্য চিঠি হারিয়ে যাওয়া মণিশঙ্করকে যেন অট্টালিকা থেকে টেনে বের করে আনল ।

নিজের অফিসকক্ষেই এয়ার কন্ডিশন মেশিনটা ফুল স্পীডে চলছে তবুও যেন ঘামছেন। মণিশঙ্করবাবু যেন অস্থিরতায় ভুগছেন, মাথা যেন ঘুরছে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসে, ঘরের সাজানো ফটোগুলি যেন অস্বচ্ছ ও অলৌকিক, চোখে ভাসছে ছনের চালের ভাঙ্গা বেড়ার ঘরে " মা বাবার " সাদাকালো ছবি। ছবির কোনো আবছা অক্ষরে যেন কি লিখা। ওই তো কলকলিয়া গ্রামের একটি ছনের ঘর, বাঁশের তৈরী দেওয়াল। সকাল নয়টা কী সাড়ে নয়টা। মণিশঙ্কর নামে এ গ্রামের একটা ছেলে। পরনে সাদা জামা ও ব্লু রংয়ের ছেঁড়া হাফ প্যান্ট, দুটো বই খাতা নিয়ে মার সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ত। প্রাইমারী স্কুলের পাঠ চুকিয়ে জাঙ্গালিয়া হাইস্কুলে প্রবেশ। বাল্যকালেই মণিশঙ্করের পিতা মারা যান। ছেলের লেখাপড়া ও অন্নের সন্ধানে মা সারাদিন সাহা চানাচুর কোম্পানীতে কাজ করতেন এবং সন্ধ্যায় পর কলকলিয়াতে মহেশবাবুর বাড়ীতে ধান চালের মিল এ কাজ করতেন। পরেশ দা উনি মহেশবাবুর ছেলে এলাকাতে স্বজ্জন হিসাবেই পরিচিত। আর্থিক সচ্চল এই পরিবারের করুণা বরাবরই মণিশঙ্করের উপর ছিল। মণিশঙ্করের মা সন্ধ্যারাণীকে পরেশবাবু বোনের মতই স্নেহ করতেন এই সুবাদে মণিশঙ্কর পরেশবাবুদের ভাগ্নে হিসাবেই পালিত হতো। প্রায় সর্বদাই মণিশঙ্করের পড়াশুনায় মহেশবাবুর পরিবার আর্থিক সহায়তা করতেন। এই ভাবে মণিশঙ্কর সায়েন্স নিয়ে জাঙ্গালিয়া স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ২টি লেটারসহ হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে এবং তারপর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে স্থান পায়। ছেলে দূরে ডাক্তারী পড়তে যাবে তা ভেবে মণিশঙ্করের মা সন্ধ্যারাণীর মুখের রঙ বদলে গেছে। দু- তিনবার লুকিয়ে দেখেছে মণিশঙ্কর। মায়ের কষ্ট উপার্জ্জিত যৎসামান্য পয়সা ও মহেশবাবুদের আর্থিক সহায়তায় মণিশঙ্কর এবার দূরে পাড়ি দেবে। মায়েরও ইচ্ছে একবার জীবনে অন্তত ছেলের সাথে ঘুরে আসি। মহেশবাবুর নিদ্দেশে পরেশবাবু, সন্ধ্যারাণী ও মণিশঙ্কর ত্রিপুরা থেকে কোলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। জীবনে প্রথম এরোপ্লেন চড়া, মায়ের বাঁ হাতে একটা কাপড়ের ব্যাগ তাতে ওর পুরনো জামা প্যান্ট, দাঁতের মাজন, চিরুনি, আয়না এক শিশি নারিকেল তেল, এক টোঙা আরো কী সব।

পরেশবাবু মণিশঙ্করের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছেন, কি, রে, ভয় করছে নাকি ? দূর, ভয় কিসের !

ওখানে দেখবি তোর বয়সী কত ছেলে আছে। তাদের সঙ্গে দোস্তি হয়ে যাবে। মা নীরবে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মায়ের ফর্সা হাতে শুধুই একটি লোহার চুড়ি। পরনে নীলচে রং এর সাদা শাড়ী। মাথায় আলতো ঘোমটা। সার্ট প্যান্ট লাগানো শান্ত সৌম্য পরেশবাবু। উনিও কলকলিয়া এলাকার প্রথম বি. এ.পাশ ছেলে। প্লেন থেকে নেমে সোজা ট্যাক্সি করে হাওড়া, হাওড়া ট্রেন ধরেই পরেশবাবু মণিশঙ্কর ও তার মাকে নিয়ে হুড়মুড় করে ট্রেনে উঠে পড়ল। মণিশঙ্কর ও তার মার এই প্রথম ট্রেনের অভিজ্ঞতা, মা বলছে মণি দাঁড়িয়ে কি দেখছিস, তুই এখানে বসবি আয়। পরেশবাবু বললেন না সন্ধ্যাদি আপনি বসুন। মণিশঙ্কর অবাক বিষ্ময়ে দেখছে অনেক গাড়ী, ট্রাম ডিপো,

ট্রেনের ভেতরে পুলিশ, দূরে সার বেঁধে কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি । মণিশঙ্কর সেই প্রথম দুচোখ ভরে দেখছে এত বড় একটা শহর । নানা ধরনের বাড়ী , গাড়ী , মানুষ , গির্জা , মসজিদ, মন্দির , কোথাও রাস্তায় পুলিশ হুইসল বাজাচ্ছে । ট্রেন থেকে যে বাড়ীগুলো দেখছে , তা দেখতে যেন রাজপ্রাসাদ , ভারী চমৎকার । আদৌ ,ও যেখানে থাকতে যাচ্ছে , যার নাম হোষ্টেল , সেখানকার বাড়ীগুলোও কি এমন সুন্দর ।

পথ কি ফুরিয়ে আসছে ? ট্রেন চলতে চলতে মণিশঙ্কর পরেশবাবুকে দেখে আসা হাওড়া ব্রীজের কথা বলতে লাগল , যা নাকি পরেশবাবুই তাকে দেখিয়েছে । ওরে বাবা , এত বড় ব্রীজ , লোহার থামের গায়ে হাজার হাজার উঁচু পাহাড়ের মত । এগুলো কি রে বাবা ! মোটা মোটা পেরেকের মাথা । পরেশমামাকে কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করে কলকলিয়া গ্রামের রমেশবাবু কাঠের নানা আসবাব তৈরী করে , তার কাছেও মণিশঙ্কর কত ধরণের পেরেক দেখেছে ।

গঙ্গা ! পরেশমামার চোখেও যেন বিস্ময় । ওরা যাচ্ছে ওপর দিয়ে , কত নীচে কাদা কাদা ঘোলা জল । নৌকা ভাসছে। কয়েকটা ছোট ছোট জাহাজ । কত মানুষ চান করছে , গঙ্গা যেন সমুদ্র।

ষ্টেশনে নেমেই পরেশবাবু বললেন - সন্ধ্যাদি একটু পরেই বর্ধমান মেডিকেল কলেজে যাওযার গাড়ি আছে , পা চালিয়ে আসুন ।

মায়ের চোখ কি ছল ছল করছে । মণিশঙ্কর বুঝতে পারছে না । মাকে এত কষ্টেও কখনও সহজে কাঁদতে দেখেনি । স্কুল থেকে ফিরেই মণিশঙ্কর সব সময় মার হাতে ভাত খেতো । কষ্টের মাঝে ও ঢেকে রেখে দিত জলে ভেজানো ভাত আর তরকারী । ইস্কুল থেকে ফিরে মণিশঙ্কর খাবে । ইস্ হোষ্টেল গিয়ে মণিশঙ্কর আদরের মণি আর মায়ের হাতে রান্না খেতে পাবে না । ভাবতে মার গতি ধীর হয়ে আসছে ! সন্ধ্যারাণী কান্না সম্বরণ করে , কারণ মা কাঁদলেই ছেলের মুখও যে সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে যাবে । কারণ , অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সন্ধ্যারাণী ছেলে মণিকে এখানে নিয়ে আসা, ছেলেকে বলে এ সুযোগ হারাসনি বাবা । দেখছিস তো আমাদের অবস্থা তুই যদি পড়াশুনা করে দাঁড়িয়ে যেতে পারিস, তাহলে আমি মাথা তুলে পথ চলতে পারব । ভগবান আমাদের মেরে রেখেছেন, তোর বাবাকেও নিয়ে গেছেন এপার থেকে ।

ছেলে মণিকে ভর্ত্তি করিয়ে হোষ্টেলে দিয়ে মা চাপা স্বরে বলল - মণি ভাল করে লেখাপড়া করবি, শরীরের নজর রাখবি। টাকা পয়সার কথা ভাববি না । তোর পরেশমামুরা তোর জন্য সব সময় থাকবে । বিদায় বেদনাদায়ক । মার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে । মণি অবাক, মা তো এত সহজে কাঁদে না । বাবার কথা মণিশঙ্করের ভাল করে মনেই নেই । লেখাপড়ার মাঝেই মণিশঙ্করের উপলব্ধির জগৎটাও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে । এখন কত বন্ধু ওর - পঙ্কজ , সিন্ধু, দিবাকর , রতন, সুকোমল। মণিশঙ্করের সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু সুকোমল বোস । ও কিছুতেই মিথ্যে বলে না । কোলকাতার নামী দামী উকিলের ছেলে । ভীষণ চুপচাপ , সারাদিন বই পড়তে ভালবাসে । মণিশঙ্কর ওকে

বলেছিল , তোর সঙ্গে আমার সর্ম্পক আজীবন থাকবে । এটা ছিল সুতীব্র আবেগ । আবেগ বলেই এই আজীবন বন্ধুত্বের এই শব্দটা একদিন হারিয়ে গেল বাতাসের মতো, মেডিকেলে ভাল রেজাল্ট করে চিরদিনের মত কলেজ ও বন্ধুত্ব ছেড়ে মণিশঙ্কর বিদায় নিয়ে চলে এল সুকোমলের কাছ থেকে। লেখাপড়া তার অর্জিত । কেউ কেড়ে নিতে পারবে না । কিন্তু কী হল শেষ পর্যন্ত । বিবেকের দংশন।

জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু । গ্রমের বাড়ী কলকলিয়া এখন সংকোচ , মহেন্দ্রদাদু ইহলোক ত্যাগ করেছেন । মা সন্ধ্যারাণী বললেন দাদুর সঙ্গে তোর দেখা হল না । এটা তোর দুর্ভাগ্য ।

- মা কি চাইছিল কে জানে । কেই বা এখন এর তোয়াক্কা করে । জীবন যে কোথাও থেকে থামে নি । সম্ভবতএটাই কলকলিয়া গ্রামে মণিশঙ্করের শেষ পদক্ষেপ , ছেলের দারুন পরিবর্তন তবুও মা খুশী । ছেলে ঘর ছেড়ে এখন কোলকাতা শহরে পুনরায় পাড়ি দিল । ছেলে যে ডাক্তার তবুও মার ভাবনা আমার মণি এখ নো ছোট রয়েছে ।

জনস্রোত , তিলোত্তমা নগরীতে মিশে গেল মণিশঙ্কর । পিছু ফিরে তাকানোর ফুরসৎ তার নেই। ক্রমে মুম্বাই বাসিনী ধনপতি বাবার মেয়ে লীলাবতীর সাথে ভালবাসা । পিছে পড়া গ্রাম কলকলিয়া এখন অতীত স্মৃতি থেকেও দূরে । মুম্বাইবাসিনী যুবতীর ধনকৃপায় এম.ডি.ডিগ্রী লাভ । এখন মণিশঙ্কর আর কলকলিয়া গ্রামের ছেলে নয় । মুম্বাই শহরের যশস্বী ডাক্তার । যশ ও অর্থের প্রাচুর্য্য মণিশঙ্করের অতীত ছিনিয়ে নিয়ে গেল । গ্রামের বাড়ী , মা সবই যেন স্মৃতি থেকে দূঁরে । প্রাচুর্যের ছোঁয়া লেগেছে মণিশঙ্করের আবেগে । পুরানো স্মৃতি , মায়ের সাথে দারিদ্রতার দিনগুলো হয়তো মুছে গেছে । ২৫টি বৎসর অতিক্রান্ত , বয়স ৪৩ এর গোঁড়ায় । কে রাখে দারিদ্রতা ও অভাগিনী মায়ের খবর । যাই হোক চিঠি খুলেই চোখ ছানাবড়া । পরেশমামার লেখা , পত্রিকায় ঠিকানা পেয়ে আপনাকে লিখছি । আজ থেকে প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে আপনার মা চিকিৎসার কারণে দুঃসহ যন্ত্রণায় মারা গেছেন । সুযোগ্য ডাক্তারবাবু কি গর্ভধারীনি মাকেও দেখার ফুরসৎ পেলেন না ?

মণিশঙ্করের মনে পুঞ্জীভুত অন্ধকারের খুব দ্রুত যে ব্যাথা ২৫ বছর আগে তার সঙ্গে পরিচয় ছিল । তবুও মণিশঙ্কর থামতে পারছেন না । চিঠিটাই যেন তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন । সুদুর মুম্বাই থেকে ছুটে এলো অজান্তে সেই বাল্য কৈশোরের গ্রাম কলকলিয়ায় । সে যে অনেক পরিবর্তন । পিতৃভূমি আজ অনাথদের পাঠশালা । যা মা সন্ধ্যারাণী মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করেছিল । মায়ের সাথে পূর্ণ মিলন যে আর সম্ভবও নয় । শুদ্ধির দিন আজ আর নেই । শেষ শ্রদ্ধা জানাবার শ্মশানটুকুও নেই । ১২ বছর আগে বিজয়নদীর তীরে মা সন্ধ্যারাণী পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছেন । “মণি” “ মণি”- চিৎকারটুকুও আজ গ্রামের লোকের কাছে স্মৃতি । অতীত বেদনাবহ , সন্ধ্যারাই জ্বলন্ত প্রমাণ । বাস্তব বড্ড নিষ্ঠুর ।

অচেনা পথের যাত্রী

কৈশোরের মানসিক কোলাহল আর হাজারো কল্পনাপ্রসূত স্বপ্নে বিভোর অরুণের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল হয়ত বাস্তবের নিষ্ঠুর করাঘাতে । ঘুম থেকে উঠেই অরুণ দেখতে পেল প্রখর গ্রীষ্মের রোদ উঠার আগে মহড়া দিচ্ছে । অরুন ভাবল তাহলে আমি কি প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপ ? কারণটা ছিল বেশ ভোরে ওটাই তার অভ্যাস যদিও রাতে শুতে তার প্রায়শই দেরী হয়ে যায়। তারপর বড্ড গরম। ভোর ভোর উঠে ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগাতে লাগাতে রাখাল বন্ধুদের সাথে গবাদি পশুর ঘাস সংগ্রহ করতে যায় । কথাগুলো মনে হতেই বিছানা ছেড়ে উঠে বসল অরুন । রাত্রে ঘুমানোর আগে খুলে রাখা গেঞ্জি দিয়ে ঘাড় ও বুকের ঘাম মুছতে দেখতে পেল তার সাথীরা কাজ সেরে ফিরে যাচ্ছে। অরুণ ঘুম থেমে উঠেই ভারী গলায় বলে উঠল , ওরা সবই স্বার্থপর , ওপরে ওপরে শুধু ভালো মানুষি দেখাই , অরুণের শরীরটা যেন অলস হয়ে আছে , রাতে তো ভাল ঘুম হয়ই নি । তারপরও যেন কোন এক ঘটনা মনে ঘচঘচ করছে । যাকগে , অরুণের স্বপ্নটুকু ভোলার হিম্মত নেই তার আগে কিছু

বলতে বলতে , সকালে ওঠে , রাজপথে বেরিয়ে পড়ে । কি জানে কাকে দেখে মনে মনে বেশ আনন্দিত হয় ।

আজ তার ঘুম ও ভাঙ্গেনি , শেষ রাত্রেই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিল , আর কেউ ওঠায়নি কেন কে জানে । অরুণ দেখে শ্যামু নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে হিহি করে হাসে , অরুণদা আজ লেট, কী স্বপ্ন দেখছিলে গুরু । শ্যামুর সাথে সাথে তার বন্ধুরাও হেই অরুণদা হেই অরুণদা করতে থাকে। অরুণ দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে । কারণ অরুণ বেশ বদমেজাজী ছেলেও বটে । অরুণ মনে মনে ভাবে - শালা , মজা করার সময় পাওনি। যাই হোক অরুণ আর ওদের দিকে না তাকিয়ে নিজেকে খুব সামলায় । সকালবেলা থেকেই অরুণের মাথাটা হেঁট হয়ে গেল । মা করছেটা কী ? আমাকে তো উঠিয়ে দিতে পারত । অরুণ রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখল মা উনুনে "চা" করার জন্য জল চাপিয়েছে। এই সময় মার ওপর একচোট ধমকানি দিতে পারত অরুণ । যা সে সচরাচর করে থাকে । তার মনের পরিস্থিতি খুব গম্ভীর । অরুণদের এই বাড়ী পাড়াতে অনেক পুরনো বাড়ী । বৃষ্টির জলে মাটির দেওয়াল কোথাও কোথাও খসে গেছে । সেবার মাধ্যমিক পরীক্ষাটা । তার স্বপ্নের " পায়েল" এখন সম্ভবত সেভেনে বা এইটে পড়ে । কী হয়েছিল , পায়েল তার এক বড় বোনসহ প্রাতঃভ্রমণ করতে করতে অরুণদের ফুলের বাগানে । হয়ত পায়েলের সাথে অরুণের চোখ দেখাদেখি । পায়েলের বোধগম্য হোক বা নাই হোক অরুণ মনে মনে হয়ত কিছু ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ভেবেই ফেলেছিল , যার তার মার নজরও এড়াতে পারেনি। যাই হোক পায়েল চলে যাবার পরেই মার উক্তি "ইঁচড়ে পেকে গেছো। " তাই তোমার চলাফেরা জীবন যাত্রা সবটাই ছন্নছড়া , লেখাপড়ার খেয়াল আছে কিনা ? মায়ের প্রতি অরুরের সহানুভূতি থাকলেও সে মায়ের দিকে ফিরে তাকাতে পারল না , ব্যাপার একটাই যা এ বয়সটার ধর্ম্ম যেহেতু মা .... বারণ করেছে তাই । এর মাঝেই অরুণের মাধ্যমিক পাশ করা । কঠোর পরিশ্রমী ও একগুঁয়ে মেজাজের অরুণ কোন বাধা মানে না । অরুণকে আঘাত করলেই বোঝা যায় ।

বাবা শিক্ষকের চাকরী করেছেন এবং ও যখন সেভেন ক্লাসে পড়ে তখনই বাবা রিটায়ার্ড হয়ে যান । সুতরাং আর্থিক সমস্যা পরিবারে থাকাটা তো স্বাভাবিক , অরুণের সব জেদ ঠিক থাকলেও পায়েলের বেলায় সব গন্ডগোল হয়ে গেল । কোন ভাব প্রকাশ করতে না পেরে মনে মনে অরুণ খুব সঙ্কুচিত হয়ে যেত । হায়ার সেকেন্ডারী দিয়েছিল অরুন । পড়াশুনার পাট চুকিয়ে দিয়েছিল অরুণ । পড়াশুনার পরবর্তী অংশটুকু নিতান্তই একলা চলা । পরিশ্রমী অরুণ কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল বলে জঙ্গলে - পাহাড়ে ঘুরে সত্যিই যে কাজ অরুণ জুটিয়েছে তা অরুণের পরিবারের জন্য সুখবহ নয় তবুও ওকে বাধা দেবার সাধ্য আছে কার । ও তো বিগড়েই গেছে , বাড়িতে থাকে না , বিশেষ কারুর

সঙ্গে কথা বলতে চায় না । খিটখিটে মেজাজ , বন্ধু বান্ধব , আড্ডা , জীবন থেকে সহসা ছেঁটে ফেলেছিল , তবে জীবনে যে লেখাপড়া তাকে আত্মসম্মানে আঘাত করেছিল, সেই লেখাপড়া কঠোর পরিশ্রমের মাঝে করে সে অন্ততঃ লেখাপড়ায় উন্নতি সাধন করেছিল । লেখাপড়ার উন্নতির মাঝেই চাকুরীরও পরিবর্তন করেছিল । জীবনের আকাঙ্খাকে পূর্ণ করতে অরুণ কঠোর পরিশ্রম করে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আইনের স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে ও পরবর্ত্তীতে এম.এ পাশ করে , শুধু তাই নয় - পড়াশুনার ধারাবাহিকতা তাকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করে । অরুণের অগ্রগতি থমকে পড়েনি । এগোতে থাকে জীবনের জোয়ার ভাটাকে জীবনের সাথী ভেবে। আজ অরুণ প্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবসায়ী । কিন্তু অরুণের ব্যাক্তিত্বে মনে হয় ভয়ানক চোট পায়েল । একদিন প্রচন্ড ভীড়ে অরুণ দেখতে পেল মেয়েদের কী প্রচন্ড কষ্ট । স্পষ্ট দেখেছিল পেছন থেকে পায়েলের সাথে তার এক বান্ধবী অনিমা ভীড়ের চাপে পা সোজা রাখতে পারছে না মাঝেই একটা মাঝ ময়সী লোক অসভ্যতা করছে । এ ব্যাপারটুকু অরুণ সামলে নিতে পারে নি । পেছন থেকে গাড়ীর মাঝখানে এসে পৌঁছে এবং শুরু হয় প্রচন্ড বাকবিতন্ডা । যাই হোক এই প্রতিবাদের মানসিকতায় তৎক্ষণাৎ অনেক যুবক - যুবতীকে আকৃষ্ট করে , তারাও অরুণের পক্ষ নেয় ।

ব্যাপারটুকু যখন বেড়ে যাচ্ছে , তখন একজন ভদ্রলোক অরুণকে ও অন্যদের শান্ত করে ও নিজের বসার সীটটুকু অনিমাকে বসতে দেয় । তারপর থেকে অরুণ কখনো বাসে সীট পেলে স্কুল - কলেজের বা কোন মহিলাকে দিয়ে দিত । সে দিন অনিমাকে বসিয়ে দিয়ে অরুণের শান্তি । বাস চলতে শুরু করল । অরুণ দাঁড়িয়ে , পাশের সীটেই অনিমা বসা । অনিমার কত প্রশ্ন , আপনি কি করেন , বাড়ী কোথায় , কতটুকু পড়াশুনা , করেছেন , কিন্তু অরুণের সব নেভেটিভ রিপ্লাই । এবার অরুণ ভাবল - যদি আমি ওকে পাল্টা প্রশ্ন না করি তাহলে আমাকে নাজেহাল হতে হবে । অরুণের পাল্টা প্রশ্ন , অনিমা তোমার বাবা কী করে ? অনিমা হাসতে হাসতে বলে জমিদার । তাহলে তোমার বাবার অনেক জমি আছে বুঝি ? কিন্তু জমি তো আছেই যেহেতু - চন্দননগরে আমাদের গ্রামের বাড়ী , তাছাড়া আমাদের বাপ জ্যাঠাদের পুরানো ধানের ব্যবসা । তুমি এতদূর ,এত পথ হেঁটে তারপর গাড়ী চেপে পড়তে আস কেন , আবার এত কষ্ট করে যাও । শহরে থাকলেই তো পারতে । বা রে জানেন না বুঝি , গৃহস্থ ঘরের মেয়েদেরকেও অনেক কাজ করতে হয় । আমাদের কলেজে সায়েন্স খুব ভালো। তাছাড়া একসাথে ট্যুইসন সেরে যাই । আর কতদিন আছে , এই তো আর একবছর । অরুণ জিজ্ঞেস করলো এরপর কী করবে । চেষ্টা করবো নার্সের একটা চাকুরী জোগাড় করতে । নার্স হয়ে তাহলে কী করবে তুমি বলো তো ? অনিমার কাছে কথাটুকু বেমানান বলে মনে হয় । সে বলে উঠে যদি আপনি হসপিটালে ভর্ত্তি হন তখন দেখবেন আপনার সেবা করছি । অরুণ অসুখ বিসুখের কথা

শুনলে এমনিতেই প্রচন্ড ভয় পায় । তাই ভাবতে লাগল হাসপাতালে শয্যা , ঔষধ , ফিনাইলের গন্ধ, নার্সদের হাতে সেলাইনের বোতল , ইনজেকশানের সিরিঞ্জ ভাবতে ভাবতে ক্ষণিকের মধ্যে অরুণের মাথা ঘুরে উঠল । ভাবল সামনেই দাঁড়িয়ে লোম উঠা নেড়া কুকুরটা , কাজকর্ম বুঝি লাটে । তারমাঝেই গাড়ী থেমে গেল স্টপেজে , অনিমা জিজ্ঞেস করে উঠল আপনি চুপ কেন? অরুণ বলে উঠলো তোমাকে কী বলব , তুমি এমন একটা অপয়া কথা বললে কেন কে জানে ? তারপর গন্তব্যস্থান , বাড়ী ফেরার পথে অরুণ ভাবল পথে অনিমার সাথে পরিচয় । কিন্তু মন না জানা পায়েল কত সুন্দরী ওর নাকের কাছে তিলটা নাক চাবির মতো , কোমর ছাপানো লম্বা চুলগুলো যেন মেঘ গর্জ্জনে ময়ুরের পেখম আর টানা চোখগুলো যেন হরিণীর আহ্বান । থাক গে এসব , অরুণ ভাবল মিছিমিছি ভাবনা । প্রায় বছর দু-য়েক বাদে শহরের রাজপথে অনিমার সাথে অরুণের দেখা । কেমন আছ অনিমা । উত্তর - এই তো বেশ । কি করছ , যা বলেছিলাম , " পায়েল " কোথায় কেমন আছে, সে অনেক ব্যাপার। অরুণদা এখন সময় নেই , ডিউটির সময় হয়ে গেছে । পরে দেখা হলে বলব । তারপর কেটে গেলো দেখতে দেখতে 'ছ' মাস । স্বপ্নের পায়েল স্বপ্নের মাঝেই ঘুমিয়ে রইল । হঠাৎ একদিন সকাল দশটায় অরুণ ভাবল আমি কি বিভোর স্বপ্নে না সত্যিই বাস্তব দেখতে পাচ্ছি । অরুণ দেখতে পেল সুন্দর শ্যামবর্ণ সুঠাম ভদ্রলোক যেন কৃষ্ণ , সাথে গৌরবর্ণ সুন্দরী পায়েল কপাল জোড়া রক্তিম লাল সিঁদুরের সিঁথি ভরা কপালে উজ্জ্বল লাল ফোঁটা যেন সত্যিই শ্যাম বাঁশরীর রাধা , নীরবে নিভৃতে অরুণ দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করে মনে মনে ভাবল সত্যিই বিধাতার দরবারে উপযুক্ত বিচার হয় । তাই বিধাতা , রাধা, শ্যামের অপূর্ব জুটি মিলিয়েছেন । অরুণ পেল না , জুঁই ফুলের সুগন্ধি , বরংচ চেনা পথ আজ অচেনা অরুণের কাছে। অরুণ , বিধাতা সৃষ্ট পথের অচেনা পথিক ।
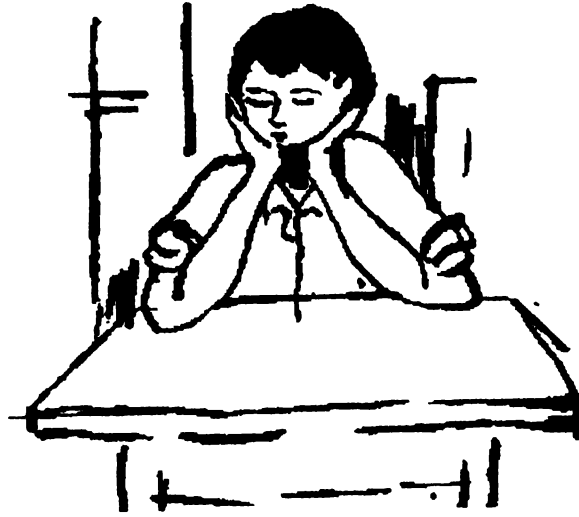
অমনটা হবে ভাবিনি

ছাই চাপা দিয়ে হীরা লুকিয়ে রাখা যায়না তা জানতাম । কিন্তু কত অপেক্ষায় পাওয়া যাবে তা জানতাম না । জানার আগ্রহ বরাবরই আমার বেশি ছিল । আমার অনুভব ছিল অন্ততঃ এক জীবনে সব আগ্রহ সঞ্চয় করা সম্ভব হবে না । স্বপ্নের ভাবনায় বিভোর হয়ে পূর্ব জন্ম থেকে এ অব্দি জীবনের স্বপ্ন তৈরী করে নিতাম । কৈশোর থেকেই জীবন নিয়ে ছক কষতাম। আমাদের একটা বড়ি বিল্ডিং - এর ক্লাব ছিল , প্রতিদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে ক্লাবে এসে শরীর চর্চা চলত জোরদার । আমি একটু পাতলা প্যাটার্নের ছিলাম বলে ক্লাবে তখন আমার পজিশনটাও একটু কমজোরি ছিল। তাই ওস্তাদের মন জুগিয়ে চলতে হতো । ফলে কখনো কখনো আমাকে ওয়েট দেওয়া হত তবে তাও কদাচিৎ । আমাদের ওস্তাদ ছিলেন পঙ্কজদা । বয়সটা ছিল ২৫/২৬ । সুঠাম চেহারা ছিল তার । সেই বয়সেই মোটামুটি এলাকারও দাদা বনে গিয়েছিল । স্বাভাবিকভাবেই তার কব্জার জোর ছিল প্রচন্ড বেশী। আমাদের ক্লাব ঘরটির পেছনে ছিল পুরানো ভাঙ্গা পাঁচিল । পাঁচিলের গায়ে ছিল নানা দলের পোস্টারিং । ক্লাব থেকে বের হয়ে যাবার পথে অন্য কোন কথা মনে রাখবো চান্স নেই বরং মানসপটে অংক স্যারের মুখটাই ভেসে উঠেছে যেন । মনটা তখনকার মত উদাসীন , নিস্তেজ , এমন সময় মনে

হল আমার মাথার উপর দিয়ে তীব্র বেগে শিস দিয়ে কে যেন আমায় জাগিয়ে দিল । কৈশোরের ঘুমটা আমার ভেঙ্গে গেল । স্কুল , স্কুলের পড়া , মা ,মা বলে ডাকতে ডাকতে বাড়ীতে ঢোকা - এসব নিয়ে কৈশোরের সময়টা যেন আমার থেকে পিছু হটে যাচ্ছে । কিছু পরেই যেন আমি যৌবনের এক কঠিন পরীক্ষায় ঢুকে গেলাম । আমিই যেন জীবনের কঠিন পরীক্ষায় বসে হীরে খুঁজতে গেলাম । ক্লাব , খেলাধূলো সবটাই যেন এক গোলক ধাঁধা । ক্লাবটার পেছনে ছিল এক পুরানো বাড়ী । মান্ধাতা আমলের প্ল্যানের তৈরী । এলোমেলো ছাদ , ছোট উঠোন , সরু রাস্তা সবদিকেই ঘর । অথচ বাড়ী থেকে কোন আওয়াজ বা শব্দ পাওয়া যেন দুস্ক র । যার কারণে বাড়ীর ভেতরকার পরিস্থিতি বুঝাও সম্ভব না । তা ছাড়াও বাড়ীতে সমবয়সী কোন ছেলেও নেই যার হাত ধরে অন্ততঃ বাড়ীটুকুর ভেতর উপলব্ধি করা যায় । তবে উপলব্ধি করা যায় বাড়ীটি খুবই প্রাচীন। আমার বাড়ীটি দেখার কৌতুহল। একদিন ভরদুপুরে পাঁচিলের গা বেয়ে একলাফে ভেতরে ঢুকলাম । সারি সারি পুরনো ঘর , দেখলে মনে হয় যেন পরিত্যক্ত। বহু পুরানো ব্যানার্জ্জী বাড়ী । ঘরের পাশে কলতলা । কলের পাশে সেঁতসেঁতে মাটি থেকে বুঁদ বুঁদ করে জল উঠছে সেই পুরানো কল থেকে । পাশে শ্যাওলা পড়া মস্ত বড় চৌবাচ্চা জলে ভাসছে । পা টিপে টিপে কাঠের পাটাতন পের হয়ে গেলাম রান্নঘরের দিকে । কিন্তু বাড়ীতে কোন সাড়া পেলাম না । কেবল আমাকে দেখে তারা খেয়ে পালাচ্ছিল একটা বেড়াল । একটু সামনে গিয়ে বেড়ালটা পুনরায় থ মেরে দাঁড়িয়ে গেল । হয়ত ভাবল ছোঁড়াটার দুঃসাহস কত, ব্যানার্জ্জী বাড়ীতে ঢুকে পড়েছে। মাথার উপর দেখতে পেলাম তারের ডগায় লাগনো ঝুলকালি মাখা বাল্ব । বাড়ীর নমুনা দেখে বুঝতে পারলাম বাড়ীতে লোক আছে অথচ আওয়াজ নেই । কীরে বাবা আমি কি কোন ভুতুড়ে বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি নাকি ? অমনিতেই একজন আমাকে দেখে ফেলেছে । দু'জন এসে দাঁড়িয়েছে পাশে , মুহূর্তের মধ্যে বিনবিন করে ঘিরে ধরেছে আমাকে কতজন, আমি ভাল করে দেখার কোন চেষ্টাই করিনি । আমি কোথা থেকে এসেছি , কি ভাবে এ বাড়ীতে ঢুকেছি এ নিয়ে যেন বিস্তর জল্পনা কল্পনা শুরু হযে গেল । তার মাঝেই মস্ত বড় সিঁদূরের ফোটা , লাল পাড়ের সাদা শাড়ী, শুভ্রকান্তি ভদ্রমহিলা এসে বলেই ফেলল কোন ,চোর , ডাকাতি , নাকি ? সুযোগ নিয়ে যদি ঘরে ঢুকে পড়ত তাহলে খাটের নীচে কে লুকিয়ে আছে কেই বা জানত । প্রকৃতপক্ষে যারা বাড়ীর বাইরের জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ , ঘরকোনে তাদেরও কিন্তু অভিজ্ঞতার অন্ত নেই । তাই আমার উপলক্ষে কত কথপো কথন, ঝোঁকের মাথায় লাফ দিয়ে পড়ার খেসারত , কত হয়রানি , তা থেকেও মনে হয় বেঁচে গেলাম " হীরার " জন্য । কারণ কথপোকথনের মাঝেই এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক ধবধবে সাদা ধুতি পরা হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি উত্তর পাড়ার রাম চৌধুরী পাড়ার ছেলে নাকি, উত্তর যখন পেলেন হ্যাঁ তখনই ডেকে বললেন " হীরা" দেখতো ছেলেটা তোদের স্কুলে
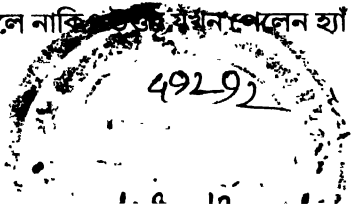
পড়ে কিনা ? আমার যে ন সমস্ত শরীর কাঁপুনি তখনও শেষ হচ্ছে না। হীরা বলল আপনি আশীষদা না, আসুন। নিজের হঠকারিতার জন্য ভয়ানক অনুশোচনায় আমাকে ভেতরে ভেতরে ডুকরে কাঁদিয়েছিল। কিন্তু প্রকাশ করতে পারিনি । হীরাকে চেপে রাখা যায় না এই পুরানো সত্যটুকু যেন পুনরায় হীরা নামের মেয়েটার মধ্যে ঘটেছে । এই বিশ্বাসটুকু আমার মধ্যেই হয়েছিল । না হলে আমার মত এক ছেলের এরূপ সমস্যা কেই বা নিজের বুকে নেবে ? আমার মনে হয়েছিল ঝকঝকে পরিস্কার ফ্রক পড়া মেয়েটি সত্যিই যেন জ্বলন্ত হীরা । কিছুক্ষণবাদেই শালোয়ার কামিজ পড়া ১৮/১৯ বছরের একটি মেয়ে এসে হাঁক দিল হীরা হীরা বলে । অমনিতেই ভয়ে পাথর তবুও হীরা থেকে জানতে পারলাম এই মেয়েটি তার বড়বোন "মুক্তা" । মুক্তা যেন মুক্ত দিয়েই তৈরী । মুক্তা হীরার দিদি । তার সঙ্গেই প্রেম ছিল পঙ্কজের । যে পঙ্কজদার সাথে সব সময় চামচাগিরী করে - সেই আশীষও জানতে পারল না , বুঝতে পারল না এ গোপন প্রেমের রহস্য । মুক্তার বাড়ীর লোক হীরাকে নিযুক্তি করে রেখেছে মুক্তার উপর নজরদারী করার উদ্দেশ্যে । সাধারণত দু' বোন যেখানেই যাক না কেন পঙ্কজ সে সময় পাড়ার দিলীপের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত আর অপেক্ষার অস্থিরতায় ঘনঘন সিগারেট ধরাত । ক্রমে ক্রমে আমি পঙ্কজের বডি গার্ড হয়ে গেলাম । কত মিথ্যাকে সত্য গল্প খাড়া করে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হত, উদ্দেশ্য শুধু পঙ্কজ আর মুক্তার গায়ে যেন কোন আঁচড় না লাগে। আমি যেন ছিলাম ওদের প্রেমের আকর্ষনহীন উপভোগকারী । ক্রমে ক্রমে পঙ্কজ মুক্তার মতো , মুক্তা ও হীরা দু বোন ঘনিষ্টতাও বেড়েই চলছিল । ক্রমে আমি পঙ্কজের বর্ডিগার্ড আর হীরা মুক্তার বডিগার্ড হিসাবে নিয়োজিত হয়ে গেলাম । হয়ত মুক্তার পরিবারের কনজার্ভেটিভ লোকজন কখনো লুকোচুরি খেলেনি । তাই পঙ্কজ আর মুক্তার লুকোচুরি খেলা বুঝলেও তাদের পক্ষে ধরা সম্ভব হয়নি । আর যতক্ষন চোর বামাল ধরা না পড়ে ততক্ষন চোরকেও চোর বলা মুশকিল । কারণ মুক্তারও কলেজ লেখাপড়া সবই ঠিক ,পরীক্ষার রেজাল্টও ভাল । একবার আমরা চারজনে , অর্থাৎ পঙ্কজ ও মুক্তা , আমি ও হীরা ঊনকোটিতে ভরদুপুরে , এর মধ্যে প্রবল ঘূর্নিঝড় , হঠাৎ খুঁজেই পেলাম না পঙ্কজ ও মুক্তাকে । প্রথমটায় খোঁজও করলাম না হীরার আকর্ষণে যেন আমি নিজেই হীরাতে আটকে গেছি । হঠাৎ যখন মনে পড়ল আর দেরী নয় তখনই উথাল পাতাল ঝড় উপেক্ষা করে হন্যে হয়ে আমি ও হীরা পঙ্কজ ও মুক্তাকে খুঁজতে লাগলাম, হীরা আনকোরা , তবে সতেজ , আমাকে বিশ্বাস করে। সুতরাং তাকে ফাঁদে ফেলাটা আমার উচিৎ হবে না । ঊনকোটি পাহাড়ে সবুজ বনানীর মাঝে মাঝে পাথরের গায়ে দেবদেবীর অভুতপূর্ব মুর্তির সব দৃশ্যই ভুলে আমি হীরাকে নিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো দুর্যোগ উপেক্ষা করে এলেপাথাড়ী ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দেখলাম পাহাড়ের গায়ে জলের ঝর্ণায় মুক্তা ও পঙ্কজ আলিঙ্গনরত অবস্থায় ভিজছে । এ যেন সর্বকালের সর্বশেষ তৃপ্তির

ছোঁয়া। মনে হচ্ছিল ভেজা মুক্তার শরীর থেকে সত্যিই ছুটে আসছে লুকানো মুক্তা - আমি নিজেকে সামলে হীরাকে নিয়ে পুনরায় ওর হাত চেপে দৌঁড়তে লাগলাম । আমার জীবনে এই প্রথম এত উত্তেজনাপূর্ণ মূহুর্ত । যাই হোক মুক্তা পঙ্কজের অ নুপ্রেরণা আমার আর হীরার প্রেমের জন্ম । কত দিন গহণ রাতে নিঃসঙ্গ বিছানায় প্রবল প্রেমসুখে শিহরণ দিয়ে ঘুম ভেঙ্গে যেত । আসলে পঙ্কজ আর মুক্তার আড়ালে আমি হীরাকে নিয়ে জীবন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম । সবে বার ক্লশ পাশ করে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছি । আমি জানি এ হীরার দাম আমি দিতে পারব না । তবু ও কেমন গোলক ধাঁধাঁ। এরই মাঝে পঙ্কজ কোলকাতায় চলে গেল এল,এল,বি পড়ার জন্য ।পঙ্কজের ফাইন্যাল ইয়ারে মুক্তা অনার্স সহ বি, এ পাশ করেছে । ব্যানার্জী বাড়ী উঠে পড়ে লেগেছে মুক্তার বিয়ের জন্য । যদিও আমার আর হীরার মধ্যে এ নিয়ে কথপোকথন হত , তবে হঠাৎ বিয়ে হয়ে যাবে তা ভাবিনি । মুক্তার অনুরোধে হীরা আমার থেকে ঠিকানা নিয়ে পঙ্কজকে চিঠিও দিয়েছিল । ভাগ্যের পরিহাস , মুক্তার বিয়ের দিন পঙ্কজ কোলকাতা থেকে বাড়ী এসে পৌঁছায় । মুক্তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে , সে বাড়ী ছেড়ে একজন অপরিচিত বরের সঙ্গে অন্য বাড়ীতে চলে যাবে , এতে অন্য সবার যতই আমোদ হোক , পঙ্কজ কি পুরোটা খুশী হতে পেরেছে ? পাশাপাশি হীরাও কি তার মন সামলাতে পারছে ? নিশ্চয় দিদির জন্য তার মন কেমন করছে । কিন্তু যখন বিয়ে বাড়ীতে হন্যে হয়ে খুঁজে পঙ্কজকে দেখতে পাচ্ছি না , তখন অবশেষে হীরাকে খুঁজতে শুরু করলাম । ভীড়ে ঠাসা বিয়ে বাড়ীর সমস্ত ঘর , গলি খুঁজে না পেয়ে পুকুরের ধারে গেলাম । পূর্ণিমা রাত্রি যেন আমাকে দেখে অট্টহাসি দিয়ে বলছে " আশীষ আর কাঁদিস্ না " ভাবলাম একি আমার ভ্রম নাকি ? যদিও পুকুরপাড় ও তৎসম এলাকা নির্জন জনমানবহীন বহ কাঁঠাল গাছের ছায়ায় কতকটা জায়গা অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে । গাছের ছায়ায় নীচে দুটো ভূত আমাকে ভেল্কিবাজি দেখাচ্ছে । অপার্থিব নীল মায়া জাগানো জোৎস্না আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে । সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে দেখি গাছের ছায়ায় কোন ভূত নেই । আলিঙ্গনাবদ্ধ মানব - মানবী । সে আর কেউ নয় , আমার স্বপ্ন সাজানো হীরা, আর মুক্তা, পরিত্যক্ত পঙ্কজ । আমার হীরা আমার থেকে হারিয়ে গেছে আর পঙ্কজ হীরা ছিনিয়ে নিয়েছে । একে অপরকে আসক্ত করছে - কথা দিচ্ছে " আমি তোমার" - তুমি আমার " বাধা দিলাম না , নীরব নির্জ্জন প্রেমে সন্তর্পণে ফিরে এলাম নিজের ঘরে, বুঝে নিলাম হীরা পাওয়া সত্যিই দুস্কর ।"

নিঃশব্দ প্রয়ান

জীবন কারো অপেক্ষায় বসে থাকে না । কালের গতির সাথে সাথে জীবনের গতিও ধাবমান জলের গতির মতো , এ কথাটুকু ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন বৃদ্ধ ধনঞ্জয়বাবু , তাই স্বগতোক্তি করে বলেছিলেন - যাকে ভালবাসি সে তো আর চিরদিনের জন্য নয় সুতরাং প্রথমে নিজেকেই বেশি করে ভালবাসে কারণ আমরা নিয়তিকে জানি না । যৌবনে ততটা তোয়াক্কাও করি না । বার্ধক্যই মানসপটে স্মরণ করিয়ে দেয় ফুরিয়ে যাওয়া দিনগুলোর অতীত স্মৃতি । পুরানো হাতঘড়িটা টেবিলের উপর টিকটিক শব্দে বেজে যাচ্ছে আর স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ধনঞ্জয়বাবুকে আজ থেকে প্রায় ৫০ টি বছর আগের কথা । প্রথম দিনটিতে এম. এ. পাশ করে ক্লাবে বসে অন্য দোসরদের সাথে দাবা খেলা কিন্তু তার ঠিক এক সপ্তাহ বাদেই এ সময়েই শিক্ষকতার কাজে যোগদান করা । ক্রমে ক্রমে এই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক । এলাকার পুরানো হাই স্কুল '' জাঙ্গালীয়া হাইস্কুল '' । আজ এই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক । সময়ের ব্যবধানে জীবনের দৃশ্য পরিবর্তন বড নিষ্ঠুর । বড় ছেলে দ্বিপায়ন বিয়ে করেছে । বদলী হয়ে এখন নিজের এলাকাতে এসেছে উত্তর ত্রিপুরা থেকে, সাথে পুত্রবধু শিল্পীকে নিয়ে । পুত্রবধু নতুন ঘর সাজিয়েছে , এঁটে দিয়েছে একটা দেওয়াল ঘড়ি ।

যা সে বিয়েতে পেয়েছিল । আপন গতিতে কারো তোয়াক্কা না করে ঘড়িটা চলছে ।

শুক্রবার সকাল দশটা । কৈশোরের বন্ধু " প্রতাপবাবু" বাড়ীতে এসে হাজির । এমনিতেও মাঝে মাঝে প্রতাপবাবু এ বাড়ীতে আসেন , কারণ উনিও রিটায়ার্ড । প্রতাপ রায় পুলিশ অফিসার ছিলেন । ঘোরাঘুরি করা উনার পুরানো অভ্যাস , তার উপর মোদ্দা কথা উনার সময় আছে , কারণ প্রতাপবাবু সংসার করেন নি । ধনঞ্জয়বাবু ও প্রতাপবাবু বন্ধু হলেও কিন্তু উনাদের উভয়ের কখনোও মতের মিল হয়নি । সব সময়ই অমিলটা উপলব্দি করা যেত । বোধ হয় দুজনের পেশা ধনঞ্জয়বাবু অনেকটা দুর্ব্বল , কারণ উনার চোখ অপারেশন হয়েছে দু -দুবার । তা ছাড়াও নানা রোগের উপসর্গ। পুত্রবধূ শিল্পীও একটা প্রাইভেট স্কুলে চাকুরী নিয়েছে । ছেলে দ্বিপায়নও চাকুরী করে । ওদের একমাত্র মেয়ে দেবলীনা নার্সারী স্কুলে পড়ে এবং সকাল ছযটার মধ্যে ওর স্কুলের গাড়ী ধরতে হয় । তারপর সাড়ে ১০ টার মধ্যে দ্বিপায়ন ও পুত্রবধূ বেরিয়ে পড়ে অফিসের জন্য । তার পর সম্পূর্ণ বাড়ী শুনশান । তবে প্রতাপবাবু যখনই আসেন তখন ধনঞ্জয়বাবু একা । কাজের লোকটা যাওয়ার সময় ফ্লাস্কে চা বানিয়ে রেখে যায় । প্রতাপবাবু লাঠি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ধনঞ্জয়বাবুর ঘরে এসে ঢুকলেন। দরজা খোলাই ছিল । পিট - পিট করে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল । প্রতাপবাবু ঢুকেই বললেন , কী রে তোর ঘরের চেহারাটা যেমন অন্যরকম লাগছে ।

উত্তরে ধনঞ্জয়বাবুর উক্তি - এখন কি আর আমার বলার কিছু আছে ? পুত্রবধূ যেভাবে রাখে ঠিক সে ভাবেই থাকতে হয় । চোখে খুব আবছা দেখি । পত্র পত্রিকাও পড়তে পারি না । মনে হয় যেন কোন বৃদ্ধ তোতাপাখী জীবন সায়াহ্নে খাঁচায় বন্দী। যাই হোক ফ্লাস্ক থেকে দু ' কাপে চা নিয়ে দু'বন্ধুতে আলাপ জুড়ে দিলেন । তারই মাঝে প্রতাপবাবু বলে উঠলেন - ধনঞ্জয় এ ভাবে দিনের বেলা হা করে দরজা খোলা রাখিস্ না । কেন ? তুই জানিস না , তিন চারদিন আগে তোর গলির সামনের গলির বৃদ্ধ নরেশবাবু উনার বাড়ীতেই খুন হয়েছেন । ধনঞ্জয়বাবু - একি বলিস্ ! আজ থেকে দু' মাস আগেও তো উনার সাথে রাস্তায় একসাথে মর্নিংওয়ার্ক করতাম । কিভাবে কি হোল বলতো ? প্রতাপবাবু বললেন - আজকালের ছোঁড়া তো । এই তো দিন ১০/১৫ হল নরেশবাবুর ছেলে ও বৌ নাতীকে নিয়ে কন্যাকুমারী ঘুরতে গেছে । বৃদ্ধ খিটখিটে বাবা, উনাকে নিয়ে কি হবে , তাই সঁপে গেছেন । ধনঞ্জয়বাবুর প্রশ্ন - তাহলে নরেশবাবু স্ত্রী কোথায় ছিল ? আরে ওটাও কি বুঝতে তোর দেরী হয় , ছোট নাতীকে তো বেড়াতে গিয়ে একজন রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে । তাই সাথে করে মাকে নিয়ে গেছে । কারণ একলা তো আর বাপের পক্ষে সম্ভব নয় । তারপর ? তারপর আর কি - বাড়ীর ঝি তো রান্নাবান্না করে সন্ধ্যায় চলে যায়। ঘরে নরেশবাবু একাই থাকেন । রাত্রে চোরের দল ঘরে ঢুকে পড়ে ।

নরেশবাবু তো এমনিতেই মেজাজী লোক ছিলেন । হয়তো ভয়ানক তর্কাতর্কি বেধে যায় । তখনই চোরেরা পেটে ছুরি বসিয়ে দেয় । রক্তে সমস্ত ঘর ভেজা । দরজা হাট করে খোলা ফেলে ওরা চলে গেছে, রাত্রে তো আর কেউ কিছু বলতে পারে না - পরদিন সকালে ঝি এসে দেখে দরজা খোলা, ঘরের মেঝে রক্তাক্ত অবস্থায় নরেশবাবুর নিথর দেহ পড়ে আছে । ঝি-র চিৎকার চেঁচামেচিতে লোকজন ছুটে আসে , পরে পুলিশও আসে , তদন্ত শুরু করে ডেড্‌বডি মর্গে পাঠায় । পরের দিন এলাকাবাসী ডেড্‌বডির সৎকার করে । তাহলে উনার ছেলে এখনও খবর পায়নি ? না - খবর পাঠানো হয়েছে । এখনও এসে পৌঁছায়নি প্রতাপবাবু বুঝলেন ধনঞ্জয় ভয় পেয়েছে ।

তুই কি ভয় পেয়েছিস ধনঞ্জয় ? যদি রাতে নরেশবাবু খুন হতে পারেন তো দিন দুপুরে আমার হওয়ার আশ্চর্য কি? এখনতো আর জীবনের তাড়া নেই । জীবনের স্রোত ক্রমশ ভেসে চলে যাচ্ছে ।

হ্যাঁ , প্রতাপ আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি । একলা তো আমিও থাকি । প্রতাপবাবু বলে উঠলেন- আমি তো সম্পূর্ণ একা। তোর তো ঘরে লোক আছে রে । ধনঞ্জয়বাবু রেগে উঠে বললেন - এটা এখন আর আমার কাছে বাড়ী না , একটা বদ্ধপাখীর খাঁচা । প্রতাপবাবুকে বললেন - প্রতাপ , তুই যদি তিনটা মানুষের সঙ্গে স্বাধীনতাহীন ভাবে একসঙ্গে বাস করিস , তবে তারা কি তোর পরিজন হয় ? দেখ না কারেন্ট চলে গেলে রাত বিরেতে একা ঘর থেকে বের হতে হলে তো আলোর দরকার । কিন্তু কোথায় টর্চ , দেশলাই, মোমবাতি । আমার এখন এদেরকে কিছু বলতেও ইচ্ছে করে না । আর তুই এদেরকে পরিবার পরিজন বলিস ? ধনঞ্জয়বাবুর স্বগতোক্তি - এখন মৃত্যুদিনের সন্ধান জানতে চাই । যতদিন তোর বৌদি বেঁচে ছিল ততদিন মনে হয় জীবনের আনন্দ ছিল । আজ আর নেই । সাথীহীন জীবন জলের স্রোতের মতো ঝাপ্টা মেরে চলে যাচ্ছে । এই ছেলে ছেলে বলে জীবনটাকে মরুভূমি করে দিয়েছি । ওকে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখাতে গিয়ে ওর মা আমার কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিল । এখনও মনে হয় হসপিটেলের বেডে সোজা হয়ে ঘুমিয়েছিল তোর বৌদি চিরনিদ্রায় । কিন্তু আর কখনো ঘুম থেকেও উঠল না বা একটা বারের জন্যও কোন কিছু বলে গেল না । নীরবে ছেলের দায়িত্বটা আমার কাঁধে দিয়ে চলে গেল ৩২টি বছর ছেলের দায়িত্ব পালন করলাম , বিনিময়ে আজ আমি খাঁচায় বন্দী এক পাখী । বেঁচে থাকাটা যদি বাঁচার মত হয়, তাহলে এর থেকে বেশি আনন্দ আর কিছুতেই নেই । কিন্তু আমার সে আনন্দটা বহু আগে ফুরিয়ে গেছে । ভেবেছিলাম ছেলে বড় হলে ঘর সাজাবে । আমার জীবনে পুনরায় আনন্দ ফিরে আসবে , কিন্তু তা নয়রে । প্রতাপ , জীবনের একটা হাওয়া আছে, কখনও ঝোড়া কখনও ঝিরি ঝিরি । কখনও বা মৃদু , কিন্তু আমার জীবনের মূল হাওয়াটাই ছিল ঝোড়ো। তবুও কেন মিছিমিছি ভয় পাই । মনে হয় এটা আমাদের আদিম স্বভাব বলেই । কারণ আমরা জানি আমরা অমর নই । আমাদের মৃত্যু হবেই । কিন্তু

প্রাণীদের এই ব্যাপারটা জানা নেই । তাই আমাদের মৃত্যুভয় বেশী । আসলে তো জীবন কারুর মুখ চেয়ে চলে না । নদীর জলের মতো কারো অপেক্ষা না করে সময়ে ধাবমান । বাল্য গড়িয়ে কৈশোর, যৌবন , বার্ধক্যে নাটকের অবসান ।

প্রতাপ চলে গেলেন । একা মানুষ ঘরে বসে ভাবেন মানুষ কত বদলে গেছে । আগে মানুষ সংঘবদ্ধ থাকতে ভালবাসত , এখন শুধু ছোট সংসার । মাতাপিতাও এখন বোঝা বনে যায় , তাই বিয়ে থা করিনি মনে হয় ভালই হয়েছে প্রতাপবাবু আজও জানেন না তার ভালবাসার কোন যুবতীর কথা । সেই যুবক সময়েই দাক্ষিণ্য তিনি পেতেন কিনা বা বিয়ে নামক সামাজিক সংসার কতদূর করতে পারতেন তাও জানেন না । বাল্যকালে যার মা বাবা বিদায় নেয় সেকালের ইতিহাসে সে অভাগা বলেই বিবেচিত । সুতরাং সর্ম্পক করতে গেলে পরিচিতি তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় অগ্রগণ্য হতো হয়ত । বিয়ে না করার এটাও একটা কারণ । তবুও হয়ত তিনি প্রত্যাশী ছিলেন । তারপর বেশ কিছুদিন প্রতাপবাবু আর ধনঞ্জয়বাবুর কাছে আসেননি । যাই হোক ১৫/১৬ দিন বাদে একদিন ধনঞ্জয়বাবুর বাড়ী আসার জন্য প্রতাপবাবু রওয়ানা হন ।

বাড়ীর কাছাকাছি এলে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রাতপবাবুকে জিজ্ঞেস করেন , কোথায় যাচ্ছেন ? উত্তরে প্রতাপবাবু বলেন ধনঞ্জয়বাবুর বাড়ীতে ,প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন ধনঞ্জয়বাবু আর নেই । হতবাক প্রাতাপবাবু কিছুক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞেস করলেন - কি হয়েছে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের উত্তর - এ জমানায় যা হয় । ছেলে , ছেলের বৌ - নাতনী কেউই ঘরে ছিলেন না । বাড়ীতে জল না থাকায় বাধ্য হয়ে বাড়ীর পেছনে পুকুরে স্নান করতে যান । আর উনার পুকুর থেকে উঠে আসা হয়নি । সন্ধ্যার পর প্রাণহীন নিথর দেহ ভেসে উঠল পুকুরের জলে । আসলে যখন ধনঞ্জয়বাবু বুঝলেন এ বাড়ীটা তার বাড়ী নেই , বন্দীগৃহ । তখন আর মৃত্যুভয় কিসের ? ঘরেও মন রইল না । জলে ফুলে যাওয়া শরীরের অন্ত্যেষ্টি হল , কিন্তু " প্রতাপ" খবর পেল না ।

এখন প্রতাপ পথ চলেন । পথও কথা বলে । চলার গতি কমে গেছে । লাঠি এখন তার পরম বন্ধু । পরিচিতি সব অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে । বিষন্ন , নিঃসঙ্গ । বয়স বাড়ে , শরীর কৃশ হয় । ভাল মন্দের উপমা বদলায় । পাপ পুণ্যের হিসেব নেই। ভয়ও নেই । জীবনের অধ্যায় বদলে গেছে , নদী সাগর হয়ে মহাসাগরের পথে, জীবনের যবনিকা - জীবন এক স্রোতস্বিনী নদীর মত প্রবল বেগে ধায়। কূল কিনারা ভেঙ্গে মহাসমুদ্রে পাড়ি দেয় , যেখানে কোন হিসেব নেই ।

ভুলের অবসান

রিটায়ার্ড লাইফটা যে এত একা তা কখনো ভাবতেও পারেননি মণীন্দ্রবাবু । সময় কাটানো যে এত কঠিন ব্যাপার কে জানত। চার রুম বিশিষ্ট বৃহৎ টিনের ঘর , ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন মণীন্দ্রবাবু । তখনও রাত্র হয়নি । না দিবা না নিশি অর্থাৎ শীতের গোধুলিলগ্ন । সামনেই মণীন্দ্রবাবুর নিজ হাতের গড়া সাজানো ফুলের বাগান । সারিবদ্ধ নানা রং বেরং এর জবা , হাইব্রীড গোলাপ , বাকী কতকটা জমি ন্যাড়া ।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক লক্ষ্য করে ঘরে ঢুকে পড়লেন মণীন্দ্রবাবু । অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন একটা ফটোগ্রাফের দিকে ,যার নীচে লিখা ১৭ই ফাল্গুন । হ্যাঁ, এই তারিখটাই ছিল উনার দেখার মূল বিষয়বস্তু । অনেক কথা মণীন্দ্রবাবুকে ভাবিয়ে তুললেন কিন্তু কাকে বলবেন । মনে হল যেন মুকের ভেতর অজানা কোন যন্ত্রণা উনাকে ভুগাচ্ছে । ফটো আর দেওয়াল তো আর কথা বলে না , তাই কিছুক্ষণ বাদে উনার ইমোশানও কমে এল । চোখে মুখে যেন তেজ ভাব ফুটে উঠল - নিজেকে যেন ভয়ানকভাবে শক্ত করে নিলেন ।

মণীন্দ্রবাবুর ঘর ছাড়া বাকী তিনটি ঘর , ঠিক পাশের ঘরটি খুব সাজানো গোছানো যেন কোন

নব পরিণীতার হাতে সাজানো, ঘরটাতে যেন সব আছে কিন্তু কোন মানুষ নেই ।

মণীন্দ্রবাবুর দুই ছেলে সত্যব্রত ও প্রিয়ব্রত । গোটা বাড়ীটাই নিঃশব্দ কারণ প্রিয়ব্রত দুপুরে খাওয়া ও রাতে ঘুমানোর সময় ছাড়া বাড়ীতে থাকে না । সে বি. এ পাশ করেছে এখন ঠিকাদারী কাজ করে । নিশ্চয়ই এ সময় পাড়ার ক্লাবে আড্ডা দিতে গেছে, রাতে ফিরবে তাও অন্ততঃ দশটা /এগারটায়, কেবল রান্নাঘরে টুকটাক শব্দ শোনা যাচ্ছিল হয়ত রান্নাঘরে মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী পারুলদেবী রান্না করছে। মণীন্দ্রবাবু বের হতেই পারুল দেবী জিজ্ঞেস করলেন বেরুচ্ছে নাকি ? মণীন্দ্রবাবুর ক্রোধ যেন খামকা বেড়ে গেল - বের হবো না কি ঘরে বসে ডিমে তা দেবো ? পারুলবালা জবাব দিল না, সে জানে গত ৭/৮ মাস যাবৎ লোকটা যেন কেমন খিট খিটে মেজাজেব হয়ে গেছে ।

মণীন্দ্রবাবু থমমে দাঁড়িয়ে গেলো, বলে উঠল, "চা" দেবে নাকি ?

পারুলবালা বলে উঠলেন চা ০খাবে ? চা হল, দু কাপ । রান্নাঘরেই ডাইনিং চেয়ারে বসে পড়লেন মণীন্দ্রবাবু । চারটি ডাইনিং চেয়ার । ডাইনিং টেবিলে সাদা চিনে মাটির তৈরী জলের জগ । মুখোমুখি বসে মড়লেন মণীন্দ্রবাবু ও পারুলবালা । চায়ের কাপে এক চুমুক দিয়ে মণীন্দ্রবাবু উনার স্ত্রীকে বললেন চারটি চেয়ার যেন প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশী মনে হচ্ছে। একটি চেয়ার সরিয়ে নিলে জায়গাটাও ফাঁকা হবে আবার চেয়ারটার আয়ু বাড়বে । আসলে মণীন্দ্রবাবুর এই কথার পেছনে একটা ক্রোধ বারংবার উনাকে ধাওয়া করছিল । চা - খেতে খেতে স্বামী স্ত্রী উভয়ের যখন কথোপকথন চলছিল তখন পারুলবালা আর নিজেকে সম্বরণ করে রাখতে পারলেন না । আবেগ ভরা চোখে মণীন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন - হ্যাঁ গো আমাদের 'সত্য' কী আর কখনো ঘরে আসবে না ?

মণীন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ উদাস চোখে বাইরের জগৎটাকে একবার জানালা দিয়ে লক্ষ্য করে নিজের অভিমানকে বুকে চেপে রেখে রক্তাক্ত চোখে মুখে চোয়াল লক্ষ্য করে গুরুগম্ভীর স্বরে বলেন সবই ফিরে আসবে যখন পেটে আর ভাত জুটবে না । প্রাইভেট ফার্ম, কি ভরসা চাকুরীর, যখনই তালা ঝুলবে তখনই বেহায়ার মত মাথা নীচু করে ঘরে ফিরবে - তখন সব অপমানের শোধ তুলে নেব ।

মায়ের মন বলে কথা পারুলবালা মণীন্দ্রবাবুকে বললো, তুমি কেমন মানুষ গো? ছেলের উপর কি প্রতিশোধ নেওয়া যায় ?

মণীন্দ্রবাবু, কেন নেওয়া যাবে না, যে ছেলে বাপের মানমর্যাদার কথা চিন্তা করে না, বাবার মাথা কেটে দেয় তাকে কি অমনি ছেড়ে দেওয়া যায় ।

এই তো আজ সকালে বাজার করে ফেরার পথে দক্ষিণ পাড়ার দেবরায় বাবুতো বলেই ফেললেন - কী ব্যাপার মণীন্দবাবু এত বড় বাড়ী, এত সুখ, সব ছেড়ে শুনলাম আপনার ছেলে বউ ও নাতনী'কে নিয়ে ভিন্ন হয়ে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল । আপনাদের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না বুঝি ? হায় হতভাগ্য

বাপ - এ যুগের ছেলেপুলেরা - তাই হয় , বউদের হাতের পুতুল আর মা - বাপকে বৃদ্ধ বয়সে

পারুলবালা চোখের জল মুছতে থাকে দেখে মণীন্দ্রবাবুর ভয়ানক গোসা হয়ে গেলেন , বলে উঠলেন কুষ্মান্ড ছেলে পেটে ধরেছো , কত যত্ন করে বড় করেছ । ছেলে বিয়ে করার পর দেশ জানিয়ে নববধূকে ঘরে এনেছ , নতুন বউ এর কষ্ট হবে বলে অসুস্থ শরীরে দিন রাত হাঁড়ি জ্বেলেছ , একটি বারও বউকে কাজের জন্য হাঁক দাওনি । নাতনীকে কোলে করে ঘুম পাড়িয়েছ, নাতনীকে মা বাবার আদর দিয়েছ । সুতরাং এখন আর কেঁদে কী লাভ হবে । বুকে পাথর চাপা দাও , কারণ এতটুকু করার পুরষ্কার তাই হয় । তোমার ছেলে সত্য একটা বেইমান । চা -খেয়ে কথপোকথন এর পর মণীন্দ্রবাবু সেকেলে টর্চটা ও অপর সঙ্গী লাঠিটা হাতে নিয়ে বলে উঠেন তুমি যেমন মা আমি ও তেমনি বাপ , দেখি 'সত্য 'কতদিন তার শ্বশুর বাড়ীতে থাকতে পারে । আমার জেদটুকুও তুমি বুঝ না. এবার বুঝবে , তার পর বিড়বিড় করতে করতে মণীন্দ্রবাবু বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পড়লেন ।

স্থানীয় বাজারে ঢুকার আগে ভুবন ঠাকুরের চায়ের দোকান যেখানে সব রিটায়ার্ড মানুষদের আসর । সন্ধ্যার পরে যদি ও মণীন্দ্রবাবু প্রথমে এই আসরে বসতেন না কিন্তু নাতনীটা বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার পর উনিও এই আসরে বসেন । যদিও মনে মনে ভাবতেন কখন গল্পের ছলে কেউ আমার পারিবারিক সত্যটুকু জিজ্ঞেস করে ফেলেন । সেদিন তাই হল । মণীন্দ্রবাবুর দীর্ঘদিনের দোসর পরেশবাবু সবার সামনেই জিজ্ঞেসা করে ফেললেন , বৌদির সাথে কি সত্যর বউ -এর সব সময় ঝগড়াঝাটি হত ? নাকি ছেলে সংসারে পয়সা করি দিত না বা তার শ্বশুরবাড়ীর কোন কূট কৌশল আছে ? মণীন্দ্রবাবু বুঝলেন মানমর্যাদা তো সবটাই গেলো । ঘরের ঝগড়া এখন ভুবন ঠাকুরের চায়ের দোকানে । যাই হোক শক্ত করে ব্যাপারটুকু খোলসা করে উনি প্রমাণ করতে চাইলেন উনার স্ত্রী পারুলবালা নির্দোষ । যদিও সাময়িক মন হাল্কা হয়েছে , কিন্তু বুকের জ্বালা যে ক্ষিদের থেকেও বেশি, তাকে কি সম্বরণ করা যায় । তবে কিছুই করার নেই । কারণ রিটায়ার্ড লাইফ বড়ই নিঃসঙ্গ । বিশেষ করে ছোট নাতনীটা যাওয়ার পর মণীন্দ্রবাবুর সময় যেন কাটতেই চায় না । যার দরুন ভুবনঠাকুরের দোকানের চায়ের আড্ডা থেকে দূরে সরে থাকাও উনার পক্ষে সম্ভব হয়নি । পরের দিন যথারীতি মণীন্দ্রবাবু সন্ধ্যার সময় ভুবনঠাকুরের চায়ের দোকানে আসেন। দোকানে ঢুকেই মণীনদ্রবাবু শুনতে পেলেন উনার দোসর পরেশবাবুর উচ্চস্বরে কথা বার্তা । মণীন্দবাবু মৃদুভাবে জিজ্ঞেসা করলেন পরেশবাবুকে - হঠাৎ করে চটে গেলেন কেন । উত্তরে পরেশবাবুর বললেন আজকের কাগজ পড়েননি ? ধর্মনগরের মাড়োয়ারীদের প্লাস্টিক কারখানা যেকোন সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং রাজধানীতেও তাদের মেইন অফিস বন্ধ করে দিয়েছে । বুঝতে পারছেন না কেন আপনার সত্য যেমন বেকার হবে তেমনি আমার ঝুটনও এই ফ্যাক্টরীতে চাকুরী জুটিয়েছিল। বলুন তো ছেলেটা নতুন বিয়ে করেছে

উপায়টা কি হবে? আপনার শিক্ষিত ছোঁড়া তো ওখানকার ম্যানেজার, আমার ঝুটনতো যাই হোক সেলসম্যান হিসাবে কাজ করত, যাই মাইনে পেত তাতে মোটামুটি ভালই চলছিল। বলুনতো এখন কি হবে উপায় সব কিছু শুনার পর মণীন্দ্রবাবু জবাব না দিয়ে আর পারলেন না - বলে উঠলেন, মাড়োয়ারীদের লাভ না হলে ওরা ব্যবসা চালাবেই বা কেন? সুতরাং ফ্যাক্টরী বন্ধ হবে, তাই কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

মণীন্দবাবুর কথা শুনে পরেশ বাবুর যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি ঘটলো - রোষে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন আপনার কথাবার্তা মশাই প্রতিক্রিয়াশীলদের মতো - আপনার ছেলে সত্যও তো না খেয়ে মরবে ওর মত কত বি. এ পাশ এখন ঘোড়ার ঘাস কাটে। আড্ডায় সবাই ভেবেছিল পরেশবাবুর এ কথা শুনে মণীন্দ্রবাবুর বুকে বাজ পড়বে। কিন্তু না মণীন্দ্রবাবু উপরন্তু বলে উঠলেন। তাই নাকি? তাহলে বলুন তো কবে নাগাদ ফ্যাক্টরী বন্ধ হবে? এ কথা শুনে সবাই হতভম্ব হয়ে মণীন্দ্রবাবুর মুখে তাকিয়ে রইলেন, ভাবলেন নিজের ছেলে যে ফ্যাক্টরীতে একটা ভাল কাজ করে ওই ফ্যাক্টরীটুকু বন্ধ হবে এমন কু - সংবাদ শুনেও এত উৎফুল্ল তা যেন অবিশ্বাস্য। উনার মাথায় কি কোন দোষ পড়েছে নাকি?

চা দোকানের মালিক ভুবনঠাকুর বলেই ফেললেন মণীন্দ্রবাবুর চিন্তা কিসের! নিজের জায়গা জমি আছে। পেছনে তো আর কারো চিন্তা নেই। প্রিয়ব্রতও কাজে লেগে গেছে। সুতরাং ফ্যাক্টরী বন্ধ হলে উনার কি আসে যায়? মরণ হবে তো পরেশবাবুদের এবার রেগেমেগে ভুবনঠাকুরের দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং বলে উঠলেন - শুনুন মণীন্দ্রবাবু, যাওয়ার আগে একটি কথা বলে যাচ্ছি - যা দিন আসছে তাতে ব্যাগ ভরে বাজার করে বাড়ী ফিরে যেতে পারবেন না। ভুখা শ্রমিক হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে যাবে, তখন কিন্তু তাদের কোন দোষ হবে না এখন চলি'।

মণীন্দ্রবাবু কিন্তু ভয়ানক নীরব। তিনি কোন কথার উত্তর দিলেন না। কারণ তার মনের ভেতরে ফ্যাক্টরীর সামনে বিরাট বড় তালা ঝুলছিল। ফ্যাক্টরীর গেট বন্ধ ফ্যাক্টরীর চিমনীতে ধোঁয়া নেই।

সেই সূত্রে নাতনী ও বউকে নিয়ে ভিন্ন হয়ে শ্বশুর বাড়ী যাওয়া সত্য আবার মাথা নীচু করে ঘরে ফিরে এসেছে। মায়ের পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করছে, মা আমাদের ক্ষমা করো, চোখ বুঝে ভাবতেও আনন্দ হচ্ছিল মণীন্দ্রবাবুর। আবেগ জড়ানো চোখ। চোখ খুলতেই দেখেন সবাই চলে গেছে। ভুবনঠাকুর দোকান গুটিয়ে নিচ্ছেন। পরেশবাবুর অর্বতমানে আড্ডাটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ভুবনঠাকুরেরও তাড়া আছে সেও দোকান বন্ধ করে ফেলবে। রাস্তায় বেরিয়ে দেখেন কারেন্ট চলে গেছে। অন্ধকারে টর্চ হাতে লাঠি নিয়ে যেতে যেতে মণীন্দ্রবাবু নিজেকে বড্ড একা মনে করছিল।

ভাবতে ভাবতে চললেন । ছোট ছেলে প্রিয়ব্রতও যদি বিয়ের পর এভাবে ভিন্ন হয়ে যায় । কারণ আজকালকার ফ্যাশান - বিয়ের পর আলাদা হওয়ার মানসিকতা । আরো ভাবেন আমাদের যুগে তো সবাই একসাথে থেকে দারুণ আনন্দ পেতাম কিন্তু ওরা ভিন্ন হয়ে কি সুখ পায়। এই মানসিকযন্ত্রণাটুকু তো ওদের জীবনেও আসবে । কিন্তু কে বোঝাবে ওদের ।

রাস্তা চলতে চলতে মণীন্দ্রবাবুর বুকটা যেন কান্নায় ভরে উঠল । ছোট নাতনীটাকে তো কতদিন ধরে দেখিনা । কোলে নিয়ে আদরও করতে পারি না । কতদিন হলো কচি মুখে দা-দা ডাকও শুনি না । পথ যেন ফুরোচ্ছে না ।

রাত্রিতে মণীন্দ্রবাবু ও ছোট ছেলে প্রিয়ব্রত খেতে বসল , হঠাৎ প্রিয়ব্রত বলে উঠল - বাবা বড়দার ঘরের খাটটা খুলে ফেললেও জিনিষগুলো সরিয়ে দিলে খুব ভালো হতো । তাহলে ওখানে আমি ঠিকাদারীর কিছু মালপত্র রাখতে পারতাম । শুধুশুধু ঘরটা খালি ফেলে রেখে কী লাভ ।

মণীন্দ্রবাবু একটু হেসে বললেন - লোক নেই তাতে কী হলো ? লোক আসবে । প্রিয়ব্রত অবাক হয়ে বলল - মানে ? তাহলে তুমি কি ঘর ভাড়া দেওয়ার মতলব করেছ ? না - না ভাড়াটাড়া ওসব নয় - তাহলে কী খুলে বলো । ভাড়া আমি দেবো না । সত্যই বাড়ী ফিরে আসবে বউ নাতনীকে নিয়ে । আমি কনফার্ম করেই বলতে পারি কারণ ওদের ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে গেছে। ধর্মনগর - আগরতলা দু' জায়গাতেই । পারুলবালার শরীরটা যেন হিম হয়ে গেছে । বলে উঠলেন তোমাদের কে এ দুঃসংবাদ দিলো ? কে আর বলবে সত্য ঘটনা কি কখনোও গোপন থাকে । যাও খোঁজ নিয়ে দেখো । ছেলের চাকুরী গেছে শুনে কী কোন মা আর ভাত খেতে পারে । তাহলে সত্য বৌমা ও নাতনীকে নিয়ে কোথায় যাবে , কি করবে ।

ঝুটন পাড়ারই ছেলে । সত্য তাদের ফ্যাক্টরীতে কাজ করে , আগরতলায় পোষ্টিং । সত্য থাকতে সব সময় আসত এখন আর আসে না । সত্য যখন নেই এখন আর এসে কী করবে । তবে মণীন্দ্রবাবু মাঝে মাঝে রাস্তায় তাকে দেখতে পান ।

একদিন শীতের বিকেলে মণীন্দ্রবাবু বারান্দায় বসে আছেন একা , এমন সময় হাতে একটি ব্যাগ নিয়ে ঝুটন আসছে । চোখে চোখ পড়তেই ঝুটন বলে উঠল কেমন অছেন মেসোমশাই ? মণীন্দ্রবাবুর চটজলদি উত্তর - ভালই তো আছি । কারণ পৃথিবীতে কারো জন্য কিছু আটকে থাকে না। বেশ খোস মেজাজেই তো অবসর জীবন কাটাচ্ছি । তা তুমি বাইরে দাড়িঁয়ে কেন ? ঘরে এস, কারণ মণীন্দ্রবাবু জানেন ঝুটন, সত্য আলাদা হওয়ার ব্যাপার স্যাপার সবই জানে , যেহেতু বন্ধু ।

ঝুটন ঘরে এল । মণীন্দ্রবাবু একথা সেকথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করে ফেললেন শুনলাম তোমাদের ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে গেছে। - হ্যাঁ মেসোমশাই , বন্ধ হয়ে গেছে । আর সেই চিন্তাতেই তো ঘুমোতে পারছি না কিভাবে যে বাঁচব । এ কথা শুনেই পারুলবালা পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন । উদ্বিগ্ন স্বরে

বললেন বাবা আমার সত্য কেমন আছে ? ওর সঙ্গে কি তোমার দেখা হয় ।

সত্যর কথা শুনাটাও যেন মণীন্দ্রবাবুর কাছে পাপ । সরে এলেন ঘর থেকে , জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে কান পেতে রাখলেন । ঝুটন বলে উঠল - ও হয়ত জানে না আমাদের ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে গেছে । কারণ ১৫/২০ দিন আগেও বউদির শরীর অসুস্থতার কারণে শিলচর গেছে চিকিৎসা করাতে । ইস্ কী কষ্ট , এ কথা বলেই পারুলবালা কেঁদে ফেললেন । গলা ভাঙ্গা । বলে উঠলেন - ঝুটন সবই কপাল বাবা । ঠিকই বলেছেন মাসীমা না হলে কী আমাদের এ দশা হতো । শুনেই পারুলবালা ডুকরে কেঁদে উঠলেন । মণীন্দ্রবাবু সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠলেন - কাঁদছ কেন ? ও তোমার ছেলে নয় । ও একটা অসভ্য ছেলে । বরংচ তোমার আর একটি ছেলে আছে ওর কথা ভাব । তাতেও পারুলবালার কান্না থামল না । বরং আরো অজস্র প্রশ্ন বুকের মধ্যে উঁকি মেরে উঠতে লাগল । বউমা, একমাত্র নাতনী, সবার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল , কিন্তু মণীন্দ্রবাবুর কঠোর চাইনীর কাছে পারুলবালা আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেলো না । ঝুটন বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে বলল আজ আসি মাসীমা । পারুলবালা চোখের জল মুছে বললেন " এসো বাবা" । শুধু বললেন - বড্ড দুশ্চিন্তায় আছি বাবা। কয়দিন বাদেই ঝুটন একদিন এদিক ওদিক চেয়ে মনীন্দ্রবাবুর ঘরে ঢুকে পড়ে । তখন ঘরে মণীন্দ্রবাবু নেই । ঝুটন পারুলবালাকে পায়ে ধরে বলে উঠল - মাসিমা আমাকে বাঁচান । মাসীমা - আর কতদিন ,আর ,এখন যে কোন উপায় নেই ।এসব শুনে পারুলবালার চোখে জল এল । ২/১ মিনিট নীরব থেকে বললেন - একটু অপেক্ষা কর , তারপরেই মণীন্দ্রবাবু শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। তখন মণীন্দ্রবাবু ঘরেই ছিলেন না । কিছুক্ষন বাদে ঘর থেকে বেরিয়ে ঝুটনের হাতে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা গুঁজে দিল ,বললেন - বাবা একটু অপেক্ষা কর । বলে ঘর থেকে কেজি পাঁচেক চাল , কিছু ডাল, আলু , পেঁয়াজ ব্যাগে পুরে দিয়ে বললেন যা বাবা । এত দান পেয়ে ঝুটন খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলল মাসীমা এ যুগেও আপনার মতো মা আছে । তারপর ঝুটন বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়ল । রাস্তায় মণীন্দ্রবাবুর দেখা । মণীন্দ্রবাবু দু' হাতে ব্যাগ বাজার করে বাড়ী ফিরছিলেন । ঝুটন জিজ্ঞাসা করলে উত্তর করলেন আমি কখনোও কি খারাপ থাকতে পারি । তুমি কেমন আছে । বলে উত্তর পাওয়ার আগেই মণীন্দ্রবাবু বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন । মণীন্দ্রবাবু বাড়ীতে এসেই সোজা রান্না ঘরে ঢুকে ব্যাগ দুটো রাখলেন । তখন পারুলবালা ব্যাগ খুলে মাছ সব্জী ব্যাগ থেকে বের করেই সশব্দে কেঁদে উঠলেন । মণীন্দ্রবাবু আবারো বললেন - তোমার যখন তখন - কান্নাটা থামাও তো । যে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে তার জন্য অত চিন্তা করে লাভ কী । ওর শ্বশুরবাড়ীই তো আছে , ওরাই সামলাবে। একসময় রান্নার কাজটা সেরে পারুলবালা নীচে কুয়োতলায় গিয়ে স্নান করে বসলেন পূজোর আসনে। হাত কেঁপে কেঁপে ফুল দিয়ে শুধু বলে চলল - ঠাকুর ওদেরকে দেখো - এই সুযোগে মণীন্দ্রবাবু বড়

ছেলে সত্যের ঘরের দিকে হাটতে হাটতে গেলেন । যাওয়ার পরক্ষণেই যে মণীন্দ্রবাবুর কান্না পেয়ে গেল । পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন । - কার জন্য এত দুঃখ । ছেলে কি এখন আর আমাদের আছে । এখন তার শ্বশুরবাড়ীর লোক আছে ।

দুপুরে খেতে বসে মণীন্দ্রবাবু ছোট ছেলে প্রিয়ব্রতকে বলে উঠলেন · হ্যাঁ রে সত্যর বউ এর নাকি শরীরটা খুব খারাপ ও নাকি নিজেও সুস্থ নয় । সাথে সাথে প্রিয়ব্রত কটুক্তি করে বলে উঠল - বাবার যেমন হঠাৎ করে বড় ছেলের জন্য বেশী দরদ হতে শুরু করেছে । সাথে সাথে মণীন্দ্রবাবু চুপ। পারুলবালা বলে উঠলেন - দরদ হবেই না কেন ? ছেলে তো বটে ।

প্রিয়ব্রতর এবার তির্যক মন্তব্য - যাও তাহলে হাতজোড় করে ডেকে নিয়ে এস- এবার পারুলবালা অনুনয় বিনয় করে বলে উঠল - প্রিয় বাবা যা -না একবার ওদেরকে দেখে আয়না । খবরটা নিয়ে আয় না । প্রিয় রাগে জ্বলে উঠল , বলেই ফেলল - সাবধান মা, তোমার দরদ হয় তো তুমি যাও । আমি যদি মরেও যাই তা হলেও আমি দাদার শ্বশুরবাড়ী যাব না । ওদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই । তোমার যতসব ন্যাকামী । যে ছেলে একবার মা বাবা ভায়ের কথা ভাবল না । তারজন্য এত চিন্তা।

বেশ কিছুদিন দারুণ মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে কাটল মণীন্দ্রবাবু ও পারুলবালার । উঠতে বসতে শুধু ছেলে , বৌ ও নাতনীর জন্য চিন্তা । অথচ কিছুই মুখে প্রকাশ করার জো নেই । মুশকিল বেশী হল মণীন্দ্রবাবুর ,কারণ বড় ছেলে সত্য কখনো বাপের মুখের দিকে চেয়ে কোন কথা বলেনি । - আজ এ ছেলে না জানি কত কষ্টে দিনাতিপাত করছে । মাঝে মাঝে মনে হয় নিজের সন্তানের দুঃখে যে সুখী হয় সেতো মানুষ নয় , সে নরখাদক ।

মণীন্দ্রবাবুর দুশ্চিন্তা মণীন্দ্রবাবুকে কুরে খাচ্ছে , কিন্তু কি করা যায় উপায়ান্তর খোঁজে পান না। একদিন সকালে বাজার সেরে আসার পথে চা দোকানের মালিক ভুবনঠাকুর মণীন্দ্রবাবুকে ডেকে বললেন - শুনেছেন ঝুটন ও তার স্ত্রী অভাব অনটনের যন্ত্রণায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে এবং একটি চিরকুট লিখে গেছে । বেকার শ্রমিকের বেঁচে থাকা যে কী কষ্টের তা কেউ জানে না । তাই অভিশপ্ত জীবনটাকে নিজের হাতেই শেষ করে দিলাম । কথাটুকু শুনে মণীন্দ্রবাবু চোখ মুছতে মুছতে যন্ত্রণায় তিনি ও ভুগছিলেন । কিন্তু তাও নিঃ স্তব্ধ , ভাষাহীন , পরদিন সকালে প্রিয়ব্রত টিফিন করে বেরিয়ে পরে কিছুক্ষণ বাদে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ীতে ফিরে আসে , একটা খবরের কাগজ নিয়ে । চিৎকার দিয়ে বলে উঠে - ও বাবা শুনেছ , সর্বনাশ হয়ে গেছে , দাদার বন্ধু ঝুটন আত্মহত্যা করেছে অভাবের তাড়নায় ।এবার মা পারুলবালার কান্না থামায় কে? সমস্ত বাড়ীতেই যেন নিস্তব্ধ পাষানভূমি।

সিদ্ধান্ত হলো পরদিন সকালের বাসে করে মণীন্দ্রবাবু ও প্রিয়ব্রত ধর্মনগর যাবেন । নাতনীকে, ছেলে ও বৌ সমেত বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন । বিধাতার কি পরিহাস ! সন্ধ্যা হয় হয় প্রিয়ব্রত

বাবাকে বলছে - বাবা আমাদের কিন্তু দাদার প্রতি এতো কঠোর হওয়াটা ঠিক হয়নি । ঠিক পর মুহূর্তেই মা মা বলে ক্ষীণ স্বরে ডাক শুনতে পেলেন পারুলবালা । ঘরে থেকে বেরিয়ে দেখতে পেলেন, সত্য , নাতনী সুমনা ও স্ত্রী সুরেখাকে নিয়ে বাড়ীর উঠোনে । কান্না সবটা মিলিয়ে মজুমদার বাড়ী আবার মেতে উঠেছে আগের মতো । নাতনী বুকে জড়িয়ে মণীন্দ্রবাবু । বৌকে জড়িয়ে ধরে বৌ শ্বাশুড়ীর আপ্লুত কান্না - কী দৃশ্য যার কোন ভাষা নেই । সত্যের উক্তি , কি ভুল করেছি বটগাছের ছায়া থেকে সরে গিয়ে । সুমনা যেন বড় হয়ে গেছে, প্রিয়কে ধরে বলছে - কাকা আমার পুতুল কই ? পুতুল দাও আমি খেলব .... । টেনে কোলে তুলে নিলেন পারুল বালা , চুমোয় চুমোয় গাল ভরিয়ে দিলেন । বলে উঠেলেন তুই কিভাবে আমাকে ছেড়ে এতদিন কাটালি । আজ থেকে তোর সঙ্গে আমি খেলব । সত্য সম্পূর্ণ বদলে গেছে । খুব অনুগত শান্ত প্রকৃতি । কিন্তু পুরো পাল্টে গেছে বউমা , যে কখনোও রান্নাঘরে ঢুকত না । সে হাত মুখ ধুয়েই বলল - মা আজ থেকে আপনি আর রান্নাঘরে যেতে পারবেন না । বলুন কী রান্না করতে হবে?

রাতে সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া , বউমা এঁটোবাসন ধুয়েঁ হাতমুখ ধুয়ে এল । তারপর সবার ঘরের বিছানা সাজিয়ে মশারি টাঙ্গিয়ে দিল । পারুলবালা উক্তি বেঁচে থাক্ বউমা শতবর্ষ - নাতনীকে নিয়ে এখন সারাদিন কেটে যায় মণীন্দ্রবাবুর । পারুলবালা আছে সারাদিন পূজো অর্চ্চনা নিয়ে । মণীন্দ্রবাবু আর এখন ভুবনঠাকুরের দোকানে আড্ডায় যান না । ঘরেই তার আড্ডা । পারুলবালা সন্ধ্যায় বউমাকে নিয়ে গীতাপাঠ শুনতে যান । সত্যব্রত , প্রিয়ব্রত দুভাই মিলে ব্যবসাও করছে । দু'ভাই এর যে ব্যবধান গড়েছিল তা আজ আর নেই । সব জড়তা সম্পূর্ণ কেটে গেছে । সত্য শুধু প্রিয়কে বলল - যে ভুল আমি করেছি তা যেন তোর জীবনে কখনো না হয় । আমার ভুলের ক্ষমা নেই। ঘরে তো ফিরেছি , মাঝখানে কিছু লোক হাসিয়ে । প্রিয় মাকে বলে মা , বউদি কত চেঞ্জ , ঘরে এখন কত আনন্দ । মণীন্দ্রবাবু এরই মাঝে বলে উঠলেন - অত কথা আমি বুঝি না বাবা মূল কথা হলো আর কিছু আমি শুনতেও চাইনি , শেষ কথা হলো - আমার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলো ।

' মুক্ত দুনীয়ায় বন্দী ছেলে "

অসীমবাবু এ যুগের দুব্বার জাদরেল নেতা । ইনার বাগ্মিতা ,ভাষণ , যেন মহাপ্রলয় । ইনার একডাকে হাজারো লোকের জমায়েত । অসীমবাবুর অসীম ব্যাক্তিত্ব , শুধু সাধারণ প্রশাসন নয় এমনকি ..... ও কর্তা ব্যাক্তিদেরও নাভিশ্বাস । জনগণের সুখ দুঃখের অংশীদার , সহমর্মিতার সাথে সাধারণ লোকের স্মৃতি শ্রবণ সবই উনার চরিত্রের উৎকর্ষতা। উনার পিতা সীতাংশুবাবু ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক , বর্ত্তমানে অবসরপ্রাপ্ত । চোখেও কম দেখেন , সাদাসিধে চরিত্রের লোক সবাই অসীমবাবুকে ভাল বললেও কিন্তু সীতাংশুবাবু উনার ছেলে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করতে নারাজ । শুধু এইটুকুই বলেন - সারাজীবন চাকুরী করেও শেষে জীবনটা ভালোভাবে কাটাতে চাই , তাতেও মনে হয় বাধা , কারণ মধ্যরাত্র অব্দি তার ঘরে চলে আনন্দ - উৎসবের হুল্লোড় । আভিজাত্য , জীবনযাত্রা , এত পয়সা ওর কাছে এল কোত্থেকে । তার একমাত্র ছেলে কুমার অলক দিল্লীতে কোন নামী দামী কলেজে পড়াশুনা করে । আর নাতী অলকের মুখ দর্শন করতেও সীতাংশুবাবুর চোখে মুখে ঘেন্না ফুঠে ওঠে , কারণ অলকের সঙ্গীসাথী , জীবনযাত্রা সবটাতেই যেন উৎশৃঙ্খলতার ছাপ , আর যে কোন কারণেই অলক জোর করে তার মুখটা দাদুকে দেখাতে ইচ্ছুক । দরকারে অদরকারে ঠিক দাদুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে - খিস্তি মারবে , বিদ্রুপভাবে অট্রহাসিতে ফেটে

পড়বার ভঙ্গি করবে শুধু তাই নয় । সিটি মারবে যা সীতাংশুবাবুর সবচেয়ে অপছন্দ । সীতাংশুবাবু ভাবেন - আজ আর আমর বয়স নেই, নয়তো এই ছোঁড়াটাকে বাড়ী থেকে বের করে দিতাম । কিন্তু এখন কি তাঁর পক্ষে সম্ভব অলককে ঠান্ডা করা । তাছাড়া অসীমবাবুও দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ান। এবার যখন ছেলে বিনাছুটিতে বাড়ীতে আসে, তখন অসীমবাবু সস্ত্রীক বাইরে উনার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য । স্ত্রী উর্মিলার কিডনী প্রোবলেম, সকালে অলক পাড়ার গলিতে, দোকানে সিগারেট ফুঁকতে এসে বুঝতে পারে ওর বখাটে বন্ধুরা ওকে দেখে কেটে পড়ে । আর যাকে নিয়ে সে ছুটছে আসলেই নেশা খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে, একমাত্র অলকের সঙ্গী হিসাবে সেই রয়ে গেল । সেই প্রথম অলককে বলল যে পুলিশের জালে একজন ড্রাগ চোরাকারবারী ধরা পড়েছে এবং সেই নাকি তোর বাবার নাম বলেছে, যে উনিও এই ব্যবসায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং ওকে দিয়ে ড্রাগ আমদানী - রপ্তানী করায় এবং রামু আরো শুনতে পেয়েছে সি.আই.ডি পুলিশ অলক ওদের বাড়ীতে রেইড করবে। এ কথা শুনে অলক বাড়ীতে ঢোকামাত্র দেখে দুইখানা পুলিশের গাড়ী হাজির । সাদা পোষাকের পুলিশ নিজেদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বলল - তারা সি.আই.ডি বিভাগের এবং আদালত থেকে তল্লাসী পরোয়ানা নিয়ে এসেছে অলকদের বাড়ী রেইড করতে অলক জানায় তার বাবা বর্তমানে বাড়ীতে নেই উনি উনার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বাইরে আছেন কিন্তু উনারা তাতে কর্ণপাতও করেননি । রেইড করতে এসে পুলিশ অলকের ঘরও বাদ দেয়নি । আদ্যোপান্ত, এমনকি বিছানাও উল্টে পাল্টে দেখেছে । দুটি ছোট মদের বোতল পেয়েছিল, বাদবাকী দ্রুততার সাথে চালাক অলক হাপিস করে ফেলেছে তবে স্পেনিস গীটার দেখে খুব আনন্দ পেয়েছিল বেঁটে মোটামত মিষ্টার দেবরায়, যিনি সি.আই. ডি গ্রুপকে লীড করছেন । অলককে বাজাতে বলেছিল । অলক চটপট বলেছিল - আই ডোন্ট নো । মিষ্টার দেবরায় তখন বলে উঠল তাহলে রেখেছ কেন ? - আমার গার্ল ফ্রেন্ড প্রেজেন্ট করেছে। - ফ্যান্টাস্টিক । তাহলে তোমার গার্ল ফ্রেন্ডও আছে । অবকোর্স, কেন থাকবে না, বলে অলক একটু বিদ্রুপ হাসি হাসল আর মনে মনে মিষ্টার দেবরায়কে হিজরা বলে গাল দিল । সি.আই.ডি অফিসাররা সীতাংশুবাবুর ঘরও বাদ দেয়নি । স্ত্রীহীন আশি বছরের নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ শিক্ষক ভদ্র ও শালীনতার সঙ্গে ঝুঝে পড়লেন অফিসারদের সঙ্গে, ক্ষোভ, অপমানে প্রশ্ন করলেন হোয়াই সার্চ, ইন মাই রুম, আই এম নট কার্লপ্রীট এট অল। সি আই.ডি অফিসাররা বললেন আমরা এসেছি অসীমবাবুর বাড়ী সার্চ করতে । সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে । আটকে গেলেন । নীতিপরায়ণ শিক্ষক সীতাংশুবাবু, কারণ ঘটনাচক্রে উনি উনার পুত্র অসীমবাবুর অট্টালিকাসম বাড়ীতেই আছেন । অফিসাররা স-সম্মানে বিনম্র ভঙ্গিতে উনার সঙ্গে কথা বল্লেন এবং অনুরোধ করেন তাদের কর্তব্যে বাধা না দিতে । শুরু হয় তন্ন তন্ন করে সার্চ করা । আর চমৎকার এক উন্মোচন ঘটে সীতাংশুবাবুর ঘরে থেকে । ঘরের ভেতর দিয়ে দোতালায়

অসীমবাবুর ঘরে উঠা যায় রেলিং বেয়ে রেলিং এর বিপরীত দিকে ওয়ালে এক মস্ত বড় ফটোগ্রাফ ঋষি অরবিন্দের । সেই ফটো সরিয়ে মিষ্টার দেবরায় আবিষ্কার করে ফেলেন একটি লুকানো বেশ বড়সড় গর্ত । আর তার বিশাল গর্ত থেকেই ,বেরিয়ে এলো বেশ কয়েক ধরণের ড্রাগ হেরোইন : আফিমজাতীয় , সাথে বেশ কটি বেনামে বিদেশী ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট বই এবং বেশ কিছু কাগজপত্র ও কিছু নাম ।

এরপর রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সম্মানিত শিক্ষক সীতাংশুবাবুর সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি । বাজ পড়লে যেমন মানুষ স্থির হয়ে যায় উনিও তাই হলেন । একটি কথাও আর মুখ ফুটে বলতে পারলেন না । তাঁর বক্তব্য উনার অজ্ঞাতে কেউ এই কাজ করেছে । ওখানে যে এতসুনিপুণভাবে এতবড় বিশাল গর্ত আছে তাও কি তিনি জানতেন ? আদৌ জানতেন না । কারণ এ বাড়ী তৈরী করেছে উনার ছেলে অসীম ।

মিষ্টার দেবরায়ের প্রশ্ন - এ বিশাল গর্তে কে এই ড্রাগস রেখেছে ?

প্রশ্নের জবাবে বৃদ্ধ সীতাংশুবাবু হাত উল্টে বুঝিয়ে দেন কেবল ভগবানই জানেন । সি. আই. ডি. অফিসাররা বাস্তবে বিশ্বাসী তাঁরা উনাকে দিয়ে সীজার লিষ্টে সই করিয়ে নেন যে অসীমবাবুর ঘর থেকেই এই ড্রাগস পাওয়া গেছে । কাঁপা কাঁপা হাতে উনি দস্তখত করতে বাধ্য হন । জীবনে সম্ভবত এই প্রথম এতবড় হেনস্তা ।

তারপর রটে যায় যে অসীমবাবু আর কখনো ফিরে আসবেন না । পুলিশ উনাকে খুজছে । প্রশ্ন উঠে উনি কি আগাম জামিনের আবেদন করেছেন , উনার আইনজীবির মাধ্যমে ? চোখে খুব কম দেখেন সীতাংশুবাবু । লজ্জায় অপমানে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারেন না । এর মধ্যে নাতী অলক কখন কোথায় থাকে কে জানে । প্রায়ই অনুপস্থিত । কিন্তু বাল্য জীবনে অলকের জীবন সূর্য ছিল ঠাকুর্দা সীতাংশু ।

কিন্তু ঠাকুর্দা সীতাংশুবাবু যা করতে পারেননি বরং বাবা অসীম তা করেছে । কারণ অসীমবাবু দোর্দন্তপ্রতাপ নেতা যদিও অলকের এখন আর কোন পথ নেই । এখন অলকের জীবনে উদয়াস্ত অনিশ্চিত । দিল্লীর সেই নামী দামী কলেজ ছেড়ে চলে এসেছে , তার ঘর বাহির একাকার । সমস্ত পরিবারের মান সম্মান ভুলুন্ঠিত কোথাও মুখ দেখাবার জো নেই , তবুও অলক কখনও সে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় এবং গলাটুকু লম্বা করে বাহিরের জগৎ লক্ষ্য করে ,আর দেখে নিচের তলায় নিজের ঘর থেকে কীভাবে সামান্য কুঁজো হয়ে ঠাকুর্দা সীতাংশুবাবু এসে নিজের ইজি চেয়ারটাতে বসেন । শীতেরবেলার সোনালী রোদ্দুরে ভাঁজ করে পরা ধুতি আর খদ্দেরের সাদা পাঞ্জাবীর সঙ্গে তাঁর পাকা চুলের মাথাটা একাকার হয়ে যায় । হাই পাওয়ার চশমা লাগিয়ে খবরের

কাগজ পড়েন ঠাকুরর্দা , আর দুচোখ জলে ভরে যায় । এখনও মাঝে মাঝে সীতাংশুবাবুর অবচেতন মনে হয়ত উনার অজান্তে উঠে আসে হাঁক , - কুমার মানে অলক আয় ব্যাটা , নেচে নেচে আয়ত দেখি।

এরকম করে ছোটবেলা অলককে ডাকতেন কিন্তু অলক গিয়ে বলত - তুমি তো বুড়ো ঘোড়া , যতই চেষ্টা করনা কেন , আমাকে ছুঁতে পারবে না । কিন্তু এখন সীতাংশুবাবু নাতী অলককে আর ডাকেন না । শুধু যেন ক্ষোভ । এক পলক দেখেন । বিশ্বাস , হয় না । সেই উনার ছোটবেলার আদরের কুমার । আবার সীতাংশুবাবু ভাবলেন কুমার তো এত সকালে ওঠার কথা নয় , কারণ বাবার অঢেল পয়সার স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন । সে ছুটিতে এলে কখনও এত সকালে ঘুম থেকে ওঠে না , অন্তত বেলা ১০ টা গড়িয়ে গেলে ওর ঘুম ভাঙ্গে । সে উঠতেও পারবে না । কারণ সে ঘরে বসে কখনও একা বা কখনও রামু বা অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে গভীররাত পর্যন্ত দামী মদ খেতে ভালবাসে । কখনও ওরা রামুর দেওয়া গাঁজা টেনে টেনে বুঁদ হতেও ভালবাসে । ঘরে যখন থাকতে আর ইচ্ছা হয় না তখন মুহুর্তের মধ্যে কাউকে কিছু না বলে সে তার 'ইয়ামাহা ' নিয়ে বেরিয়ে পড়ে , খুব রাফ ড্রাইভ করে । ওটাই নাকি ওর কাছে দারুণ এক্সাইটিং ।

সেই দিনটা কিন্তু একটু অন্যরকম । অলক সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়ে কিছুক্ষণ বাদে শিস দিতে দিতে দোতলা থেকে নেমে আসে । জানে ঠাকুরদা শিস দেওয়া সিটি বাজানো মোটেই পছন্দ করেন না । ঠাকুরদা সীতাংশুবাবুর গায়ে ছায়া ফেলে দাঁড়ায় কুমার । কিন্তু ঠাকুরদা চোখও তোলেন না । আরও ঝুঁকে পড়েন খবরের কাগজের মধ্যে।

সীতাংশুবাবু । সাদা ভুরু , চোখের পলকও সাদা । কুমারের মুখটা যেন আবছা মনে হয় বলেন- ব্যাটা আজ এত সকালে ?

কুমারের চটজলদি উত্তর - কাল রাতে ঘুমাইনি । কেন ?

তোমার ছেলের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের সেলিব্রেট করলাম । সীতাংশুবাবু প্রশ্ন কীসের এত আনন্দ । বিদ্রুপের হাসি হেসে কুমারের উত্তর - জানি না । তোমার পুত্রের লেটেস্ট ইনটেলিজেন্সের কথা । উনি একটি কাগজে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন আমার বাড়ীতে ওসব হতেই পারে না । আমার অ্যাবসেন্সের সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিছু স্কাউন্ড্রেল আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার নষ্ট করার জন্য পুলিশ লাগিয়েছে । আমাকে ব্ল্যাকমেইল করেছে ।

অলকের প্রশ্ন ঠাকুরর্দা - কী মনে হচ্ছে ? এসব কি তোমার ছেলের কাজ নয় ? ভাবতে পারি না । কেন ভাবতে পার না ? এর আগেও তো তুমি বলতে অসীমের লাইফস্টাইল কীভাবে অত হাই - কিন্তু আমি তো কিছু প্রমাণ করতে পারিনি। কিন্তু আমি বলি এই যে উনার ২/৩ জায়গায় ২/৩ টি

বাড়ী , বেনামী গাড়ী , বছরে ৩/৪ বার বাইরে যাওয়া । আমাকে দিল্লী রেখে পড়ানো । আমার এডুকেশন এর জন্য বছরে দু'বার মোটা টাকা পাঠানো ।

দ্যাখ জেন্টালম্যান ঠাকুরদা মশাই , তুমি নিজেও জান না - তুমি কাকে জন্ম দিয়েছ । তুমি তো কোকিল তাই তোমার বাসায় কাকে ডিম পেড়ে গেছে ।

- কুমার তুইও কি আমাকে দায়ী করছিস । সবাই তো আমাকেই দায়ী করছে । আমিই নাকি অসীমের বুদ্ধিদাতা । ঠাকুরর্দা তুমিই বলো তোমার ছেলে অসীমের হাই লাইফ কি তোমার জন্য নয় - তোমার সাদামাটা চরিত্রটাকে কি উনি কাজে লাগান নি ? একবার শুধু ভেবে দেখো তুমি কি করেছ , আর তোমার ছেলের কি নেই ।

একটু মাথা তুলে সীতাংশুবাবু বলেন কুমার তোর মুখটা যে দেখতে পাচ্ছি না । জানি না কেন দেখতে পাচ্ছ না । দেখলে যে তোমার ঘেন্না করবে ।

শার্ট টেনে অলককে ঠাকুরদা বলে - ব্যাটা এই মুখেই তো তুই তোর বাবার বন্দনা করেছিস্ , যেহেতু তোর বাবা তোকে মোটা টাকা দিত , আমাকে ওয়ার্থলেস এন্ড হর্স বলে ব্যাটা যত ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে গেছিস । কুমার বলে ঠিকই বলেছ ঠাকুরদা, আরাম আয়েসের জীবন কাটানোর জন্য আমিই ছিলাম বাবার একমাত্র সঙ্গী । যে বাবাকে সবসময় সাপোর্ট দিয়ে যেতাম । সীতাংশুবাবুর খেদোক্তি - আমি অসীমকে বোঝাতে পারিনি , ও যে বেপরোয়া দুর্নীতি , কালো ব্যাবসা ওর কাছে কোন ব্যাপার না বুঝে যাচ্ছিলাম , কিন্তু কিছু করার ছিল না - এখন ভয়তো তোকে নিয়ে । - কেন ঠাকুরদা ? গুরুগম্ভীর গলায় সীতাংশুবাবুর যুক্তি - তুইও যদি তোর বাবার মতই হয়ে যাস্ তবে আমি যাই কোথায় ? ভরসাটুকু যে পাই না কুমার ।

কুমারের উত্তর - আমি কি আর আগের মত আছি ঠাকুরদা মশাই - এখন কি আর তোমার ছেলেকে কুনির্শ করব ?

হঠাৎ দিল্লী থেকে চলে এলাম , এখন তো বুঝতেই পারছি , লেখাপড়া লাটে উঠেছে । জান ঠাকুরমশাই লজ্জা করে লাভ নেই । প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক নীরেনবাবুর ছোট মেয়ে নন্দিতা আমার গার্ল ফ্রেন্ড ছিল ঠাকুরদার প্রশ্ন - তাহলে কি আজ আর নেই ? শোনো - সেই আমাকে স্পেনিশ গীটার প্রেজেন্ট করেছিল । আর নামীদামী নেতা অসীমবাবুর ছেলে বলে আমাকে ওদের বাড়ীর সবাই খাতির করে । কিন্তু বাবার কেচ্ছা - কাহিনী খবরের কাগজে বের হবার পর পড়াশুনা করার কথা ভাবাটাও এখন আমার অন্যায় । সবদিক থেকে খিস্তি খেয়ে আমি চলে গেলাম শিক্ষক নীরেনবাবুর বাড়ী । যেই নন্দিতা আমাকে রাজকুমার বলে ডাকতো । নন্দিতা বাড়ীতে ঢুকতেই হেসে ফেলল - বলল হ্যালো ড্রাগ ব্যবসায়ী - আসুন , আসন গ্রহণ করুন - নন্দিতার কথায় আমি রেগে গেলাম ,

চিৎকার করে বলে উঠলাম - চুপ করো । কী করে এডুকেটেড ছেলের সাথে কথা বলতে হয় জান না? অশিক্ষিত , মুর্খ , ফকির।

হঠাৎ যেন নন্দিতা রুদ্ররূপ নিয়ে জ্বলে উঠল ছুটে এসেই আমার দু'গালে আচমকা দু'থাপ্পড় কষাল । চিৎকার করে বলে উঠল - আমরা ডাল ভাত খাই, সাধারণ ইস্কুলে পড়াশুনা করি , আর তোর লেখাপড়া জানা বাপ আন্তর্জাতিক ড্রাগ চোরাচালানকারী। সারাদিন দেশ সেবা বলে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে , শিক্ষিত চোরাচোট্টা , লুঠেরা , ভদ্রলোকের মুখোস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্। আমরা গরীব হতে পারি কিন্তু আমাদের আত্মমর্যাদা আছে । যদি কোনদিন আমাদের বাড়ীর দিকে আর পা রাখিস তাহলে পা দুটো কেটে দেব । ঘৃণা লজ্জায় , নীরেনবাবুর বাড়ী থেকে বের হয়ে যখন রাজপথে উঠে এলাম ঘরেই ফিরে যাব বলে , তখন গলি গলি থেকে ছেলেরা বলতে লাগল চোরের ব্যাটা পালাচ্ছে দ্যাখ , ঠাকুরদা বল কোথায় যাই , সব পথ বন্ধ , মুক্ত দুনিয়ায় থেকেও আমি বন্দী বাবার অপকর্ম এখন আমার ঘাড়ে ।

আত্মসম্মান কেনা যায় না

দরজায় দাঁড়িয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখছিল রূপা । গোধুলির নিস্তেজ আলোতে মেঘের রূপটাও যেন পাল্টাচ্ছে । ১৯৭২ ইং ২২শে এপ্রিল রূপার বিয়ে হয় শহরের নামী দামী ব্যবসায়ী সুনীলবাবুর ছোট ছেলে শেখরের সাথে । বনেদী রায় পরিবার ।বিয়ের পরটাতেই একদিন শেখর রূপাকে নিয়ে শহরে ঘুরতে বের হয় । জীবনমল পরশমল এর কাপড়ের দোকানে হঠাৎ ঢুকে পড়ে এবং বলে একটি ভাল কাশ্মীরী শাল বের করুন তো । তারপরই একটি নেভী ব্লু শাল কিনে নেয় রূপার জন্য । সেই নেভী ব্লু শালটুকু আজ রূপার জীবনের একমাত্র স্মৃতি । বিয়ের দু'বছর বাদে পুত্র পল্লবের জন্ম।

সমস্ত রায় পরিবারে খুশীর জোয়ার। রায় পরিবার বিশাল পরিবার , যা এ যুগে সচরাচর দেখা যায় না ।এক উনুনে এক হাঁড়িতে খাওয়া , সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল সকালে সবাই মিলে এক টেবিল চা, টিফিন করা । সন্ধ্যেবেলা সবসময় ঘরে শেখর রূপাকে নিয়ে চা খেত এবং বিয়ের প্রথম বৎসর অন্ততঃ মাসে ১/২ বার শহরে ঘুরে বেড়াত ও অশোকা রেষ্টুরেন্টে ডিনারটুকুও সেরে নিত । যদিও তা রায় পরিবারের অপছন্দ ছিল কিন্তু তাতে কি আসে যায় ? শেখর অন্য ভাইদের তুলনায় একটু বেপরোয়া ও বদমেজাজী ছিল, তাই কেউ মুখ খুলে শেখরকে কখনো কিছু বলত না । এর মাঝেই পল্লবের বয়স যখন সবে দু'মাস হঠাৎ একদিন ভোরবেলা ঘুমের মধ্যে সুনীলবাবুর মৃত্যু হয় মাস ছয়েকের মধ্যেই রায় পরিবারে প্রচন্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । তিন ভাই সম্পত্তি ভাগ করে নেয়, ব্যবসা আলাদা হয়ে যায় । ভাই ভাই সম্পর্কেও ছিন্ন হয়ে যায় । রূপা বিয়ের রাতে বাসরঘরে শেখরের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা টের পেয়েছিল , কিন্তু বিয়ের প্রথম রাত , কিছু টের পেলেও বলার মত পরিবেশ তখন ছিল না । রূপার কলেজের বান্ধবী শিখা কিন্তু রূপাকে বলেছিল - শেখরদাকে সামলে নিবি । যদিও রূপা তখন শিখার কথায় প্রচন্ড বিরক্ত হয়েছিল - কিছু প্রকাশ করেনি । শেখর দেখতে খুব সুঠাম চেহারার ছেলে ছিল । রূপা কলেজের অনুষ্ঠানে আধুনিক গান গাইত । শেখর রাত্রে এসে প্রায়ই রূপাকে গান গাইতে অনুরোধ করত । বাধ্য হয়ে রূপাকে গান গাইতে হতো । যা নিয়ে শেখরের অনুপস্থিতিতে রূপাকে পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে অনেক টিপ্পনীও শুনতে হতো । চাপা মেয়ে রূপা কিছুই শেখরকে বলতো না , মুখ বুঝে সব কিছুই সহ্য করে নিত । শেখর বাইরে যতই উশৃঙ্খলতা করুক না কেন ঘরে ফিরে রূপাকে কখনোও জ্বালাতন করতো না। যদিও রূপা অনেক বার শেখরকে তার ব্যাভিচারী জীবন থেকে সরে আসার জন্য অনুরোধ করেছে , তাতে কোন ফল হয়নি। এভাবে বছর চারেকের মধ্যে শেখর গোটা ব্যবসাটা ধ্বংস করে ফেলেছে । কিন্তু রূপাকে কিছু বুঝতে ও দেয়নি। ক্রমে পল্লব বড় হয়ে উঠেছে। তাকে শহরের অভিজাত স্কুলে শেখর ক্লাশ ওয়ানে ভর্ত্তি করে দিয়েছে । রূপার বুঝার কোন উপায় ছিল না যে শেখর দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। তবে মদ্যপান শুধু ক্রমেই বেড়ে চলেছে । একদিন দুপুরে

হঠাৎ শেখর রূপাকে বলে উঠে রূপা , এ বাড়িটা অলক্ষ্মী , বাড়ীটা বিক্রি করে দেব । রূপা এবার বড্ড কাকুতি মিনতি করে বারণ করল কিন্তু কে শোনে । বাপের ভিটেমাটি ,কারো কোন তোয়াক্কা না করে শেখর তিন লাখ টাকা দিয়ে এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিল । তারপর রামনগরের কোন এক বাড়ীতে ঘর ভাড়া করে পুত্র পল্লবসহ রূপাকে সরিয়ে নিল , ভাগ্যের কঠোর পরিহাস , রূপা বুঝতে পেরেও কোন বাধা নিতে পারল না । শান্ত প্রকৃতির রূপা মুখ বুঝে সব মেনে নিত । ১৯৮২ ইং মার্চ মাস । শেখর পুত্রের ক্লাস টু'তে পদার্পন । পল্লবের ভাল রেজাল্ট শেখরকে খুব খুশী করেছে বৈকি কিন্তু এই খুশীই যে রূপার জীবনের শেষ খুশী হবে তা রূপা কি কখনো জানত । ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে সন্ধ্যায় । পাড়ার মোড়ের তিনটে ছেলে দৌড়ে বাড়ীতে এসে রূপাকে বলে, বৌদি শেখরদার শরীর খারাপ করেছে । উনাকে উনার বন্ধুরা জি বি হাসপাতালে নিয়ে গেছে । যাওয়ার সময় বলে গেছে আপনাকে খবর দিতে । রূপার হাতে তখন ছেলের খাওয়ানোর জন্য দুধের গ্লাস , খবর শুনেই হাত থেকে খসে পড়ে গেল। তবুও মনকে শান্ত করে পাড়ার ছেলেদের অনুরোধ করে বলে উঠল রূপা - ভাই আমার সাথে একটু চল , যাই হোক পাড়ার দুই ছেলে আশীষ ও তপন রূপার সাথে জিবি পৌঁছল। রূপা গিয়ে দেখতে পেল শেখর নিস্তেজ নিঃশব্দে ইনটেনসিভ কেয়ারে পড়ে আছে নাকে অক্সিজেন মাস্ক , কিন্তু জানতেও পাড়ল না রূপা , পরদিন সাত সকালে শেখরের জীবন প্রদীপ নিভে গেল, বেচারী রূপার জীবনে নেমে এল যৌবনেই অন্ধকার। কারণ শেখর কোথায় কি রেখে গেছে কিছুই জানে না রূপাও কখনো শেখরকে কিছু জিজ্ঞেসও করেনি , কারণ তার প্রয়োজনও ছিল না । পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা বটতলা মহাশ্মশানে ছেলে পল্লবকে দিয়ে মুখাগ্নি করিয়ে শেখরের নশ্বর দেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিয়েছে । খবর দেওয়া সত্ত্বেও শেখরের পরিবারের কোন লোক আসেনি । শ্রাদ্ধ - শান্তিটুকু শেখরের বন্ধু বান্ধবরা মিলে করেছে । কিন্তু তারপর কে নেবে রূপা ও তার ছেলে পল্লবের দায়িত্ব । যে যাওয়ার সে তো চলে গেছে । কিছুদিন সবার সহানুভূতি ছিল । কিন্তু আস্তে আস্তে সবই ম্লান হয়ে গেল। এরই মধ্যে বাড়ীর মালিক রূপাকে বলে দিল একমাসের মধ্যে ঘর ছাড়তে , কোথায় যাবে রূপা। তার একমাত্র ভাই ভুবনেশ্বরে থাকে এছাড়া এখানে কোন আত্মীয়

স্বজন নেই । বিবাহিত ভায়ের কাছে বোঝা হওয়ার ইচ্ছা রূপার নেই , তাই ভাইকেও কোন খবর দেয়নি । শুধু ভাসুরদের দরজায় গিয়েছিল কিন্তু শূন্য হাতে ফিরে আসতে হল । স্বাভিমানী রূপা লজ্জায় অপমানে ঘরে এসে ভাবতে লাগল এভাবে পল্লবকে বাঁচানো যাবে না । আমাকে কিছু করতেই হবে। রূপা গ্র্যাজুয়েট মেয়ে, এরই মাঝে রূপার কলেজের বান্ধবী শিখা , শ্বাশ্বতী , বর্ণনী একদিন দুপুরে এসে হাজির । রূপাকে বলে উঠল - রূপা তুই একটি বার আমাদের তো খবর দিলে পারতি , যাই হোক তিন বান্ধবী বলে উঠল - রূপা তুই একটা কিছু শুরু কর , এভাবে কি চলবে ? আর ভাববি না । আমরা আছি , রূপার বান্ধবী শিখা বাস্তববাদী মেয়ে , সে রূপাকে বলে উঠল -আমি তোকে কিছু টিউশনি যোগাড় করে দিচ্ছি । আপাতত টিউশনি শুরু কর । দেখা যাক কি হয় । শ্বাশ্বতী বলে একটি খালি ঘর আছে সেখানে এসে পড় , প্রথমটায় রূপা বারণ করলেও সবার অনুরোধে শেষ অব্দি রাজী হলো । রূপার জীবনে নতুন মাত্রা । সকাল - বিকেল দুপুর রূপার ছুটাছুটি ও টিউশনিতে ব্যস্ত । রাতে এসে রান্নাবান্নার কাজ সেরে পুনরায় পল্লবকে পড়াশুনা করানো ,এক কথায় যান্ত্রিক জীবন ।

রূপা এখন প্রতিষ্ঠিত । ছেলে পল্লব যখন ক্লাশ নাইনে পড়ে তখন তিল তিল করে রাখা পয়সা দিয়ে রূপা কলেজ রোডে বাড়ীর জায়গা করে নিয়েছে । ছেলের মাধ্যমিকের রেজাল্টও খুব ভাল হয়েছে । রূপার চাপা অভিমান - ছেলেকে ভাল করে মানুষ করবে। এর মাঝে রূপার টিউশনি আরও জমজমাট , স্টুডেন্ট ফেরৎ দিতে হচ্ছে সময়ের অভাবে, ছেলে ইলিভেনে পড়ার সময়ই খুব সুন্দর করে দুটি রুম করেছে । একটা সুন্দর ঘরও করে নিয়েছে । সামনে ছোট ফুলের বাগান , মাঝে মাঝে রবিবারে বান্ধবীরা আসে । রূপাকে বলে - তুই কেমন ঘর কোনে ছিলি , আজ কত স্মার্ট । কিন্তু বাস্তববাদী বান্ধবী শিখার স্পষ্ট কথা - পরিস্থিতি মানুষকে চেঞ্জ করে দেয় । এটাই ফ্যাক্ট । ছেলে পল্লব উচ্চ মাধ্যমিক -এ দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছে এবং জয়েন্ট এন্ট্রাসে ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে চান্স পেয়েছে । রূপা বড্ড খুশি যদিও বহিঃপ্রকাশ নেই। পড়াশুনার মাঝেই ছেলে পল্লবের সাথে তার ইয়ারের এক বান্ধবী লোপামুদ্রার ভালবাসা হয় । রূপা সবই টের পায় কিন্তু কোন ধরণের বাধা দেয়নি । মনে মনে ভাবে আমার জীবন তো কেটেই গেল । সুতরাং ছেলেকে বাধা দিলে যদি বিপরীত

কিছু হয় । তাছাড়া সংসারও তো সে করবে, যে যদি সুখী থাকে তাতেই তো হল, আমার আর কিসের প্রয়োজন । ক্রমে ইঞ্জিনায়ারিং পাশ করে চাকুরীও জুটিয়ে নিয়েছে মার বাধ্যগত ছেলে । মার কাজে হাত লাগায়, একদিন সন্ধ্যায় মাকে কাঁচুমাচু খেয়ে কিছু বলতে চায় পল্লব কিন্তু পারেনি । দিন পাঁচেক পর অফিসে যাওয়ার সময় মাকে বলে ফেলে - মা আমি একটা প্রবলেম - এ আছি । রূপা সবই বুঝতে পারে তবুও জিজ্ঞেস করে উঠল - কি বল, ভয়ের কি আছে, মাকে বলবি । পল্লব বলে উঠল - মা তুমি কত কষ্ট করেছ আমার জন্য, কিন্তু আমি তোমার কথা রাখতে পারিনি । আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি । রূপা বলে উঠল ঠিক - আছে । আজ নিয়ে আয় না । সন্ধ্যায় পল্লব, লোপামুদ্রাকে নিয়ে বাড়ীতে আসে । রূপা দেখেই বুঝেছিল আধুনিক যুগের মেয়ে । উপরন্তু চাকুরী করে ,মানিয়ে নেবো । পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লোপামুদ্রা পল্লবকে বলে উঠল আমার দমবন্ধ লাগছে, চল বেরিয়ে পড়ি । রূপা তবুও অনুরোধ করেছিল বসতে, প্রথমদিন এসেছে খালি মুখে কিভাবে যাবে । লোপামুদ্রা বলে উঠল - ঠিক আছে পার্মানেন্ট আসলে তখনই ভাল করে খাওয়াবেন। এই বলে পল্লবকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে । পল্লব বুঝলেও প্রতিবাদ করেনি । পরের রবিবার শিখা ও বর্ণানী রূপার বাড়ীতে আসে । সবাই এখন প্রৌঢ়া । রূপা কথাটুকু চেপে না রেখে শিখা ও বর্ণানীকে বলেই ফেলল - যেহেতু এই বান্ধবীরাই রূপাকে দুর্দিনে সাহস জুগিয়েছিল.। বর্ণানী বলে উঠল - রূপা সব ম্যানেজ হয়ে যাবে, এখন তো রক্ত গরম তাই । কিন্তু শিখার অভিমত - রূপা জীবনকে একাকী করে নেওয়া মনে হয় ভাল হবে। এরই মাঝে ছেলের ইচ্ছানুসারে ঘটা করে বিয়ে হল । রূপার বান্ধবীরাও ছিল বিয়ের অনুষ্ঠানে । রূপাকেই গাঁধার খাটুনী খাটতে হয়। ছেলে, ছেলের বউয়ের মনরক্ষায় বেড-টি থেকে শুরু করে খাওয়া, পরিবেশন সবটায় । কিন্তু তাতেও যে তৃপ্তি নেই । ছেলে, ছেলে বউ অফিস সেরে গভীর রাতে ফ্যাংশন সেরে ঘরে ফেরে, রূপা বসেই থাকে । প্রায়ই পল্লব বলে - মা তুমি খেয়ে ঘুমিয়ে থাক । আমরা ডিনার সেরে এসেছি । এরমধ্যে একদিন রূপা শুনতে পেল পুত্রবধূ লোপামুদ্রা মা হতে চলেছে । রূপা সকালে পল্লবের সামনেই লোপাকে বলে উঠল বৌমা এখন একটু সাবধানে চলবে এ সময়টা সতর্কতার সময়। লোপামুদ্রার চটপট উত্তর - কেন ,রূপা বলে উঠল - তুমি যে মা হবে । উত্তরে লোপামুদ্রা বলল আপনি জানেন না আমি এক সপ্তাহ হয়েছে অ্যাবোর্শান করেছি ।

ওসব বাচ্চা - কাচ্চা ভেবে আমি আমার ক্যারিয়ার নষ্ট করতে চাই না । রূপা মনে প্রচন্ড ব্যাথা পেলেও কিছু না বলে নিজের ঘরে এসে পড়ে ।ঐ রাতে প্রায় বারোটা ছেলে , ছেলের বউ ফিরছে না দেখে রূপা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে দেখতে পেল ছেলে বাইক নিয়ে বাড়ী ফিরেছে । ছেলে বাইক রাখতে গেলে লোপামুদ্রা টলতে টলতে ঘরে ঢুকছে দেখে রূপা নিজেকে সামলাতে পারল না , বলে ওঠে - এই বাড়ীর বউদের এটা শোভা পায় না । আমি যেন কখনো না দেখি তুমি মাতাল হয়ে ঘরে ফিরেছ । লোপামুদ্রা সাথে সাথে বলে উঠে - কেন তোমার স্বামীও তো মদ গিলতে গিলতে মরল। অপমানে ক্ষোভে রূপা বলে উঠল - কালই আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও - বলে ঘরে ঢুকে পড়ল। বাইক রেখে পল্লব ঘরে গেলে লোপামুদ্রা তাকে আরও উত্তেজিত করে দেয় - সাথে সাথে পল্লব মাকে ডেকে ঘরে ঢুকে পড়ে এবং বলে ওঠে লোপাকে অপমান করার সাহস তোমাকে কে দিয়েছে ।

ওকি তোমার খাচ্ছে । তোমার মতো মা আজ থেকে আমার আর দরকার নেই । পরদিন সকালে পল্লব লোপাকে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায় । যাওয়ার পথে ইচ্ছেমত দুজনে মিলে রূপাকে অপমান করে । বুকে পাথর বাঁধা , রূপা সমস্ত পরিস্থিতি যে ভাবেই হোক সামলে নেয় । যা সবার পক্ষে সম্ভব ও নয় । বিকেলে রূপা , প্রথমবারের মতো প্রিয় বান্ধবী শিখার কাছে যায় ও সমস্ত ঘটনাটুকু বলে । শিখা বলে ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্যই । তোর ভালই হয়েছে , ভেবে নে তোর কেউ নেই। ওসব ভাববিও না । যাই হোক একদিন রূপা শুনতে পেল পুত্রবধু লোপামুদ্রা ছেলের মা হয়েছে । ওরা বেশ ভালই আছে যদিও মার খোঁজ খবর নেয় না , কিন্তু রূপা যেভাবেই হোক খবরাখবর রাখে ।একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ টেলিফোন । রূপা ভাবল , এ সময়ে আবার আমাকে কার প্রয়োজন হল। টেলিফোন ধরতেই শুনতে পেল ,মা কাল তো বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ , কিছু করছ নাকি ? অভিমানে রূপা বলে উঠল - এত বছর পরে আবার বাবার শ্রাদ্ধের কথা মনে পড়ল কিভাবে ? - না মা অতীত ভুলে যাও। তোমারও বয়স হয়েছে । একা একা থাক তাই ভাবছি তোমার একটা কথা বলার লোকও নেই যদি আমরা এসে পড়ি তা হলে তোমারও কিছুটা ভাল লাগবে । তা ছাড়া তোমার নাতী তিন বৎসরের হয়ে গেছে । লোপা বলে - কখনো ঠাকুমার আদর পেলো না , তাছাড়া আমরা দু'জনে অফিসে চলে গেলে কাজের লোকের হাতে থাকে বলে ওদের উপর ভরসাটাই কি । দু - তিন দিন

আগে সিঁড়ি থেকে পড়ে তোমার নাতি দেবারুণের মাথা ফেটে গেছে । যদি তোমার কাছে থাকে তাহলে এই চিন্তাটুকু তো নেই । রূপা জিজ্ঞেস করল - তা হলে বাকী আয়ার কাজটার প্রয়োজন । তাই - না । পল্লব বলল - না না মা তোমাকে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি দিতে চাইছি । না রে আমি তো টিউশনি নিয়ে ছেলেদের দিয়ে ভালই আছি । না মা এখন আর টিউশনি করতে হবে না । না- না আমি টিউশনি করে ছেলেদের নিয়ে বেশ আছি । আমাকে ভাবতে দে । ঐ দিন সন্ধ্যায় রূপা পুনরায় শিখার কাছে যায় । শিখার সোজা উত্তর । নাতী পায়ে ব্যাথা পাবে, দোষী তুমি । খাওয়া ঠিকভাবে হলো না দোষী তুমি । জীবনটাকে যেভাবে কাটিয়ে নিয়েছে সেভাবেই মনে হয় ভাল । এখন কোন ব্যাভিচার তোমার সহ্য হবে না । সুতরাং একাকীত্ব, শান্তি , ভেবে নাও । দু'দিন বাদে ছেলে পল্লব নাতী দেবারুণসহ স্ত্রী লোপামুদ্রকে নিয়ে গাড়ী করে বাড়ীতে আসে , মা রূপা অপ্রস্তুত , মাখনের মতো নরম নাতী । প্রথমটায় অনেক ভেবে রূপা ভাবল লোপামুদ্রা এখন অনেকনম্র । নাতীটা বড্ড সুন্দর , বাহান্ন বছর বয়সে কি আত্মসম্মান ও স্বাভিমান ধুয়ে জল খাব । সন্ধ্যায় ছেলে ও বৌকে চা , টিফিন দিল, নাতীকে দুধ খাওয়ালো । কিন্তু পর মুহূর্তেই রূপা নিজেকে সংযত করে নিল । পরিষ্কার ভাবে ছেলেকে বলে দিল, ভাল জিনিষ অল্প পাওয়াই ভাল , তাতে দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ থাকে । কিছুক্ষণ বাদেই পল্লব পুত্রবধু ও নাতীসহ গাড়ীতে চাপল । রূপা দরজায় দাঁড়িয়ে আবেগভরা অশ্রুসিক্ত চোখে ,কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল আত্মসম্মান সন্তান স্নেহের চাইতে ও অনেক বড় ।

****

বেঁচে আছি ওদের জন্য

নব দম্পতি, আশুতোষবাবু ও রেণুবালার যেন কপোত কপোতীর সংসার, অসাধারণ বোঝাপড়া কে জানত বাঁধভাঙ্গা কালস্রোতে সুখের সংসার ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যাবে। আশুতোষ বাবু ছিলেন একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার নতুনবাজার থানাধীন চেলাগাং বাজারে আশুতোষ বাবুর বাড়ী ছিল, সাথেই ছিল মুদির দোকান, এ ছাড়াও ছিল ঠিকেদারী। এলাকায় আশুতোষ বাবুর ছিল বেশ সুখ্যাতি, স্বজন ও পরোপকারী হিসাবে, জাতি উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ের সাথেই ছিল মনখোলা মেলামেশা, ও ভাতৃত্ব সুলভ মনোভাব। ক্রমে ক্রমে আশুতোষবাবুও স্ত্রী রেণুবালা তিন কন্যাসন্তানের জননী হয়ে যান। সংসার, সমাজ ছাড়াও সন্তানের দায়িত্বও এখন আশুতোষ বাবুর উপর। তিনকন্যা সন্তান যথাক্রমে, পুতুল, প্রতিমা, ও অনিমা, রেণুবালা ও আশুতোষবাবুর উচ্চাকাঙ্খা ছিল মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া। স্ত্রী কন্যা নিয়ে

আশুতোষবাবুর সুখের সংসার । বাজারের কাছে বাড়ী , উপরন্তু স্বজ্জন ব্যবসায়ী প্রায় সবসময়ই থাকত লোকসমাগম , যখন পুতুল সিক্স এ পড়ে তখন তার বয়স ১২ বৎসর পাশাপাশি প্রতিমা তখন ক্লাস ফোর এ পড়ে ১০ বর্ষীয়া মেয়ে, অনিমা ছোট মায়ের আচঁল ধরে ঘরে অ, আ শেখে । দিনটি ছিল ১৯৮১ ইং অগ্রহায়ণ মাসের ২ তারিখ , আশুতোষবাবু স্ত্রী , কন্যাদের সহ সকালে নিজ ঘরে চায়ের আসরে । এমন সময় সকাল ৭ টা নাগাদ , আশুতোষবাবুর উপজাতি পল্লীর দুই বন্ধু উনার কাছে আসেন , সবাই মিলে চা খাওয়া গল্প করা ইত্যাদি , ইত্যাদি , ঘড়ির কাটায় ৯ টা বেজে গেছে গপ্পে হঠাৎ আশুতোষবাবু স্ত্রী রেণুবালাকে বলে আমি বন্ধু বিশ্বমনি উচই এর সাথে যাচ্ছি , প্রথমত বলে গেলেন আসতে দেরী হলে তোমরা খেয়ে নিও । সকাল গড়িয়ে দুপুর , দুপুর গড়িয়ে রাত , আশুতোষ বাবু ঘরে ফিরছেন না দেখে ব্যাকুল রেণুবালা দেবী পাশের পড়শীদের বলেন পড়শীরা সারারাত ধরে অনেক খোঁজ খবর নিয়েও আশুতোষবাবুর কোন সন্ধান মেলেনি । পরদিন ও সারাদিন ধরে খোঁজাখুঁজি করেও আশুতোষবাবুর কোন সন্ধান পায়নি পড়শীরা । বাধ্য হয়ে রেণুবালাকে নিয়ে থানাপুলিশে যান ও ঘটনার পুঙ্খাণুপুঙ্খভাবে পুলিশকে জানান , শুরু হয় জোরদার তল্লাসী খোঁজখবর । রেণুবালা দেবীর হতাশার রাত্রি ফুরায় না, চোখের জল ছাড়া যে করার কিছুই নেই , গ্রাম্য গৃহবধু উপরন্তু তিন- তিনটে নাবালিকা মেয়ে । রেণুবালা বিহ্বল হয়ে পড়েন। বিশ্বমনির খবর নেওয়া হয় । কিন্তু তাকেও পাওয়া যায় নি । পুরোগ্রামে এক অস্থিরতায় দিন যাপন করে । ভাষাহীন মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে অজানা হাহাকার । কেন না দীর্ঘ ১৫ বৎসর সংসার জীবনে আশুতোষবাবু কখনো না বলে একরাত্রিও বাইরে রাত্রি যাপন করেনি । সেই জায়গায় রাতের পর রাত গড়িয়ে ৮/১০ দিন হয়ে গেলো । সবদিক থেকেই চেষ্টা কিন্তু সব যেন বিফল মনোরথ । অবশেষে বিশ্বমণিকে পুলিশ খুঁজে বের করে । পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে বিশ্বমণি বলে উঠেন এমন ঘটনা ঘটবে তার স্বপ্নে ও জানা ছিল না , তাই লজ্জায় সে আশুবাবুর বাড়ীতে যেতে সাহস পাচ্ছিল না , ঘটনার বর্ণনায় বিশ্বমণি বলে সকালে যখন আশুবাবু , বিশ্বমণি ও তাদের অপর এক বন্ধু গ্রামের রাস্তা ধরে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ জলপাই রং এর পোষাক পরিহিত আগ্নেয়াস্ত্রধারী ১০ /১২ জন যুবক তাদের পথ আগলে দাঁড়ায় এবং আশুবাবুকে নিয়ে কোন অজানা স্থানের দিকে চলে যায় । সে আরো বলে যে ও তার অপর দুই বন্ধু অনেক কাকুতি মিনতি করে কিন্তু কোন অজানা হয় নি বরঞ্চ ওরা তাদেরকেও মারপিট করে । সবাই অন্তত আশ্বস্ত হন যে আশুতোষ বাবু অপহৃত হয়েছেন উগ্রবাদীর দ্বারা । বিশ্বমনির কথা অনুযায়ী উগ্রবাদীরা টি. এন .ভি দলের লোক , এখন সবার প্রশ্ন ইনি কি জীবিত ? শুরু হয় আরো জোর তল্লাসী । কিন্তু রেনুবালার কাছে এখন দিবা রাত্র সবই সমান শুধু স্বামী আগমনের প্রতীক্ষায় । এ ভাবে কেটে গেল অনিশ্চয়তায় কুড়ি দিন । কুড়ি দিন

গড়িয়ে একুশদিনে পুলিশ আশুতোষ বাবুর মৃতদেহ উদ্ধারে সক্ষম হয় । চেলাগাং থেকে অনেক দুরে পুলিশ আশুতোষ বাবুর মৃতদেহ উদ্ধারে সক্ষম হয় । চেলাগাং থেকে অনেক দুরে দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোরা থানার অধীনে কলসী নামক স্থানে এক জঙ্গলে ডোবার ভেতরে চিরনিদ্রায় শায়িত আশুতোষ দেবনাথ , এ বার শুরু আইনী প্রক্রিয়া , আইনী প্রক্রিয়ার পর অন্তোষ্ঠী ক্রিয়া কর্ম্ম , স্বজনদের চোখের জল, তা আর কতক্ষন । সমাজের গতিতো আর থেমে থাকে না , আনন্দ , দুঃখশোক যাই হোক না কেন সমাজ গতিশীল। রেণুবালাকেও তো আর বসে থাকলে হবে না , সন্তানদের বাঁচাতে হবে । এখন আরো গুরু দায়িত্ব রেণুবালার । রেণুবালা বহু কষ্টে মনকে শান্ত করে পুনরায় শুরু করল পথ চলা । ভেবে নিল এভাবে তো আর বসে থাকা যায় না তবে পাশাপাশি তাও ভেবে নিল দুঃখের বোঝা বয়ে আর চেলাগাং থাকবো না । কিন্তু পুরানো প্রবাদটুকুই যেন ঠিক স্বামী বিনা মেয়েদের জীবন বেগতিক। ক্রমে সবাই দূরে সরে গেছে তবুও রেণুবালা মানসিক দিক দিয়ে ভাঙ্গেননি মন শক্ত করে কঠোর জীবনপথে এক পা দু পা করে এগিয়ে যেতে থাকে অভাগি তিনকন্যাকে সাথে নিয়ে । অবশেষে নানাহ দৌড় ঝাঁপে সরকারী বদান্যতায় রেনুবালা চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরী পান । মেয়েদের ভালো শিক্ষা দেবে ভেবে অভিশপ্ত চেলাগাং ছেড়ে চলে আসেন উদয়পুরের ছনবন গ্রামে । মায়ের দুঃখ অনুধাবন করে তিনকন্যা , পুতুল ,প্রতিমা ,অনিমাও লেখাপড়া শুরু করে । এরই মাঝে বড়মেয়ে পুতুল বড় হয়ে গেছে দশমশ্রেণীতে পড়ে পাশাপাশি প্রতিমা ও নবম শ্রেণীতে পড়ে । মেয়েরা বড় হয়ে যাচ্ছে তাদের বিয়ের চিন্তা ভাবনাটুকুও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে রেনুবালা এগোচ্ছেন । ১৯৮৫ ইং ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পুতুলের বিয়ের জন্য মেলাঘর থেকে আশুতোষ ভৌমিক নামে এক ব্যাক্তি প্রস্তাব দেন । উভয় পক্ষের কথোপকথোন শান্তস্বভাবা , ভদস্থ মেয়ে পুতুলকে দেখেই আশুতোষ বাবু একবাক্যে কথা দিয়ে গেলেন আমি আমার ছেলে অরুণকে এই মেয়ের সাথেই বিয়ে করাবো । যেমন কথা তেমনি কাজ। ১৯৮৫ ইং মার্চ মাসে (ফাল্গুন) পুতুল ও অরুনের বিয়ে হয় । নববধু পেয়ে ভৌমিক বাড়ী ও প্রচন্ড খুশী । শ্বাশুড়ী অমিয়বালা ও বৌ পেয়ে খুশীতে আত্মহারা । বলে মনের মত বৌ পেয়েছি , এখন থেকে তুই আমার ছেলের বউ নয় আমার মেয়েও বটে সুখের সংসারে আরো হাসি ফুটে উঠে । বউ যেন ভৌমিক বাড়ীর স্বাক্ষাৎ লক্ষী । বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই অরুন ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেল প্রথম ব্যাটিলিয়ানে জোয়ানের চাকুরী পায় । বউএর আদর বহুগুন বেড়ে যায়। ক্রমে ক্রমে পুতুল একছেলে ও একমেয়ে সন্তানের জননী হয় । মায়ের মতই মেয়ের ইচ্ছা ছেলে মেয়েকে ভাল করে পড়াশুনা শেখাবে । পুনরায় ভৌমিক বাড়ীতে আনন্দ অরুন তার বাহিনীতে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে জোয়ান থেকে প্রমোশন পেয়ে ল্যান্সনায়েক হয়েছে ।১৯৯৭ ইং ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেল তৃতীয় ব্যাটালিয়ানে বদলী হয়েছে । দুর্দান্ত সাহসী অরুন ও দেশসেবার কৃতিত্ব দেখাতে

কখনো ও কসুর করেনি । জোয়ানদের কাছে ছিল অরুন আদর্শ ও সুশৃঙ্খল কমান্ডার ,তার কর্ম দক্ষতার জন্য সে বাহিনী থেকে বহুবার পুরস্কৃত ও হয় । কিন্তু কে জানত রেনুবালার মতো তারই বড় মেয়ে পুতুলের জীবনেও অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে । কে জানত মুখোশধারী হায়নাদের রক্ত পিপাসু চোখ অরুনের উপরেও পড়েছে যদি জানত তবে কখনোও মুখোশধারী হায়নারা অরুনের হাত থেকে রক্ষা পেতো না। মুখোশধারী হায়নারা সম্মুখ সমর হানে না , চোরাগোপ্তা আক্রমনই তাদের নেশা । ১৯৯৮ ইং ফেব্রুয়ারী মাসের ১২ তারিখ কমলপুর সাব- ডিভিশনে গঙ্গানগরে ৭ জন জোয়ান সহ গুপ্তঘাতক মুখোশধারী হায়েনাদের হিংস্র আক্রমনে বুলেটে ঝাঝড়া হয়ে যায় । আহত হয় অরুণসহ সাতজন জোয়ান । বীরদর্পে হাসিমুখে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া অরুণ আজ আর নেই , বাক্সবন্দী নিস্প্রাণ অরুণের দেহ এসে পৌঁছে অরুণের বাড়ীতে । ঝড়ে পড়ে পুতুলের সিথিঁর সিঁদূর , হাতের শাখা , সাথে অফুরন্ত অশ্রু জলে স্বামীকে শেষ বিদায় । অরুণ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে , তাই বলে সমাজের গতি স্তব্ধ হয়নি , শেষ স্তব্ধতা সারিয়ে পুতুলকেও উঠতে হয়েছিল মা রেণুবালার মতো , শুরু হলো ছেলে মেয়েকে নিয়ে ভাবনা । দায়িত্বের বোঝা পুতুলের আরো বেড়ে যায় । কিন্তু ভদ্রবেশী মুখোশধারীদের অভাব নেই , পিতা আশুতোষের মৃত্যুর পর যারা বন্ধু ছিল তারাও কেটে গিয়েছিল। পুতুলের বাবার অনেক টাকা পয়সা বন্ধুবেশী মুখোশধারীরা আত্মসাৎ করে নিয়েছিল , মা রেণুমালার কাছ থেকে এই তিক্ত অভিজ্ঞতাটুকু পুতুলের অপ্রাপ্ত বয়সেই জানা হয়ে গিয়েছিল । যার দরুণ বন্ধু বেশী মুখোশধারীরা সেই সুযোগটুকু পুতুলের কাছ থেকে নিতে পারেনি । স্বার্থান্বেষী অর্থলোলুপড়া মুষড়ে পড়ে । সরকারী বদন্যতায় পুতুল চাকুরী পেয়ে যায় , পাশাপাশি দায়িত্ব ও বেড়ে যায়, কারণ নিজের ছেলে মেয়ে শেষ কথা নই পাশাপাশি অরুণ রেখে গেছে পুতুলের জন্য আরো গুরু দায়িত্ব , পুত্রহীন শোকগ্রস্থ অরুণের বৃদ্ধ পিতা মাতা , পুত্র কন্যা সহ এখন পুতুলের পথ চলা , নানাহ ঝড়ঝাপটার মাঝে ও ভাবনা সন্তানদের সুন্দর জীবন আর তাদের দেখেই ও তাদের আনন্দেই আজ পুতুলের আনন্দ ও পথ চলা । জীবন বসে থাকে না , পুতুল আজ সরকারী ও সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে স্বামীর সুপ্ত ইচ্ছা পূরণে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রত্যাশায়।

প্রতারণার ফাঁদে

বয়সটা চল্লিশোর্ধ তবুও দীপকবাবুর বয়স সদাসর্ব্বদা ১৮ বছরের উঁকিঝুঁকি মারে ।উনার বন্ধু বান্ধব আড্ডার জায়গা সবটাই ১৮ থেকে ২৫ এর মধ্যেই , নিজে ও চির তরুণ, তার মাঝেও বিশেষত্ব এখনো কুমার ।লেখাপড়ায় ক্লাস নাইন হলেও বাকপটুতা , বেশভুষায় এ যুগের বিদ্বানদেরও ছড়িয়ে গেছেন ।বোঝা বলতে কিছুই নেই , বৃদ্ধা মাও বাবার পেনশনে চলেন। বছর ১০ এক আগেই বাবা পরলোক চলে গেছেন ।সুতরাং বোঝাও নেই , বাধাও নেই ।তরুণ যুবকদের সাথে নারী বিশ্লেষণ ,প্রেমের গল্প , মেয়ে খোঁজা উনার নিত্য নৈমত্তিক আমেজ ।বাবার তৈরী অট্টালিকা , যা উনার ঘরের শোভা বাড়ায় , তার উপরে পৈতৃক তৈরী দালানবাড়ী সরকারী বেসরকারী সংস্থার কাছে ভাড়া আছে। মোটামুটি ভাল অংকের টাকাই আসে চিন্তা নেই কোন মেরামতির ।সুতরাং অমন ভাগ্য ক-জনের আছে ।স্কুল কলেজের সময়টুকু তাই চা স্টলটাই উনার জন্য উৎকৃষ্ট স্থান ।চায়ের কাপে এক চুমুক খেয়ে পত্রিকাটা উল্টান , অন্য খবরের বালাই নেই , খবর শুধু পাত্র - পাত্রী চাই , মুচকি হেসে দেখেন কোথাও লেখা র্ফসা , সুশ্রী , শিক্ষিতা , গৃহকর্মনিপুনা গান জানে (২৫) প্রাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত সুযোগ্য পাত্র চাই ।নিম্নে থাকে ঠিকানা - যোগাযোগের স্থান ইত্যাদি ।তারই মাঝে কলেজ ছাত্রীদের আঁচল

উড়িয়ে সুগন্ধি গায়ে চলে যাওয়া। লাল লিপস্টিক লাগিয়ে ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখে এসবটাই দীপকবাবুর কাছে রোমান্টিক । তারপর রোমান্টিক বন্ধুরা এলে শুরু হতো বিশ্লেষণ , সাথে থাকত খবরের কাগজটুকো । যদি সুন্দরই হয় তাহলে বিজ্ঞাপণ কেন ? তাহলে হয়ত গোলমাল বেশি। গৃহকর্মে পারদর্শী এটাতো কমন ওয়ার্ড , তাই মনে হয় সবাই লেখে । লেখাপড়া মনে হয় বড়জোর এইট - নাইনের বিদ্যে , যার কারনে গুনগত মান বাড়ানোর জন্যে গৃহকর্মেপারদর্শী । হয়ত কয়েকটা ওর্য়াকি এ্যডুকেশনের সেলাইয়ের কাজ, লাল রং এর ঝোল মাঝ খানে মাংসের টুকরো তাই বৈকি । মেয়ে দেখতে গেলে মেয়ের মার স্বগতোক্তি বাবা আমার মেয়ে ভাল রান্না করে , আজ যা রেধেঁছে সবটাই ওর নিজের হাতে । এত সবের মাঝেও দেখো , বাবা মেয়ে আমার রুপে লক্ষী , গুনে বিদ্যাদেবী স্বরস্বত্বী - তাই মনে হয় গৃহকর্মে পারদর্শীর সংজ্ঞা । এ ভাবে চলতো জমজমাট আড্ডা । তারপরই শুরু হতো আরেকটা বিজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনা । আঠাশ , এতো অনেক বড়ের সংখ্যা , লেখাপড়া হায়ার সেকেন্ডারী তাহলে এতদিন বিয়ে না হওয়া মানে হয়ত বিশ্রী , নয় চরিত্র , নয় পারিবারিক দুরাবস্থা । তাছাড়া এ যুগে আঠাশ কেন আঠারতেই মেয়েদের মাথায় কালো মেহেন্দী লাগিয়ে চুল কালো রাখতে হয় । তার উপরে আবার দাবিহীন , যদিও এই শব্দটা হঠাৎ করে যেন নতুন সংযোজন। মানে লালপাড়ের শাড়ী ছাড়া কিছুই চাওয়া চলবে না । পাছে আবার যৌতুক বিরোধী আইনের ভেজাল । দীপকবাবুর উক্তি কিন্তু আমি যে প্রতিষ্ঠিত । এবার কাগজটা বগলদাবা করে উঠে দাড়াল দীপক । এরইমাঝে তমালের খিচতি দীপকদা আরে বসতো দেখি এরপর কি আছে । তমালের কথায় আবার ঝুঁকে বসে পড়ে । অনুপ বলে উঠে দীপকদা তারপর কি পড়তো । নারে কাগজের ছাপাগুলো খুব ছোট ছোট । চোখ টা যেন টনটন করছে , চোখগুলো ও ঝাপসা হয়ে আসছে । অনুপ বলে উঠে এখনো ও তোমার তিরিশ হয়নি কিন্তু কথাগুলো যেন বলছ চল্লিশের মতো । যা হোক সকাল গড়িয়ে দুপুর পেটে টান ধরেছে। বাড়ী গিয়ে দীপক হতভম্ভ , মা রাঙা চোখে ঠাঁই তাকিয়ে । তারপরেই ডুকবের কেঁদে উঠল । দশটা বছর তোর বাবা মারা যাওয়ার পর তুই কতই না জ্বালা দিচ্ছিস । কাজকর্মে তো কিছুই নেই , তার উপর ঘরে কিছুই নেই ,বাজারটা করে কে ? যাই হোক মার হ্যাপা সামলাতে হবে । না হলে যে মা তার পয়সা দেবে না । মা বলে উঠে আমি আর কদিন । কিছু একটা কাজকর্ম কর বিয়ে থা কর । বয়েসটা তো আর কম হলো না । সারাটা জীবন তো জ্বালিয়ে আসছিস্। দীপকের কাছে যেন মা - ইবড় দায় । যাই হোক আলুসেদ্ধ ভাত তো পাওয়া গেল । খিদের পেটে তাই এখন অমৃত । খেয়েদেয়ে কাগজটা তক্তপোশের উপর ছুড়ে ফেলে দিল । বিড়বিড় করে বলতে লাগল আজকের কাগজটাই বরাদ্দ । ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া পাত্র পছন্দ নয় । তাহলে আমার মত দীপকেরা যায় কোথায় ?

যাই হোক রাত্রীতে খাবার দাবার সেরে দীপক বিছানায় গেল । ছট ফট করতে করতে গভীর রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল কে জানে । ভোরের বাতাস খোলা জানলা দিয়ে দীপকের গায়ে লেগে রোমাঞ্চ হতে লাগল গভীর স্বপ্ন , নানা রং বেরং এর ফুল , স্বপ্নের জগৎ , বড্ড দূর , সকাল আটটায় মায়ের ডাকে দীপকের স্বপ্ন চটকে গেছে । উঠে লক্ষী ছেলেটির মত বাজারে গিয়ে বাজার করে আবারো সেই আড্ডায় , কারণ স্কুল কলেজের টাইম এটা তো মহা মূল্যবান । চায়ের দোকানে কাগজটা খুলেই দেখল আজকের বিজ্ঞাপনের প্রথমেই , সুন্দরী , মাধ্যমিক , শান্ত স্বভাবা , অনূর্ধ তিরিশ পাত্র চাই । নিম্নে ঠিকানা বক্স নং ইত্যাদি । এখন প্রশ্ন সুন্দর তো বটে কেমন সুন্দরী ? ফরসা ফ্যাকাশে রক্তশূন্য নয়তো ? নাকি দুধে আলতো । তবে দীপকের পছন্দ হলো চুল থাকবে ঘনকালো , মুখ চোখ থাকবে হরিণীর মতো , হ্যাঁ সেই আপীল থাকবে তবে তা শুধু দীপকেরই জন্য। গলার স্বরটা হবে কোকিল কণ্ঠী তা যেন কথা বললেই কাকের মত না হয় ।

যাই হোক বিজ্ঞাপনটা দীপকের আজ কিছুটা মনঃপুত । পাশেই রাধেশ্যাম বাবুর টংদোকান সেখান থেকে একখন্ড কাগজ ও ঝকঝকে খাম কিনে নিল । বলা বাহুল্য বিদ্যের জোর যাই হোক না কেন দীপকের হাতের লেখা কিন্তু ঝরঝরে মুক্তা দিয়ে বাঁধানো। কাগজ কলম নিয়েই বৃদ্ধ সুরেশ দাদুর চা ষ্টলে বসে শুরু হল পত্র লেখা । আজকের খবরের কাগজে আপনাদের দেওয়া বিজ্ঞাপনটুকু দেখলাম । যেহেতু আমার বাবা নেই , মা বৃদ্ধা ,ভাই বোনও নেই তাই আমি নিজেই নিজের অভিভাবক। যে কারণে নিজেকেই লিখতে হচ্ছে । আমার বয়েস এখনোও তিরিশ হয় নি । আমি একটি হাইস্কুলে পিউর সায়েন্সের টিচার। বৃদ্ধা মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই । সুতরাং আপনাদের বিজ্ঞাপনটুকু আমাকে অভিভুত করেছে । আমি ২৯ তারিখ সরস্বতী পূজোর দিন বিকেলে আপনাদের বাসায় নিজেই আপনাদের কন্যাকে দেখতে আসব , ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে নেবেন । তারপর নিজের মন থেকে নিজের একখানা ঠিকানা দিয়ে দেয় সাথে স্কুলের ঠিকানাও যার খোঁজ পাওয়া কিনা বড্ড ভার , আর চিঠিখানা আগরতলা প্রধান ডাকঘরেই পোষ্ট করে , গ্রামের পোষ্ট অফিসে নয় ।

কথায় কথায় চা স্টলের মালিক সুরেশ দাদু বলে উঠে তোমার মেয়ে তোমাকেই সাজিয়ে দিতে হবে , যেমনটা বাজারে, যদি সব্জী টাটকা না আনতে পারো তবে খদ্দের নেবেই বা কেন । তাতে দীপকদের কি দোষ ?

যে করেই হোক জায়গাটা চিনতে দীপকের কেন কষ্ট হল না । বাস থেকে রাস্তায় নেমেই বা দিকে একটা ছোট্র মুদির দোকান যাতে নাকি আবার চায়ের ব্যবস্থাও আছে । সোজা দোকানে ঢুকে পড়ল দীপক - মাঝবয়সী দোকানদার ছাড়া দাকানে আর কেহই নেই দীপক জিজ্ঞেস করলো বলতে পারেন আদর্শ পাড়ার সুভাষবাবুর বাড়ীটুকু কোথায় ? বলতেই দোকানের মালিক নরেশবাবু একগাল হেসে ফেললেন । বলে উঠলেন তাহলে —— আপনি নাকি ? আপনার জন্য এতক্ষন অপেক্ষা করে এইতো সুভাষবাবু গেলেন --- তাহলে রাস্তাটুকু বলুন তো । এই তো মাটির পথ বেয়ে সোজা চলে

যান হাতে গোনা। তিন নম্বর বাড়ীটুকু । এই তো মাটির পথ বেয়ে সোজা চলে যান হাতে গোনা তিন নম্বর বাড়ীটুকুই সুভাষবাবুর । খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না দীপকের , দু খানা সুন্দর টিনের ঘর , মাঝখানে উঠোন , বিকেলের পড়ন্তরোদ , বাড়ীতে ঢুকতেই মনে হল কি যেন ব্যস্ততা ।

প্রস্তুতি নিয়ে দীপক জিজ্ঞেস করল সুভাষবাবু এখানে থাকেন ? গায়ে খদ্দরের জামা পরণে ধুতি মাঝ বয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন আসুন আসুন । ঘরে ঢুকে পড়ল দীপক খুব সাজানো ঘর , চেয়ার পাতানো সামনে সুসজ্জিত টেবিল । দীপক বসতেই সুভাষ বাবু বলে উঠলেন , আমার লক্ষী সত্যিই লক্ষী । ছোট থেকেই শান্ত প্রকৃতির বাযনা বলতে কিছুই নেই , এই তো আর্দশ পাড়া স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ কেরছে । দীপক যেন একটু আনমনা হয়ে পড়ল । নামটাই নাকি এখানে ওল্ড ফ্যাশনের 'লক্ষী' । যাই হোক কিছু তো করতেই হয় । সুভাষবাবু জিজ্ঞেস করলেন বাবা বাড়ীটা কোথায় বলুন তো , দুর্গাচৌমুহনী বাজার গেছেন তো , একটু সামনে গেলেন প্রগতি স্কুলের রাস্তা ধরে বা দিকে একটু সামনেই একটা গলি, গলির ডান দিকে এন জে ক্লাব ঠিক তার পেছনের বাড়ীটুকুই আমাদের । কর্থাবার্তার পরেই এলো সাজানো একখানা, থালা , মিষ্টি , পায়েস, লুচিকত কী? খেতে খেতে দীপক দেখতে পেল সুভাষবাবু ও উনার স্ত্রী বেশ খুশী , বলেই ফেলছে ছেলে খুব স্মার্ট , সত্যিইখুব মানাবে , খাওয়া শেষে সুভাষ বাবু ভদ্রস্থ কণ্ঠে বলে উঠলেন তাহলে এবার ডাক ! নিঃশব্দে গুটি গুটি পায়ে , তারপরে সামনে রাখা একটি জল চৌকিতে টুক করে বসে পড়ল ও হাত জোর করে প্রণাম।

সুভাষবাবু বলে উঠলেন নাম বল মা "লক্ষী" । তাকিয়েছিল দীপক, আরে এ যেন সত্যিই লক্ষী। চোখ , নাক ঠোঁট কোথাও যেন কোন ত্রুটিনেই । সুন্দর ঠোঁট ভুরুর ঠিক ওপরে একটি ছোট্র টিপ , দারুন মানিয়েছে তো । এমন সময় পাশের বাড়ীর এক বৃদ্ধ লোক এসে উঠলেন । বললেন দেখুন বাবা, সুভাষ মানুষটি খুবই সরল । বলুনতো মেয়ে আপনার কেমন লাগল। খুবই পছন্দ হয়েছে। দাদু বলে কথা 'লক্ষী' তোর কাছেপাত্র কেমন লাগল। লক্ষী ছোট্র মুচকি হেসে সম্মতিটুকু বুঝিয়ে দিল । দাদু বললেন তাহলে আমরা কেটে পড়ি উভয়ে উভয়কে জেনে নেওয়াটাই ভাল । সারাটা জীবন তো তোরাই সংসার করবি । কিছুক্ষণ আলাপ চারিতাও হল । উভয়েই উভয়কে পছন্দ করে ফেলেছে সুতরাং আর বাকী বা কী? তারপর বৃদ্ধ এসে কথায় কথায় সত্যটা জেনে নিতে চাইছিলেন।

কোন স্কুলে এখন আছেন । দীপক বলে উঠল আমাকে আপনি করে সম্বোদন করে লজ্জা দেবেন না । আমি মতিনগর হাইস্কুলে পিউর সায়েন্সের টিচার । এই মতিনগর হাইস্কুলে একসময়ে মতিনগর পাঠশালা নামে খ্যাত ছিল । যুগের বির্বতনে আজ মতিনগর হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল । বাবা মারা গেছেন আমার বাবা অবনীবাবু রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন , খুব সুপরিচিতও ছিল , একডাকে সবাই চেনে । আপনারাই এখন আমার সব । আমার জন্য মা অনেক কষ্ট করেছেন । সত্যিইতোমার

মা ভাগ্যবতী, একমাত্র ছেলে সামনের গ্রীষ্মের বন্ধে গেলেই খুব ভাল হয় । দিনক্ষণ ও ঠিক হয়ে গেলো তাছাড়া মায়ের সঙ্গেও আলাপ করে আসবেন । বাড়ীটাও দেখে আসবেন । আসবেন কিন্তু, মা - আপনাদের দেখলে খুব খুশী হবেন। তারপরে তো মায়ের বাড়ী , আসতেই হবে । সুভাষ বলছে বাবা? হাত চেপে ধরল দীপকের পছন্দ হয়েছে তো আমার লক্ষীকে? তোমার মত ছেলের কাছে দিতে পারলে আমিও নিশ্চিত হই । সুভাষ বাবুর স্ত্রী ও বলে উঠলেন , দ্যাখো না , কোন দাবী দাওয়া ,দীপক না , না একি বলছেন আমি মেয়ে নিতে এসেছি জিনিষ নয় । বাঃ বাঃ কত ভাল ছেলে দেখতো, ও ভারি শান্ত । কথা দিচ্ছিতো বাবা? হ্যাঁ মা আর কি ই বাকী রইলো বলুন তো ।

হাত নেড়ে সবাইকে বিদায় নিয়ে লক্ষীর সাথে কথা বলে দীপক আস্তে আস্তে উঠে পড়ল বাস ষ্ট্যান্ডের দিকে । সাথে সাথে সুভাষবাবু ও ভাবী জামাইয়ের পথ অনুসরণ করে এগিয়ে এলেন । এখন দিনক্ষণ ঠিক করার পালা ।

শুরু হল সুভাষ বাবুদের দৌড়ঝাপ , মেয়ে বিয়ের ব্যাপারে বলে কথা , কত চিঠি মতিনগর হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে কিন্তু না কোন জবাব নেই । লক্ষী বলে উঠল বাবা উনি কিন্তু ফালতু নয় হয়ত বা বাইরে কোথা ও গেছে । গ্রীষ্মের বন্ধে গিয়ে বাড়ীঘর দেখে আস তখনই তো কথা হবে এতো পাগলামি করছ কেন , লক্ষী বাসরঘরের স্বপ্ন দেখছে । গ্রীষ্মের ছুটিতে সুভাষবাবু গ্রামের দু-একজন কে নিয়ে গেল সেই দুর্গাচৌমুহনী বাজার , এন জে ক্লাব , প্রগতি রোড। রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্ত অবনীবাবুর বাড়ীর খোঁজে । না সে ঠিকানায় কিছুই নেই আছে অকটি জলাশয় আর অপর প্রান্তে মহাশ্মশান । সুভাষবাবুরা হন্যে হয়ে খুঁজে ও কোন হদিস পেলেন না - বুঝতে পারলেন এ এক ভদ্রবেশী প্রতারকের ফাঁদে পড়েছেন । যাই হোক বুক ফাটা কান্নায় তো আর বেশী দিন চলে না । লক্ষী সরল ভাবা মেয়ে ভেবে নিল ছেলেরা এমনটাই হয় , সুতরাং আর কখনো ও বিয়ে করবে না । অমনি এক দিন পূজোর কেনাকাটা করতে লক্ষী দুই বান্ধবী সহ রাজধানী আগরতলায় আসে । কামান চৌমুহনী হয়ে হকার্স কর্ণারের ভেতরে ঢুকতেই দেখে এক ভদ্রলোক হন্যে হয়ে কি যেন খুঁজছে আর সবাইকে জিজ্ঞেস করছে আমার পারসটা (ম্যানিব্যাগ) পেয়েছেন কি ? কে যেন পকেট থেকে নিয়ে গেল ? অমনিতেই লোকটা লক্ষীর মুখোমুখি । উভয়ে হতভম্ব । হতবাক , ইতস্ততঃ, কিছু সময় ভ্রম কাটিয়ে লক্ষী জিজ্ঞেস করে উঠল আপনি দীপকবাবু না । লোকটি মাথা নীচু করে ঠাঁইদাড়িয়ে ———— কি হয়েছে। পকেট মার আমার ম্যানিব্যাগ নিয়ে গেছে । ও —— তাই নাকি ? এখন তো বাড়ী যাওয়ার পথও নেই । লক্ষী বলে উঠল অন্যকে প্রতারণার ফাঁদে ফেললে নিজে ও আমার মতো পড়তে হয়, আমার মতো কত লক্ষীর জীবন হয়ত আপনার প্রতারণার ফাঁদে পড়েছে । যাক গে নিন, লক্ষী নিজের পার্টস টুকু খুলে কটি টাকা হাতে দিয়ে বলল যান ঘরে ফিরে যান । আর কোন দিন কোন লক্ষীকে আর প্রতারণা করবেন না — তা হলে নিজেই এমন ভাবে ফাঁদে পড়বেন । ক্ষমা করে দাও --- নতুন জীবন শুরু করব।

ওরা পণের বলি

রাত ৯টা বেজে ১৫ মিনিট , ঝিরঝির বৃষ্টি সাথে দমকা হাওয়া , দিনটা ছিল শুক্রবার ,তারিখ ৯-৩-২০০১ ইং ।অন্ধকার রাত্রি হঠাৎ বাইরের দিকে চোখ পড়তেই হতচকিত দুই নবযৌবনা গ্রাম্য বধু সাধারণ বেশে দুর্যোগের রাত্তিরে থানার সদর দরজায় ক্রন্দনরত , একি ! কোন বড় অঘটন ঘটে গেলো না তো , বড় বাবু ছোট বাবু একে অপরের দিকে তাকিয়ে ।সম্ভ্রম কাটিয়ে ও সি সাহেব বলে উঠলেন আপনারা কে , এই দুর্যোগের রাত্রে সাথে কেহ আসে নি ? আপনাদের বাড়ী কোথায়, নাম কি, কেন এসেছেন , বলতেই সমস্বরে উভয়ে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল , স্যার আমরা গরী , আমাদের জন্য কেহ নেই , পঞ্চায়েতে গেছি , গ্রামে গেছি কেহ কোন কিছু বলে না । তাই থানায় এসেছি । বলুন আপনাদের অভিযোগ , আগে নামতো বলুন । স্যার আমার নাম রেখা নমঃ আর

সাথে আমার ছোট বোন সে পূর্ণিমা দাস । স্যার আমি তো লিখতে পারবো না আপনাকে বলতে পারব , গতকাল বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ৯-৩-২০০১ ইং বেলা এগারটার সময় আমাদের সবার ছোট বোন ঝুলনকে তাহার স্বামী প্রদীপ জোর করে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় , বর্তমানে সে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে । আমার বোন পনের বলি , স্বামী শ্বাশুড়ীর অত্যাচার অকালে হয়তো আমার বোনের প্রাণ কেঁড়ে নেবে। এক বৎসর হলো ওর বিয়ে হয়েছে , স্যার আপনার কাছে এসেছি কিছু করুন । অভাগা বোনকে বিচার দিন । এবার শুরু হলো আইনী প্রক্রিয়া। রেখা নমঃর অভিযোগ ও সি সাহেব গুরুত্ব সহকারে লিখে মামলা লিপিবদ্ধ করেন । ঝুলনের স্বামী ও শ্বাশুড়ীর বিরুদ্ধে , আমতলী থানার মোকদ্দমা নম্বর ১৭/২০০১ ইং ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ৪৯৮ (এ) ৩২৬,৩০৭ ধারা মোতাবেক মামলা লিপিবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই মামলার তদন্তকারী অফিসার দ্রুত ছুটে জি জি হাসপাতালে যান যেখানে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ঝুলন ফিমেল সার্জিকেল ১ বেড নাম্বার ২৪ এ শায়িত আছেন । তদন্তকারী অফিসার গিয়ে দেখেন ঝুলনের বেডের পাশে তার বৃদ্ধ মা উষা রাণী বসে আছেন । ঝলসানো মাংসের পোড়া গন্ধ এক অসহনীয় পরিস্থিতি । ঝুলন সজাগ দৃষ্টিতে অনর্গল ভাবে বলে গেল তার উপর অত্যাচারের কাহিনী। বৃদ্ধা মা পাশে বসে কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছতে লাগল। ঝুলন বলতে শুরু করল ৮/৩/২০০১ ইং দুপুরে আমাকে জি বি হাসপাতালে ভর্ত্তি করানো হয়েছে গত ১৩/৩/২০০০ ইং আমার সাথে প্রদীপের বিয়ে হয় । বিয়ের পর হইতেই প্রদীপের মা মালতী ও প্রদীপ নিজে সবসময় আমাকে মারপিট করত। বাপের বাড়ী থোকে নগদ টাকা আনার জন্য । আমি তাদের অত্যাচারের কথা , মা বাবা, ভাই , বোন , আত্মীয়স্বজন সবার কাছে বারংবার বলেছি । আমার মা , বাবা ও ভাই সবাই আমার শ্বাশুড়ী ও স্বামীর কাছে কাকুতি মিনতি করে অনুরোধ করেছে আমাকে যেন নির্যাতন না করে । আমার বিয়েতে বাবা সাধ্যমত পণ তাদেরকে দিয়েছে । তবুও আমাকে অন্তঃ সত্বা অবস্থায় আমার স্বামী ও শ্বাশুড়ী বাড়ী থেকে বের করে দয়ে । উপায়হীন হয়ে বাপের বাড়ী চলে যাই , সেখানেই আমার একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। স্বামী , সন্তান নিয়ে সুখে ঘর করার উদ্দেশে ঝুলন মাকে নিয়ে , শিশু কন্যাকে নিয়ে পুনরায় স্বামীর ঘরে ফিরে আসে । কিন্তু যেই কপাল সেই মাথা , স্বামীর বাড়ীতে ফিরে আসার পর পুনরায় পণের জন্য ঝুলণের উপর শুরু হয় অত্যাচার । ৭-৩-২০০১ ইং স্বামী ও শ্বাশুড়ী সারা রাত্র ঝুলনকে অত্যাচারে নাজেহাল করে তুলে । এক অবর্ণনীয় অত্যাচার, পরদিন অর্থাৎ ৮-৩-২০০১ ইং সকালে শ্বাশুড়ী সুকৌশলে বাড়ী থেকে বের হয়ে যান । সকাল থেকেই চলে মানসিক নিপীড়ণ বেলা গড়িয়ে ১১টা হঠাৎ যমরূপী স্বামী প্রদীপ ঝুলনকে ঝাপটে ধরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় । ঝুলনের চিৎকার চেচামেচিতে গ্রামের লোক ছুটে আসে । আগুন নিভিয়ে হাসপাতালে প্রেরণ করে । হাসপাতাল শয্যায় শুয়ে ঝুলন

আশাবাদী সে সুস্থ হয়ে উঠবে কিন্তু তার অনুরোধ সে কখনোও আর এই স্বামীর ঘরে যাবে না। তদন্তকারীকে বলে উঠে, স্যার আমি আর ওর ঘরে যাবো না। ও আমায় মেরে ফেলবে। পাশে বসা ঝুলনের মা উষারাণীও একই বক্তব্য, স্যার ঝুলনকে বাঁচান, মেয়েকে আর ওই পাষন্ডের ঘরে পাঠাব না। ঝুলন বহুবার আমাদের বলেছে, আমরা অনুরোধ করেছি আমাদের ঝুলনকে যেন আর অত্যাচার না করে। আমরা বলেছি সুযোগে তাদের দাবীও মিটিয়ে দেবো। মেয়ের ভবিষ্যত চিন্তা করে কখনোও আনি আদালতের কথা ভাবি নি। কিন্তু এখন আর উপায় নেই স্যার এখন আমরা বিচার চাই। জি বি হাসপাতালে থাকা ঝুলনের অপর বড় বোন পূর্ণিমাকেও তদনন্তকারী অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ করলে সেও বোনের মর্মান্তিক নির্ম্মম ঘটনার বিচার প্রার্থনা করে। তদন্তকারী তাদের বয়ান লিপিবদ্ধ করে হাসপাতালে কর্তব্যরত সেবিকার সাথে কথা বলে জি বি হাসপাতাল ত্যাগ করেন বেং ঘটনাস্থল আমতলী থানা থেকে যার দূরত্ব ৫ কিঃমি পূর্ব দিকে সেই রাণীরখামার গ্রামে যান এবং গিয়ে দেখেন অপরাধী প্রদীপ সরকারও নেই বা তার মা মালতী সরকারও নেই তদন্তকারী অফিসার গ্রামের লোকজন থেকে জানতে পারেন অব্যহতি পরেই মা পুত্র গা ঢাকা দিয়েছেন। ঘটনাস্থলে গোপনে তথ্যের ভিত্তিতে অফিসার কাঠালতলী গ্রামে যান। তখন গভীর রাত সম্ভাবনা বিফল যায়নি তদন্তকারী দলের হাতে ধরা পড়ে যায় অত্যাচারী স্বামী প্রদীপ সরকার, পুনরায় পথ চলা। নিস্তব্দ পথ এবার দিক দর্শক প্রদীপ সরকার নিজেই। নিয়ে এলো তার বাড়ীতে যেখানে প্রদীপ ও তার মার হাতে নৈত্য নিমত্তিক প্রহৃত হতো হতভাগা গৃহ বধূ ঝুলন। পুলিশী জেরার মুখে প্রদীপ ঘরের কোন থেকে বের করে দিল সেই পাত্র যাতে অল্প কিছু কেরোসিন ছিল। বাকীটুকু ঝুলনের শরীরের উপরে বৃষ্টি স্নান করিয়েছিল মানবতাহীন স্বামী প্রদীপ যার পর আগুন জ্বেলে বহ্নুৎসব উপভোগ করেছিল। শেষ রাতে প্রদীপ পুলিশকে উগলে বলে দিল স্যার আমি ভুল করেছি, এবার ক্ষমা করুন, নিজের জীবনের কথা শুনাতে গিয়ে নিজের মনের অজান্তে প্রদীপ সব বলে যেতে লাগল ১৯৯৮ ইং তে সে প্রথম বিয়ে করে সিধাই থানাধীন কালীবাজারে। সেই স্ত্রীর নাম ছিল অনিতা। শখ করে ঘর বেধেছিল অনিতা। কেইবা জানতো অনিতার জীবনের এই নির্ম্মম ইতিকথা। প্রদীপ ও তার মার অত্যাচার শুরু হয় প্রথমা স্ত্রী অনিতা থেকে। উদ্দেশ্যেও এক বাপের বাড়ী থেকে পণ আদায় করা। অবশেষে ঝুলনের মত অন্তসত্বা অবস্থায় অনিতা বাপের বাড়ী চলে যায় তাদের অত্যাচার থেকে মুক্তি নিতে। বাপের বাড়ীতে অনিতা এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস ছয় দিনের মাথায় অনিতার পুত্র সন্তানের অকাল মৃত্যু হয়। পুত্র বিয়োগের যন্ত্রণা, স্বামী শ্বাশুড়ীর অত্যাচার, তবু ও অনিতা ভেবেছিলো হয়তো এবার স্বামী আমাকে ভালবাসবে। এই ভেবে পুনরায় স্বামীর ঘরে ফিরে আসে অনিতা। কিন্তু না এ যেন বিপরীত। স্বামী শ্বাশুড়ীর অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অনিতার দিক বিদিক শুন্য হয়ে যায়। ওদের কাছে ক্ষমা নেই। ওরা বর্বর, একদিন শ্বাশুড়ী ও স্বামী অনিতাকে ঘর থেকে বের করে দেয়,

অনন্যোপায় অনিতা বাপের বাড়ী যেতে বাধ্য হয় কিন্তু অপমান, ক্ষোভ , ভবিষ্যতহীন জীবন ভেবে অনিতা বাধ্য হয়ে নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহুতি দেয় । অনিতার আশার ঘর দেড় বছরেই পুড়ে ছাড়খার । অনিতার জীবনের সমাপ্তি । গরীব বাপের বাড়ীর লোক শুধু চোখের জল দিয়েই অনিতাকে বিদায় দিল । চাইল না আইনের বিচার বিচারের ভাব দিয়ে দিলো ভগবানের উপর । অনিতার মৃত্যুর দু মাস বাদেই মালতী তার ছেলে প্রদীপকে বিয়ে করায় ঝুলনের সাথে । ঝুলনের বাপের বাড়ী বিশালগড় থানাধীন ব্রজপুর গ্রামে । জীবনের ইতিকথা প্রদীপ শুনাতে শুনাতে ভোরের পাখী ডেকে উঠে । প্রদীপ বলে ফেলে তার মা কোথায় আত্মগোপন করেছে। তদন্তকারী দল সাথে মহিলা পুলিশ সহ এবার আর এক গন্তব্য স্থল , যেখানে মালতী আত্মগোপন করে আছে ।পুলিশের হাতে ধরা পড়ে মালতী নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করে কিন্তু স্বাক্ষ্য প্রমাণ এমন কি নিজের ছেলেও যে এখন তা মানতে নারাজ । যথা সময়ে স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মালতী ও প্রদীপকে আদালতে প্রেরণ করা হয়। আদালত স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের জেলখানায় পাঠিয়ে দেয় । ক্রমে ক্রমে এলাকাবাসী ঝুলনের বাবা, ভাই,আত্মীয় স্বজন তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে ঝুলনের উপর ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা জানায় যা তদন্তকারী অফিসার আদালতে প্রেরণের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করেন । ঝুলনের পরিবার, পরিজন , পাশাপাশি হাসপাতালের ডাক্তাররা বাঁচানোর জন্য কিন্তু সমস্ত প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে, যাক ঝুলন আত্মীয় পরিজনদের কাছে তার শেষ স্মৃতি দু মাসের কন্যাকে রাখার দায়িত্ব দিয়ে ২৩-৩-২০০১ ইং গভীর রাতে সবাইকে ছেড়ে চলে যায়। শুরু হয় আইনী প্রক্রিয়া । ঝুলনের নীথর / নীরব শরীরের ময়নাতদন্ত অবশেষে পঞ্চভূতে বিলীন । সুখের সংসার বাধার সাধ এক বছরেই ফুরিয়ে গেলো , শুধু রেখে গেলো ফুটফুটে কন্যা, শুধুই স্মৃতি । যা ঝুলনের পূর্বজ অনিতা রেখে যেতে পারে নি । তদন্তকারী অফিসার খবর পাঠালেন সেই কালীবাজরের রাঙ্গাউঠিয়া গ্রামে প্রদীপের দেওয়া বয়ানের সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে । যথারীতি খবর পৌছে । ছুটে আসে প্রদীপের প্রথমা স্ত্রী অনিতার আত্মীয় পরিজন । দিনটি ৫-৪-২০০১ ইং । অনিতার মা ভাই, আত্মীয় পীরজন অনিতার উপর ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন । এ এক হৃদয় বিদারক ঘটনা । না - প্রদীপ সত্যিই বলেছিল কারণ এ ছাড়া তার আর কোন উপায় ও ছিল না । অবশেষে অনিতার পরিবারের লোক মামলার তদন্তকারী অফিসারকে বলেগেলো স্যার আর কিছুই চাইনা শুধু বলি অনিতা , ঝুলনের মত আর যেন কোন গরীব মেয়ের অকালে প্রাণ না ঝড়ে । আমরা বিচারের অপেক্ষায় । নির্দিষ্ট দিনক্ষনে বিচার শুরু পহয় । বিচারে শ্বাশুড়ী মালতী ও স্বামী প্রদীপ দোষী সাবাস্ত হয় এবং আদালত তাদের সাজা ঘোষনা করেন ।

শোক

টিপটিপ বৃষ্টি সাথে প্রচন্ড বিদ্যুৎ ঝলকানি , বৃদ্ধ খগেন্দ্র দেব অপেক্ষারত ছেলে সুধাংশু ঘরে ফিরছে না , খুব সকালেই বাবাকে বলে জমি দেখতে গেছে জারুলবাচাই গ্রামে । মূলত খগেন্দ্র বাবু একজন সম্পন্ন কৃষক এবং গাবর্দ্দী এলাকাতে স্বজ্জন হিসাবেই পরিচিত তবে খুব স্বল্প ভাষী । কাউকে কিছু না বলে এ ঘর ও ঘর করছেন , সুধাংশু আসার অপেক্ষায় , আর মনে মনে ভাবছেন আর ঘরে ফিরলে ঠিক ভাবে গালাগাল দেবেন । দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা , আবহাওয়া ও খুব খারাপ তাই ভাবছে হয়ত সুধাংশু কোন বন্ধুর বাড়ীতে গেছে । খারাপ আবহাওয়ার জন্য বাড়ীতে আসতে পারছে না । বিপত্নীক খগেন্দ্র বাবু সারা দিন না খেয়ে ঠাঁই বসে আছে সুধাংশু আসবে ভেবে , কিছুটা অভিমান তো আছেই বড় ছেলের ঘরে ও যাই নি বা কাউকে কিছু বলেনও নি । না -দিন গড়িয়ে রাত্র কোনও খবরও নেই বা সুধাংশু এলো ও না । ঠাঁই বসিয়ে রাত কাটিয়ে দিলেন আর মনে মনে ভাবলেন আমার সুধাংশু তো অবাধ্য না বা কোন দিন আমাকে না বলে কোথাও যাইনি । তবে আজ তার কি হলো গত ১৯/৬/২০০০ ইং সুধাংশুর বিয়ের প্রস্তাব ও পাকা হয় এবং মঙ্গলাচরণ হয়ে গেছে তবে এসময় ছেলেদের বাইরে থাকা শুভ নয় । পুরানো দিনের মানুষ তাই কিছুটা ধর্ম্মান্ধও বটে ,খগেন্দ্র বাবু ভাবেন ছেলের তো কোন আমার অজান্তে কোথাও কিছু নেই , পরক্ষণেই মনে মনে ভাবেন না আমার

সুধাংশু অমন হতে পারে না । ছোট বেলা তার মা মারা যাওয়ার পর আমি তাকে বুকে পিঠে করে কত কষ্ট করে মানুষ করেছি । সুতরাং আমার সুধাংশু আজকালের ছেলেদের মত হতেই পারে না । আবার ভাবে যদি কোথাও অন্য কোন মেয়েকে সে কথা দিয়ে থাকে বা সে অন্য মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে তবে আমি আমার পছন্দের মেয়ে " মমতার " বাবাকে কি বলাব , আমার যে মাথা কাটা যাবে। আমি যে কি করি ? ভাল মন্দের ভাবনা ভাবতে ভাবতে রাতের অন্ধকার ফুরিয়ে ভোরের পাখী মধুর সুরে ডাকতে শুরু করে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের আলো প্রকট তেজে উঠে, কিন্তু সুধাংশু তো আর ফিরে আসছে না দেখে রাগে বড় ছেলেকেও গ্রামের বেশ কয়েক জনকে ডেকে আনেন । বাড়ীতে আসুক তখন সব বলবো । তাকে মজা দেখাবো , তখন ও বৃদ্ধ খগেন্দ্র বাবু জানেন না শেষ বয়সের মজাটা যে উনাকে দেখতে হবে । ভাই , গ্রামবাসী সবাই মিলে শুরু হয় খোঁজাখুজি পরবর্ত্তীতে পুলিশের কাছে নিঁখোজ সংবাদ দেওয়া । এরই মাঝে পরদিন অর্থাৎ ২২/৬/২০০০ ইং ভর দুপুরে খগেন্দ্র বাবুর দুই উপজাতি বন্ধু উপজাতি পল্লী থেকে উনার বাড়ীতে এসে বলে এই জমিতেই সুধাংশু এসেছিল আর ফেরেনি । এবং বললেন আসার কোন উপায় ছিল না তাই খবরটা দিতে বিলম্ব হল । অর্থাৎ ২১/৬/২০০০ ইং সুধাংশু সকালে জমিতে যাওয়া মাত্র ৫ জন জঙ্গলদস্যু আগ্নেয়াস্ত্র সহ দৌড়ে সুধাংশুকেধরে ফে লে এবং হাত দুটো পিছ মোড়া করে বেঁধে নিয়ে যায় এবং তার চোখ দুটোও ওরা বেঁধে দিয়েছে । খগেন্দ্র বাবুর বুঝতে আর বাকী হইলো না যে তার সুধাংশু তার মনের মতই হয়েছে কিন্তু নিয়তীর নিষ্ঠুর পরিহাস , বর্বর জংলী হায়নাদের হাতে সে অপহরণ হয়েছে । যাই হোক বৃদ্ধ বয়সেও বুকে পাথর চাপা দিয়ে সব ধরনের চেষ্টা শুরু করেন খগেন্দ্র বাবু ও উনাার শুভাকাঙ্খীরা। অবশেষে নানাহ মাধ্যমে খগেন্দ্র বাবু অশুভ বর্বর শক্তির কাছে দুই ধাপে আশি হাজার টাকাও পাঠান ছেলের মুক্তিপণ বাবদ, কিন্তু না তারপরে ও ছেলে সুধাংশু ফিরে আসছে না দেখে খগেন্দ্র বাবু শোকে অধির হয়ে যান । পুত্র আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকেন । কিন্তু না দিন যায় রাত পোহায় সুধাংশু ফিরে আসে না । ক্রমে ক্রমে তা মাসের পর মাস, বছর গড়িয়ে যায় কিন্তু সুধাংশুর কোন খবর নেই দেখে বৃদ্ধ পিতা খগেন্দ্র বাবু অধির হয়ে পড়েন । অবশেষে ১৯/৬/২০০১ ইং কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের দু-জন সুবল ও রাজু দেববর্মা নিরাপত্তা বাহিনীর জালে ধরা পড়ে । জেরার মুখে ওরা স্বীকার করে কত না নির্যাতিন করে সুধাংশুকে হত্যা করা হয়েছিল । তাকে হাত পা চোখ বেঁধে কুপিয়ে হত্যা করে গভীর জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে কবর দেওয়া হয়েছিল । ধৃত সন্ত্রাসীদের জবানবন্দী অনুসারে ও তাদের সনাক্তক্রমে পাশাপাশি সুধাংশুর আত্মীয় স্বজনের সনাক্তক্রমে সুধাংশুর গলিত দেহ কবর খুঁজে বের করা হয়েছিল । সুধাংশুর ঘড় সাজানো । কবরেই শায়িত করেছিল শুধাংশুকে বর্বর হায়নারা । যৌবনেই কেড়ে নিয়ে গেলো সুধাংশুর প্রাণ , যে বর্বরতা ক্ষমাহীন । ভাষাহীন শোকাহত বৃদ্ধ পিতা খগেন্দ্রবাবুর জিজ্ঞাসা এ ভাবে আর কত দিন ? কবর থেকে তুলে আনা হচ্ছে সুধাংশুর গলিত দেহ ।

ওরা নরখাদক

তারিখটা সে দিন উনত্রিশ । দু হাজার সালের আগষ্ট মাস । তিন সন্তানের জননী মালতী দাস ঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত । মালতীর বয়স ৩০ /৩২ বৎসর হবে । যখন তার বয়স ১৭ বৎসর তখন তার বাবা ঘটা করে গাবর্দ্দীর সুনীল দাসের ছেলে নিমাই দাসের সাথে তাকে বিয়ে দেয় । সুনীল দাসের স্ত্রী ও সুনীল দাস নিজেও ছেলের বৌকে মেয়ের মতো ভালবাসে । নিমাই , মলেতীর সুখের সংসার। সুনীল দাসের গাবর্দ্দী বাজারে ব্যবসা আছে তাছাড়া সুনীল বাবু প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থ । নিমাই বাবার জায়গা , জমি রক্ষণাবেক্ষণ করে আর সন্ধ্যায় বাবার ব্যবসায় বাবার সাথে হাত বাড়ায় সেই দিনটিতে ও নিমাই সন্ধ্যার সময় মালতীকে বলে, গাবর্দ্দী বাজারে বাবার দোকানে চলে যায় । যদিও বাজার ও বাড়ীর দূরত্ব খুব একটা বেশী নয়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত । ঘরে স্বামী নেই , শ্বাশুড়ী বেড়াতে গেছে । শ্বশুর মশাই দোকানে। এমন সময় ৭/৮ জন যুবক স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে সুনীল বাবুর বাড়ীতে ঢুকে পড়ে । মালতী যা বুঝার বুঝে ফেলে কিন্তু তখন দরজা বদ্ধ করার ও ফুরসৎ নেই বা সন্তান রেখে পালাবারও সুযোগ নেই । ওরা সোজাসুজি মালতীর ঘরে ঢুকে পড়ে, ভয়ে মালতী কাঠ হয়ে গেছে । বাচ্চাদের করুণ আর্তনাদ চিৎকার এরই মাঝে হঠাৎ একজন জোরে মালতীর বড় ছেলেকে গালে থাপ্পর কষিয়ে দিল, আর্তনাদ , চিৎকার সব শেষ শ্বশানের নিরবতা, ভয় ,দু জন মালতীকে জিজ্ঞেস করে উঠে সুনীল , নিমাই কোথায়, ভয় জড়ানো গলায় মালতী বলে উঠে উনারা বাজারে , মালতী নিজের ও সন্তানের প্রাণ রক্ষার্থে উপস্থিত অগ্নেয়াস্ত্রাধারী বর্বরদের পা ঝাপটে ধরে নিজের ও সন্তানদের প্রাণ ভিক্ষা চায় । সাথে সাথেই হুকুম শালীকে নিয়ে চল বর্বরতা কাকে বলে ? চারজন বর্বর জঙ্গলদস্যু মালতীকে চুলে ধরে টেনে হিঁচড়ে গ্রাম পেরিয়ে জঙ্গল পথে ধাবমান হয় , মালতীর প্রাণের আর্তনাদ শুনেও গ্রামের খোলা দরজা গুলো ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়ে যায় । বিহুল অবুঝ শিশুরা দৌড়ে পিছুধাওয়া করে প্রাণময়ী মাকে রক্ষা

করতে , কিন্তু তা যে অসম্ভব ব্যর্থ প্রয়াস । অবশেষে অবুঝ কঁচিকাচারা অশ্রুসিক্ত নয়নে শেষ সম্বল বাবা ও দাদুর কাছে ছুটে যায় । তাদের মায়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্য । চলে পুলিশী তল্লাসী , মধ্যস্থতা, যোগাযোগ , শুধু অপেক্ষা গৃহবধু মালতী কখন ফিরে আসবে । অপেক্ষার রাত আর ফুরায় না । বর্বরতা জানি কত না অত্যাচার ...? কত খোঁজাখুঁজি চেষ্টা , সবই যেন বৃথা , এটাও সংশয় মালতী জীবিত না মৃত । যদি জীবিত হয় তবেই বা কোথায় আর যদি মৃত হয় তাহলে তার শবদেহ কোথায়? পুলিশী প্রচেষ্টা অব্যহত অবশেষে ১৯/৬/২০০১ ইং পুলিশের তল্লাসী বাহিনীর জালে ধরা পড়ে কুখ্যাত জঙ্গীরা। মালতীর কঙ্কাল বের করে নিরাপত্তা বাহিনীকে দেখাচ্ছে সন্ত্রাসীরা মালতীর হাতের শাঁখাগুলো ও কাপড়ের টুকরোগুলো কবর থেকে বের করা হচ্ছে । নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাসীদল নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসীদের সাথে নিয়ে মালতীর কঙ্কাল নিয়ে ফিরে আসছে সন্ত্রাসী সুবল দেববর্মা ও রাজু দেববর্মা প্রত্যন্ত দেবেন্দ্রপাড়া থেকে , জায়গাটি টাকারজলা থানার অন্তগর্ত । চলে পুলিশী জেরা। অবশেষে প্রতিনিয়ত জেরার মুখে সুবল ও রাজু স্বীকার করে মালতীকে তাদের দলই অপহরণ করে নিয়ে যায় গহন অরণ্যের পথে তার উপর চলে শারীরিক .... সংঘবদ্ধ আক্রমণ । তারপর মালতীকে হত্যা করে গভীর জঙ্গলে মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয় । স্বীকারোক্তি অনুয়ায়ী পুলিশ বাহিনী চলে গহন অরণ্যে পথধরে সাথে দীর্ঘ প্রতিক্ষায় থাকা মালতীর স্বামী নিমাই ও তার বড় পুত্র বিশ্বজিৎ এবং ২/১ জন গ্রামবাসী সবার বারণ সত্বেও মাতৃহারা পুত্র বিশ্বজিৎ লুকিয়ে লুকিয়ে পুলিশবাহিনীর পথ অনুসরণ করে তার মায়ের শেষ কবরস্থল টুকু প্রত্যক্ষ করতে । সাথে সেই দুই কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী হরিকান্ত পাড়া পার হয়ে গহন অরণ্যে ঢুকে পড়ে । সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত ক্রমে পুলিশ বাহিনী হরিকান্ত পাড়া হয়ে গহন অরণ্যে ঢুকে পড়ে । সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত ক্রমে তাদের দেওয়া কবর থেকে ২৫/৬/২০০১ ইং মাংসবিহীন মালতীর কঙ্কাল বের হয়ে আসে । সাথে পরিচিতির শুধু আছে মায়ের হাতের শাঁখা আর মায়ের পরিধানের খন্ড বিখন্ড কাপড়ের টুকরো গুলো । বিশ্বজিৎ তার মাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কেবল পেলো মার হাড় গুলোকে । নিমাই তার আদরের মালতীকে পেল না কিন্তু নির্দশন পেলো স্বামীর স্ত্রীর বন্ধনের চিহ্ন শাখা গুলোকে । মালতী সময় পেলো না শেষ কথা বলার , তার মনের কথা মনের ভেতরেই চাপা রয়ে গেলো শেষ বিদায় পর্যন্ত । বৃদ্ধ শ্বশুর সুনীল দাস বলে উঠলেন গৃহলক্ষীকে যখন ওরা নিয়ে গেছে কি হবে ধন সম্পত্তিতে ? ভিটে মাটি ছেড়ে রিক্ত হস্তে সুনীল দাসরা আজ বনকুমারী রবীন্দ্র পল্লীর বাসিন্দা । ছেলেদের কাছে মাতৃ হত্যার জবাব কে দেবে?

****

"মা" হওয়া বড্ড কঠিন

প্রতিদিনের রুটিন, বিকেল চারটায় পরেশ আমাকে ডাকবে । তার আমি ও পরেশ দ্বীপ নারায়নের বাড়ীর সামনে গিয়ে শিস্ দেবো, তিন তিন বার, তাহলে ও বুঝবে আমরা এসে গেছি । আমরা ততক্ষনে দ্বিপনারায়নের বাড়ীর সামনে থেকে কেটে পড়ব সোজা চলে য াব প্রাইমারী স্কুলের মাঠে । দ্বিপ নারায়ন এলে তিন জনে মিলে যেখানে লক্ষ্মীবিল গামী রাস্তার উপর ব্রীজ তৈরী হয়েছে সেই খানে বেশ ঝাঁপঝোড় এবং ব্রীজ তৈরীর সময় বেশ খানিকটা জায়গা কেটে সেখানে গর্ত হয়ে আছে, চার দিকে বেশ জঙ্গল সেই গর্তটায় নেমে যাবো দ্বিপনারায়নের কাছে সিগ্রেট থাকে কিন্তু দেশলাই রাখার সুযোগ নেই। কিন্তু বিকেল সময়টায় রাজধানী থেকে কাজ সেরে লেবাররা এই রাস্তায় তাদের গ্রামের বাড়ী ফেরে । তখন তাদের কাছে হয়ত জ্বলন্ত বিড়ি বা দেশলাই পাওয়া যায় । তখন ওদের কাছে চাইলে কখনোও বারণ করে না । কখন ও জ্বলন্ত বিড়ি বা কখনোও দেশলাই এগিয়ে দেয় ।

আগুন জোগাড় করতে কখনো কোনও অসুবিধা হয় নি তবে দ্বিপনারায়ন কখনোও আগুন আনতে যায় না । কারণ ওর বাবা খুব নামীদামী লোক, এলাকার সবাই চেনে বিশিষ্ট নেতা হিসাবে । ওদের বাড়ীর সব সময় লোকের ভীড় তাই কেউ না কেউ ওকে চিনে ফেলতে পারে এই ভয়ে সে কখনোও আগুন নিতে ব্রীজের কাছে আসত না । রোজ বিকেলে আমরা শিস দিয়ে যায় । কিন্তু সে দিন অনেক খোঁজাখুজির পরেও তাকে দেখা যায় নি । সন্ধ্যার পর আমরা আবার দ্বিপ এর বাড়ীর সামনে গিয়ে শিস দেই কিন্তু দ্বিপ নারায়নের চতুর বাবা বুঝতেও পারে নি আমরাই শিষ দিয়েছি।

সে উপর্যুপরি নাইনে ফেল করেছে যদিও বাবা তার স্কুল শিক্ষক আমরা তাকে দ্বিপনারায়ন ডাকতাম কিন্তু বাবা তাকে কখনো কখনো দ্বিপু বলে আদর করে ডাকত । তবে এতটুকু জানি প্রতিদিন রাতেই তার বাবা বাড়ী ফিরে তাকে ইছে মতো গালগালদি । যদিও আমাকে এবং পরেশকে দ্বিপনারায়নের সাথে দেখলে আমাদের কিছু বলতো না । পরেশের মা বাবা মারা গেছেন । গার্ডিয়ান বলতে বড় দু বোন । তাই কখনো কখনো পরেশকে ডেকে দ্বিপনারায়নের বাবা পরিবারের খবর জানতে চাইত । আমার বাবা ছিলেন পি ডব্লিউ ডি এর একজন ক্লার্ক আর ঐ অফিসেই কাজ করত দ্বিপনারায়নের বিলাসী মা । আমাকে জিজ্ঞেস করত বাবা কেমন আছে । আমাদের সাথে কথা বলার পর আমাদের সামনেই দ্বিপানারায়নকে চুলির মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যেতো । চতুর্থবার দ্বিপনারায়ন ক্লাশ নাইনে ফেল করার পর সে ইদুর মারার বিষ খায়, হয়ত সে ভেবেছিল প্রতিদিন ধুমধাম মার খাওয়া থেকে এক দিনের মৃত্যু ঢের ভালো । কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে হাসপাতালের ডাক্তার দত্তবাবু ষ্টমাক ওয়াশ করে ভাল ঔষধ খাইয়ে সেলাইন লাগিয়ে তাকে সুস্থ করে ফেলেন । শহীদের খাতায় দ্বিপনারায়ন আর নিজের নামটুকু উঠাতে পারল না । তার পরে তাকে আমরা নতুন নামাকরণ করি ইন্দুর বলে । যদি ও সামনাসামনি ওকে আমরা দ্বিপনারায়ন বলেই ডাকতাম । আড়ালে আবডালে ইঁদুর বলে ডাকতাম । আমরা গোপন আড্ডায় জিজ্ঞেস করতাম কিরে দ্বিপনারায়ন তুইতো তোর বাবার একমাত্র ছেলে, পয়সা কড়িও অভাব নেই তবুও কেন তোর এত দুর্দশা। তোকে এত মারপিট করে কেন? তোর মা কি তোকে বাঁচাতে পারে না ? তোর মা কী করে ? দ্বীপ সিগারেটাতে কষে একটা টান দিয়ে ধোঁয়ার সাথে সাথে বলে উঠে মা নই, সে একটা মস্ত বড় বদমাইশ . ওই আমার মাকে খেয়েছে । তারপর আর কোন কথা নেই । তার মুখের উগ্রতা দেখে সত্যি কথা বলতে কি. কিছু জিজ্ঞেসা করার সাহস ও আমাদের হয় নি কারণ দ্বিপনারায়নের মুখে ছিল নির্লিপ্ততা . আসলে এর আগে আমরা কখনো ও জানতাম না দ্বিপুর আসলমা নেই । পর দিন পুনরায় আমরা আমাদের গোপন আড্ডায় নতুন মাটি কাটা গর্তে বসে চারমিনার টানি . এরই মাঝে পরেশ বলে উঠে দ্বিপু যদি তুই খারাপ না ভাবিস, বলবি কি? তোর মার কি হয়েছে ? সাথে সাথে আমিও বলে উঠি বল, না. বন্ধুদের বললে মনটা অনেক হাল্কা হবে। ক্ষি প্ত চেহারায় দ্বিপু বলে উঠল জানিস আমার বয়েস যখন

ছ মাস তখন আমার মা গায়ে আগুন লাগিয়ে 'সুইসাইড ' করে তাহলে কখন তোর বাবা বিয়ে করল। আমরাও খুচরা খবর জোগাড় করে দ্বিপের মুখের কথায় বুঝে ফেলি কেসটা । তখন আমার মনে হয় আমার বাবা মাকে বলতেন সত্যনারায়ন বাবু অর্থাৎ দ্বিপনারায়নের বাবা তাদের অফিসে যেতো যদিও তা অনেক আগের কথা তবে মা বাবার আলাপ আলোচনায় এতটুকু শুনেছিলাম । আর এতো জানতামই যে দ্বিপানারায়নের মা অঞ্জলী দেবী আমার বাবার অফিসে চাকুরী করেন । দ্বীপ বলে , সে সব জেনেছে তার বাড়ীর কাজের অন্নপূর্ণামাসী থেকে । তারপর যখন ওর সৎ মা ব্যাপারটুকু বুঝতে পারে যে অন্নপূর্ণা সব কথা দ্বিপকে বলে দিয়েছে তখন এক দিন কাজের অন্নপূর্ণা মাসিকে পিটিয়ে বাড়ী থেকে বিদায় করে দেয় ।

ব্যাপারটা এমন ,যখন দ্বিপের বয়স ২/৩ মাস তখন অঞ্জলী দেবীর সাথে তার বাবা সত্যনারায়নের প্রনয় ঘটে । অজ্ঞলী দেবী ফুসলে দ্বিপের বাবাকে কাবু করে ফেলে । এই গোপন অবৈধ প্রনয়ের ঘটনা যখন দ্বিপনারায়নের মা জানতে পারে তখন দ্বিপের মা তার বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরাতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাতে ফল হয় উল্টো । সত্যনারায়ন বাবু তখন প্রায়শই অজ্ঞলী দেবীকে নিয়ে সন্ধ্যায় সোজা তাদের বাড়ী নিয়ে আসত । ঘরে আনন্দ হুল্লোড় । হৈ চৈ চলে বেহিসাবী বিলাসী অঞ্জলী দেবীর সাথে । দ্বিপের আসল মা প্রতিবাদ করলে তার উপর চলতো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন , এরুপ ভাবে চলতে থাকে আরো কিছু দিন । এসব যন্ত্রণা , দ্বিপের আসল মা রুপশ্রী দেবীর সহ্য হত না , দ্বিপের বয়স যখন ছমাস শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেতে দ্বিপের মা রুপশ্রীদেবী নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে । সর্বজন গ্রাহ্য শিক্ষক সত্যনারায়ন বাবু বুদ্ধির জোরে সমস্ত প্রকার ঝুটঝামেলা হতে নিস্তার পান । কারো সাহসও নেই যে সত্যনারায়ন বাবুর বিরুদ্ধে মুখ খোলে । ধুমধাম করে এলাকাবাসীদের নেমন্তন্ন করে দ্বিপনারায়নের মার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয় । অবশেষে দু মাস যাওয়ার পর ছোট বাচ্চা দ্বিপকে লালন পালনের অজুহাত দেখিয়ে সত্যনারায়নবাবু অঞ্জলী দেবীকে বিয়ে করেন । তারপর আর কী বুঝতেই তো পারিস । মাঝে মাঝে বাবার দু চার জন বন্ধুবান্ধব আসে , কষা মাংস রান্না হয় , বাবা দামী বিলেতী মদ আনে । তারপর শুরু হয় ফ্যাংশান । আমার বিলাসীনি সৎ মা গান গায় আর সে দিন আমাকে পয়সা দেওয়া হয় সিনেমা দেখার জন্য । লেখাপড়া ওসবের পরোয়া নেই । এখন উনি চিৎকার করেন আমার পড়াশুনার জন্য। এর মাঝেই পরেশ বলে উঠে তাড়াতাড়ি বাড়ী যাবো । নহেতু দিদিরা চিন্তায় পড়বে । পরেশের দুই দিদি ট্যুউসন করে । সংসারও চালায় লেখাপড়াব খরচও যোগায়, তবে বড় দিদি বি এ পাশ । তারপরে পরেশ চলে যায় । পরেশ চলে যাওয়ার পর দ্বিপু পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে আর আমাকে আদেশ দেয় সিগারেটের জন্য আগুন জোগাড় করতে । আমি চারমিনার সিগারেট ধরিয়ে

আনি । পরেশ কখনোও বেশী কথা বলে না এমন কি দিদিদের কথা বা সংসারের কথা কিছুই বলে না। এক দিন পরেশ লাঠি নিয়ে দ্বিপনায়াণকে মারতে উদ্যত হয়েছিল কারণ দ্বিপ বলেছিল ওর বাবাকে ধরলেই নাকি ওর বড় দিদির চাকরি হয়ে যাবে । কারণ আমাদের অঞ্চলের অনেক মেয়েছেলেই সত্য নারায়ণ বাবুর কাছে চাকুরীর জন্য যেত এবং উনি আশ্বাসও নাকি দিতেন। দ্বীন শুনেছে ওর বাবা নাকি অনেক উচুদরের নেতা । উনার লড়াকু মনোভাবের জন্য বিশেষ করে যুবকরা উনাকে আপোষহীন সংগ্রামী মনে করত । কিন্তু দ্বিপনারায়ণের কথা অনুযায়ী তার সংগ্রামী পিতা সত্য নারায়ণ অল্পবয়সী যুবতীদের সাথে খুব মোলায়েম ব্যবহার করতেন । এমনকি ২/১ টি মেয়েকে উনি কাজের ব্যবস্থা ও করে দিয়েছেন । পেশায় সত্যনারায়ন বাবু শিক্ষক হলেও স্কুলে উনি খুব কম যেতেন । যেদিন স্কুলে যেতেন সে দিন তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে সহপাঠীদের সাথে আলাপ আলোচনা করতেন । কারো স্পর্দা ছিল না উনাকে কিছু বলার । দ্বিপনারায়ণ বলে যাই বলিস না কেন , বদমাশ মাগীটা কিন্তু আমাকে খুব ভয় পায় । একদিন কি হয়েছিল জানিস - আমাকে অসভ্য বলতেই আমি চেয়ার ছুড়ে মারি । যাই হোক রাত্রিতে সত্যনারায়ণ বাবু আমার পিঠের খাল উঠিয়ে দিয়েছিলো । যাই হোক বন্ধু এখন কিন্তু দিন পাল্টেছে । প্রায়শই ওরা মিঞা বিবির দরজা বন্ধ করে তুমুল ঝগড়া করে। দরজা বন্ধ থাকলেও আমি সব শুনতে পাই । মূল ইস্যুটা কিন্তু আমি। বাবা বলে তোমার জন্যে আমার এক মাত্র ছেলে বখাটে- হয়ে গেছে । সেই মহিলা বলে উঠে কে বলেছিল সিনেমার পয়সা দিতে । আরো কত কী, তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি সবটাই । যেহেতু আমার বাবা এ অঞ্চলের খুব নামী লোক। তাই এসব নিয়ে খুব একটা হল্লাগুল্লা কখনো হয় না । একদিন জানিস বাবুর দুই বন্ধু বাড়ীতে আসে , সেই কষা মাংস আর মদের বোতলের ফাংশান । তারপর বাবা বন্ধুদের সাথে বেড়িয়ে পড়েন সুযোগ বুঝে আমি বাবার বৈঠক খানায় ঢুকে পড়ি । দেখি বোতলের নীচে বেশ কিছু অংশ মদ পড়ে আছে তার উপর সিগারেটের প্যাকেটটাও যাতে অবশিষ্ট আছে ৩টি সিগারেট । আমি সিগ্রেটগুলো পকেটে পুরে রাখি । আর বোতল থেকে মদটুকু গ্লাসে নিয়ে সাবাড় করে ফেলি ঠিক এমন সময় বদমাশ মাগীটা ঘরে ঢুকে পড়ে এবং সব দেখে ফেলে । বলে উঠে বাবাকে সব বলে দেবে । আমি উলটে বলে দিয়েছি আমিও যা জানি গ্রামের সবাইকে বলে দেব । তাবপর আমি চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম । তৎক্ষণা কেটে পড়ল । তারপর থেকে এখন আর কিছুই বলে না । দ্বিপনারায়ণের সব কথা শুনে আমি বলে উঠলাম দ্বিপ বিষ খেতে তোর ভয় করে নি ? একটু ভয়ে ভয়েই এ কথাটুকু জিজ্ঞেস করেছিলাম কারণ এর আগে কখনো তার সাথে আমার এ ব্যাপারে কোন কথা হয় নি । আমি বুঝতে পারতাম এ প্রসঙ্গ উঠলে দ্বীপ খুব লজ্জা পায় । আরো কিছু দিন কেটে গেল সে দিন শুধু আমরা দু জন সেই আড্ডায় বসেছিলাম । মুখে দুজনেরই সিগ্রেট । পরেশ এসেছিল কিন্তু সামনে

পরীক্ষা তাই চলে গেছে । আমিও মনের ভুলে বলে উঠি দ্বীপ তোর মার কথা তোর মনে পড়ে না । কথা বলা শেষ হতে না হতেই দেখি দ্বিপনারায়ণের চোখে জল , সে বলে উঠে ভাই 'মা' না থাকা এক অভিশাপ । এবারও তো পাশ করবো না । আর পাশ না করলে লাথি মেরে বাড়ী থেকে বের করে দেবে । বাড়ী থেকে বের করে দিক দুঃখ নেই কিন্তু ভাই মারপিট তো আর সহ্য হয় না । যাক ও দিন আর বেশী দেরী না করে ঘরে চলে যায় । কারণ মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যস্ততা । যাই হোক আমার আর পরেশের সাথে দ্বীপনারায়ণের যোগাযোগ কমতে থাকে । পরীক্ষা শেষে যখন আমি আর পরেশ ঘোরাঘুরি করি তখন দ্বিপ নারায়ণকে সচরাচর দেখা যেত না । খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারি দ্বিপনারায়ণ বাড়ীতে বেশী আসে না । বাইরে বাইরে থাকে এবং এক দল চোরা কাঠকারবারীর সাথে বর্তমানে তার ঘনিষ্ঠতা এবং সে ওদের সাথে সীমান্তের এপার ওপার কারবার করে এবং অনেকে তাকে সময় অসময়ে সিপাহীজলা অরণ্যে দেখতে পেয়েছে । আমি আর পরেশ যা বুঝার বুঝে ফেলেছি কিন্তু তাকে তো পাওয়াই ভার তাই বোঝানো তো দূরে থাকুক দর্শনটুকুও মেলে না । এক দিন খুব সকালে গ্রামের লোকেরা মুখে শুনতে পাই দ্বিপনারায়নের বুলেটবিদ্ধ প্রাণহীন দেহ থানায় আনা হয়েছে । গ্রামের লোকের ভীড় সাথে আমি ও পরেশ যাই । গিয়ে দেখি থানার সামনে মাটির মধ্যেই শায়িত রক্তাক্ত দ্বিপনারায়ণের প্রাণহীন দেহ । ফর্সা দেহে ও ওর মুখমন্ডলে যেন ছিল অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ । এ যেন যন্ত্রণার মুক্তি । পরে জানতে পারি গত রাতে যখন দ্বিপনারায়ণ ও ওর সাকরেদরা অভয়ারণ্য থেকে কাঠ চুরি করছিল তখন বন বিভাগের কর্মচারীরা সেখানে এসে হাজির । বন বিভাগের লোকদের দেখে দ্বিপনারায়ণের সাকরেদরা বোমা ছুঁড়তে থাকে ও পালিয়ে যায় । কিন্তু অনভিজ্ঞ দ্বিপনারায়ণ পালাতে পারে নি । বন বিভাগের গার্ডরা আত্মরক্ষার্থে গুলি চালালে তা দ্বিপ নারায়ণের বুকে লাগে ও ঘটনাস্থলেই দ্বিপনারায়ণের মৃত্যু হয় । মা , বাবার বেহিসাবী , বিলাসী , একগুয়ে জীবন যাত্রা দ্বিপনারায়ণের মত ফুটন্ত ফুলকে আধাঁর পথে যেতে বাধ্য করে যার ফলশ্রুতি, ফুলফোটার আগেই ঝড়ে গেল । সত্যনারায়ণ বাবু বলে উঠেন কুলাঙ্গার থাকা থেকে না থাকাই ভালো । সৎ মা অঞ্জলী দেবী মায়াকান্নায় ভেঙ্গে পড়েন । সত্যিই অঞ্জলী দেবী পুত্র পেয়েছিলেন কিন্তু তবু ও মা হতে পারেন নি । দ্বিপনারায়ণ পেলো না মার স্নেহ । প্রৌঢ় সত্য নারায়ণ বাবু বলুন তো .... ?

নিষ্ঠুর সমাজ

ঠক্ঠক্ শব্দ । রাত ১১ টা সাধারণ্যে উপজাতি পল্লীতে এত রাত্রিতে কেহ্ সজাগ থাকে না , তাহলে এত রাত্রিতে কে আমাদের দরজায় ? ছায়ারানী অন্ধকার ঘরে বসে ভাবছে কিছু সময় বাদে পুনরায় ঠক্ ঠক্ শব্দ! তখনি শব্দ ও কথা ভেসে আসে " নিবারণ দরজা খুলকদি' (নিবারণ দরজা খোল) তখন ছায়ারানী জিজ্ঞেস করে উঠে তোমরা কে ? দরজার বাইরে থেকে উত্তর ভেসে আসে " চুং নিবারণনি কিচিং" (আমরা নিবারণের বন্ধু) । তখন ছায়ারানী সরল বিশ্বাসে দরজা খুলে এবং দেখতে পায় চার জন যুবক মুখে কালো কাপড় বাঁধা এবং ওরা কিছু না বলে ঢুকে পড়ে । তখন নিবারণ বেঘোর ঘুমে। সারা দিন পরিশ্রম করে সব্জী ফেরী করে এসে অল্প কিছু তরল পান করে সুখ নিদ্রায় । তার মাঝেই অপরিচিত চার যুবক নিবারকে বলে " এই হুমানি ভাসাদি"(ঘুম থেমে উঠ) । নিবারণ হতচকিত হয়ে জেগে উঠতেই ওরা বলে উঠে " আং- নুং বাই - কক তঙ্গু" (তোমার সাথে কথা আছে) । এই বলেই নিবারণকে সাথে নিয়ে অপরিচিত চার যুবক উপজাতি পল্লীর গা বেয়ে অন্ধকারে মিশে যায় । বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে উপজাতি গৃহবধু কিংকর্তব্যবিমুড় হয়ে পড়ে । কারণ ঘরে ২ বৎসরের ছেলে নিখিল আর ৪ মাসের অবুঝ দুধের শিশু নিত্য তার উপরে নিবারণের বৃদ্ধ পিতা বিরমনি দেববর্মা আরেক গ্রামে বড় ছেলের সাথে থাকে । অগত্যা বাধ্য হয়ে ছায়ারাণী তার নিজ গ্রাম ভবানীয়া পাড়ার গন্যমান্য ব্যক্তি সুখু চন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে যান , নাবালক শিশুদেরকে খালি ঘরে রেখে এবং ঘটে যাওয়া ঘটনার বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলেন । ঘটনা শুনে সুখু বাবু ছায়াকে নিয়ে সম্ভাব্য স্থান গুলিতে খোঁজাখুঁজি ও ডাকাডাকি করেন । নিবারণ নিবারণ বলে কিন্তু না কোন সাড়া শব্দ নেই । নিঝুম রাত্রে রাত পাখীর কু কু ডাক আর জোনাকীর দেখানো আলোর পথ ধরে সুখু দেববর্মার সাথে ঘরে ফিরে আসে ছায়ারানী । তখন ছায়ারানীর দুই নাবালক সন্তান ঘুমে আচ্ছন্ন । ছট্ফট্ করে কোন প্রকারে সন্তান বুকে নিয়ে ভোরের অপেক্ষায় ছায়ারানী পড়ে থাকে । খুব ভোর

পাখীদের কিচির মিচির ডাক ছায়ারানীকে আর বিছানায় থাকতে দেয় না । সে নাবালক দুই শিশুকে ঘরে রেখে পাশের বাড়ীর বৃদ্ধা বাসন্তী দেববর্মাকে সন্তানদের দায়িত্ব দিয়ে পুনরায় খুব ভোরে সুখু দেববর্মার বাড়ীতে এসে হাজির হন । সুখু দেববর্মাও ছায়ারানীর দুঃখের অংশীদার হয়ে ছায়ারানীর সাথে নিবারণকে খুঁজতে বাহির হন । ছায়ারানীর ভেতর অজানা ভয় আমার নিবারণ জানি কোথায়, তাকে খুঁজে পাবো কিনা, কারণ নিবারণই সংসারের একমাত্র উপার্জ্জিত ব্যক্তি । সারা দিন পরিশ্রম করে যা রোজগার করে তা দিয়ে নিজেদেরও সন্তানের মুখে ভাত যোগান হয় । এখন নিবারণ যদি না আসে আমি কিভাবে সন্তানদের নিয়ে থাকব । ওদের মুখেভাত যোগাবেকে, কারণ দুটি নাবালক সন্তানকে ঘরে রেখে ছায়ারানীর পক্ষেও কোন কাজ করা অসম্ভব । ভাবতে ভাবতে ছায়ারানী সুখু দেববর্মার সাথে এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম ঘুরে বেড়ায় আর নিবারণকে কেহ দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করে ও গত রাতের ঘটনা সবিস্তারে সবাইকে বলে । আর শুধু অনুরোধ করে তার নিবারণকে যেন সবাই মিলে খুঁজে বের করে দেয় । উপজাতি পল্লীর অনেক যুবক ও ছায়ারানীর সাহায্যে খোঁজ খবর নিতে শুরু করে বন, জঙ্গল , সমস্ত সম্ভাব্য স্থানে কিন্তু না সবই যেন নিস্ফল । নিবারণকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি । বা কেহ কোন প্রকার সংবাদও দিতে পারে নি , নিবারণকে কোথায় আছে বলে । অবশেষে হতাশ হয়ে , ছায়ারানী , সুখু দেববর্মার সাথে ঘরে ফেরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় । কিছু দূর এগিয়ে এসে ছায়ারানী ও সুখু দেববর্মা দেখতে পায় উপজাতি পল্লীর গ্রামীণ রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ের কাছে একটি লোকের মত দেখা যায় । দ্রুত পায়ে সুখু দেববর্মা ও ছায়ারানী এগিয়ে আসে এবং দেখতে পায় নিবারণের দেহ ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত রক্তাপ্লুত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে আছে। শরীরে ধাক্কা দিতেই ছায়ারানী বুঝতে পারে তার নিবারণ আর বেঁচে নেই । ঘাতকেরা তার প্রাণ কেড়ে নিয়েছে চিৎকার দিয়ে ছায়ারানী কেঁদে উঠে আর বলে , আমি এখন বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় যাই , কে ওদেরকে ভাত দেবে , হে ভগবান তুমি দুষ্টদের শাস্তি দিও , যাতে ওরা আর কারো প্রাণ নিতে না পারে । এখন ছায়ারানী দুই নাবালক সন্তান নিয়ে অসহায় , অন্ধের মত এদিক ওদিক দিক্‌বিদিক শূণ্য হয়ে হাতরাচ্ছে । কে দেবে ছায়ারানীর দুই অবুঝ নাবালক শিশুর মুখে ভাত । কে দেবে ওদের পিতার স্নেহ ? জবাবহীন হাহাকার ও শূণ্যতা এখন ছায়ারানীর দুই চোখে , এখন শুধু দু বেলা দু মুঠো অন্নের চিন্তা । সমাজ বড্ড নিষ্ঠুর ।

মিসিং

দক্ষিণত্রিপুরার একটি উপজাতি অধ্যুষিত গন্ডগ্রাম শালথাংমনু যেখানে দেববর্মা , জমাতিয়া , রিয়াং ইত্যাদি উপজাতীয়দের বাস , গ্রামের অধিকাংশ মানুষই সরলপ্রাণ , এই গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ভর করত দুর্গারাই জুনিয়র বেসিক স্কুলের মাধ্যমে শালথাংমনুর পাশাপাশি গঙ্গারাইপাড়া ছিল মিশ্র বসতি এখানে বাঙালী অংশের মানুষ ছাড়াও ছিল রিয়াং , ত্রিপুরী, চাকমা সম্প্রদায়ের লোকের বাস । আনুমানিক ১০/১২ বৎসর আগেও এখানে ছিল শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ । বিবাহ , উৎসব অনুষ্ঠান, পার্বণে উভয় অংশের মানুষ সামিল হতো । জাতি উপজাতির মধ্যে বিবাহ বন্ধনও চলত । কিন্তু আজ আর তা নেই আজ সত্য মিথ্যা যাচাই করার দরকার বোধ করে না কেউ । এই ভাবে এক দিন গঙ্গারাই পাড়া থেকে এক শ্রেণীর লোক চলে গেছে এবং তিন জায়গায় বসতি স্থাপন করে । এরই মাঝে উগ্র জঙ্গল দস্যুদের বর্বরতায় ও সাম্প্রদায়িক রোষাণলে অবিশ্বাসের বাতাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ভালবাসা যে অদম্য কোন বাধাই মানে না । কোন বারণ শোনে না ।

শালথাংমনুতে গরীব জুমিয়া ঘরে জন্ম নিয়েছিল নাইফতি রিয়াং । ছোটবেলাই নাইফতির বাবা শুদ্ধমণি মারা যায় । সর্বনাশ কালাজ্বর ছোট বেলাই নাইফতির কাছ থেকে তার বাবার প্রাণ হরণ করে । যদি প্রাচীনরা বলে ৬ বৎসর অনেক মানুষের প্রাণ গিয়েছিল এই কালা জ্বরে । তখন নাইফতির ছোট ভাই দু মাসের মায়ের কোলে । এভাবেই দৈন্য দশায় মায়ের খাটুনীতে নাইফতি গ্রাম্য পাহাড়ী পরিবেশে বাড়তে থাকে । মায়ের ইচ্ছা নাইফতিকে লেখাপড়া শেখাবে । যদিও প্রতিদিন নাইফতিদের পরিবারের উনুন ও জ্বলত না । এরই মাঝে ছেঁড়া জামা সম্বল আধময়লা খাতার মলাট সাথে করে নাইফতি ছড়া পেড়িয়ে আসত দুর্গারাই জে . বি .স্কুলে । যদিও গ্রামের স্কুল ছিল । পরিবেশ ছিল সত্যিই মনোরম । স্কুলে আসতে আসতে ক্লাসের সাথী পাশের গ্রামের অজয়ের সাথে বন্ধুত্ব । যেহেতু অজয় চুপচাপ শান্ত প্রকৃতির ছেলে সেহেতু সবাই অজয়কে ভালবাসত । শিক্ষক থেকে সঙ্গী সাথী

সবার আদরের ছিল অজয় । ছোট্ট পাহাড়ী ফুল নাইফতিও শান্ত স্বভাবাছিল ফলত ঃ নাইফতি ও অজয়ের বন্ধুত্ব নিবিড় ছিল । অজয়ের বাবা মনীন্দ্র দাস ছিল কৃষক। গঙ্গারাই পাড়াতেই ছিল তাদের বাড়ী অজয়ও সাধারণ গ্রাম্য পরিবেশের বড় হয়ে উঠে এরই মাঝে দারিদ্রতার রোষাণলে নাইফতি দুবৎসরের মধ্যেই তার পাঠ্যক্রম চুকিয়ে ফেলে । মায়ের সাথে কাজে হাত বাড়ায় । কিন্তু ছোট বেলার সাথী অজয় কায়ক্লেশে পড়াশুনা করতে থাকে । প্রায়শই অজয় হাট বারে বাবা মনীন্দ্রের সাথে গ্রামের বাজারে আসে । অপর দিকে নাইফতিও মায়ের সাথে হাট বারে বাজারে আসে বাজার করার জন্য । গ্রামের বাজার হাট বারেই সবার সাথে সবার দেখা , সুখ দুঃখের কখপোকথন । কিন্তু এরই ফাঁকে কিশোর কিশোরীর নিষ্পাপ ভালবাসা নাইফতি ও অজয় নিবিড় ভাব প্রকাশ করে যেত । অজয় নাইফতি পড়াশুনা করার জন্য অনুপ্রানিত করতো । কিন্তু নাইফতি তার পারিবারিক দুর্দশার কথা বন্ধু অজয়কে বলত । প্রতি হাট বারেই উভয়ের সাথে উভয়ের কথপোকথন হত । যদি কোন হাটবারে নাইফতি না আসত তাহলে অজয় হন্যে হয়ে খুঁজত এবং নাইফতির মাকে নানাহ প্রশ্ন করত কেন নাইফতি বাজারে আসে নি । অপর দিকে যদি অজয় কখনো কোন হাট বারে না আসত নাইফতি হন্যে হয়ে অজয়কে খুঁজত ও বাবা মনীন্দ্রকে প্রশ্ন করত, কেন অজয় এলো না । কিশোর কিশোরীর বন্ধুত্ব যে নিবিড় তা নাইফতির মা যেমন টের পেত তেমনি মনীন্দ্রদাস ও বুঝত । মনীন্দ্র দাস বলত বাচ্চাদের মনতো , তাই বন্ধুকে না দেখলে কৌতুহল বশতঃ প্রশ্ন করে । এভাবে অজয় ও নাইফতির যোগাযোগ প্রায়শই হত । ক্রমে অজয় দুর্গারাই জে বি স্কুলের পাঠ্যক্রম শেষ করে অলয়দারা মাধ্যমিক স্কুলের দিকে পা বাড়ায় । অদম্য পড়াশুনার নেশা গরীব ঘরের ছেলে অজয়কে এগিয়ে নিয়ে যায় ।

যদিও শালথাংমনু ও গঙ্গারাই পাড়া পাশাপাশি গ্রাম কিন্তু অজয় ও নাইফতির মিলনের বাধা শুধু মাঝখানের নদী , এরই মাঝে জঙ্গল দ্যসুদের বর্বরতার নিপিড়ন সাম্প্রদায়িকতার রোষানল দুই গ্রামের দূরত্ব বাড়িয়ে তুলে । দুই গ্রামের মাঝের হাট আজ গ্রহণ অরণ্য, যে যার পথে । বিষবাস্প গ্রামের পরিবেশ বিষাক্ত করে দিয়েছে । মনীন্দ্র দাসরা গঙ্গারাই পাড়া ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে । যে যার পথে , এত কিছুর মাঝে ও নাইফতি ও অজয়ের বাল্য কৈশোরের ভালবাসা অপরির্তিত এযেন বাধাহীন জলের স্রোত । কখনো রাস্তায় , কখনো জুম পাহাড়ে উভয়ের কথপোকথন । উভয়ের চোখে মুখে যৌবণের হাতছানি । বাল্য কৈশোরের ভালবাসা যখন যৌবনে পা বাড়ায় তখনই বাধার সৃষ্টি হয়। যা অজয় ও নাইফতির বেলাতেও সত্যি । নাইফতির গ্রামের লোক নাফতিকে অজয়ের সাথে মিলতে বারণ করে । অপর দিকে অজয়ের গ্রামের মানুষ অজয়কে নাইফতির কাছে যেতে বারণ করে । এরই মাঝে গরীব কৃষকের ছেলে অজয় মাধ্যমিক পাশ করে । মনীন্দ্রের বাড়ীতে আনন্দের হুলোড় চলে । কিন্তু অজয় মন মরা , যেভাবেই হোক অজয় নাইফতিকে খবর পৌঁছায় এবং বলে মনু

বাজারে আসতে ।অজয়ের বার্তা নাইফতির কাছে ভগবানের বর্তা । যথা সময়ে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে নাইফতি মনু বাজারে অজয়ের সাথে মিলিত হয় । একে অপরকে দেখে আবেগ প্লাবিত হয়ে উভয়ে কেঁদে ফেলে । নাইফতি বলে অজয় আমি তো পড়াশুনা করতে পারলাম না । তুই পড় তবে আমাকে ভুলিস না । নাইফতি বলে তুই যখনই খবর দিবি তখনই আমি আসব। এই ভাবে বাজারেই উভয়ের দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায় । গ্রামের মিষ্টির দোকানে উভয়ে জিলীপি খায় । সন্ধ্যায় ঘনিয়ে এলে একে অপরকে বিদায় জানিয়ে গৃহমুখী হয় । নাইফতী পীচের রাস্তা ছেড়ে গ্রামের মাটির রাস্তা দিয়ে রওয়ানা হয় মাটির রাস্তার শেষে নদী , অন্ধকারে নদী পার হয়ে পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে নাইফতি চলতে থাকে । বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছতেই ৬/৭ জন যুবক নাইফতির পথ আগলে দাঁড়ায় ও নাইফতিকে মারপিট করে ও এ বলে শাসায় যদি কোন দিন ওই ছেলের সাথে তোকে দেখি তাহলে পরিনাম খারাপ হবে ।

মৃত্যু ভয়ও কখনো নাইফতিকে রুখতে পারে নি । সময় সময় নাইফতি ও অজয়ের স্বাক্ষাৎ হয়। অজয়ের বাড়ী এবং গ্রাম থেকেও অজয়ের উপর প্রচন্ড চাপ । কিন্তু হৃদয়ের ভালবাসা কখনোও কোন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে না ,তাহলে অজয় কি ভাবে নতি স্বীকার করবে , তা যে অজয়ের কাছে অসম্ভব ও বিশ্বাসঘাতের সামিল ।নাইফতির ভেতরে সোনালী স্বপ্ন পাশাপাশি অজয়ের ভেতরে আবেগ উচ্ছ্বাস স্বনির্ভর হওয়ার উদ্যম ।কর্মোদ্যোগী অজয় এরই মাঝে এক রাবার বাগানের মালিকের সান্নিধ্যে এল , চটপট কাজ পেয়ে গেল অজয় ।দুমদাম কাজ উদ্ধার করে দিতে অজয়ের জুড়ি নেই । কিন্তু এ মালিকের একটা বড় দোষ হল বিনা নোটিশে যখন তখন উনি ছাঁটাই করে দেন কিন্তু অজয়ের বেলা ঠিক উল্টৈা , মালিক অজয়কে চোখের পলক থেকে দূরে সরাতে নারাজ । মালিকের স্নেহধন্য অজয় কোম্পানীর খরচে গ্রাম থেকে শহরে । শহর ছেড়ে বহিরাজ্যেঃ অর্থাৎ কেরলে টেনিং এ যায় । দু মাস বাদে অজয় ফিরে এসে দেখে জঙ্গল , দ্যসুদের কারণে সম্প্রীতির বুকে পেরেক লেগে আছে দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কে চুড়ান্ত অবনতি । সে ভাবতে লাগল আমার নাইফতি জানি কোথায় আছে কি ভাবে আছে ? যাই হোক পুরানো এক সাথীর বদান্যতায় অজয় শুদ্ধ ভাষায় একটি চিরকুট লিখে বন্ধুর পকেটে চিরকূট গুঁজে দিয়ে বলে চিঠিটা নাইফতিকে দিস । যাতে লিখা - ছিল - তুমি আমার সাথে বাগানে দেখা করো । ইতি তোমার প্রিয় অজয়। অজয়ের চিরকুট নাইফতির কাছে ভগবানের প্রসাদ , কালবিলম্ব না করে নাইফতি জীবন ভয় উপেক্ষা করে ভোর রাতে অজয়ের বাগানের ডেরায় উপস্থিত ।দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা , কথোপকথন , রাতের অন্ধকার ছিনিয়ে দিনের আলো ফুটে উঠে । অজয়ের থেকে বিদায় নিয়ে নাইফতি পাহাড়ী গ্রামে যায় । যা দৎসুদের কানে লাগে । ওই রাতেই জঙ্গল দৎসুরা নাইফতিদের কুঁড়ে ঘরটুকু জ্বালিয়ে দেয় এবং নাইফতির মাকে নির্দয় ভাবে মারপিট

করে ছোট ভাই শঙ্করকে নিয়ে নাইফতি জঙ্গলে লুকিয়ে কোন ক্রমে প্রাণ বাঁচায় । কারণ ওদের সামনে প্রতিশোধ , প্রতিবাদ সবটাই নিষ্ফল ভেবে পাহাড়ী মেয়ে নাইফতি কোন ক্রমে নিজের ও ভায়ের প্রাণটুকু রক্ষা করে ।

তিন চার দিন বাদে বহুকষ্টে নাইফতি অজয়ের কাছে খবর পাঠায় তুমি এখন আমার সাথে দেখা করতে এসোনা আমরা একটুদূরে থাকি । পরিস্থিতি একটু ভাল হলে তোমার সাথে দেখা করব । অজয়ও সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অজয় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় কিন্তু এ যে নিতান্তই দুজনের কথা, তা কি কখনো কাউকে বলা যায় । কিছু দিন অতিক্রান্ত হলে অজয় ভাবে আমি তো কাপুরুষ নয় । মেয়ে হয়ে নাইফতি যদি এত বাধা বিপত্তি প্রাণ ভয় তুচ্ছ করে আমার কাছে আসতে পারে তাহলে আমি পারব না কেন ? এমনই এক দিন অজয় নাইফতির কাছে খবর পৌঁছায় আমি আজ ভোরে আসবই । যথা সময়ে খবর নাইফতির কাছেও পৌছায় । ভয় মিশ্রিত চোখে নিথর দৃষ্টিতে নাইফতি থাকে অজয়ের আগমনের প্রতীক্ষায় । কনকনে শীতের রাত্রি সাথীদের ছেড়ে অজয় বাগানের ডেরা ছেড়ে নিস্তব্ধ গভীর রাতে জোনাকীদের দেখানো আলোতে গুটি গুটি পায়ে পাহাড়ী পথ ধরে চলতে থাকে গন্তব্যস্থল নাইফতির উদ্দেশ্যে । কিন্তু রাত প্রভাত হয় ভোরের রোদে ঝলমল আলো ফুটে উঠে । অজয় নইফতির কাছে পৌঁছে নি হয়ত অজয়ের পথ ফুরায় নি. শিশির ভেজা ঘাস, জঙ্গল পথে খোজাখুজি করে ও নাইফতি অজয়ের খোঁজ পায় নি । পর দিন সকাল পেরিয়ে দুপুর অজয়ের নিখোঁজ সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । বৃদ্ধ পিতা গ্রামবাসী কেহই কোন হদিস পায় নি অজয়ের । নাইফতি নিদ্রাবিহীন রাত ঠাঁয় বসে আছে চক্ষু স্থবির । অজয়ের সেই কণ্ঠ, সেই ধ্বনি । পাহাড়ী পল্লীতে প্রবল শীত । বাতাস বয় জোরে । নাইফতির চোখেমুখে বিষন্নতা ঠাঁই বসে আছে অজয়ের জন্য । না নিজের জন্য কিছুই বলতে পারে না ।

জীবন্ত ছবি

ক্ষতচিহ্ন এখনো আছে ! গ্রামের নাম ছিল জম্পুই কলোনী । কারনটা হচ্ছে এখনোগ্রামের প্রসিদ্ধ বাজার জম্পুই পৌছে কেউ যদি জানতে চায় জম্পুই কলোনী কোথায় ? নিশ্চয় জবাব আসবে, জম্পুই কলোনী নামে এক গ্রাম ছিল বটে , ১৯৯৯ - ২০০০ এ ভাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক রোষানলে সে গ্রামের চিহ্ন বন্যার জলের মতো ধূয়ে মুছে সাফ । হয়তো উত্তর দাতার মনে পড়বে এখনো পুরানো কাঠাল গাছ , আম গাছ গুলো এবং কিছু মাটির দেওয়ালের ভগ্নাংশ স্মৃতির শেষ স্মারক হয়ে ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে । অবশ্যই সেই জায়গাতে বর্তমানে নিরাপত্তা বাহিনীর স্থায়ী চৌকি গড়ে উঠেছে হয়ত কিছুদিন বাদে তা কার ও স্মরনে থাকবে না । হয়ত কিছু লোকের স্মৃতির রোমন্থন হবে ।

মনে না থাকারই কথা । বছর ৫/৬ হয়ে গেল বিরক্ত হয়ে গ্রামবাসীরা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দূরে সরে গেছে । কতবার লুটিয়ে পড়া বাড়ি গড়া যায় । এমনিতেই সর্বস্বান্ত । কোন সীমানার চিহ্ন নেই , ঝোপঝাড়ে সব মুছে গেছে । সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় জম্পুই কলোনী এখন বিস্মৃতির গহ্বরে।

বীরভদ্রের , আজ কিছুই খেয়াল নেই শুধু মনে আছে একটি নাম '' কুহেলিকা'' , তাই কখনো খুঁজতে আসে কুহেলিকাকে সন্ধান পেল কি না পেল তা .... ?

বীর ভদ্র , কলোনীর কোনাতে স্কুলের পাশে বৃদ্ধ চন্দ্র কুমারের দোকানে কাউকে না বলে কখনো আসে । বৃদ্ধ বারন করে তবু ও সে আসে কুহেলিকার সন্ধানে । এই দোকানেই কলোনীর গরীব মানুষরা কখনো চাল, এক শিশি সরষের তেল, হয়তো বা কখনো মশুরীর ডাল বা দেশলাই কিনত , বীরভদ্রের অবস্থ অত খারাপ নয় । কিন্তু সন্ধ্যায় চন্দ্রকুমারের দোকানে ডাল বা দেশলাই কিনত , বীরভদ্রের অবস্থা অত খারাপ নয় । কিন্তু সন্ধ্যায় চন্দ্রকুমারের দোকানে সে আসত । সারাদিন ক্ষেত খামার করে সন্ধ্যায় চন্দ্রকুমারের দোকানে বসে চা খেতে একটু আড্ডা , আর বাড়ী ফেরার আগে বিড়িতে সুখটান দিয়েই দোকান থেকে উঠত ।

চন্দ্রকুমার বীরভদ্রকে জিজ্ঞেস করে কেমন আছিস , বীরভদ্র উত্তরের বদলে প্রশ্ন করে কুহেলিকা কোথায় । চন্দ্রকুমার দেববর্ম্মা বয়সে বীরভদ্র সরকারের অনেক বড়ো তবু ও সম্পর্কটুকু ছিল পিতা পুত্রের নয় , দুই নিবীর সম্পর্কের বন্ধুর । সময়ে অসময়ে এসে গোপনে গোপনে বীরভদ্র বনে , পাহাড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আজো ও কুহেলিকার খোঁজ নেয় । কখনো ও বা তার চিহ্নহীন পুরানো বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে বেভুল তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে । কথাবার্তা বলেন খুব কম । মনে মনে গুনগুন করে পল্লীগীতি গায় , কারো সাথে কথা না বলে বিড়িতে টান দিয়ে হারানো স্মৃতিকে পুনরায় উজ্জীবিত করে তোলা। মনের কান্না যেন ধন সম্পত্তির জন্য নয় নয় শুধুই " কুহেলিকা" । বীরভদ্রের কৈশোর , যৌবন এই জম্পুই কলোনীতে । পুরানো স্মৃতি আসে সকালে উঠেই ক্ষেত গ্রেহস্থীর কাজ শুরু করে দিত । ভাবতে ভাবতে বীরভদ্রের পশ্চিম আকাশে লাল ছাপ ধরে গেছে কিন্তু বীরভদ্র পুরানো কাঠাল গাছ ধরে মুখে বিড়ি নিয়ে ঠাঁই দাঁড়িয়ে । কখন বিড়ি নিভে গেছে তার পাত্তা নেই । ঘরে ফেরার পথে চন্দ্রকুমার বীরভদ্রকে বলে উঠে - কি রে জম্পুই বাজারে কি চৈত্রের মেলা লেগেছে। অবাক দৃষ্টিতে বীরভদ্র মাথা নাড়ে , জম্পুই বাজা র এই পাহাড়ী জনপদের সবচেয়ে বড় বাজার । চন্দ্রকুমার ও বীরভদ্রের পাশে দাঁড়ায় , বলে উঠে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে চলে যা । মেলার কথা যেন বীরভদ্রকে দূরের স্মৃতি কাছে এনে দেয় । এই মেলা যে তার জীবনের গোপন বিনোদন , আরো কত কী ? চন্দকুমার প্রশ্ন করে উঠে বীরভদ্র মেলায় যাবি ! চন্দ্রকুমারের গলায় যেন বিনম্র আবদারের সুর ।

বীরভদ্র অবাক হয়ে বলেন , চন্দ্র দা আপনি যাবেন । চলুন আপনি গেলে আমি ও যাব আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে বীরুর মূখ । তড়িঘড়ি চন্দ্রদার সাথে রওনা আধ কিমি পথ মেলায় যাওয়ার জন্য । মেলা তার কাছে ভেসে আসা বাতাসে জীবন যৌবনের স্পর্শ , আপন হাসি হাসে বীরভদ্র । কত শত স্মৃতি লুকিয়ে আছে এই মেলায় । পা চালিয়ে বীরভদ্র চলেছে মেলায়। ভেসে আসা মাইকের ককবরক গান যেন তার হাত ধরে টানছে । বীরভদ্র হাটে ডুকছে কিছুটা নাচের ছন্দে । অনেকদিন বাদে সে ঢুকছে মেলায় তাও মনে মনে এক বুক ভরা আশা " কুহেলিকাকে" খুঁজে পাবে এই মেলায় , জম্পুই

বাজরের চৈত্রের মেলা নামকরা মেলা , মানুষের এত ভীড় , পায়ে জড়িয়ে যায় । বীরভদ্রের টাল রাখা দায় হয়ে পড়ে । গাঁয়ের মেলা সেদিক থেকে অনেক আপনার । কারো হাতে ঠেলা ঘূর্নি , কোথায় ও চাকতির জুয়ো , পাঁপর ভাজা , ইত্যাদি ইত্যাদি । কিন্তু এত সবের ভেতরে ও বীরভদ্রের মাথায় একই কথা, হয়ত কুহেলিকাকে খুঁজে পাওয়া যাবে । আস্তে আস্তে মেলার ভীড় কমছে কিন্তু বীরভদ্র - কোহেলিকার কোন সন্ধ্যান পেল না । এবড়ো থেবড়ো জমি পার হতে হতে একই সঙ্গে উৎসাহিত পরক্ষনেই নিরুৎসাহ হচ্ছিল বীরভদ্র । অনাবাদী জমি , পাশ বে ড়ে যাচ্ছে ,বুড়ীমা নদী, ঝোপঝাড় তো আছেই । নানান সরীসৃপ , পোকামাকর, বেজির অবাধ বিচরন এখানে , বীরভদ্রের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই । দুরে পাহাড় জঙ্গল ঘেষে পরিচিত গ্রাম । ওখান থেকেই পাহাড়ী মানুষের বসতির ছিরিছাঁদ লক্ষ্য করা যায় । পাঁচ - ছ ,ঘর স্থানীয় উপজাতি মানুষ থাকে । ওই উপজাতি গ্রাম থেকেই নবযৌবনের মাতোয়ারা কোন যুবকের কণ্ঠে ভেসে আসছিল মধুর ভালবাসার গান " বলংনি তকছা" মানে সুন্দরী বনের পাখী । গায়ের নীচের রাস্তা থেকে ঘ্রান আসছিল , সু - স্বাদ মাংসের, ছেলে মেয়ে বউয়েরা সবাই তাকে চেনে । কুহেলিকার সন্ধানে এদিকে সেদিকে ঘুরে বীরভদ্র অবশেষে উপজাতি গ্রামে । প্রশ্ন কুহেলিকাকে দেখেছো । সবাই হতবাক কিন্তুপাড়াগাঁয়ে বীরভদ্র " কুমুই" অর্থাৎ জামাই বাবু হিসাবে পরিচিত । যেহেতু কুহেলিকা এই গ্রামেরই ছিল সবাই বীরভদ্রকে অনুরোধ করে খাবার খেয়ে যেতে ,কিন্তু বীরভদ্র যেন কুহেলিকাকে না পেয়ে ছিটকে উঠতে যাচ্ছিল বীরভদ্র , পরক্ষনে নিজেকে সামলায় ভাবে আমি যা করছি তা তো মনে হয় মিছিমিছি খেলা । বীরভদ্রের হঠাৎ খেয়াল পড়ে সে অনেকক্ষন ধরে বসে আছে । যাই হোক ভয়হীন বীরভদ্র রাত্রিকালীন আহার সেড়ে রাত্রিতে এই গাঁয়েই রাত্রি যাপন করে পুরানো স্মৃতির গহ্বরে কুহেলিকাকে নিয়ে । ঘোর ভেঙ্গে বীরভদ্র দেখে , রাত প্রভাত হয়ে গেছে ভোর পাখীদের ডাকে , কি সুন্দর তার যৌবনের উপবন । সকালে আবেগ সামলাতে না পেরে বীরভদ্র উপজাতি গ্রামের বৃদ্ধ মহিলা স্বর্নলক্ষী দেববর্ম্মার পায়ে ঝাপটে ধরে , ককবরক ভাষায় চিৎকার দিয়ে বলে উঠে , আমার কুহেলিকাকে এনে দিন । কিন্তু ওরা কোথায় পাবে কুহেলিকাকে। অবশেষে আবেগ , ক্ষোভ, যন্ত্রণা প্রশমন করতে বীরভদ্র দু' পাত্তর মদ গিলে নেয় । বীরভদ্র নেশার ঘোরে বলে আমার বাড়ি নাই , মা , বাবা , ভাই বোন,বন্ধু কেউ নেই , শুধু আছে কুহেলিকার স্মৃতি । তারপর ..... উদ্দেশ্যে কিছু অকথ্য গালিগালাজ করে । সবাই বোঝে বীরভদ্রের নেশা হয়ে গেছে । পাহাড়ী গ্রাম ছেড়ে গাঁয়ের লোকের উদ্দেশ্যে ককবরক ভাষায় বলে উঠে " আনি কুহেলিকা ন তুবৌই রি ফাইদি " অর্থাৎ আমার কুহেলিকাকে এনে দাও ।

ধু , ধু ফসলহীন মাঠ পার হচ্ছে বীরভদ্র , কানে বাজছে কুহেলিকার খিলখিলে হাসি । চরাচর জুড়ে চাঁদের আলো । অদূরে ঝির ঝির করে সোনালী ফিতের মতো চলছে বুড়ীমার জল । চিকচিক করছে বালি । হঠাৎ থমকে দাড়িঁয়ে বীরভদ্র ভাবে জীবন যেন আমার সাথে ভেলকিবাজি করছে ।

গিয়েছিলুম আশা নিয়ে ফিরে এলুম শূন্য হাতে । মাথার উপর দিয়ে কর্কশ ডাক দিয়ে হঠাৎ উড়ে যায় এক কাক । বীরভদ্র ভাবে আমি মদ গিলেছি দেখে রাগে ক্ষোভে কুহেলিকা কাক হয়ে আমাকে বারন করে গেল । পরের দিন ঘরে ফেরে বীরভদ্র । ঐ দিন সন্ধ্যেবেলা পুরনো পূনিমার চাঁদ কুটিল হাসি নিয়ে উঠেছে আকাশে । বীরভদ্রের দীর্ঘশ্বাস । আবেগ বিহুল বীরভদ্র কুহেলিকাকে কথা আর তাদের পিছে ফেলে আসা দাম্পত্যের কল্পনায় কেঁদে উঠে । জম্পুই মেলার হাটে কিশোরী কুহেলিকার সাথে প্রথম দেখা হয় প্রায় ১২ বৎসর আ গে । চোখ দেখাদেখি ক্রমেই বীরভদ্রের ভালবাসার জালে আটকে যায় ।

কুহেলিকার , ভালবাসা জাতপাত বোঝে না , ভেদাভেদ জানে না , বাঁদন মানে না , তা যে অন্ধ। এ ভাবেই শুরু হয় বীরভদ্র ও কুহেলিকার ভালবাসা । এ যেন প্রকৃত্তির প্রেম , অকৃত্রিম ভালবাসা। এক জন একজনকে না দেখে এক পলক ও থাকতে পারে না । দেখা তাদের করতেই হবে সে জুমের মাঠেই হোক বা ফসল কাটার সময় হোক নইতো জম্পুই বাজারের হাটের দিন । হৃদয়ে অফুরন্ত ভালবাসা বীরভদ্র কুহেলিকাকে কাছাকাছি নিয়ে আসে । ক্রমশ উপজাতি পল্লী থেকে পাড়াঁ গায়ে সুগন্ধি জুঁইয়ের মতো তাদের ভালবাসার কথা ছড়ে পড়ে । এভাবে বৎসর কাল কেটে গেছে উভয়ের বারন আর সই না । এক সন্ধ্যায় পল্লী গ্রামে গানের সুরে মাদল আর ঢোল বেঁজে উঠে । বিবাহ সুত্রে অবন্ধ হয় বীরভদ্র ও কুহেলিকা । সুখী দাম্পত্য জীবন, যেন একে অপরের সর্বক্ষনের সঙ্গী , পাহাড়ে গরু চরানোই হোক , নয়তো জমিতে ফসল বুনাই হোক , কখনো কেউ কাউকে ছেড়ে চলত না । যেন দুটো প্রাণ মিলে একটিই প্রাণবায়ু।

এভাবেই কাটতে থাকে পরম সুখে , ছোট্ট পাহাড়ী নীড়ে বীরভদ্র কুহেলিকার জীবন ছন্দ । ভরদুপুর , বুড়ীমা নদীর ধারে গা সিরসিরে শব্দ । পাথরের উপর দা শান দিচ্ছে কিছু লোক । বুড়ীমার জলের মতোই চকচক করছে অস্ত্রগুলো । হঠাৎ চারদিক থেকে আগ্রাসী আগুনের লেলিহান শিখা ,জ্বলছে কাঞ্চনমালা , যুগল ,কিশোর , প্রভাপুর , দ্বারিয়াছড়া , রামনাথ চৌধুরী পাড়া । সাম্প্রদায়িক রোষানলে জ্বলছে জাতি , উপজাতির ঘর । পুড়ছে বোবা পশু , খুন হচ্ছে উভয় অংশের মানুষ । ওসব ভাবার অতো সময় নেই , এক সন্ধ্যায় কতিপয় দুর্বৃত্ত এসে হাজির বীরভদ্র কুহেলিকার ঘরের দোঁড়ে । বীরাঙ্গনা কুহেলিকা বীরভদ্রকে তার প্রাণ থেকে ও বেশী ভালবাসে । স্বামীকে বাঁচানোর তাগিদে কোমর বেঁধে লাঠি নিয়ে লড়াই শুরু করে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে এ যেন মা দুর্গার লড়াই অসুরদের বিরুদ্ধে । স্বামী বীরভদ্রকে বলে উঠে তুমি ঘর থেকে বের হইওনা। চেঁচাতে চেঁচাতে কুহেলিকা দুর্বৃত্তদের পিছু ধাওয়া করে কিন্তু আর ফিরে আসেনি । রাত গড়িয়ে সকাল , দিন গড়িয়ে বছর কিন্তু কুহেলিকা আজো ঘরে ফেরেনি । খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে একরাশ কুণ্ঠা আর অস্বস্তি নিয়ে ঘরের দরজায় বসে আছে বীরভদ্র কুহেলিকার অপেক্ষায় । কিন্তু কুহেলিকা আজো ঘরে ফেরে নি । স্মৃতি পর্দ্দায় কুহেলিকার নিঃস্বার্থ ভালবাসা আজো জীবন্ত ছবি ।
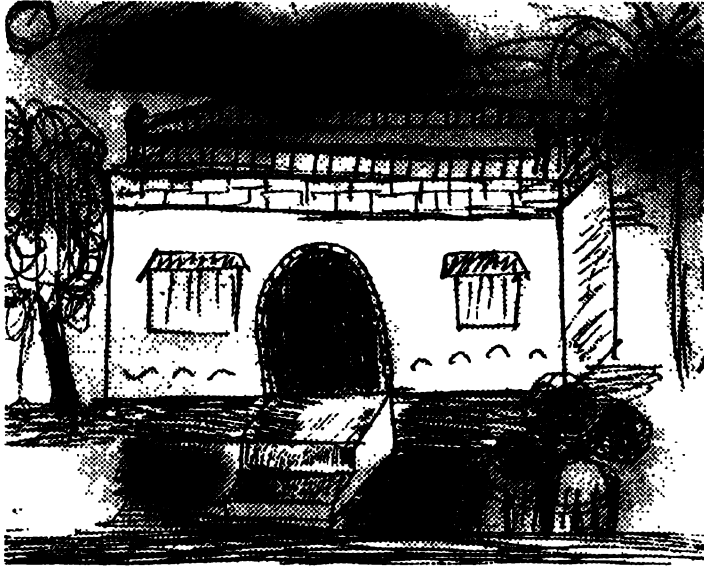
স্বপ্নের বাড়ী

স্বপ্ন! জাতীয় সড়কের পাশে একতলা বাড়ী । এখন ও অসম্পূর্ণ , কিন্তু পরিকল্পনামাফিক ছাদ পর্যন্ত হয়ে গেছে । অর্থাৎ দেহ তৈরী হয়েছে এখন সাজ সজ্জা অর্থাৎ রুপ দেওয়ার বাকী এই সবই এখন প্রসেনজিৎ আর তার স্ত্রী পারমিতার নিজস্ব রাজ্যপাট।

একরাশ স্বপ্ন নিয়ে পারমিতা নতুন তৈরী হওয়া বাড়িটির দিকে তাকিয়ে কিভাবে সাজাবে তার অনেক ভাবনার কথা প্রসেনজিৎকে বলে , সঙ্গে প্রসেনজিৎকে মনে করিয়ে দেয় এতদিন হয়ত ভাড়াটে পরিচয় টুকু জুড়ে ছিল ওর পরিচিতিতে , দীর্ঘ বছর ধরে আগরতলা শহরের সভ্রান্ত জয় নগর এলাকায় কন্যা সন্তানের লেখাপড়ার জন্য ভাড়া থাকতে হয় । এবার মনে হয় স্থায়ী পরিত্রাণ। ভাড়াটে জীবনের গঞ্জনা কখনো কখনো নিজের অক্ষমতাকে বড্ড বেশি বেদনা দেয় , মনে খোঁচা দেয় ! মানষিক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে বিরক্তি ও ভাগ্যহীনা বলে মনে হয় । অর্ধেকের বেশী জীবন কেটে গেছে কখনো ভাড়াটে বাড়ী নয়তো সরকারী কোয়ার্টার । পারমিতার অক্লান্ত পরিশ্রম আর ঘাম ঝরানোর ফলে অন্ততঃ মাথা গোজার মতো একটা ছাদ তৈরী হয়েছে । মফস্‌সলের মহকুমা শহর , স্কুল , কলেজ , অফিস , আদালত , প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র অধুনা মহকুমা হাসপাতাল তার উপর "

নোটিফায়েড এরিয়া'' ঘোষনা সব নিয়ে ধীরে ধীরে জায়গাটির গুরুত্ব বাড়ছে ।

স্ত্রী পারমিতার মানষিক দৃঢ়তা আর পরিশ্রমের ফলেই প্রসেনজিৎ এর তৈরী হচ্ছে স্বপ্নের বাড়ী একদিন সাতসকালে পিতৃভিটের উপর নিজের বাড়ীর দিকে এক পলকে তাকিয়ে প্রসিনজিৎ এত বিভোর হয়ে পড়েছিল যে পারমিতা কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে টের পায়নি । স্বামীর আনন্দে পারমিতার ও চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করে ওঠে । স্বামীর মগ্ন চেহারা যেন তাকে সুখানিভুতি এনে দেয় , পারমিতা বলে কী গো এমন ভাবে তাকিয়ে আছ যেন নতুন জীবন খুঁজে পেয়েছো । প্রসেনজিৎ পারমিতার কাঁধে হাত রেখে মগ্নস্বরে বলে ঠিকই বলেছ , মধ্যচল্লিশে মনে হয় টাটকা যৌবন স্বপ্ন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে । বসন্তের সকালে ফুলের গন্ধ আর সিগ্ধ হাওয়া বইছিল । পারমিতা বলে এবার তোমার নিকট আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধব কেউ এলে থাকার কোন চিন্তা রইল না , তোমার স্বপ্নের বাড়ী তোমার স্থায়ী ঠিকানা । এই বাড়ীটুকু ছিল বিশাল এলাকা। প্রসেনজিৎ এর বাবার ভিটে মাটি । মস্ত বড় একটি মাটির কোটা ঘর । তা -ছাড়া ও ছিল মাঝারি ধরনের আর ও দুটি মাটির কোটাঘর । সব ঘরেই ছিল টিনের চাল । বাড়ি মানে প্রসেনজিৎ এর পিতৃভূমি । প্রসেনজিৎ এর বাবা জীবিত থাকতে দূর দুরান্ত থেকে ও অনেক আত্মীয় পরিজন বেশ কয়েকবার এসেছে । অন্তত বৎসরান্তে একবার আত্মীয়স্বজনরা আসত । পরবর্ত্তীতে চাকুরী বাকুরী কাজ কর্মের তাগিদে এদিক ওদিকে চলে যেতে হয় । মেয়ে পায়েলকে নিয়ে পারমিতা জয়নগরে ভাড়া থাকত । প্রসেনজিৎ চাকুরীর পেশাগত কারণে প্রায়শই কর্মস্থলে থাকত । বাড়িওয়ালার স্ত্রী থাকে পারমিতা নন্দামাসীমনি বলে ডাকত ।এমনিতে মানুষ হিসেবে নন্দাদেবী ভালই ছিলেন । পায়েলের প্রতি ও স্নেহময়ী ছিলেন। মাঝে মধ্যে পায়েলকে তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে জোর করে কিছু ভাল খাবার হলে খাইয়ে ও দিত। একবার পারমিতার শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়ে পেটের সমস্যা ও জ্বর তার উপর নিত্য নৈমত্তিক কাজ মেয়ে পায়েলের স্কুল । প্রসেনজিৎ তখন শহরের বাইরে । পারমিতা বেশ একা বোধ করে নার্ভাস হয়ে পড়ে । তখন কিন্তু নন্দামাসী মনি মাথায় জল দিয়ে সেবা যত্ন করে ঔষধ খাইয়ে পারমিতাকে বেশ ভরসা দিয়েছিলেন । বাড়িটিতে তিনটি ঘর ছিল । মুল পাকা ঘরটিতে মালিক অর্থাৎ নন্দাদেবীরা, অন্য আরেকটি ঘরে আরেকজন শিক্ষক মহাশয় ভাড়া থাকতেন । আর বাড়ীর মুল ফটকের পাশের ঘরটিতে থাকতেন প্রসেনজিৎ এর স্ত্রী পারমিতা ও কন্যা পায়েল । প্রসেনজিৎ পরিযায়ী পাখীর মতো মাঝে মাঝে আসত । যদিও কখনো দু চারজন লোক বেশী আসত ক্ষনিকের আত্মীয় স্বজন তখন স্বাভাবিক ভাবে জলের প্রয়োজন একটু বেশী হয় তখন নন্দামাসী কিন্তু ডাক দিয়ে জানিয়ে দিতে একটু হিসেব করে জল খরচ করবে পারমিতা । এ রকম একবার প্রসেণজিৎ এর বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রীর সামনে বলাতে পারমিতা দারুন লজ্জায় পড়ে যায় ওদের সামনে উপরন্তু প্রসেনজিৎ ও ঘরে নেই । যাইহোক ম্যানেজ করে তো চলতেই হবে ।

তার পরে অন্য একটি বাড়ীতে যখন থাকত , তখন ও পারমিতা এবং পায়েল দুজনে থাকত । মুলত ঃ পায়েলের পড়াশুনার জন্যই ভাড়া থাকা । সেখানে ও শর্ত ছিল হিসেব করে জল খরচ করা অথচ সকাল বিকেল পনেরো মিনিট পাম্প চালিয়ে দিলে ওভারহেড টাঙ্ক ভর্ত্তি হয়ে যায় । কিন্তু এই জায়গাতে ওরা মালিক , ওদের মনোভাব অনড় । তার উপরে শর্ত ছিল রাত ১১ টার পর আলো জ্বলানো যাবে না যদিও পারমিতাদের আলাদা বৈদ্যুতিক মিটার আছে এবং বিলটুকু ও ওরা দেই তবু ও মালিক বলে কথা । তৃতীয়শর্ত বাড়ির দেওয়ালে কোন ও পেরেক পোঁতা চলবে না । একান্ত প্রয়োজন হলে মালিকের (বাড়ীওয়ালার) অনুমতি ক্রমে উনার স্বাক্ষাৎ এ কাজটি করিতে হইবে ।

তখন পারমিতার মনে হত , মাসে মাসে মোটা টাকা গুনে দিয়ে বাড়িতে থাকি তবু ও কেন সব কাজ সংঙ্কোচ করে করতে হয় । অপমানে যেন মাথানিচু হয়ে যেত পারমিতার , বড়ীর মালিক ছিলেন একজন সুঠাম দেহের ও.এন.জি.সির , ইঞ্জিনিয়ার । ধনী ব্যাক্তি হিসেবে পাড়ায় পরিচিত । তাছাড়া হাট , বাট তো আছেই , ঘন ঘন ভাড়াটে তাড়ানোটাও উনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। নানাহ্ কুসংস্কার , স্বপ্নদর্শন ভাড়াটে উৎখাত করার জন্য যত ফন্দি করা সম্ভব তিনি করেন। যদি অপর আগন্তুক ভাড়াটিয়া আর কিছু টাকাকড়ি বাড়িয়ে দেন । জল বন্ধ করে দেওয়া হঠাৎ ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দেওয়া , জানলা দিয়ে ময়লা ফেলা আরো কত কিছু । কাঁহাতক সহ্য করা যায় ।

একরকম বাধ্য হয়ে পারমিতা নতুন বাড়ীর কাছের মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে অসম্পূর্ন বাড়ীর দরজায় ফুল ঠেকিয়ে ঢুকে পড়ে । ঘরের কাজ তখন ও অনেক বাকী প্লাষ্টার হয়নি । রান্নাঘর হয়নি । দরজা , জানালায় পাল্লা অবধি লাগানো হয়নি। অর্থের জোগান ও যে করতে হবে । তবু ও বলে তাতে কী ? সুখের চেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস বড় ।

একটু একটু করেই তো সব কাজ সম্পূর্ণ হয় । পারমিতা একাকী থাকলেই তার চোখের উপর ভাসে ভাড়াবাড়ীতে থাকার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা , যা কর্মব্যস্ত প্রসেনজিৎ কখনো অনুভব করতে পারেনি । তবে প্রসেনজিৎ এতটুকু বুঝে যতই বন্ধুত্ব থাকুক , সু-সম্পর্ক থাকুক এক সময়ে ঘরের মালিকদের এই অহংকার বোধ প্রকাশ্যেই এসে পড়ে আমি মালিক, তুমি ভাড়াটে , নিজের ঘরদোর , বাড়ি ঘর, প্রতিটি মানুষের কাছে বিশেষত স্ত্রীদের কাছে একটা বিশেষ মানে রাখে । কারণ বাড়ী তৈরী করতে গিয়ে পারমিতা আত্মীয়স্বজন এমনকি প্রসেনজিৎ এর বড় ভাই ও বড়ভায়ের বৌদের বেশ কয়েকবার ঠেস্ দেওয়া কথা শুনেছে । যাই হোক এখন পারমিতার একটা আস্তানা , ঠিকানা হয়েছে। সে এখন আর যাযাবর ছাউনিহীন মানুষ না, মনের অজান্তে কখনো পারমিতার ক্ষীন আত্মগরিমা দেখা যায় ।

প্রসেনজিৎ ভাবে বাবা জীবিত থাকলে খুশি হতেন , এক পা দু পা করে প্রসেনজিৎ অন্ততঃ

একটু দাড়িয়েছে এ কথা ভাবত অন্তত ঃ একথা বলত প্রসেনজিৎ নিজের জন্য পাকা ছাদের ব্যবস্থা করেছে । প্রসেনজিৎ কখনো নিজেকে অসফলতার প্রতীক ভাবেনি ভাতৃত্বের বৈরীতা এ তো সমাজ জীবনের চিরকালীন অধ্যায় । তাতে বাক্যবানে হুল ফোটানোর জ্বালা কম বেশী তো হবেই ।

পারমিতাকে পরিতৃপ্তি দেখাই । সে সমস্ত গ্লানি, দুঃখজ্বালা মুছে ফেলে সবার সাথে মিলে মিশে থাকতে চাই । তবে তার জীবনের সবকিছুই হচ্ছে স্বামী প্রাসনজিৎ আর একমাত্র কন্যা পায়েল ।

প্রসেনজিৎ চাঁদের আলোয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল । বাড়ীটির সামনের পুকুর , বিশাল বাড়ীটির ঝোপঝাড়, আম কাঁঠাল, সবেদা গাছ বুকে নিয়ে মস্ত বাড়িটা এক সময়ে নির্জ্জন পড়েছিল । দীর্ঘদিন ছিল খোলামেলা পরিবেশ । যদিও মুক্ত আজো ও আছে । ক্ষয়িষ্ণু পুকুরটি এখন ও স্মৃতি বহন করছে । গত কয়েক বছরে অনেক নতুন বসতি হয়েছে প্রসেনজিৎ এর পিতৃজমির উপর । গাছপালাগুলো নেই , নতুন বাড়ীঘর তৈরীর সময় গাছপালা কাটা পড়েছে । তবে পছন্দের জায়গায় বাড়ী করতে পেরে পারমিতা খুবই খুশী , বাড়ীর সামনে বাগান করার জন্য জায়গা ও ছেড়ে রাখা হয়েছে , সত্যিই খুব ভাল লাগছে, পারমিতা বাগান তৈরীর কাজও শুরু করে দিয়েছে । তবে বাড়ীর কাজ শেষ হতে আরো কিছুদিন সময়ের ও অর্থের প্রয়োজন। প্রসেনজিৎ পারমিতাকে আশ্বস্ত করে বলে ঠিক আছে । তুমি যা চেয়েছো , যেভাবে চেয়েছো তাই হবে । তোমার ইচ্ছাই আর তোমার চেষ্টাইতো সব ।

প্রসেনজিৎ এর কথা শুনে পারমিতা আনন্দিত হয়ে ওঠে , সে গৃহপ্রবেশের আগে কোন অসম্পূর্ণতা রাখতে চায়ছিল না। কিন্তু সব তো আর করা যায় না ।

পারমিতা মনে করিয়ে দেয় , আরো কী কী কাজ করতে হবে । প্রসেনজিৎ মৃদু হেসে বলে তুমি কোনও চিন্তা করো না। আমি সব কাজ ঠিক করিয়ে নেবো । সকালে পরিবেশ শান্ত , নির্মল । তবে বাড়ী থেকে বের হওয়ার পথ পাকা নয় । মাটির পথ একটু বেলা হতেই মিস্ত্রী মজদুরের দল এসে ওয়ালের প্লাষ্টারিংয়ে হাত লাগায় । । প্রসেনজিৎ ওদের বুঝিয়ে বলে ভাল করে কাজটুকু করার জন্য। মিস্ত্রিরা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে অভয় দিয়ে বলে দাদা আপনাকে চিন্তা করতে হবে না শৈবালদা অর্থাৎ কন্টাকটার আমাদের সব বলে দিয়েছেন ।

দিন গড়িয়ে যায় । এলাকার মানুষের আনাগোনা সামনে আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কে প্রতিনিয়ত গাড়ীর শব্দ। বাড়ীর পরিবেশটি যেন বেশ ফুটে উঠছে । পারমিতা বলে ওঠে বাড়ীতে অনুষ্ঠান হলে ছোট ঘরের ডাইনিং টেবিলে বেশী লোকের বসার জায়গা হবে না , পায়েল বলে মা নতুন বাড়ির করিডোরে অনেক জায়গা আছে ওখানে বসে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে । মিস্ত্রিরা স্থানীয় নয় , ওরা জীরানিয়া থেকে এসেছে । প্রসেনজিৎদের জায়গাতে একটি অস্থায়ী টিনের

ঘরে ওরা ৫/৬ জন থাকে এবং প্রসেনজিৎদের বাড়ীর কাজ করছে । গৃহপ্রবেশের শুভ অনুষ্ঠানের পূর্বে বাড়ীতে এখন উৎসবের আমেজ বাড়ীর সামনে বেশ কিছু জায়গা খোঁড়া হয়েছে , বাগানের জন্য। সামনে সুদৃশ্য পুকুর তারপরেই জাতীয় সড়ক , বাড়ীটির পেছনে ও বেশ খানিকটা জায়গা , প্রসেনজিৎ এর ইচ্ছে ওখানে ফলের বাগান করা হবে । বাড়ীর কাজ করাতে গিয়ে পারমিতাকে অনেক হোঁচট খেতে হয়েছে , কখনো ও জলের সমস্যা ,কখনো বা , বিদ্যুৎ সমস্যা ,আরো কত কী ।

স্বজনদের আর্থিক ক্ষমতা বেশী থাকলে স্বভাবতই ক্ষেত্র বিশেষ আত্মগরিমা বেড়ে যায় । সমপর্যায়ভুক্ত না হলে তাচ্ছিল্য আতিক্রম করেই চলতে হয় । অশান্তি এড়াতে পারমিতা ও বোবা , কালার মত অতিক্রম করেই চলত পাশে কোন কথা যেন প্রসেনজিৎ এর কানে না পৌঁছায় , পারমিতা ভাবে অশান্তি অশান্তিকে আমন্ত্রণ দেয় ।

পারমিতাকে নিকট আত্মীয়দের কথার হুল ফোটানোর জ্বালা সইতে হতো । যা প্রকাশ ও করা যায় না অথচ ভয়ানক পীড়াদায়ক । তারপরে ও সবকিছু ঝেড়ে পেলে পারমিতা সুখের নীড় বানাতে ব্যস্ত । রকমারী ফুলের গাছ লাগাতে শুরু করে। নানাহ্ খিস্তি খেত্তর তো আচেই । ঘরটুকু পেছনে উঠলে ভাল হত । অমনটা কেন করেছো, অযথা সমস্যা । এই বাড়ীতে এক বৃহদাকার সর্প আছে । ওটা না , কি মঙ্গলের না অমঙ্গলের কে জানে । এ পুজা দরকার ও পুজা দরকার । অস্বস্তিকর পরিস্থিতি । দ্বিধা দ্বন্ধ । প্রসেনজিৎ এর বুকের মধ্যে আশ্চর্য এক সিরসিরানি শুরু হয় । অন্যকিছুর ভয় নয় , স্বজনদের গোপন আক্রমনের ভয় । পারমিতা কখনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি পছন্দ করে না তার চাইতে মুখ বুঁজে থাকাটা শ্রেয় মনে করে । পারমিতা বুঝতে পারে প্রসেনজিৎ পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করে আস্তে আস্তে ঘর তৈরী করছে তাও পরিচিত কন্টাকটার শৈবালবাবুর সহযোগীতায় । কারণ একসাথে টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই , মেয়ে পায়েল রাজ্যের বাইরে থাকে পড়াশুনার জন্য। সুতরাং তার ও একটা খরচ আছে । সবদিক মিলিয়ে ভাবনা চিন্তা করেই এগোতে হচ্ছে । কান্ডারীর দায়িত্ব তো পারমিতার উপর ।

লোকদেখানো সহমর্মিতা আসলে থাবার মধ্যে নখ লুকিয়ে বিড়ালতপস্বীর মতো সুযোগ বুঝে ঘা দেওয়া তো একধরনের মানুষের কৌশল প্রগ্লভ ভাষণ আর খুদ ধরা এ ও তো একধরনের চাল। প্রসেনজিৎ ওসবে পাত্তা দেয় না । কে কি বলল , কে টিপ্পনী কাটল , তাতে কী আসে যায় । এ যেন সুদীর্ঘ পথ । পারমিতার অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠে । স্বপ্নের ঘর কাজ তো কখনো শেষ হয় না তবু ও দিনক্ষন ঠিক হয় গৃহপ্রবেশের । গৃহপ্রবেশের শুভ অনুষ্ঠানে বাড়ীতে উৎসবের আমেজ । রান্নার কাজ শুরু । পুজো পাঠ ইত্যাদি । কেউ বা মাথা হেলিয়ে ঠোঁটে অদ্ভুত মোড়ে দিয়ে কথা বলে . কথাবার্তায় পরিবেশ অকারণে ঘোলাটে না হয় এ দিকে প্রতিনিয়ত নজর পারমিতার । কারণ পারমিতা

ভাবে প্রসেনজিৎ এর হতাশাভরা মুখের দিকে তাকিয়ে স্ত্রী হিসেবে স্বামীকে অশান্তির হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য এই সময় প্রসেনজিৎ কে রিলিফ দেওয়া দরকার।

গেটের বাইরে দিয়ে তখন যাচ্ছিল এই গ্রামেরই পুরানো বাসিন্দা হরিমোহন কাকা প্রসেনজিৎ কে দেখে দাঁড়াল। প্রসেনজিৎ এর স্বপ্নের বাড়ী দেখে কাকা প্রচন্ড খুশী হয়ে প্রসেনজিৎ এর অনুরোধে প্রসেনজিৎ এর বাড়ীতে আসে। প্রসেনজিৎ এর বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করতেই বলে ওঠে বাবু, ওকে তো ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। এ জায়গাটা ঝোপঝাড়ে ভরা ছিল। এদিকের প্রাচীন বাসিন্দাতো আমরা কয়েক পরিবার। বাকী তো সবই নতুন বাড়ী। সবাইকে চিনি ও না এবার কাকা সকলের দিকে ফিরে বেশ ফুরফুরে ভঙ্গিতে খুশি উপচানো স্বরে বলে। ওপরটায় আমার বাড়ী আমাদের সাবেক ভিটা। এই ছেলে তো আমাদের ঘরের ছেলে ওর কোন অনুরোধে নই, দরকার হলেই আমার ছেলেরা আসবে, প্রসেনজিৎ তো ওদের দাদা, কৃষ্ণকান্ত শঙ্করেরা আসবে। কোন সমস্যা নেই।
কথা শেষে হরিমোহনকাকা হাটতে শুরু শুরু করে। কিন্তু এককাপ চা ছাড়া কিছুই খেল না। বল্লো বাবা আজ তোমার গৃহপ্রবেশের দিন। তোমার সব, মঙ্গল হবে এটাই আমার আশীর্ব্বাদ। আস্তে আস্তে রাত্রি ঘনিয়ে এলো। সবাই পরিশ্রান্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিনের কাজের দখলের পর পারমিতারা সবাই ঘুমিয়ে গেছে। সকালে স্বর্নাভ লাল সূর্য উঠছিল আকাশে। প্রসেনজিৎ বিছানা ছেড়ে উঠে। লাইব্রেরীর বিপরীতে ঠাকুরঘরে নমস্কার দিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে বলে হে ঈশ্বর আমরা সত্যিই বিচিত্র দেশের মানুষ। তোমার আশীবার্দ আর পারমিতার শ্রমে তৈরী হয়েছে আমাদের স্বপ্নের বাড়ী। জীবন সত্যিই জীবনের জন্য।

আমি অচ্ছুৎ বনমালা

আমার নাম বর্নমালা দেবর্বম্মা। বলার মতো এমন কোন পরিচয় আমার নেই, বরংচ লুকিয়ে রাখতেই আমি ব্যস্ত । পেটের দায়ে বাঁচে থাকার তাগিদে এবং ছোট ভাই বোনদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে কখনো পরিচারিকার কাজ , কখনো ক্ষেত মজুর , কখনো ইট ভাট্টার শ্রমিক হিসেবে কাজ করে যায় । বাধা আসে ,আমি ভাবি কাজ তো কাজই তাতে নারী পুরুষ কি বা ছোট বড়ই বা কি ? হীনমন্যতার বুক ভরা ব্যাথা আমার মনে সর্বদাই লেগে থাকতো , আমার সাথে মালিকের সম্পর্ক তো শুধু কাজের । যান্ত্রিক জীবনে কে কার দুঃখ যন্ত্রনার কথা শুনেছে , খাঁচায় বন্দী পাখীর যন্ত্রনার মতো আমার মনের ভেতরে ও একটা যন্ত্রনা বন্দী ছিল । ভাল করে বাঁচার স্বাদ আমার ও ছিল কিন্তু কোন উপায় আমার ছিল না তাই জীবনের সাথে আপোষ করে পরিস্থিতির

সাথে মোকাবেলা করে চলতে থাকি ।

আমার জীবনের কি ই বা আছে নিজেকে মেলে ধরার । শুনেছি মানুষকে নিজের পরিচয় নিজেকেই তৈরী করতে হয় কিন্তু জীবনতো গল্প বা সিনেমা নয় এ তো ভয়ানক বাস্তব সংঘর্ষ । এই পাহাড়ী অঞ্চলে আমার মতো অনেক মেয়ে আছে যাদের জীবন গোপন কান্নার জলে ভেসে গেছে । ক্লান্ত শরীরে ঘুমের ঘোরে অলীক স্বপ্ন ও দেখতে পারতাম না , অবসন্নতা সব ভুলে গিয়ে একটু বিশ্রাম চাইতো । হয়তো জীবন অতি দ্রুতই সলিল নদীর শান্ত ছায়ায় যবনিকা টানবে , আমি সাদা মাটা আট পৌরে জীবন নিয়ে কোন ও সুত্র দেখিনি , বা স্বপ্নের ঘোরে কখনো রাজপুত্র ও দেখিনি । কেন আমার এই দুর্দশা , কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই । ১৯৮১ সাল থেকে আমার বাবা বুদ্ধ দেববর্মা বাচার তাগিদে সুইপারের কাজ গ্রহন করে । আবারো বলছি কাজে লজ্জা কিসের । ১৯৮০ সালে ভাতৃঘাতী জাতি দাঙ্গায় বিদ্বেষ বিষবাস্প ঘনীভূত হয় । আমার বাবা বুদ্ধ দেববর্ম্মা জাতি -উপজাতি ভেদাভেদ কি তা জানতেন না । অ- উপজাতি অংশের কিছু লোক আমার বাবাকে অনুরোধ করে তাদের গবাদি পশু সহ মালামাল গুলো যেন পৌছে দেয় । সেই মোতাবেক বাবা তাদেরকে যথাসম্ভব সাহায্য করে । এরই মধ্যে নিজ সমাজের কতিপয় ষড়যন্ত্রকারী মিলে কুট - কৌশলে বাবাকে সমাজচ্যুত করে ও তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র শুরু হয় । স্ব -জাতীয় লোকেরা তার বাসগৃহে অগ্নি সংযোগ করে তার ঘর বাড়ী পুড়ে রাখ হয়ে যায় । শুরু হয় আমার বাবার জীবনের প্রচন্ড সমস্যা ও দুর্বিসহ যন্ত্রণা। নিজ বাস্তুভিটা বীরচন্দ্র পাড়ায় আর তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি । দুস্কৃতিকারীরা তার ধন সম্মত্তি বাস্তুভিটা সহ দখল করে নেয় ।

বাধ্য হয়ে সংসারের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বাবাকে সুইপার হিসেবে অস্থায়ী কাজ বেছে নিতে হয় । একদিন বুদ্ধ দেববর্মা এলাকাতে স্বচ্ছল কৃষক হিসেবে পরিচিত ছিল কিন্তু বাধ্য হয়ে পরিবার বাঁচানোর গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বুদ্ধ বুড়ীমা নদীর তীরে স্ত্রী , পুত্র , কন্যা নিয়ে অস্থায়ী ঠিকানা তৈরী করে । আজ অব্দি এই ঠিকানাই বয়োবৃদ্ধ বুদ্ধ দেববর্মার শেষ ঠিকানা। বয়ঃ বৃদ্ধ বুদ্ধ আজ শক্তিহীন, অচল ,খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জমিতে ঝিনুক , শামুক কুঁড়িয়ে বাজারে বিক্রি করে । কায়ক্লাশে জীবনের শেষ সম্বল হিসেবে বর কন্যা বর্নমালাকে মনে করে ।

বর্নমালা দেবমর্মা বুদ্ধের বড় মেয়ে , ময়স ৪৫ এর উপর কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে অর্ধ্ব আহারে বর্নমালাকে দেখলে মনে হয় ষাটোর্ধ্ব । বর্নমালা আর্থিক অসঙ্গতি ও পরিবার পালনের গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আজো ও কুমারী । জীবনের প্রথম থেকেই বাবার বড় মেয়ে হিসাবে বাবার দুঃখ যন্ত্রনার অংশীদার হয় । সম্পূর্ণ বাস্তভিটা হীন বুদ্ধ বড়মেয়ে বর্নমালার সহায়তায় জীবন সংগ্রাম শুরু হয় । বুদ্ধের জীবনটা এক মর্মান্তিক ঘটনা । কুমারী বর্নমালা আর্দশের প্রতীক । বর্নমালা বিধস্ত

ভুমিতে পিতৃ মাতৃহীন এক সদ্যোজাত শিশুকে নিজ বুকে তুলে নেয় । মাতৃ স্নেহে তাকে বড় করে তোলে । এক দিনের সদ্যোজাত শিশু আজ চার বছরের ফুট ফুটে সুন্দর ছেলে । মাতপিতা উভয় দায়িত্বেই বর্নমালা নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছে । তবে ভবিষ্যৎ বলতে পারে আগামী কি ? বর্নমালা সহজ সরল উপজাতি মেয়ে । জীবনের স্বাচ্ছন্দ ভাবার সময় তার কখনো ছিল না । আজও নেই। আর ভবিষৎ কি তা কে বলবে ?

বুদ্ধের পরিবার যখন প্রায় ডুবন্ত তখন ছোট ভাই বোনদের জীবন বাঁচানোর জন্য বাধ্য হয়ে বর্নমালা এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরে ঝি এর কাজ করতে থাকে । তাতে ও যে বাধা । বর্নমালা সুইপার বুদ্ধের মেয়ে এই বলে তাকে কেউ ঝি এর কাজ দেয় না । যখন সব পথই বদ্ধ তখন বর্নমালা এক ইট ভাট্টাতে শ্রমিক হিসেবে কাজে অংশ গ্রহন করে । চলে পুরুষ শ্রমিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কঠোর পরিশ্রম । ছ- মাস ইট ভাট্টার শ্রমিক হিসেবে কাজ করে যখন ছ- মাসের জন্য বনমালা বেকার হয়ে যেতো তখন ও বর্নমালা বসে থাকার মানুষ ছিল না , আর বসে থাকলে যে চলবে ও না । ভর দুপুরে নির্জন পাহাড়ী রাস্তায় গহন অরন্যের মধ্য দিয়ে পুরুষ শ্রমিদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শুরু করত রাস্তা তৈরীর কাজ কোন না কোন ঠিকাদারের অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে , বিনিময়ে তখন রোজ হাজিরা মিলত মাত্র বিশ (২০) টাকা একের পর এক দুর্গম অঞ্চলে রাস্তা তৈরীর কাজে হয়ত বনমালার ইতিহাস মানুষের পায়ের ধুলো মিশে গেছে । সুইপারের মেয়ে এই পরিচিতিতে যখন নিজ ভুমিতে বর্নমালার কোন কাজের সন্ধান নেই তখন একদিন বাধ্য হয়ে আরো দূরে পাড়ি দেয় ভাগ্যচক্রে জিরানীয়া থানাধীন জম্মেজয় নগরের ইট ভাট্রায় বর্নমালা শ্রমিক হিসেবে কাজের সুযোগ পায় । ছয় মাস ধরে চলে বর্নমালার একটানা কঠোর পরিশ্রম ।শুধু একমাত্র চিন্তা ছোট ভাইবোনদের জীবন বাঁচানো । মরশুম শেষে বর্নমালা পুনরায় বেকার হয়ে পড়ে , হন্নে হয়ে খুঁজতে হয় অন্য কাজ । তখন বর্নমালা পুনরায় কৃষকের ভুমিকায় অন্যের জমিতে শ্রমিক হিসেবে কৃষি কাজ করে । এ ভাবে শরীরের তিল তিল রক্ত ঝড়িয়ে কঠোর পরিশ্রমে বনমালা ভাইদের বড় করে তোলে । জীবনের অধোঃগতি ক্রমে ক্রমে বর্নমালার ভায়েরা বড় হয়ে বাড়ী ছেড়ে নিজ নিজ সংসার তৈরী করে । একবার ও ওরা ভেবে দেখেনি বৃদ্ধ পিতা বুদ্ধ বৃদ্ধ মাতা বর লক্ষী এবং মাতৃ তুল্য বড় বোন বর্নমালার কথা । সত্য রঞ্জন , সুকুমার , সুনীল , শম্ভু, সবাই বিয়ে করে নিজেদের ঘর সাজিয়েছে । পেছনে দেখার ফুরসৎ তাদের নেই । অভাগিনী বনমালা অভিশাপের বোঝা নিয়ে পৌরত্বে মাঝে বার্ধ্যক্যের ছাপ নিয়ে তবু ও কুমারী সেজে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যাচ্ছে । জীবনের যত সব যন্ত্রনা , দুঃখ বিধাতার রুষ্ট রোষ যেন তাদেরই জন্য । বর্নমালার জন্য সমাজ বন্ধু , সমাজ পতি কেউ কর্নপাত করে না । আমরা বলি আধুনিক সমাজ

তবু ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ কাটেনি , দু - বেলা দু - মুঠো ভাত খেয়ে বাঁচাতে ও বাধা । কঠোর হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে বর্নমালার শারিরীক ভারসাম্য প্রায় শেষ হয়ে গেছে । অর্ধাহার , অনাহারে দুর্ব্বল শরীরকে আজ শ্রমিক হিসাবে ও কেউ কাজে নিতে চায় না । তবু ও জীবন বাঁচার তাগিদে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় । অন্য শ্রমিকদের অর্ধ্বমুল্যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বর্নমালা পড়ে আছে বাবুদের জমিতে । ধানকাটা , ধান লাগানো , কিন্তু অর্ধ্বপেটা শরীরে তা আর কত দিন ।

বর্নমালার ছোটবোন সন্ধ্যা বুড়ীমা নদীর তীরে অস্থায়ী ঠিকানায় বর্নমালায় আদরে শৈশব , কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে পা দেয় । প্রকৃতির বাধাধরা নিয়মে বড় হয় সন্ধ্যা । লেখা পড়ার সুপ্ত বাসনা ছিল সন্ধ্যার মনে কিন্তু বাদ সাধে আর্থিক অস্বচ্চলতা এবং সমাজ , সে একই কথা সুইপারের মেয়ে। একে অস্বাভাবিক দারিদ্রতা অন্য দিকে বুদ্ধের মেয়ে সে আর এক অভিশাপ। আর্থিক , সামাজিক পরস্পরা গত কারনে ছোটবেলায় লেখাপড়া থেকে ছিটকে পড়ে সন্ধ্যা । এক সময় বুড়ীমা নদীর পাড় দিয়ে টাকার জলা জম্পুই জলা সড়ক ধরে গাড়ী চালিয়ে যেত এক বাঙালী যুবক নাম তার রনজিৎ দেবনাথ , দক্ষিন ত্রিপুরায় তার বাড়ী । আসা যাওয়ার মাঝে রনজিৎ এর সাথে সন্ধ্যার চোখে চোখে দেখা । মনের গোপনে উভয়ের মনে সৃষ্টি আলতো ভালবাসার ছোঁয়া । কিছুটা ভাষাগত সমস্যা থাকলে ও অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা রনজিৎ ও সন্ধ্যার সমস্ত বাধা অতিক্রম করে । অকৃপন ভালবাসা একসময় রনজিৎ সন্ধ্যাকে জীবন সাথী বলে মেনে নিতে বাধ্য করে । কিন্তু সমাজ মানতে রাজী নয়, শুরু হয় চোঁখ রাঙানী নানাহ কু- রীতিনীতি । যাই হোক রনজিৎ - সন্ধ্যা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বর্নমালার আর্শীবাদ ধন্য হয়ে ভালোবাসার পরীক্ষায় উর্ত্তীন হয় । বর্নমালার প্রশ্ন এ সমাজ কি দিয়েছে ? প্রমানিত হলো হৃদয়ের ভালবাসা কোনো বাধা মানে না । সে যতই কঠোর থেকে কঠোরতর হোক না কেন ? একদিন সন্তর্পনে সন্ধ্যা বের হয়ে পড়ে তার জীবনসাথী রনজিৎকে নিয়ে শুরু হয় জীবনের সুর্খ দুঃখ , নানাহ সমস্যা , এর মধ্যেই সন্ধ্যা দু সন্তানের জননী হয় কিন্তু বিধাতার রুদ্র রোষে সন্ধ্যার সন্তানরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে । জীবন কি ? - ভয়ানক বিভীষিকা । ভাষাহীন যন্ত্রনা তার পরে ও রনজিৎ ও সন্ধ্যার ভালবাসায় বিন্দু মাত্র আঁচ পড়ে নি । পুনরায় বাধ তৈরী করে সাম্প্রদায়িকতা । ১৯৯৯ - ২০০০ এর সাম্প্রদায়িক রোষানলে রনজিৎ ছিটকে পড়ে সন্ধ্যার বুক থেকে । কিন্তু সম্পর্কের বিন্দুমাত্র ছেদ পড়েনি ।। রনজিৎ সন্ধ্যার ঘরে আসতে না পারলে ও হুমকী , রক্তচোখ উপেক্ষা করে সন্ধ্যা ছুটে যায় তার জীবন সাথী রনজিৎ এর কাছে । এ যে ঠুনকো ভালবাসা নয়। স্নেহ আজো ও ভালবাসার সাগরে ঢেউ সৃষ্টি করতে পারে , যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বর্নমালা , নিজের জীবন উৎসর্গ করে অসামান্যতার পরিচয় রাখে । বর্নমালা ভাবে মেয়ে বলে বিধাতা আমাকে কিছু করে দেননি এবং এই জীবন সত্যটি বর্নমালা প্রতিটি পদক্ষেপে প্রমান করতে চাই । বর্নমালা ভাবে হতে পারি আমি

শ্রমিক , আমি গতর খেটে খাই ও ভাইবোনদের জীবন বাঁচিয়েছি , কি ভাবে কত রোজগার করেছি কেউ তা চোখে দেখতে পায় না , সারাদিন পরিশ্রম করে মালিকের গালমন্দ শুনে , দিনের শেষে পরিশ্রান্ত হয়ে যখন আলোবিহীন বুড়ীমা নদীর তীরে অস্থায়ী ডেরায় ফিরি , তখন নোংরা ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় শুয়ে বর্নমালা ভাবে জীবনটা বুড়ীমা নদীর জলের মতো ভেসে গেলো , কিছুই কি করতে পারলাম না ? ভেতরে ভেতরে ডুঁকরে কাদঁছে অহরহ বর্নমালা - বাইরে থেকে কেউ তা বুঝার উপায় নেই । এই বোবাকান্না বুকে করে বর্নমালা কাজ করে, মালিকের আদেশ নির্দ্দেশ শোনে , সব শ্রমিকদের সাথে তাল মিলিয়ে চলে , তা যে কত কষ্ট শুধু বর্নমালারাই জানে । আমার মতই তারা কষ্টের রোগে ভোগে , তবুও বর্নমালার জীবনের ক্ষুদ্র অংশ শোনার লেখার এক আশ্চর্য তৃপ্তি আমায় পেয়ে বসেছে তার নিশ্চয় কারন আছে। জীবনের গভীরতা যে কি তা - কি সবলোককে বলা যায় । মর্মকথা কেউ বা জানতে বুঝতে চেষ্টা করে ভাবতে ভাবতে আমি বর্নমালাদের ভেতর এক নিদ্রিত ভিসুভিয়াস দেখতে পাচ্ছি , যেদিন সমস্বরে বর্নমালাদের কণ্ঠস্বর ফুটে উঠবে সেদিন তপ্ত আগ্নেয়গিরি গর্জ্জন করে জেগে উঠবে । মানুষ মানুষের জন্য ভাবতে নইলে তো সমাজ অর্থব হয়ে যাবে , অন্যজীব ও মানুষের মধ্যেকার পার্থক্য থাকবে না। বর্নমালারা সমাজে অতি ক্ষুদ্র হয়ে থাকলে ও ওরা প্রমান করেছে ওরা ক্ষুদ্র নয় , অসাধারন ও অসামান্য । সমাজকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়েছে জীবন সংঘর্ষ কাকে বলে ?

বন্ধুত্ব

চাকুরীতে এসে পরিচয় । ব্রজেশ , শ্যামল , স্নেহাংশু , শুভ্রদ্বীপদের সাথে সুরজিৎ এর । ব্রজেশ রাজধানী আগরতলায় বাড়ী কিনেছে । জায়গা , ঘর সব মিলে প্রায় সাত লাখ টাকা । বন্ধুরা খবরটা শুনেই ওকে ধরল । ব্রজেশ ও বন্ধুদের নতুন ঘরে নিয়ে রকমারী খাবারে পেটপুরে খাওয়াল । শ্যামল, ও খানিকটা জায়গা কিনেছে শহরের বনেদী এলাকা রামনগরে । যদিও দামটা একটু বেশী হয়েছে তবে জায়গাটা খুব ভাল শহরের ব্যস্ততম রাস্তা থেকে দেখা যায় । সামনেই দুর্গাচৌমুহনী বাজার। পায়ে হেঁটে বাজারে গেলে বড়জোর পাঁচ মিনিট লাগবে । শ্যামলের জায়গাটা দেখতে সময় করে চার বন্ধুই গিয়েছিলুম। শ্যামল এখন ঘরদোর করবে না শুধু জায়গাটা কিনে রাখল ভবিষ্যতের কথা ভেবে । চাকুরীর সময়টা সরকারী কোয়ার্টারে কাটিয়ে দেবে বলেই ভাবনা ।

আমরা পাঁচ জন বন্ধু , সত্যি বলতে কি আজ থেকে ১৮ বৎসর আগে একসাথেই চাকুরীতে যোগ দেয় । শিলং এর কাছাকাছি বরাপানী অ্যাকাডেমিতে একসাথেই এক বৎসর বেসিকট্রেনিং করি। একই মেসে খাওয়া , একই সাথে ট্রে নিং মোটামুটি সময়টা ছিল ব্যস্ততার মধ্যেও আনন্দময় । শনিবার বিকেল আর রবিবার সবার ছোটাছুটি শুরু হতো শিলং শহরে যাবার আর নতুন নতুন সিনেমা উপভোগ করা । বাকী দিন গুলো খুব ব্যস্ত । সবাই অপেক্ষায় থাকত কখন শনিবার আসবে। তারপর একে একে সবার বিয়ে হল । সুরজিৎ কিন্তু আগেই ভালবেসে বিয়ে করেছিল লক্ষী নামে সহজ সরল এক মেয়েকে । টেনিং শেষে সবাই আলাদা হয়ে গেল । রাজ্যের এক এক স্থানে এক এক বন্ধু । কিন্তু সময় সুযোগে বন্ধুরা বন্ধুদের খোঁজ খবর নিত । সবাই এখন চল্লিশোর্ধ । সবাই ছেলে মেয়ে বউ নিয়ে ব্যস্ত সংসার । সুরজিৎ এর একটি মেয়ে আছে নাম তার যুথিকা । রিটায়ার্ডের পর কার কোথায় আস্তানা হবে তা ভাবনা চিন্তা আমাদের বহু আগেই শুরু হয়ে গেছে । ব্যাতিক্রম সুরজিৎ এর । দিলখোলা হই চই করে সুরজিৎ কাটিয়ে দেয় , একটুকু প্রতিবাদের নেশা প্রথম থেকেই তার

ছিল। মনে না মিললে ভয়ানক চটে যেত, যেন খানিকটা বদমেজাজী। ঝুটঝামেলা বেশী পছন্দ করে না। বিভাগীয় কাজকর্মের ফাঁকে লেখাপড়া যেন তার একটা অভ্যেস আর লেখালেখি তার নিত্য সঙ্গী। বই লেখা, খবরের কাগজে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা লেখা, বাস্তব চিত্র নিয়ে শহর পল্লী জীবন নিয়ে লেখালেখি তার নিত্য অভ্যেসে পরিনত হয়ে গেছে। বন্ধুদের কেহই পিতৃভিটে মাটিতে বা একত্রিত সংসারে ফিরতে রাজী নই। সবাই রাজধানী আগরতলা বা তার ধারে কাছে থাকতে চাই। শুধুই নিজের পরিবার নিয়ে। তারই ফলশ্রুতি বন্ধুদের বাড়ী, জায়গা বাসা কেনা। সবার উদ্দেশ্য শহর ও কাছাকাছি থাকলে সবরকম নাগরিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে। বন্ধুরা জায়গা খুঁজছে, হয়ত জায়গা পছন্দ হচ্ছে না, না হয় দামে পোষাচ্ছে না। শুভ্রদ্বীপের শ্বশুরবাড়ীর লোক ভাল জায়গার জন্য শহরে খোঁজ খবর চালাচ্ছে। মনমত হলেই জায়গা কিনে নেবে। কিন্তু আশ্চর্য আমাদের মধ্যে সুরজিৎ এসব নিয়ে কোনও উৎসাহ দেখায় না। আমাদের আলাপ চারিতা অন্যদিকে নিয়ে যেতে চাই আর নইতো আমাদের কথাবার্তা শোনা আর কখনো মিটমিট হাসে। আমরা কেউ বলি সুরজিৎ চালাক, কেউ বলি নারে, স্নেহাংশু বলে বুদ্ধিমান মানুষ সবারটা দেখেশুনে অনেক ভাবনা চিন্তা করেই সুরজিৎ শেষ খেলাটা খেলবে। আমাদের একের সাথে অপরের দেখা হলে আলোচ্য বিষয় টাকা, পয়সা, সঞ্চয়, বাড়ীঘর ইত্যাদি ইত্যাদি, আমাদের অন্য কোন চিন্তা নেই। আমাদের জীবনটা যেন হিসেব কষা জীবন। কিন্তু সুরজিৎ যেন ভিন্ন জগৎ এর মানুষ। কাগজ কলম নিয়ে লেখালেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটাছুটি, বই কেনা এই সব যেন তার কাছে অনেক প্রিয়। যদিও তার ফুরসৎ মনে হয় আমাদের সবার থেকে কম। সাংসারিক ঝামেলা ও কম নয়। ওর বউ লক্ষী অত্যাধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়ে প্রায়শইঃ। সুরজিৎ বউকে খুব ভালবাসে ছোটবেলার ভালবাসা তো কিন্তু যে চাকুরী ফুরসৎ কোথায় কিন্তু বউয়ের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সবসময় উদ্বেগে থাকে, সুরজিৎ তার উপর একমাত্র কন্যা যুথিকা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। মা মেয়ে শহরের ভাড়া বাড়ীতে থাকে। বাবার কাছে না থাকলে সমস্যা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সুরজিৎ এর দুশ্চিন্তা আছে কি নাই কাউকে কখনো ধরা দেই না সে। যে নানাহ্ চাপের মধ্যে ও মানষিক যন্ত্রনায় আছে। তার উপর বিভাগীয় কর্তারা তার গতর থেকে নিতে জানে, কিন্তু বিনিময়ে যেন ..... সে। মনে হয় যেখানে সমস্যা সেখানেই সুরজিৎ। সুরজিৎ এর বিভাগীয় সাফল্য, শিক্ষার সাফল্য সবারই জানা। যাই হোক অতসব ভাবার মত ফুরসৎ সুরজিৎ এর নেই। সে চলে তার নিজস্ব ভাবনায়। কিন্তু কখনো কখনো আমরা বন্ধুরা ওকে পরামর্শ দিই। কখনো চিন্তা হয় তার বেপরোয়া আর ঝুঁকিপূর্ণ জীবন পাছে কি বা তাকে বিপদে ফেলে দেয়। কখনও বা জিজ্ঞাসা করি কী রে বাড়ীঘর করার ব্যাপারে কিছু চিন্তাভাবনা করলি, ভেবেচিন্তে কিছু একটা কর। আস্তে আস্তে বয়স কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য ! এসব কথায় সুরজিৎ এর মুখে কখনও দুশ্চিন্তার ছায়া ফুটে উঠতে দেখি না। সেটা ওর

চাতুরী কি না কে জানে , তবে দিব্যি স্বাভাবিক গলায় উত্তর দেয় বাপের এক খন্ডখালি ভূমি এখনো গ্রামে আছে । তারপর বলে ছোটবেলা থেকেই এ বস্তি ও বস্তি বনে পাহাড়ে কেটেছে । রিটায়ারের পর নইতো সেভাবেই যাবে । আরে অত ভাবনা কিসের কিছু না কিছু একটা হয়েই যাবে । মেয়েটার পড়াশুনা চলছে , আমি থাকি দূরে দুরে বলত ওসব ভাবার সময় কি এখন ? ঘর দোরে কে থাকবে । আগে আগে অতশত ভেবে কী হবে শুভ্রদ্বীপ ভুরু কুচকে বলে উঠল তোর কথা যেন সাহিত্যের সুদূর প্রসারী রাস্তা।

বছর গড়িয়ে যেতে রাজধানীর কাছাকাছি কলেজটিলায় আমিও জমি কিনে লোনে বাড়ী করে ফেললাম্ । ব্যস এবার নিশ্চিন্ত বাড়ীটা দু- হাজার টাকায় ভাড়া দিয়ে দিয়েছি এক শিক্ষক মশাইয়ের কাছে । যাই হোক বাড়ী মেনটেনেন্সের খরচ হয়ে যাবে । সেই সঙ্গে বাড়ীটাও ভুতুরে বাড়ী হবে না ।

মোটামুটি আমাদের বন্ধুদের সবার মনপ্রাণ আগরতলা কেন্দ্রিক ।

হঠাৎ একদিন শ্যামল বলল সুরজিৎ পিতৃ ভিটেতেই স্থায়ী ঠিকানা গড়বে । শুনে একটু অবাক লাগল তার প্রতি। পরিচিতি কেনই বা গ্রামেই বাড়ী করার সংকল্প করে নিল । আমরা বন্ধুরা সাধারণত সমস্ত ব্যাপারেই আলোচনা করি ,বুদ্ধি পরামর্শ নেয় কিন্তু সুরজিৎ যেন সে সবের ধার দিয়েও গেল না ।

একদিন রাস্তায় আচমকা সুরজিৎ এর সাথে দেখা জিজ্ঞেস করলাম কিরে পিতৃভিটায় ফিরে যাচ্ছিস্ । মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল । বললাম তোর বউ মেয়ে কি রাজী হবে , মেয়েটা তো ছোটবেলা থেকেই শহরে লেখাপড়া করেছে এ ছাড়া ওর বন্ধু - বান্ধব , শহরের পরিবেশ খাপ খাইয়ে নিজেকে মানিয়ে নেবে । এটা সত্য সুরজিৎ আমাদের মধ্যে প্রায়শই কথাবার্তা হয় । ক্লান্তিবিহীন সুরজিৎ আমাদের কর্মক্লান্ত চাকুরীর রিলিফ মেশিন । ওকে বুঝা বড্ড কঠিন ।

যখন আড্ডায় বসি তখন আমরা আলোচনা করি কার কতটা ইনভেষ্টমেন্ট আছে , কার ঘরে বাথরুমে কি ধরনের টাইলস লাগিয়েছে বেসিন , মোজাইক কি রকম সহ রকমারী আলোচনা । ঘর সাজাতে সাজাতে আমরা যখন ক্লান্ত , সুরজিং তখন বেশ খোঁস মেজাজে ওর লিখা গল্প কবিতা , প্রবন্ধ বা অপরাধকাহীনী শোনাতে বেশ তাঁতিয়ে উঠে । ওর মন রাখতে গিয়ে বিরক্ত হলেও কখনো কখনো শুনতে হয় । কখনো ভাবী সুরজিৎ তুই কি ? যান্ত্রিক যুগের মানুষ যন্ত্রের মতো ধাবমান আর তুই আছিস্ বই প্রকাশনায় ব্যস্ত । কী মূর্খ! এ যে ইন্টারনেট , কম্পিউটারের যুগ , পয়সা ফেললে বাঘের চোখ ঘরে আসবে, তুই আছিস্ সে কেলে লেখালেখি নিয়ে । সুতরাং সুরজিৎ আমাদের আড্ডায় বিরক্তি , বেমানান । সেও বুঝতে পারে তাই আসে না ।

একদিন বিকেলে রেস্তোরায় দেখা স্নেহাংশুর সাথে । শ্যালিকাকে নিয়ে চুটিয়ে গল্প করছে আমি ও হাজির । বেশ মজা হল । কথায় কথায় পুনরায় সুরজিৎ এর কথা উঠল । স্নেহাংশু বলে ওই

সব তথাকথিত ডিগ্রী আর লেখালেখি এ যুগের আদিখ্যেতা । কারণ দেখনা যমুনা শেঠ বড় জোর আট ক্লাস , তার সম্পত্তির হিসেব তৈলমর্দন । তাহলে বুঝতেই তো পারছিস ইন্টারনেটের যুগে পয়সা ফেকো তামাসা দেখো । এখন ভুমি বিত্তবানদের কদর করে ...... সুরজিৎদের নয় । স্নেহাংশু আমাকে বলে যদি কোন দিন বেচারা সুরজিৎ এর দেখা পাস বলে দিস ওসব ছেড়ে যদি পারে বউ কন্যার ভবিষৎ চিন্তা করতে । দেখনা শুভ্রদ্বীপ বস্ কে ম্যানেজ করে আগরতলায় পোষ্টিং নিয়ে নিয়েছে এ - ছাড়া ও ওর পলিটিক্যাল সম্পর্ক ও খারাপ নয় । ও দারুণ ম্যানেজ করতে পারে । যাই হোক শুভ্রদ্বীপ যখন আছে ওর সাথে কথা বলে দেখব কারণ বরাবরই ওর একটা হেল্পিং আটিচুয়েড আছে , হয়ত ও আমার একটা সুবিধে করে দেবে । আরে ভাই নিজের লাভের জন্য নয়তো দু -চার রোজ ছুটাছুটি করলাম , কি বললাম , না বললাম কে দেখে আছে । দেখ বন্ধু, জীবনে একটু দাঁড়াতে হলে কিছুটা ডিপ্লোমেসি করতেই হয় । প্রবলেম আছে তা থাকবেই তার মাঝে ম্যানেজ করতে হবে তবেই তো আখের লাভ । নয়তো সুরজিৎ এর মতো " হ্যাপা" জীবন কাটাতে হবে ।

সুরজিৎ এর অনুরোধে তার ভাড়া বাড়ীতে আমরা কয়েকজন বন্ধু গিয়েছিলুম তার নেমন্তন্ন রক্ষা করতে । তার বউ ভালই খাইয়েছে , এরই মাঝে সুরজিৎ এর সেই গল্প পাখীর কিচির মিচির , পল্লীগ্রাম , পাহাড় , অসহায়ত্বের কাহিনী ইত্যাদি। তার এই কথাগুলো শুনে শ্যামল তাচ্ছিল্যের স্বরে সুরজিৎকে বলে উঠে , সুরজিৎ বস্তুবাদী দুনিয়ায় তোর ওসব লেখা আর কথাগুলো কোন দাম নেই রে। এর পরের ব্যাপারটুকু কিন্তু চোখে পড়ার মত ক্ষনিকের মধ্যেই আমরা আসতে সুরজিৎ এগিয়ে দিলে ও ওর বউ আর মেয়ে ছিল সম্পূর্ণ নিশ্চুপ , মনে হলো যেন ওরা ভয়ানক ভাবে নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছে যা নাকি পাথরের কাছে ও মর্মভেদী । সুরজিৎ এর ঘর পেরিয়ে চলতে চলতে আমরা সবাই কিন্তু কেউ কাউকে কিছু না বলে মনে মনে ভাবছিলাম সুরজিৎ এর কথা । মাঝে মাঝে আড় নজরে ফিরে তাকিয়েছি ততক্ষনে সুরজিৎ হয়ত ঘরে গিয়ে বউ আর মেয়ের সাথে আমাদের অসভ্য আচরণের ব্যাখা দিচ্ছে আবার ভাবি না ওসব বলার মতো অবসর মানুষ সে নয় । মনে মনে বিশ্বাস করেছি আমরা বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে হেলাফেলার সুরজিৎকে দেখিছি কখনো গভীরে যাই নি কিন্তু আজ ওর আজ ওর ভাড়া বাড়ীতে সব কিছু পরখ করে মনে হচ্ছে সত্যিই সুরজিৎ সাফল্যের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে আছে হঠাৎ করে আরো মনে হল ও তো বুঝে নিজের মনের মতো সাফল্য নিয়েছে তবে আমরা কী করছি । হঠাৎ ব্রজেশ বলে উঠে আমরা শহর কেন্দ্রিক মানসিকতার চরম স্বার্থপূর্ণ ভাবনাচিন্তা করেছি আর সুন্দর সৃষ্টিকে বারংবার পদদলিত করেছি ।

কিন্তু সুরজিৎ সৃষ্টি থেকে সৃষ্টি করে সুন্দর করে সাজিয়েছে , জানান দিয়েছে সৃষ্টি অচল হতে পারে না । ঘুমন্ত পাহাড়ের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেই । সৃষ্টির প্রচুর ক্ষিদে তবুও বিতড়নে তৃপ্তি।

মাটি কোথায় পাব ?

নিজ্জন গহন অরন্যের পথ ধরে অনিশ্চিত , উদ্দেশ্যহীন ভাবে অন্যমনস্ক মনে বিষাদের ছায়া মুখে হেটে চলেছে শৈলেশ বিশ্বাস । গভীর জঙ্গলে এক বিশাল বট গাছের নীচে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় শৈলেশ , কিছুক্ষন বাদে হাটু ভেঙ্গে বসে পড়ে বটের ছায়ায় । চারদিকে বণানী ঘেরা , বুনো লতাগুলো যেন বাতাসে হেলদোল খেয়ে শৈলেশের গায়ে ভালবাসার স্পর্শ লাগিয়ে দিচ্ছে তার মাঝেই সুগন্ধী ফুলের গন্ধ । শৈলেশের মনে যেন আবেগের স্পর্শ লাগাই বুনো ফুলের স্পর্শে মন তাজা হয়ে উঠে শৈলেশের , চলতে থাকে ঘন অরন্যের পথে । বুনো গাছের পাতায় তখনও শিশির বিন্দু লেগে আছে , হাঁটতে হাঁটতে কখনো এক ফোঁটা জল শৈলেশের গায়ে পড়ে । এই গহন অরন্যে শৈলেশ কোথায় পাড়ি দিচ্ছে , কি, ই বা তার উদ্দেশ্যে , কোথায় তার গন্তব্যস্থল , কে জানে তার মনের কথা ।

খুঁজে পাওয়া গেল তার ঠিকানা , গহন অরন্য পেরিয়ে এক উপজাতি মহল্লায় তার বাস । যেখানে এখনো মাটির প্রদীপ জ্বলে , গাড়ী ঘোড়ার তো প্রশ্নই আসে না । গ্রামে ডোকার মুখে বাঁশের তৈরী দোকান , দোকানখানি শৈলেশের । এখানে সে শুকানো মাছের ব্যবসা করে । মহল্লায় লোকের কাছে শুকনো মাছ খুব প্রিয় , শুকনো মাছ বিক্রি করে চলে শৈলেশের জীবিকা। মহল্লার ভেতরেই বাঁশ বেতে তৈরী করেছে তার স্বপ্নের বাড়ী । উঠোনের পুর্ব্ব প্রান্তে আগন্তুকদের বসার জন্য তৈরী করেছে বাঁশের মাচাং । বাঁশের তৈরী সাজানো দু -টো ঘরের সামনে রকমারী ফুলে সাজানো দুটো বাগান । সমতলে শুকনো মাছ যখন শৈলেশ কিনতে আসে তখন শৌখিন শৈলেশ ফুলের চারা গাছ সংগ্রহ করে বাগান সাজায় । শুধু তাই নয় প্রবেশদ্বার ও বাঁশ দিয়ে তৈরী ফটক তার উপরে ঝুলন্ত বুনো লতা দিয়ে সাজানো এবং ছোটো ছোটো বুনো ফুলে সু সজ্জিত যেন গুহার ভেতরে সাজানো মন্দির । এই গৃহ মন্দিরেই থাকে শৈলেশের স্ত্রী শ্যামলী , আর আদরের ফুটফুটে মেয়ে বণানী । বনের

স্নিগ্ধ ছায়ায় জন্ম বলে শৈলেশ মেয়ের নাম রেখেছে বণানী । বণানী স্থানীয় উপজাতিদের ভাষায় পটু।

শৈলেশ প্রতিদিন খুব ভোরে ওঠে , বাগান পরিচর্যা করে । ফলের বাগানে ও তদ্রুপ যেন প্রকৃতির হাতছানি । তারপর সে প্রত্যহ পাহাড়ী ঝর্নার জলে গুনগুন ভ্রমরার মতো গান গাইতে গাইতে গাত্রদাহন করে , পূজো অর্চ্চনা সেড়ে দোকানে যায়। প্রতিদিন স্ত্রী শ্যামলীও তার সাথে সব কাজে হাত লাগায় । দোকান বদ্ধ করে পল্লী গান গাইতে গাইতে রাতে ঘরে ফেরে । দরজায় গালে হাত রেখে শ্যামলী গান শুনে বুঝতে পারে তার জীবন সাথী শৈলেশ আসছে , আর মুচকি মুচকি হাসতে থাকে।বণানী ঘুমিয়ে থাকে । কথপোকথনের মাঝে রাত্রিকালীন খাওয়া দাওয়া সেড়ে শৈলেশ নিদ্রা দেবীর কোলে ঘুমিয়ে পড়ে শৈলেশ প্রতিদিন দোকানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে শ্যামলী মায়াভরা চোখে তার প্রানপ্রিয় স্বামীর খাবার সযত্নে সাজিয়ে দেয়। শ্যামলী এমনিতেই প্রচন্ড সংসারী , তাদের ছোট্র সংসারের চারদিকেই তার সুতীক্ষ্ণ নজর । কাজকর্ম সেড়ে আদরের বণানীকে ঘুমপাড়ানী গান শুনিয়ে বিছানায় নিয়ে যায় । বণানী ঘুমিয়ে গেলে শুরু হয় শৈলেশের প্রতীক্ষা । পূর্ণিমার হাসি ভরা রাতে সিঁথিতে লাল সিদূরে শ্যামলীকে প্রচন্ড ভাল লাগে । দূর থেকে প্রানের পুরুষের গান শুনে এগিয়ে আসে এক গলা ভরা হাসি নিয়ে । কখনো দোকানে দেরী হয়ে যায় , শ্যামলীর শুরু হয় উৎকন্ঠা। পুরুষ মানুষ নানাহ্ কাজে ঝামেলায় দেরী হতেই পারে এই কথাটুকু শৈলেশ বহুবার শ্যামলীকে বুঝিয়েছে । বুঝালে শ্যামলী হয়ত কিছুক্ষন মানে কিন্তু পরক্ষনেই তথৈবচ । ফিরতে দেরী হলে শৈলেশের প্রতীক্ষায় না খেয়ে ঠাঁই দাড়িয়ে থাকে শ্যামলী । যখন শৈলেশ নিত্য অভ্যেস মতো গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে আসে , শ্যামলী অভিমানে মুখ লাল করে ঘরে ডুকে পড়ে । অগত্যা শৈলেশকেই শ্যামলীর অভিমান ভাঙাতে হয় । কখনো কখনো ছোট্র শিশুদের মতো উভয়ের মধ্যে ঝগড়া ও হয়ে যায় । তবে উভয়েরই একটা গুন আছে , রাগ করে বেশীক্ষন থাকতে পারে না । অভিমান পালার পরই দেখা যায় মিলিত কণ্ঠে গান অমাবস্যার আধারকে ও স্তম্ভিত করে দেয় । এই তো শৈলেশ শ্যামলীর জীবন । এ যেন সবুজ পাহাড়ে ভালবাসার আকা ছবি । মা, বাবার এই মিলন আনন্দ বণনীকে সবসময় আনন্দিত করে রাখে । প্রকৃতির কোলে মা - বাবার ভালবাসায় বণানী বড় হতে থাকে । ক্রমে বণানী পাহাড় ঘেষা, অরন্য ঘেরা গ্রামের পাঠশালায় যেতে শুরু করে । মা , বাবাার শেখানো শিক্ষা , সংস্কৃতিতে গড়া বণানী সবার নজর কাড়ে । শৈলেশ গরীব কিন্তু কর্মঠ । কঠোর পরিশ্রমী, কিন্তু তার মধ্যে শৈলেশ , শ্যামলীদের দিন কেটে যাচ্ছে বণানীকে নিয়ে আনন্দে আনন্দে পাহাড়ী ঝঁণার জলের গতিতে । বাগানের ফল ফুলের মত তাদের জীবন ছিল সুগন্ধিময় । বাস্তুভিটা ছিল না শৈলেশের , মাতৃপিতৃহীন শৈলেশ দাঙ্গায় বিধ্বস্ত হয়ে ওপার থেকে এসেছে , কায়ক্লেশে , নিজের চেষ্টায় একটা ঠিকানা ও তৈরী করেছে । এতো ব্যাস্ত মানুষ শৈলেশ , মহল্লাতে গিয়ে কখনো

আড্ডা গপ্প মারার ফুরসৎ ও পায় নি । নদীর স্রোতের মত জীবন চলে যায় তবে রুপ পাল্টায়· বিধ্বংসী ঝড় তুফানের মোকাবেলা করে স্বজন হত্যার বিয়োগ চেপে রেখে সাজিয়েছে নতুন ঘর অবশ্যই শ্যামলীর মানষিক অনুপ্রেরণায় । গ্রামের মানুষ শ্যামলী ও বণানীকে খুব ভালবাসে । এরই মধ্যে শৈলেশ বুঝতে পারত আকাশে কালো মেঘ আস্তে আস্তে জমছে তবে সে গুরুত্ব দেয়নি ভাবতো আমার শত্রুকে? একদিন খুব সকালে আগ্নেয়াস্ত্রধারী ৪ জন যুবক শৈলেশের বাড়ী আসে বলে অদূরে কমান্ডার আছে , তোকে ডাকছে । শ্যামলী কেঁদে উঠে শৈলেশ বলে আমার কোন শত্রু নেই তুমি মিছিমিছি কাঁদছ । শৈলেশ গন্তব্যস্থলে যাই , কমান্ডারের হুকুম তোকে এ মাটি ছেড়ে স্থায়ী ভাবে চলে যেতে হবে । এ - মাটি তোর নয় ।

শৈলেশ এ কথা শুনেই উদ্বিগ্ন মনে হতাশাচ্ছন্ন হয়ে স্মৃতির রোমন্থন করে মনে মনে ভাবে আমার জীবন ছিল শস্য শ্যামলা গৃহস্থ বাড়ীর , গোলাভরা ধান ছিল , পুকুর ভরা মাছ , ঘরে দুধ ছিল নদী , সমুদ্রের ঘেরা ছিল তার দেশ, কিশোর ছিল আনন্দের গতিতে ছন্দময় । স্কুলের পড়াশুনা , খোলামাঠে খেলাধুলা । মা , বাবা আত্মীয় পরিজনের অফুরন্ত ভালবাসা । ভাবে শ্যামলীর মতো , আমার মা ও বাবার জন্য প্রতীক্ষা করতো । কোথায় আমার সেই শৈশব , কৈশোর । হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল,শৈলেশের বাবাও বাইরে যেতো না , মা বারণ করতো ভাই বোনদের যেন বাইরে না যায়। দ্রুত পাল্টে গেল পরিস্থিতি মানুষে মানুষে , হিংসা বিদ্বেষ , জন্ম নিল । কাছের মানুষ দূরে চলে গেল। একদিন মাঝ রাত্তিরে শুরু হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা । এক রাত্তিরে সাম্প্রদায়িক দ্যসুরা আক্রমন করল শৈলেশের পরিজনকে , খুন হয়ে গেল শৈলেশের জীবনের স্বপ্ন , সাথে নিয়ে গেল মা , বাবা , দু- ভাই একবোনের প্রান । ওরা লুট করে নিল সমস্ত ঘর , জ্বালিয়ে দিল ঘরদোর , পুড়ে ছাই হয়ে গেলো বোবা প্রানীগুলো ও প্রান ভয়ে একা শৈলেশ পুকুরে কচুরীপানার ঘন ডিপোতে লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখল । কিন্তু বলবে কাকে ? এই ভাবেই একান্ত স্বজন বিয়োগ ও বিতাড়িত শৈলেশ , একদল গৃহহীন মানুষের সাথে গভীর বেদনা বুকে সীমান্ত পার হয়ে ঢুকে পড়ে । পুনরায় যে যার পথে এক বিন্দু এক বিন্দু করে সব কিছু ভুলে পুনরায় গড়েছিল শৈলেশ পাহাড়ী জনপদে ছন্দের নীড়। কিন্তু পুনরায় বিতাড়িত হওয়ার হুমকি শৈলেশকে মনে করিয়ে দেয় কিভাবে দাঙ্গায় , মা, বাবাকে তার হারাতে হয়েছিল । সেই ভয়াঙ্কর রাত্রির কথা মনে পড়তেই শৈলেশের দু - চোখ গড়িয়ে জল নামতে থাকে । এখন কি করা যায় ভাবতে ভাবতে শৈলেশ গহন অরন্যের পথে পাহাড় ঝর্নার কাছে গিয়ে বসে । পাহাড়ী ঝর্নার জল ছন্দবিহীন ভাবে গড়িয়ে নামতে থাকে । শৈলেশ ও ভাবে জীবন পুনরায় গতিবিহীন হয়ে গেছে । চোখে মুখে ভেসে আসে সেই পিছে ফেলে আসা বাল্য জীবন । ভাবনার গতিহীন , পাহাড় ঝর্নার জল বয়ে যায় । ঘরে শৈলেশের একান্ত আপন স্ত্রী শ্যামলী প্রানপ্রিয় কন্যা

বণানীকে রেখেই নির্জ্জন অরণ্যে রাত পাখীর ডাকে , প্রকৃতির অরণ্য ঘেরা বাতাসে রাত ফুরিয়ে যায়। ঘুমন্ত কন্যাকে বুকে নিয়ে শ্যামলী দুঃশ্চিন্তা উৎকন্টার রাত জাগে । তার প্রান পুরুষ জানি কোথায় আছে কিভাবে আছে হঠাৎ যেন রাত ফুরিয়ে ভোরের পাখী এসে শৈলেশকে বলে গেল কেন মিছিমিছি বসে আছিস্ । তোর স্ত্রী , কন্যা কি অন্যায় করেছে । যেখানে খুশী সেখানে চলে যা কিন্তু তোর স্ত্রী , কন্যা কি অন্যায় করেছে । তাদেরকে নিয়ে দ্রুত পালা । বিষন্নতা মুখে , হতাশা বুকে নিয়েই সকালে শৈলেশ ঘরে ফিরে আসে । বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে শ্যামলী স্বামীকে দেখে গুঁমরে কেঁদে উঠে, বলে আমি তোমাই দেখছি তো। তুমি সুস্থ আছো কিনা , ওরা তোমাই মেরেছে নাকি । উত্তরবিহীন শৈলেশ পাথরের মতো ঠাঁই দাড়িয়ে , শিশুকন্যা দৌড়ে এসে বাবার পায়ে জড়িয়ে ধরে , এবার শৈলেশের বাধন ভাঙ্গা কান্না শুনে উপজাতি মহল্লায় নারী পুরুষ ছুটে আসে । সবাই ভাবে এই নিরপরাধ মানুষটি কেন কাঁদছে । উত্তরে শৈলেশ বলে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে । পুনরায় শ্যামলী প্রশ্ন করে আমরা কোথায় যাবো , শৈলেশ নিরুত্তর । অবুঝ বলে উঠে বাবা আমরা কি আরো সুন্দর বাড়ীতে যাবো । শৈলেশের বুক ফাটা কান্না কে শোনে । ফুলের গাছ বলে উঠে , তোমাকে যেতে হবে না । সবুজ বণানী বলে উঠে তুমি এখানে থাকো , যে পাখী মধুর স্বরে গান গাইতো , তারা র্ককশ স্বরে বলে উঠে কোথায় যাবি আমাদের ছেড়ে । উপজাতি মহল্লায় লোক বলে উঠে শৈলেশদা আমাদের ছেড়ে কোথাই যাবে । তুমি যেও না , সব ঠিক হয়ে যাবে । আমরা তোমার সাথে আছি । গ্রামের উপজাতিয় লোকেরা বসে স্থির করলো শৈলেশকে যেতে দেবে না । গ্রামের মোড়ল সব ব্যাবস্থা করবে । সবাই মিলে দায়িত্ব সঁপে দিল উপজাতি গ্রামের মাঝ বয়সী সর্দ্দার শম্ভুদার হাতে । পরদিন ভরদুপুরে শম্ভু গ্রামের গুটি কয়েক যুবক নিয়ে রওয়ানা হলো তথাকথিত স্বঘোষিত কমান্ডারের কাছে । দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা শম্ভুদা এলো না সাথী ও কেহ এল না , শৈলেশের বাড়ীতে গ্রামের লোকের ভীড় । পরদিন সকালে শম্ভুদা এলেন ছেলেদেরকে নিয়ে । শম্ভুদা ও সহজ সরল প্রকৃতির লোক । শম্ভুদা ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন বললেন ভাই শৈলেশ আমাকে ক্ষমা করো ওরা মানল না । তোমাকে বাঁচানোই হয়তো আমাদের মুস্কিল হবে । পরদিন পুনরায় আগ্নেয়াস্ত্রধারী ৪/৫ জন যুবক শৈলেশের বাড়ীতে ডুকে পড়ে এমনিতেই তিন চারদিন যাবৎ শৈলেশের উনুন জ্বলে না । বাড়ীর সবাই যেন জীবন্ত শব , তার মাঝে পুনরায় আগ্নেয়াস্ত্রধারী দ্যসুদের আগমন । মহল্লার নারী পুরুষ ছুটে আসে শৈলেশ ও তার পরিবারের লোকজনদের প্রাণভিক্ষা চায় অনেক কাকুতি মিনতির পর শৈলেশ ও তার স্ত্রী কন্যার প্রাণভিক্ষা তো মিলল বটে কিন্তু বলে গেল সূর্যাস্তের আগে যদি শৈলেশ এ মাটি না ছেড়ে যায় তবে তার গোটা পরিবারের মৃত্যুদন্ড । কোথায় যাবে শৈলেশ । কোথাও যে তার ঠাঁই নেই । কে দেবে শিশুকন্যার মুখে ভাত । জবাবহীন শৈলৈশ মৃত্যুভয়শূন্য হয়ে

ঠাই দাড়িয়ে । শ্যামলী বলে উঠে আমরা কোথায় যাব , আমাদের যে কেউ নেই , কিছু নেই । তার মাঝে নিরপরাধী বণানীর কথা ভেবে বাকশূন্য শৈলেশ স্ত্রী শ্যামলীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে । অশ্রুসিক্ত নয়নে মহল্লায় আবাল , বৃদ্ধ বনিতা শৈলেশকে বিদায় দেয় । বারংবার বারণ করে সবুজ গাছগুলো , বনের পাখী গুলো , ওরা ভাবে মুক্ত দুনিয়ায় । এ আবার কিসের হুমকী । মানুষ কি তাহলে সিংস্র পশু থেকে ও হিংস্র । এখন এতসব ভাবার সময় শৈলেশের নয় । নির্ঝুম রাতে স্ত্রী কন্যা নিয়ে শৈলেশ পাড়ি দেয় অজানা পথের উদ্দেশ্যে । পিতৃভুমি ও আজ শৈলেশের পরদেশ তার মাঝেও বাধা কাটাতার আর সান্ত্রী । তাহলে যাবো কোথায় ভাবতে ভাবতে শৈলেশ এদিক ওদিক তাকায় , দেখে সীমাহীন অন্ধকার নেমে গেছে তার জীবনে । ভাবে তার বাড়ীর ফুলগুলো বলে তুমি ফিরে না আসলে আমরা আর ফুটবো না । পাখীগুলো বলে তুমি ফিরে না আসলে আমরা আর গান গাইব না । এতসবের মাঝে শৈলেশের মনে একটাই প্রশ্ন , আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি , স্ত্রী কন্যা নিয়ে আমার ঠাঁই কোথায় , কি হবে আমার নতুন ঠিকানা আর নতুন পরিচয় । আমার জন্য কি কোথাও কোন মাটি আছে । শৈলেশের শৈশব , কৈশোর যেখানে কেটেছে সেখানেও তার স্থান নেই । নিজের ভূ - খন্ড থেকে ছিটকে যাওয়া শৈলেশের সম্বল শুধু স্ত্রী ও কন্যা । বাল্যকালের দেশ এখন প্রাচীর দিয়ে ঘেরা স্বদেশ আজ তার কাছে বিদেশ । নিষেধ আছে এপার ওপারের লঙ্ঘন করলেই অপরাধ , দন্ড পেতে হবে । ভাবতে ভাবতে স্ত্রী কন্যা নিয়ে ঠাঁই দাঁড়িয়ে শৈলেশ জনমানুষহীন হাহাকার অন্ধকারময় কোন মৃত প্রান্তরে । দাড়িয়ে থাকলে চলবে না শৈলেশের কারণ তার সাথে আছে স্ত্রী শ্যামলী কন্যা বণানী। মধ্যরাত্রির হিমেল বাতাস ক্ষিদে পেটে শৈলেশের হাতে ধরে চলছে দুটো প্রাণ একটুকরো মাটির সন্ধানে ।

আদর্শ মা

ছনের তৈরী চাল , বাঁশের তৈরী দরজা , চারদিকে মুলি বাঁশের আচ্ছাদন দিয়ে তৈরী বেঁড়ার ঘর । এই ঘরই ছিল চারুবালা ও কৃষ্ণপদের সুখের নীড় । এক কন্যা , এক পুত্রের জননী , মেয়ের গায়ের রং ফর্সা বলে কৃষ্ণপদ মেয়ের নাম রাখে জ্যোস্না আর ছেলেটির গায়ের রং শ্যামলা বলে ছেলের নাম রাখে শ্যামাপদ । মেয়ের বয়স ৮ বৎসর গ্রামের পাঠশালায় ক্লাস টু -তে পড়ে আবেরু ছেলে মায়ের বুকে , বয়স ছ - মাস হবে । কৃষ্ণপদ সুঠাম দেহের যুবক মাটির কাজ করে । গতর খেটে কোনদিন শ দেড়শ টাকা রোজগার হয় । স্ত্রী ছেলে পুলে নিয়ে ভালই চলছে । ঘরে বৈদ্যুতিক বাতি নেই কিন্তু পূর্ণিমা রাতে বেঁড়ার ফাঁক দিয়ে আলোর চ্ছ - টা আলোকিত করে তুলে যদিও অমাবস্যা রাতে ঘর তমসাবৃত হয় । কিন্তু বছর গড়িয়ে গেছে ঘরের আর কোন মেরামতি হয় না , তাই বৃষ্টি আসলেই চারুবালার দুর্ভাবনা শুরু হয় , কারণ ঘর কর্দমাক্ত হয়ে যাবে দু-টো সন্তান নিয়ে যাবে কোথায় ?

চারুবালার এ পরিনতির জন্য দায়ী কে ? চারুবালা , ভাগ্যের দোষ দেয় । একদিন খুব সকালে কৃষ্ণপদ ঘুম থেকে উঠে কাজে যাওয়া জন্য , বারটি ছিল রবিবার । চারুবালা প্রতিদিনের মত স্বামীকে বলে পান্তাভাত আছে খেয়ে যাও তো ! কৃষ্ণপদ বলে না - আজ ভাত খাবো না , দুপুরে এসে ভাত

খেয়ে তোমাকে নিয়ে সিনেমায় যাবো । আজ রবিবার তাড়াতাড়ি এসে পড়বো , তুমি তৈরী হয়ে থেকো । শুনে চারুবালা খুশীতে আটখাট দুপুরের আগেই ছেলেমেয়েকে খাওয়া দাওয়া করিয়ে নিজে সেঁজে গুঁজে তৈরী, ভাবনা কৃষ্ণপদ এলে দু জনে খেয়ে দেয়ে একসাথে শহরে সিনেমায় যাবে । আরো কত কল্পনা কারণ চারুবালা বিয়ের পর কখনো হলে সিনেমা দেখেনি । দুপুর গড়িয়ে বিকেল , তারপর সন্ধ্যে, চারুবালা প্রচন্ড বিরক্ত কৃষ্ণপদের উপর , ক্রমে রাত্রি ,না কৃষ্ণপদ এলো না । আশে পাশে খোঁজ খবর নিল কিন্তু কৃষ্ণপদের কোন খবর পেলো না । খানিকটা দূরে নীতিন বাবুর বাড়ী। ঘরে টর্চ নেই কিভাবে যাবে চারু কৃষ্ণপদের খবর নিতে, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দু -সন্তানকে ঘরে রেখে সাহসে ভর করে গভীর রাতে চারু নীতেন বাবুর বাড়ী পৌছে , জিজ্ঞেস করে জ্যাঠামশাই বাড়িতে আছেন কি ? নীতেনবাবুদের সাথে চারুদের ছোটবেলার সর্ম্পক । চারুর মা নীতেনবাবুদের বাড়ীতে ঝি - এর কাজ করতো । নীতেনবাবু বয়স্ক লোক ছেলেপুলেরা ও বড় হয়ে এখানে ওখানে চাকুরী করে । বয়োবৃদ্ধ নীতিনবাবু চারুকে চিনতে পারে বলে । উঠে তুই এত রাত্তিরে কেন এলি । কি হয়েছে বল । চারু কেঁদে উঠে বলে জ্যাঠামশাই আপনাদের জামাই দুপুরে আসবে বলে সকালে কাজে গেছে এখনো আসে নি । নীতিনবাবু বলে ও মা তা কি ? তার জন্য কাঁদবি কেন । হয়তো কোন বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে কারো বাড়ী গেছে । তাতে ভয় কিসের ? চারু বলে না জ্যাঠামশাই সে কখনো আমাকে না বলে কোথাও থাকে না যত দেরী হোক ঘরে ফিরে আসবেই । নীতিনবাবু বলে উঠেন তুই মিছিমিছি ভাবছিস এখন ঘরে যা , সকাল হতেই দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে । সান্তনা পেয়ে চারু ঘরে ফিরে আসে কিন্তু ঘুমহীন চোখে উৎকন্ঠার রাত্র কাটায় ।

পরদিন সকালে ওঠে নীতিনবাবু চায়ের কাপ হাতে খবরের কাগজ নিয়ে বসেন । দেখতে পান গতকাল মাটি কাটতে গিয়ে মাটির ধস্ চাপা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু । মৃতদেহ শনাক্ত হয়নি । দেহ হাসপাতাল মর্গে শায়িত আছে আগের দিন রাত্রের চারুর উৎকন্ঠা , সকালের খবরের কাগজে যুবকের মৃত্যু নীতেনবাবুকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয় আর একটি কথাই বার বার নীতেনবাবুর মনে পড়ে চারু বলেছে সে কখনো বাইরে থাকে না । যাক গে যতসব বাজে চিন্তা । এত ভাবার কি দরকার চারুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি না কেন ? এ ভেবে নীতেনবাবু আস্তে আস্তে চারুর বাড়ীতে আসে । দেখে কোলের বাচ্চাটি ঘরের ভেতর চিৎকার দিয়ে কাঁদছে । ছোট মেয়েটি ভাই এর কাছে ঠাঁই বসে কিন্তু ঘরে চারু নেই । নীতেনবাবু দাঁড়িয়ে থাকতেই চারু উন্মাদনীর মতো নীতেনবাবুর সামনে হাজির । বলে উঠে জ্যাঠামশাই ওতো এখনও এলো না ততক্ষনে নীতেনবাবু ও এক অজানা আশংঙ্কায় পড়ে গেলেন , পাশের বাড়ীর বাবুলের মাকে নীতেনবাবু ডেকে পাঠালেন বললেন ছেলেমেয়েদের একটু দেখো আমি চারুকে নিয়ে শহরের দিকে যাচ্ছি দেখি কৃষ্ণের খোঁজ পাওয়া যায় কিনা ?

খবরের কাগজের ঠিকানা ধরে নীতেনবাবু চারুকে নিয়ে সোজা পৌঁছে গেলেন হাসপাতালের মর্গে , চারু প্রশ্ন করে উঠে জ্যাঠামশায় এখানে এলেন কেন ? নিরুত্তর নীতেনবাবু মর্গের সামনে পৌছে উর্দ্দি পরিহিত এক পুলিশকে দেখে জিজ্ঞ্যেস করলেন এখানে কি মাটির চাপা পড়া কোন লাস আছে কি না ? দূর থেকে চারুর মনে হতে লাগল কোন অশুভ সংকেত । পুলিশ মশাই বলে উঠলেন আমি দরজা খুলে দিচ্ছি দেখুনা - না । পুলিশ যখন দরজা খুলল নীতেনবাবু চারুকে নিয়ে মর্গে দেখতে পেল সবাংগে লালমাটি এক সুঠাম দেহের যুবক প্রায় চ্যাপ্টা হয়ে গেছে , কাছে গিয়ে দেখেই চারুর গগন ভেদী চিৎকার । সেইদিনই চারুর সিঁথির সিঁদুর হাতের শাখা চারু থেকে বিদায় নিয়েছে এক মুহূর্ত আগে ও চারু তা জানত না বরংচ কৃষ্ণপদের উপর রেগে ছিল সে থেকে আজ অব্দি চারুর ঘর আর মেরামত হয়নি । যাইহোক দয়ালু নীতেনবাবুর অসীম দয়ায় চারু স্বামীর শ্রাদ্ধ শান্তি তো করলো বটে কিন্তু কে কতদিন কার সংসার দেখে রাখে । কৃষ্ণপদের কাছে জমানো দু চারটে টাকা ছিলো কিন্তু কোথায় রেখেছে তা চারুর জানা নেই । চলতে থাকে সংসারের দৈন্যদশা । কিন্তু মুখবুঁজে ঘরে বসে থাকলে চলবে না চারুর কারণ দু সন্তানের মুখে ভাত দিতে হবে । ঘুরতে ঘুরতে পুনরায় নীতেনবাবুর দয়ায় চারু শহরে নীতেনবাবুর পরিচিত এক বাড়ীতে ঝি - এর কাজ যোগাড় করে । বিদুৎবাতি বিহীন, ঘরে চারু রাত্তিরে ভোরের প্রহর গোনে । কখনো ফাঁকে চালের উপর দিয়ে চাঁদ দেখে । কিংবা রাতজাগা পেঁচার ভুতুড়ে ডাক ওর কলজের মধ্যে আছাড় খায় । তখন ঘুম ঘুম চোখ। তবে বাদলার রাতটা চারুকে খুব জ্বালায় , ভাঙ্গা ছনের ছাদ গড়িয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে ঘরটা তখন কাদায় কাদায় ভরে যায় । সেই কাদার মধ্যে ভুঁই ফুড়ে কেঁচো ওঠে , তখন চারু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে । বৃষ্টি শেষে শেষ রাত্তিরে ভোরের পাখীর কিচির মিচির ডাক ও চারুকে সাড়া জাগাতে পারে না । কিন্তু সন্তানের জন্য উঠতে তাকে হবেই চোখ কচলে উঠে , বাচ্চা দু -টোকে পান্তা খাইয়ে সকালেই তাকে বাস ধরে যেতে হবে শহরে ঝি এর কাজ করতে । কখনো বর্ষার ভোরে কর্দমাক্ত ঘরে এককোনে চারু, বুকের ওপর শুয়ে রয়েছে অবুঝ ছেলেটি । বৃষ্টির পর জোছনায় ফেটে পড়েছে আকাশ । চারদিকের খোলা জগৎ দিয়ে আলো ঠিকরে পড়েছে ঘরে । কোলের কচিশিশুটি চুক চুক করে দুধ চটছে । দুশ্চিন্তায় চারুর চোখের নীচে কালো দাগ পড়ে গেছে । চারুর ঘরের সামনে দিয়ে গ্রামের রাস্তা । রাতে বিরেতে মদ্যপ ,বদমাস্‌রা কত ধরণের হিচকী মেরে যায় । এত যন্ত্রনার মাঝেও তোয়াক্কা না করে চলছে চারু । কখনোও মাঝরাতে দরজায় ধাক্কা আরো কত কি ? একদিন গভীর রাতে দরজার বাইরে ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ শুনে চারু । বাচ্চারা ঘুমিয়ে ,হঠাৎ চারুর ঘুম ভাঙ্গে । চারু বলে কে ? দরজার বাইরে থেকে নানাহ্‌ লোভ দেখায় চারুকে । চারু নিরুত্তর থাকে কিন্তু বুঝতে পারে এই লোকটি গ্রামের ষন্ডা মাধব । দু - দিন বাদে পুনরায় একই দৃশ্য । সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে এমনিতেই

ক্লান্ত তার উপর যখন অমনভাবে উত্যক্ত করে সহ্য করতে না পেরে চারু ঝাঁঝাল গলায় বলে তুই কে ? তারপরে ও যখন দরজার ওপার থেকে নোংরা খিস্তি দেয় রাগে খেন্নায় কান্না পায়। চারু বিছানা থেকে তেড়েয়ে ওঠে বলে তোর জেলে যাবার ইচ্ছে হয়েছে নাকি এবং ঘরের ঝাঁটা নিয়ে দরজা খুলে তেড়ে যায়, মাধব পালাই ।

দু-দিন যেতে না যেতেই লাজলজ্জার মাথা খেয়ে মাধব ফের রাত্তিরে চারুর দরজায় আসে ।

চারু চেঁচিয়ে বলে তুই মর ,মর , তোর মরার জন্য গলায় দড়ি জোটেনি ? ঘরে উপযুক্ত বউরেখে লজ্জা লাগে না । চারুর রুদ্রমূর্তি কোন প্রকারে বদমাস্ থেকে নিজেকে আপাতত মুক্ত করল কিন্তু চারুর সবসময় যেন ভয় ভয় ।

শহর থেকে কাজ সেড়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায় তারপর সন্তানদের নিয়ে খাওয়া দাওয়া করে বিছানায় । এ যেন নিত্য রুটিন ।

খুব ভোরে উঠে চারু কেরোসিন কুপিটা জ্বেলে দাওয়ার ওপর রেখে উঠোনে গোবর ছিটিয়ে দেয় । গোবর জলে ঘর, দাওয়া নিকোয় । তারপর জ্বলন্ত কুপি হাতে পাশের বাড়ীর পুকুরে যায় নাইতে । কখনো হাওয়ার দাপটে কুপি যায় নিভে । চারু ভাবে সাপের ভয় মানুষেরও ভয় । চারুর জন্য উভয়েই সমান বিষাক্ত । দ্রুত পুকুর থেকে নাইয়ে ঘরে ফিরে উনুন ধরিয়ে দু মুঠো চাল ফুটিয়ে রাখে নিজের কচি কাঁচাদের জন্য । নিজে আগের রাতের পান্তা নুন দিয়ে গো গ্রাসে গিলে রওয়ানা দেয় বাস স্ট্যান্ডের দিকে । ৮ বছরের মেয়ে জোৎস্না ছোট ভাইকে সামলে রাখে মা আসা অব্দি । সরাদিন শহরে গতর খাটে কিন্তু চিন্তা থাকে সন্তানদের জন্য । কারণ ছেলে শ্যামু এক - পা দু-পা করে হাটতে পারে , কোথাও পড়ে গেল নাকি ? সাপে কাটবে না কুকুরে? মেয়েটা তো ছোট ভাইকে আগলে রাখতে পারবে কিনা ? এসব দুশ্চিন্তা নিয়েই চারুকে কাজ করতে হয় । ৮ বছরের মেয়ে সেও তো দুধের শিশু । সে ভাবে বাবুদের ঘরের ৮ বছরের শিশুতো আদরে আদরে থাকে কিন্তু আমার মেয়ে তো পিতাহীনা গরীব মায়ের মেয়ে কোথায় পাবে সে আদর ?

কাজ সেরে চারু বাস গাড়ীতে করে আসতে আসতে ভাবে আমার জ্যোস্নাও কি আমার মতো বাবুদের বাড়ী কাজ করতে যাবে ? নাকি তার জীবনটা ও আমার মতো হয় । আমার মেয়েটা কি কষ্ট থেকে রেহাই পাবে ?

গাড়ী রাস্তার বিকল হওয়াতে চারুর বিলম্ব ঘটে যায় , গাড়ী থেকে নেমে সোজা গায়ের রাস্তা ধরে বাড়ীর উদ্দেশ্যে কিন্তু ঘন অন্ধকার যেন গাছ গাছালির মধ্যে লেপটে রয়েছে । ঝোপঝাড় থেকে শেয়াল ডাকছে । চারুর বুক দুরু দুরু । চলতে চলতে হঠাৎ কি যেন একটা ঠান্ডা স্রোত নিয়ে সড়াৎ করে চারুর পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল । চারু বুঝতে পারল সাপ চলে গেছে কিন্তু হাতে টর্চ নেই।

প্রতি মাসে ভাবে টর্চ কিনবে কিন্তু অনটন সব সামলিয়ে টর্চ আর তার কেনা হয় না । একটু এগোতেই চারুর মনে হল পেছনে যেন কার পায়ের শব্দ , চারু শিউরে উঠল । হঠাৎ চারুর পাশ কাটিয়ে চারুকে প্রায় ধাক্কা মেরে চলে গেল এক ষন্ডামার্কা লোক । তার একটু পরেই আবার আর এক -জন । কিছুক্ষন বাদে ষন্ডা মার্কা লোক দুটো আবার ঘুরে দাড়াঁয় , চারু যত সরে যায় , ততই তারা গায়ের উপর এসে পড়ে নির্জন রাস্তায় , একসময় চারুকে ঝাপটে ধরতে ছুটে আসে। চারু চেঁচিয়ে উঠে কে আছেন বাঁচন । গায়ের লোকের শব্দ শুনে ষন্ডা লোক দুটো কেটে পড়ে । চারু হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ছুটে যায় বাঁচার তাগিদে রাতে বিরেতে হাঁটতে হাঁটতে চারু ভাবে বিষধর সাপ আর হিংস্র মানুষগুলো দু - টোই আমার জন্য সমান । মায়ের ভয় দেখে কখনো চারুর সন্তানরা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে । হায় জীবন কত অসহায় ।

হঠাৎ একদিন বাসে চারুর সাথে দেখা ছোটবেলার এক বান্ধবীর । কথার মাঝেই বান্ধবী চারুকে বলে ওঠে তোর আর - ঝি এর কাজ করতে হবে না । আমার স্বামী নির্ম্মল আর আমি গ্রাম থেকে শব্জী এনে শহরে বিক্রি করি খুব ভাল লাভ হয়রে। তুই আমাদের সাথে আয় কাল থেকে তোকে চিন্তা করতে হবে না । ছোটবেলার বান্ধবী সন্ধ্যার কথা শুনে চারুর চোখমুখ খুশীতে নেচেওঠে । বলে ওঠে চারু , আমি রাজি , শুধু সন্ধ্যাকে বলে তোরা যদি মাঝ পথে আমাকে ছেড়ে দিস্ তা হলে আমাকে সন্তানদের নিয়ে না খেয়ে মরতে হবে । কারণ তখন আর ঝি এর কাজও পাবো না । সন্ধ্যা চারুর মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে বলে নারে না তোকে আমরা কখনো বিপদে ফেলবো না ।

আমার স্বামী নির্ম্মল খুব ভালো মানুষরে খুবই সংসারী । এ কথা শুনে চারুর ভেতর গুঁমরে কেঁদে ওঠে ভাবে আমার কৃষ্ণপদ তো কত ভাল মানুষ ছিল , কিন্তু এখন ভেবে কি হবে? ভাবলে সংসার বাঁচবে না ।

বান্ধবীর হাত ধরে চারু শুরু করে শব্জী ব্যাবসা কঠোর পরিশ্রমে চারু দু- চারটে পয়সা রোজগার শুরু করে , বাচ্চাদের পড়াশুনা শুরু করায় । চারু গৃহ দেবতার কাছে প্রার্থনা করে বলে হে বিধাতা কোন মেয়ের জীবন যেন আমার মতো না হয় আর আমি যেন কখনো পাল্টে না যাই ।

জীবন মরুভূমির কালো রাস্তা

আদর , স্নেহ , ভালবাসা সবই যেন ক্ষণস্থায়ী আর গোপনে একটা বাস্তব সত্য লুকিয়ে আছে বিনিময় । বিনিময়বিহীন ভালবাসা খুবই কম , মুলত ঠুনকো বলেই মনে হয় ।

মা ,বাবা আর আমরা দু বোন এই ছিল আমাদের সংসার । দিদিকে বাবা আদর করে সোনা বলে ডাকত তবে আমার দিদির নাম সোনালী রায় চৌধুরী । আমি ছোট মেয়ে বলে একটু বেশী আদর পেতাম । তার উপরো বেশী আদরে আমার দুষ্টমির সীমা ও ছিল বাঁধনহীন । আমার দিদি শান্ত স্বভাবের, পড়াশুনায়ও বরাবর সিরিয়াস । আমার শত যন্ত্রনাতেও কখনো রাগ করতো না । আমার রূপালী নামকে ছোট করে মা বাবা দিদি রূপা বলে ডাকতো । তাতেও ছিল আমার উজোর আপত্তি। দিদি বুঝি সোন হল আর আমি হলাম রূপো তখন বাবা বলতো না রে তোকে তাহলে আমি মুক্তো বলে ডাকবো ।

আমার বাবা দীপঙ্কর রায় চৌধুরী সমাজে প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনীয়ার তবে মা কিন্তু গৃহীনি । যার দরুন মাকে আমরা বরাবরই পাশে পেতাম । এক কথায় মা আমাদের বন্ধুর মতোই ছিলেন । যত রাগ , আনন্দ , আবদার সবই যেন মার কাছে । কাক ডাকা ভোরে প্রতিদিন আমার মা উঠে পড়ে । শুরু হয়ে যায় মায়ের কাজ, সরলস্বভাবা আমার মা যেন আমাদেরকে ভালো করে খাওয়ানো , আদর এবং পরিবারের সবার আনন্দেই নিজেকে আনন্দিত করে তুলতেন । বাবার পোষ্টিং প্রায়শই মফস্বলের থাকত তাই বাবার সাথে সবসময় সবকিছু বলার সুযোগ হতো না । বাবা সত্যিই কর্মব্যস্ত মানুষ , যার দরুণ আমার বাবার বেশ সুনামও ছিল । সত্যিই আমার মা আমাদের জন্য জগৎমাতা । আমাদের বাড়ী , এলাকার বেশ পুরনো বাড়ী । দাদুর আমলের , নতুনত্বের কোন চাকচিক্য নেই ফ্লোর পাকা মজবুত ঘর দুটি , পাশেই বারান্দা সহ মস্তবড় রান্নাঘর একটু দুরেই কল এবং বাড়ীর পেছনে পুরনো ঘাটবাধানো পুকুর । পুকুর পাড়ে সারি সারি নারকেল ও সুপারী গাছ । তবে সত্যি হলো বাবা পুরানো বাড়ীটাকে বেশ যত্ন করে রেখেছে , বাড়ীতে আসলে আমার বাবা অবসর বসে থাকতেন না সারাদিন

শুধু কাজ আর কাজ । ফুলের বাগান , পুরানো আম , কাঁঠাল , লিচু গাছ, পুকুর , সবমিলিয়ে যেন পুরানো হাভেলী । যেখানে যা দরকার তা যেন প্রকৃতির দেওয়া থরে থরে সাজানো ।'

আমার বাবা বাড়ীতে এলে আনন্দ হুলোড় শুরু হয়ে যেত । নিজের জীবনের ডিসিপ্লিন দিয়ে উনি ঘর সংসার সবটাকেই সাজিয়ে ছিলেন । তার মাঝে দুধে - আলতায় ফর্সা লক্ষীর মতো আমার মা মাথায় চওড়া সিঁদুর পড়ত । মোটের উপর আমাদের সংসার ছিল জমাটে । দিদি আমার থেকে চার বছরের বড় । দিদি সবসময় ভাল রেজাল্ট করতেন । দ্বাদশ মান পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে দিয়ে জয়েন্ট এ্যান্টান্স পরীক্ষায় পাশ করে চেন্নাইতে দিদি ডাক্তারী পড়তে যান , তখন বুঝতাম মা - বাবার কত ভাবনা , কত দুশ্চিন্তা , তখন আমি বলে ফেলতাম এতো দূরে গিয়ে পড়াশুনায় কি লাভ ? যাই হোক দুঃশ্চিন্তার উৎকন্টা মুক্ত করে আমার দিদি সোনালী এম . বি .বি. এস পাশ করে বাড়ীতে আসে এবং কিছুদিন বাদে পুনরায় দিদি চলে যান হায়ার ষ্টাডির জন্য আবার দু - বছর । ইত্যবসরে বাবা প্রমোশন পেয়ে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার হয়েছেন কিন্তু বাবা যেন একটু উদাসীন হয়ে আছেন, এ ভাবেই আমাদের সুখের সংসারে দিন কাটতে থাকে । একদিন বাবার কাছে দিদি চিঠি লিখে পাঠান বাবা তোমাকে আর চিন্তা করতে হবে না আমার রেজাল্ট হয়েছে এবং আরো সুখবর আমি চেন্নাইতে একটি বেসরকারী হাসপাতালে চাকুরী পেয়েছি । গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ীতে আসব । যাই হোক আমিও মোটামুটি ভাল রেজাল্ট করে উচ্চতর মাধ্যমিক পাশ করে বাবা বলেছিলো রূপা তুমি ইচ্ছে করলে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে পারো আমি পুনরায় দুষ্টমি করে বলে উঠি কেন পুনরায় আমি মুক্তো থেকে আবার রুপো হয়ে গেলাম । বাবা বলে উঠলো না , না তুমি আমার মুক্তো । সরি বাবা। আমি মাকে গিয়ে বলি মা দ্যাখো না দিদিকে বাইরে পাঠিয়ে বাবার চেহারা আর তোমার চেহারা কেমন হয়েছিল । আমি কিন্তু তোমাদের ফেলে দূরে পড়তে যাব না । আমি এখানেই পড়াশুনো করবো । প্রফেসর হবো ! মা বললো ঠিক আছে তোমার মনে যা ইচ্ছে হয় সেটা নিয়েই পড়ো । সন্ধ্যায় বাবা আমাকে ডাকেন বলে লক্ষী মা আমার কেন তুমি আমাকে বললে না । বাবা বললেন ঠিক আছে তোমার আইডিয়া ক্লীয়ার । তুমি অনার্স নিয়ে এম. বি.বি কলেজে ভর্ত্তি হয়ে যাও । তোমাকে কেউ রুখতে পারবে না । তুমি একদিন প্রফেসর হবেই । সেই মোতাবেক আমি এম.বি .বি কলেজে কেমিষ্ট্রিতে অনার্স নিয়ে ভর্ত্তি হয়ে যায়। গ্রীষ্মের ছুটিতে দিদি বাড়ীতে আসেন । বাড়ীতে প্রচন্ড আনন্দ। এই মাসেই আমাদের পাড়ার শিশির ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ছেলে রুপকদার বিয়ে এই বিয়েতে আমাদের পুরো বাড়ী আমন্ত্রিত । সেজে গুজে দু - বোন . মা বাবার সাথে বিয়ের বাড়ীতে যাই , বেশ আনন্দ করি । তবে বিয়ে বাড়ীতে হঠাৎ দেখি বাবা যেন কোথায় শিশির বাবুর সাথেই কথপোকথনে ব্যস্ত । অনেকক্ষন পর আমি ছুটে গিয়ে বাবাকে ডেকে নিয়ে আসি বলি আনন্দ করো । যাই হোক রাত দশটায় বিয়ে বাড়ী থেকে বাড়ী ফিরে আসি এবং দু - বোন মিলে কত গপ্পো । হঠাৎ দেখি মা বাবা

যেন খুব গভীর আলাপ আলোচনায় মত্ত । দিদিকে বলি চল্ চুপি করে দেখি তারা কি কথা বলে । দিদি বলে তুই বড় হয়েছিস্ দুষ্টমি বন্ধ করতো । এই সপ্তাহেই একদিন সকাল দশটায় একটি মারুতি ভ্যান আমাদের বাড়ীর সামনে এসে দাড়ায় দেখি শিশির বাবুর সাথে প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা আমাদের বাড়ীর দিকে ঢুকছে । দৌড়ে গিয়ে মাকে বলি , মা দেখো বাড়ীতে কে আসছে । বলা মাত্র মা দিদিকে অন্যঘরে নিয়ে যান বাবা আগন্তুক অতিথিদের আপায়ন করে ঘরে বসান । কি সমাদর অতিথিদের বলা বাহুল্য , এই প্রথম মাকে দেখলাম চোখ রাঙিয়ে আমাকে বলতে বাইরে কি ? ঘরে আস্ । মা দিদিকে নিমেষে সাজিয়ে নিল কারণ আমার দিদি এমনিতেই সুন্দর । তারপর অতিথিদের আপ্যায়ণ মিষ্টি মুখ এর মাঝেই হাতল ওয়ালা একটি চেয়ার তোয়াল দিয়ে সাজিয়ে মা আগন্তুক অতিথিদের সামনে এনে রাখলেন এবং দিদিকে এনে বসিয়ে দিলেন । আমি পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম যেন দিদি ইন্টারভ্যু বোর্ডর মুখোমুখি নতজানু শিশুর মতো । ভাবলাম আমার অতো স্মার্ট দিদি কি ভাবে এত সহজে সামাজিক অনুশাসনের সামনে ঝুকে পড়ল , তার অসামান্য আত্মমর্যাদা যেন অতিসহজে আত্মসমর্পিত । যাই হোক শিশির বাবুর সাথে আগন্তুকরা যে দিদির ভাগ্যনিয়ন্ত্রা হিসেবে এসেছে তা বুঝতে আমার দেরী হলো না । দিদি , মা বাবার খুবই অনুগত তাই মুখ খুলে কিছু বলতে কখনো ও শুনিনি , পরবর্ত্তীতে মা - বাবার কথাপোকথনে জানতে পারি আগন্তুক ভদ্রলোক হলেন সুনীল ব্যানার্জী ও মহিলা উনার স্ত্রী । দিদিকে দেখে খুশীতে আটখানা , পারলে তখনই বিয়ে ঠিক করে নেন কিন্তু বাবা বলেন মেয়েরও তো ছেলেকে দেখা জানা দরকার । ঠিক হলো উনাদের ছেলে এসে দিদিকে দেখবেন । জানতে পারলাম দিদির হবু বরের নাম অনুপম ব্যানার্জী । কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ার । ব্যাঙ্গালোরে মালটিন্যাশনাল কোম্পানীতে চাকুরী করে । যাই হোক বেশ ক্ দিন কেটে গেছে । দিদির ছুটিও প্রায় শেষ , দিদি চলে যাবে , মা বাবা ভারাক্রান্ত আমার মনে শুন্যতা । আমাদের পরিবারের উচাটন পরিস্থিতি সত্যি বলা দুস্কর । যা হোক দিদি যাওয়ার ৪/৫ দিন আগে হঠাৎ " শাহেনশা " পোযাক পরিহিত এক শাহেনশা - দুই বন্ধু সহ সকাল ১০ টায় বাড়ীতে উপস্থিত । মূহুর্তের মধ্যে উনার বাড়ীর মনে হয় কব্জা নিয়ে নিল । বাবা বাড়ীতে ছিলেন না , মা ছিলেন , আমি ছিলাম উনারা সবার সাথেই কথা বললেন , শাহেনশা নিজের পরিচয় দিলেন কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ার অনুপম ব্যানার্জী বলে । কিন্তু সত্যি আমার দিদির ব্যক্তিত্ব মানতে হবে । অতো হৈ হুল্লোড়ে ও নিজেকে ঠিক সবসময়ের মতোই ধরে রেখেছে । দু বন্ধু বলে উঠে অনু এখনই চল নিয়ে যায় .... কত ঠাট্টা মশকরা । যাই হোক ছুটি শেষ হলে দিদি চেন্নাই চলে যায় , আমার শুরু হয় কলেজ , বাবার অফিস্ মার নিত্যকর্ম । এভাবে ২/৩ মাস গড়িয়ে গেলো । একদিন দেখলাম বা বাবা রান্নাবান্না বিশাল আয়োজন । মা বললো তুমি কলেজেও যাও, বড়দের সবকিছু , এখনই তোমার বুঝতে হবে না বিধাতার

কি নিয়ম সেদিন কলেজে ক্লাশ হয়নি আন্তকলেজ ফুটবল প্রতিযোগীতার কারণে , অন্যদিকে আমারও কৌতুহল মন । দুপুরেই আমি বাড়ী ফিরে আসি । মা আমাকে দেখে প্রথমে একটু বিড়বিড় করে উঠে তারপর বুঝিয়ে যখন বলি তখন চুপ করে যান । দেখলাম শিশির কাকুর মধ্যস্থতায় শুধু কথাবার্তা চলছে । বেশ খাওয়া দাওয়া তারপরেই সবাই মিলে বারান্দায় বসে দিনক্ষণ ঠিক করতেই ব্যস্ত । মাঝে আছেন কুলপুরোহিত শশধর ঠাকুর । সন্ধ্যায় শুনলাম দিদির বিয়ে ঠিক হয়েছে বৈশাখ মাসের ১২ তারিখ । বেশ উলুধ্বনি সহকারে দিনক্ষণ পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্ব শেষ হলো । কিছুদিন বাদে বাবা চেন্নায় গেলেন ছুটি নিয়ে দিদিকে বাড়ী নিয়ে আসলেন । ঘটা করে জিনিসপত্র কিনা , গহনা কিনা , আরো কত কী যেন রাজসূয় যজ্ঞ । বড় মেয়ের বিয়ে বলে আমার বাবা দু- হাত উজোর করে খরচ করলেন। কিন্তু আমি বাবার গম্ভীর মুখকে আরো গম্ভীর দেখতে পেলাম , হাসি যেন বাবার মুখ থেকে সরে গেছে । বড় মেয়ের বিয়ে একদিকে বিশাল আনন্দ হয়তো অন্যদিকে মেয়ের জীবনের ভাবনা ভেবে প্রায়শই গোপনে গোপনে বাবা চোখের জল ফেলতেন । যাই হোক শুভ ঘড়ি শুভ সময় বৈশাখের ১২ তারিখ বিসমিল্লা খানের মায়াভরা বিসাদের সানাই আর আবেগ ভরা গানে বাড়ীটা যেন আনন্দে ও নিস্তব্দ , কত আমন্ত্রিত , আমার বন্ধু , বান্ধবীরা , পাড়া পড়শীরা , বরের যাত্রী আরো কত কী । বিয়ের মূলপর্বে হঠাৎ কোত্থকে যেন কাল বৈশাখীর ঝড়ের তান্ডব এসে যজ্ঞস্থল থেকে শুরু করে সাজানো বাড়ী নিমেষে লন্ডভন্ড করে দিল । বাবার মনে যেন অশিনী সংকেত বেজে উঠল । যাই হোক সবার সহযোগীতার মাধ্যমে বাকী কাজটুকু আমাদের বিশাল বারান্দার মধ্যেই হলো বরযাত্রী বিদায় , নিমন্ত্রিতদের বিদায় দিয়ে বাড়ীতে প্রায় ভোর হয়ে গেলো । পরবর্ত্তীতে রীতি অনুযায়ী নানাহ্ অনুষ্ঠান হলো বেশ জাকজমক ভাবে । বিয়ের পর প্রায় একমাস দিদি বাড়ীতে অর্থাৎ শ্বশুড় বাড়ীতে ছিলেন তার পরে দিদিও উনার বর কর্মস্থলে যোগ দিতে রওয়ানা এবং একসাথেই উভয়ে যান বাড়ীঘরের বড়দের আর্শীব্বাদ নিয়ে । আমারও শুরু হয় কলেজ । সেই পুরানো নিয়মবাধা জীবন । ভাবতেও পারিনি যে উজোর করে দিয়ে কর্পদ্দক বাবা শূন্য হয়ে গেছেন । যা হোক ভিন রাজ্যে দিদি কেমন আছেন তা তো বলা ভার সপ্তাহে ৩/৪ দিন হয়ত দিদি নয়তো বাবা টেলিফোন করতেন । মাঝে একদিন ব্যাঙ্গালোর থেকে টেলিফোন আসে দিদি প্রচন্ড অসুস্থ । শুনে বাবা যেন অস্থির হয়ে পড়েন তখন বুঝি বাবার আর্থিক শক্তি শুন্যের কোটায় । মায়ের বিয়ের জিনিষ বিক্রী করে আমার সৎ নিষ্ঠাবান কর্মচারী বাবা ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে ছুটেন। তখন বাবার চাকুরী মাত্র আর দু বছর আছে। ১৫/২০ দিন কাটিয়ে বাবা দিদিকে নিয়ে বাড়ীতে আসেন । তখন শুনতে পাই ভদ্রবেশী মুখের অন্তরালে দিদির বর অনুপম ব্যানার্জী কত বর্ব্বর , মদ্যপ , অসভ্য চরিত্রের লোক , দিদি রোজগারের পুরো অর্থ দিয়ে ও তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখতে পারেনি । সে পরকীয়া সম্পর্কে মত্ত , মদপ্য , দিদির উপর প্রায়শই শারীরিক মানষিক অত্যাচার করত । এমত অবস্থায় দিদি বাধ্য হয়ে স্বামীর কাছে ব্যাঙ্গালোর আসত না । কিন্তু তাতেও মুক্তি নেই । অনুপম চেন্নাই গিয়েও দিদিকে জ্বালাতন করত ,

বলত ওকে গাড়ী কিনে দিতে হবে , বাবার থেকে পয়সা আনতে । দিদি বাবার অবস্থা জানতো তবুও অনুপমকে খুশী করার জন্য দিদি লোন্ নিয়ে অনুপমকে গাড়ী কিনে দেয় যাতে বাবা কোনদিন কিছু না জানে মানষিক কষ্ট ও না পায় কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না । দিদি ভেবেছিল এখন হয়তো অনুপম খুশী হবে সেই ভেবে দিদি চেন্নাই থেকে ব্যাঙ্গাঁলোর স্বামীর কাছে আসে এবং অনুপে র ঘরে এক মহিলাকে দেখতে পায় এবং সেই মহিলা ও অনুপম উভয়েই মদমত্ত । দিদির ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে যায় । দিদি উত্তেজত হয়ে জিজ্ঞেস করলে অনুপম বলে এই মহিলা তার স্ত্রী । উত্তেজিত বাক্য বিনিময়ে হঠাৎ করে ওই মহিলা এবং অনুপম দিদিকে ধাক্কা দিয়ে দোতালা ঘর থেকে ফেলে দেয় । অজ্ঞান অবস্থায় পথচারীরা দিদিকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করান । দিদি তখন তিনমাসের অন্তস্বত্বা ছিল । বর্ব্বরদের বর্বরতায় দিদির সন্তান অকালে ভুমিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই পৃথিবীর আলো দেখা থেকে বঞ্চিত হয় । জ্ঞান ফেরার পর দিদির অনুরোধে হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ বাবাকে খবর পাঠান । তবুও দিদি কোন প্রকার মোকদ্দমায় যেতে রাজী হয়নি । ইত্যবসরে অনুপম পালিয়ে যায় । এত অত্যাচার সহ্য করে ও দিদি বাড়ীতে এসেও স্বামীর অপকর্মের জন্য কোন প্রকার বিচার প্রার্থী হননি । বুকভরা আশানিয়ে মা বাবার মনের দিকে দেখে ভাবতে থাকে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে । সেই পুরানো ঘটক শিশির বাবুর মধ্যস্থতায় আপাত দৃষ্টিতে এতো বড়ো অপরাধ ধামাচাপা দেওয়া হয় । তারপর দিদির শ্বশুড়বাড়ীর লোকেরা দিদিকে তাদের বাড়ী নিয়ে যায় । সেখানে ভদ্রবেশী শ্বশুড় সুনীল ব্যানার্জী এবং শ্বাশুরী মালতী ব্যানার্জী দিদিকে সবসময় মানষিকভাবে উত্যক্ত করতো দিদি কখনোও কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলেনি । কিছুদিন যাওয়ার পর দিদি কর্মস্থলে যোগ দেন ২/৩ মাস ভালই কাটে পুনরায় অ নুপম ব্যানার্জী নিজের রুপ ধারণ করে । দিদির কর্মস্থলে গিয়েও দিদিকে প্রচন্ডভাবে বিরক্ত করত , রাতের আধাঁরে দিদিকে শারিরীক নির্যাতিন করতো । অসহ্য যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে দিদি চাকুরী ছেড়ে বাড়ীতে চলে আসে । ভদ্রবেশী শয়তান দিদির বর শ্বশুড় , শ্বাশুড়ী দিদির চারিত্রিক জীবনের উপর আঘাত হানতে শুরু করে । এবার দিদির সমস্ত ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে যায় । দিদি বর্বরদের কুৎসা ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে স্বামীর কাছে বাধ্য হয়ে ডিভোর্স চায় যা ওরা চেয়েছিল সেই মোতাবেক দিদির সুন্দর সংসার , অভিমানী , সৎ ব্যক্তিত্বধারী মেয়ের জীবনের পরিনতি বাবা সহ্য করতে পারে নি । চিন্তায় চিন্তায় বাবা রুগ্ন হয়ে পড়ে , মা যেন দ্রুত বার্ধ্যক্য ডেকে আনে । এক রাত্তিরে বাবার বুকে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভুত হয় দিদি বাবার শিয়রে ছিলেন । মেয়ে মানুষ , যান যোগাড় করতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে । গাড়ী নিয়ে দিদি তো ঘরে আসল কিন্তু ততক্ষণে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন । বোনেরাই বাবার সব কাজ করি । সমাজের ভিন্ন রুপ তখন শুভাকাঙ্খী পাওয়া দুষ্কর । আমাদের সাজানো সুখের ঘর কাল বৈশাখীর সেই ঝড়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন । দিদি কাজের সন্ধানে । এর মাঝেই আমি অনার্স নিয়ে বি . এস. সি পাশ করি । দিদি বলে এম. এস. সি তে ভর্ত্তি হয়ে যা । বাকী চিন্তা তোকে করতে হবে না । দিদির কথামত আমি এম. এস.সি তে ভর্ত্তি হয়ে পড়ি । এম. এস. সি ফাষ্ট ইয়ারে

আমার কলেজমিট দীপঙ্কর আমার প্রতি যথেষ্ঠ সহানুভুতিশীল ছিল । দীপঙ্কর শান্ত স্বভাবের ছেলে । আমাকে যথেষ্ঠ হেল্ফ ও করতো । বেশ কয়েকবার ওর বাড়ীতেও গেছি । ওর পরিবারের লোকজনও যথেষ্ঠ সমীহ করতো । পরিবারে ছোট ভাই মা বাবা সবাই আছেন । তবে দিদি মাঝে মাঝে বলতো ছেলেদের বিশ্বাস করা দায় অতো মিশামিশি করিস্ না । মা তো এখন জড় পাথর । বাবার মৃত্যুর পর মা যেন শুধু দেহেই মানুষ আর জীবনের সবযেন মার শেষ হয়ে গেছে । যাই হোক হয়ত আমার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে । কান বধির হয়ে আছে । কিন্তু দেখিও দেখি না, শুনে ও শুনি না । দিদি কিন্তু আকারে প্রকারে সবসময় আমাকে বুঝাত । লেখাপড়া কর । বাকী সব মিথ্যা কিন্তু আমি আস্তে আস্তে দীপঙ্কর -এর প্রেম জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ি । একদিন কারো কথা না শুনে এম. এস.সি.পরীক্ষার দু -মাস আগে জীবনের মস্তবড় ভুল করে বসি । আমি দীপঙ্করকে বিয়ে করে ওদের বাড়ীতে চলে যাই । দিদির কাছে মনে হয় এ ব্যাথা পিতৃবিয়োগ থেকেও বেশী কষ্টকর হয়েছিল । একদিন দীপঙ্করকে নিয়ে বাড়ীতে আসি দেখি বাড়ীর সদর দরজায় বড় তালা ঝুলানো , পাশের বাড়ীর হাবুলদার বাড়ীতে গিয়ে জানতে পারি দিদি চেন্নাই চলে গেছে মাকে নিয়ে । তখ ন সত্যিই মনে প্রচন্ড দুঃখ হয়েছিল কিন্তু কি করার আছে যা হওয়ার তো হয়েই গেছে ।

শ্বশুর বাড়ীতে যথেষ্ঠ আদর , যত্ন আমার আর এম. এস.সি পরীক্ষা দেওয়া হয়নি । দীপঙ্কর স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরী পেয়েছে । ছোট ভাই শুভঙ্কর এর ব্যবসা আছে । সংসারের আদর মায়া মমতা দেখে ভাবতাম আমার দিদির কেন এমন সংসার হলো না । যাই হোক দিদি আর কখনো ত্রিপুরায় আসেনি বা আমার খোঁজ খবরও নেয়নি , আমিও দিদির খবর নেওয়ার সে রকম কোন সুযোগ পায়নি । বিয়ের দু -বৎসর পর থেকেই আমার শ্বশুড় , শ্বাশুড়ী সবসময় বলতো আমরা কি মরার আগে নাতী , নাতনী দেখতে পাবো না - বৌ মা , বুঝতাম আস্তে আস্তে আমার প্রয়োজনীয়তা এ বাড়ীতে কমেছে । একদিন দীপঙ্করের ছোট ভাই শুভঙ্কর দুপুরে আমার ঘরে আসে সে আমাকে যথেষ্ঠ স্নেহ ও সম্মান করতো । আমাকে বলে বৌদি আগরতলা গিয়ে তুমিও দাদা ডাক্তার দেখিয়ে আস্। আমি বলি শুভ তুমি বিয়ে কর , মা - বাবার মনে একটু আনন্দ দাও। কিছুদিন যাবার পর শুভঙ্কর বড় ভাই দীপঙ্করকে বলে দাদা তুই বৌদিকে নিয়ে আগরতলা ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে আ। আমি বলি মা কি এতো কাজ সামলাতে পারবে । শুভঙ্কর বলে আমি দেখবো তুমি যাও । এক রবিবার সকালে আমি ও দীপঙ্কর আগরতলায় যাই এবং ডাক্তার দেখাই নানাহ্ পরীক্ষা নিরীক্ষা ও করানো হয় । পরের দিন আসার পথে বাসে আমি দীপঙ্করকে জিজ্ঞেসা করি দীপঙ্কর ডাক্তার কি বললো । দীপঙ্কর বলে না কিছু না , ডাক্তার বলেছে সব ঠিক আছে হয়ে যাবে । কিন্তু তারপরে ও দু বছর গড়িয়ে যায় । এখন সারাদিন শ্বশুড় শ্বাশুড়ীর গঞ্জনা শুনতে হয় । স্বামী দীপঙ্কর কিছুই বলে না কেবল ভয়ঙ্কর সহানুভূতি দেখায় । ক্রমে আগুন জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয় দীপঙ্করদের বাড়ীতে হর্তা কর্তা বিধাতা তার মা । সুতরাং অন্যদের কোন কথার দাম নেই । এখন সকালে ঘুম থেকে উঠলেই শুরু হয়

গালিগালাজ , অলক্ষী , আটখুরে তোকে দেখেছি দিনটা খারাপ যাবে। রায় পরিবারে অঘটন ঘটবে ইত্যাদি ইত্যাদি । ছেলে , স্বামী সবাইকে আমার শ্বাশুড়ী বলেন থু থু ফেলবি। অলক্ষণা আমাদের পরিবার ধ্বংস করেছে । এখন আমার হাতে রান্না ও কেউ খান না । শ্বাশুড়ীর প্রতিনিয়ত এককথা তুই মরতে পারিস্ না তাহলে তো ছেলেকে বিয়ে করাতাম । এতো কথার পরও দীপঙ্কর নির্বিকার । কিন্তু কড়া সত্য কথাটা আমি কখনো কাউকে বলিনি স্বামী দী পঙ্করের সামাজিক মর্যাদার কথা ভেবে ওর মনের কথা ভেবে । ডাক্তারী রিপোর্ট এ পরীক্ষায় লিখা ছিল দীপঙ্কর কখনো সন্তানের পিতা হতে পারবে না । একদিন দীপঙ্করের এ্যাটাসি গোছাতে গিয়ে আমি রিপোর্ট টুকু দেখি কিন্তু কখনো কাউকে বলিনি । মুখে ও মানুষিক অত্যাচার , বেধড়ক মারতে থাকে । দীপঙ্কর বলে কি করবো বলো । মাঝে মাঝে শুভঙ্কর প্রতিবাদ করলে আমার শ্বাশুড়ী আমাকে জড়িয়ে শুভঙ্করকে বাজে বকুনি দেয় । যার ফলে শুভঙ্করও চুপ করে থাকে । আমি বুঝি আমার এখানে কেহ নেই । অদৃষ্ট মেনে নিতে হবে । একদিন রাত্তিরে আমার শ্বশুড় শ্বাশুড়ী আমার শোবার ঘরে ডুকে সেদিন দীপঙ্কর ঘরে ছিল না । ঘরে ডুকেই আমার গায়ে করোসিন ঢেলে দেয় । আমি শ্বশুড় শ্বাশুড়ীর কাছে প্রাণভিক্ষা চাই তবুও শ্বাশুড়ী নাছোড়বান্দা দেখে আমি চিৎকার দিয়ে উঠি । চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে শুভঙ্কর বের হয়ে আসে এবং মা ,বাবাকে গালাগাল দেয় । শুভঙ্কর আসায় আমি প্রাণে বেঁচে যাই । পরের দিন দীপঙ্কর অসলে ওকে বলি , বৌদি এ বাড়ীতে তুমি থাকলে তোমাকে মরতে হবে । তুমি চলে যাও তোমার দিদির কাছে ,অগত্যা শুভঙ্করের মাধ্যমে দিদির একটা অস্পষ্ট চেন্নাইয়ের ঠিকানা যোগাড় করি তবুও ভাবে যদি ওরা পরিবর্তন হয় কিন্তু না এক রাত্তিরে পুনরায় আমার শ্বশুড় শ্বাশুড়ীর সেই একমূর্তি বলে উঠে তুই বাড়ী ছেড়ে যাবি কিনা বল নইতো আটঘুরে তোকে মেরে ফেলবো । শুভঙ্কর বলে উঠে ঠিক আছে বৌদি চলে যাবে তোমরা এখন যাও । ট্রেইনের টিকিট যোগার করে শুভঙ্কর । রায় বাড়ীর বৌ বিদায়। দীপঙ্কর জানে না ভালোবাসার উত্তর । বিদায় কালেও গঞ্জনা । আমি শুভঙ্করের সাথে আগরতলা এয়ারপোর্টে আসলে শুভঙ্কর কেঁদে উঠে বলে বৌদি তুমি আমাকে ক্ষমা করো । তখন আবেগ সামলাতে পারিনি ডাক্তারের রিপোর্টটুকু যা আমার কাছে লুকানো ছিলো তা শুভঙ্করের হাতে তুলে দিই বলি ভাই আমার কোন দোষ নেই দোষ তোমার দাদা দীপঙ্করের , সে সবজেনেও না জানার ভান করে আছে । অন্ততঃ আমার মতো আর কোন মেয়ের জীবন তোমরা নষ্ট করো না । শুভঙ্কর অনেক অনুরোধ করে বৌদি তুমি যেও না কিন্তু আমি জানি এখানে আমার জীবনের যৌবনের আকাঙ্খার মৃত্যু হয়ে গেছে । অজানা পথ ধরে খুঁজতে খুঁজতে চেন্নাই এর মাটিতে দিদির সন্ধান পায়। আমার দিদি যে মায়ের আর এক রুপ বুকে আমাকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে যায় ঘরে । দিদি বলে ভাববি না আমি আছি সব ঠিক হয়ে যাবে । জীবন মরুভূমির মরীচিকা । কিন্তু আমি ভাবি আমরা দু -বোন আমরা মা - বাবার অতো আদরের মেয়ে কিন্তু কেন জীবনে এত দুর্দ্দশা । কে জানে ? এ রাস্তা এতো অন্ধকার ।

অস্তিত্ববিহীন স্বপ্ন

গ্রামের স্কুল ।এই স্কুলেই পড়তো মহকুমার ভিন গ্রামের নানাহ ছেলেমেয়েরা ।দূর দুরান্ত থেকে দলবেধে স্কুলে আসত পুনরায় স্কুলছুটিতে দল বেঁধে ঘরে ফিরত ।দীর্ঘদিন একসাথে চলাফেরা করতে করতে বিভাশ , পলাশ নির্ম্মল , মৃণাল , পারুল , মিনতি এদের ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব হয়ে যায় । স্কুলে এমনিতেই এরা সিরিয়াস ছাত্র বলে পরিচিত ।মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিককে এরা সবাই মোটামুটি ভাল ফলাফল করে কলেজে একসাথেই পড়াশুনা করতো এর মধ্যে বিভাশ ও পলাশ কমার্স নিয়ে পড়তো মৃনাল সুযোগ পেয়ে ওর বড় ভাইয়ের সাথে সুদুর ব্যাঙ্গালোরে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে চলে যায় কচিৎ কদাচিৎ মৃণালের সাথে বন্ধুদের পত্র যোগাযোগ এর বেশী যোগাযোগ তো সম্ভবও নয় বটে । বছর দু - বছরে মৃনাল পূজোর ছুটিতে দিন পনেরোর জন্য এলে তখন যোগাযোগ ঘটত কিন্তু ক্রমশই মৃণালের সাথে অন্য বন্ধুদের সখ্যতা ও হ্রাস পায় কারণ মৃণাল এখন ভিন্ শহরের স্মার্ট ছাত্র ।যদিও মৃণাল এবং নির্ম্মলের বাড়ী বিশালগড় মহকুমার তেবাড়িয়া গ্রামে , কৃষি প্রবণ গ্রাম । তাদের বাড়ী যেতে হলে বিশালগড় বক্সনগর প্রধান সড়ক থেকে জমির আল পথে হেটে যেতে হয় তবে নিঃসন্দেহে সবুজের সমারোহ তাদের গ্রাম ও প্রাকৃতিক সৌন্দের্য্যের হাতছানি । বসন্তের কোকিলের কুহু কুহু

ডাক। শিমূলের রক্তাভ ফুল , চাঁপার গন্ধ , বেলীর সুগন্ধি , তার উপরে ধানগাছের শীষের হেলদোল সত্যিই মনজুড়ায় । নির্ম্মলের বাড়ীর সামনে একটি ছোট্ট চায়ের দোকান সাথে মনিহারা জিনিষ সহ সেই দোকানের সামনে বুড়ো সুরেন্দ্র বাবু লোকজন বসার জন্য সুন্দর একটি বাঁশের মাচাং ও তৈরী করে রেখেছে । উনিই দোকানের মালিক , সন্ধ্যায় গ্রামের এই দোকানে ,বেশ ভীড় জমে । আড্ডা ও জমে ভাল কেউ বা হাতে রেডিও নিয়ে খবর শুনে কেউ বা খবরের ব্যাখা তর্জ্জমা করে বুঝান সত্যিই কি মনোরম গ্রাম । নির্ম্মলদের ধানের জমি কতটা আছে এটা ঠিক জানা নেই । তবে নির্ম্মলদের বাড়ীতে ঢোকার মুখেই বিশাল বড় এক পুকুর । ফটিকের মতো জল , সুন্দর কাঠ দিয়ে বাঁধানো ঘাট। চার পাড়ে প্রচুর নারকেল ও সুপারীর গাছ । সন্ধ্যায় বাতাস হেলদোল খায় । নির্ম্মলদের বাড়ীতে চারভিটিতে বিশাল বড় বড় চারটি ঘর গোয়ালঘর , গরু ইত্যাদি মিলিয়ে যেন গ্রামের শোভাবর্ধক ।

একবার কলেজ থেকে আমরা নির্ম্মলের বাড়ীতে গিয়েছিলুম একমাত্র মৃণাল ছিল না বাকীরা সবাই ছিলাম । নির্ম্মলের মায়ের অনুরোধে ঐ দিন আর ফিরিনি খুব মজা হয়েছিল । পুকুড় থেকে মাছ ধরা , হৈ চৈ করা । রাত্রিতে গ্রামের পল্লীগীতিতে অংশ গ্রহণ করা সত্যিই উপভোগ্য , যা আজও মনে দাগ কেটে আছে । দিন , রাত্রি একাকার হয়ে গিয়েছিল গল্প গুজব করতে করতে । পরদিন বিকেল বেলায় ভালমন্দ খেয়েদেয়ে গ্রামগঞ্জ ঘুরে বেড়িয়ে বিকেল বেলা একই পথে বাড়ী ফেরা । যদিও তখন নির্ম্মল আর আমাদের সাথে ছিল না । অল্প সময়েই নির্ম্মলদের বাড়ী এবং প্রতিবেশী সবার সাথেই আমাদের ভাব হয়ে গিয়েছিল । বার বার আমরা কথা দিয়েছি আবার আসবো । পুনরায় শুরু হয়ে কলেজ পড়াশুনা কারণ তখন তো আর রোজগারের চিন্তা নেই । এর মধ্যে আমরা কলেজ থেকে বের হই । বিভাশ ,"ল্" পড়তে গৌহাটি চলে যায় তার মামার কাছে , আর পলাশ্ কনজিওমার্স সোসাইটিতে একটি চাকুরী যোগাড় করে নেয় পলাশের পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না । যদিও আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল । খবর জানতে পারি মৃণাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে বোম্বে হাই এ চাকুরী করে । বিয়ে ও করেছে সহ পাটি এক ইঞ্জিনীয়ারকে। সুতরাং মৃণাল এখন আমাদের নাগালের বাইরে । নির্ম্মল , মিনতি , পারুল ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। যদিও পারুলের পরিবারে পারুলকে পড়াশুনা বন্ধ করে বিয়ে দিতে চেয়েছিলো কিন্তু নাছোড়বান্দা পারুল সাফ জানিয়ে দেয় ইউনিভার্সিটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে কোনকিছু ভাববে না। বন্ধুরা এরই মাঝে টের পেতো পারুল ও নির্ম্মলের মনে কিছু ভাব হয়ত বা আছে কিন্তু কিছুই প্রকাশ পেত না । এই ভাবে একদিন নির্ম্মল , মিনতি , পারুল , এম. এ.পাশ করে । এবার চাকুরীর জন্য সবাই হন্যে হয়ে ঘুরছে এমনিতেই পড়া শেষ হয়ে গেলে কার সঙ্গেই বা যোগাযোগ থাকে । তবুও মনে হয়

নিম্মর্ল ব্যাতিক্রম ও বন্ধুদের খোঁজ খবর রাখত। বিশালগড় পাবলিক লাইব্রেরীতে নির্ম্মল নিয়মিত আসত । বই নিত সেই সুবাদে প্রায়শই পারুলের সাথে বিশালগড়ে দেখা হতো , কথাবার্তা হতো কিন্তু এর বেশী কিছু নয় । কথাবার্তার বেশীর ভাগ জুড়েই থাকত , ইন্টারভ্যু ও চাকরী সংক্রান্ত আলোচনা, যা স্বভাবতই বেকার ছেলেমেয়েদের হয় । ওরা একের পর এক পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোনো রকম চাকুরী যোগাড় করতে পারেনি । একবার আগরতলায় টি.পি.এস.সি এর পরীক্ষা দিতে এসে অনেক বন্ধুবান্ধবের সাথে পারুল ও নির্ম্মলের দেখা । তখন পরীক্ষার পর বেশ জমিয়ে আড্ডা হয়েছিল । পারুলদের পারিবারিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল । ওদের দিয়ে দেওয়া ঠিক । তারা হন্যে হয়ে পাত্র খুঁজছিল । এরই মধ্যে একদিন নির্ম্মল খুব সকালে এসে পারুলদের বাড়ীতে হাজির। পারুলের বন্ধু জেনে পারুলদের বাড়ীর লোক নির্ম্মলকে যথেষ্ঠ সমাদর করে এবং অনুরোধ করে ভাল পাত্রের সন্ধান পেলে যেন তাদেরকে জানায় । পারুলকে পাত্রস্থ করার জন্য । নির্ম্মল বলে সে জানাবে। পারুল নির্ম্মলকে বলে হঠাৎ করে কিভাবে আসা হলো। নির্ম্মল পারুলকে অনুরোধ করে বলেন বন্ধুদের একটু নিমন্ত্রণ করে আসি, আগামী মাসের ১১ তারিখ আমার দাদা সুবিমলের বিয়ে । তোমাদের সবাইকে যেতে হবে । পারুল বলে আরে এটা একটা ব্যাপার হলো নাকি ? আমরা সব বন্ধুরা যাবো। আর নির্ম্মল জানো বিভাশ কোর্টে প্রেকটিস্ শুরু করেছে । চলো সবাইকে বলে আসি , পারুল ও নির্ম্মল বেরিয়ে পড়ে ক্রমশ বিভাশ, পলাশ , মিনতি সবাইকে নিমন্ত্রণ করে নিম্মর্ল পারুলকে বিদায় দেয় । বলে পারুল তোমার অনেক সময় নষ্ট করেছি এখন চলি । এই বলে বাইসাইকেল চেপে নির্ম্মল বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় । পারুল ভাবল , নির্ম্মলের ভেতর যেন আমূল পরিবর্তন হয়েছে । আবার ভাবলো , ওর মুখে যেন কিছু বলতে চেয়েছে , কিন্তু বলল না কেন । যাকগে্ , চাকুরী না পাওয়াতে হয়ত নির্ম্মল একটু হতাশ হয়ে পড়েছে । যাই হোক , সবাই মিলে ওর দাদার বিয়ের দিন ওকে বোঝাব । যাই হোক , ১১ তারিখ বন্ধুরা সবাই মিলে তেবারিয়া গ্রামে নির্ম্মলের বাড়ীর উদ্দেশ্যে বাসে চেপে বসল দুপুরের ঠিক পরটাতেই । গাড়ী থামতেই বিভাশ , পলাশ ,পারুল মিনতি জমির আল ধরে কত কি আবল তাবোল বলতে বলতে নির্ম্মলের বাড়ীর পথে যাওয়া। এরই মধ্যে মিনতি বলে উঠে পারুল তোকে কিভাবে বাড়ীর লোক ছুটি দিল রে । পারুল বলে উঠে , আমি কি এখনো ছোট খুকী নাকি বল ? না তোদের যে বাড়ীরে , তারপর আবার স্বাধীনতা পাওয়া । তুই -ই বল না তোদের বাড়ীর কোনো মেয়েটা স্কুল ছেড়ে কলেজে যেতে পারেছে । ১৮ পার হওয়ার আগেই তো বিয়ে । কিন্তু তোর ক্ষেত্রে তোর বাড়ীর লোক বড় মনের পরিচয় দিয়েছে । কারণ দেখ্ পারুল তোদের পরিবারের পুরানো ব্যবসা । তাছাড়া এটাতো স্বীকার করবি এখনো কিছু কনজারভেটিভ ফ্যামেলি । পারুল বলে মিনতি চেইঞ্জ তো আমাদেরই করতে হবে । নাকি বল । কথা বলতে বলতে নির্ম্মলের বাড়ীতে বন্ধুরা পৌঁছে যায় । নির্ম্মলের বড়দা সুবিমলদার বিয়েতে খুব আনন্দ হয়েছে । কিন্তু নির্ম্মলকে

কিন্তু আমরা আগাগোড়া মন মরাই দেখলাম। মনে হলো সে যেন হতাশ । পারুল যখন নির্ম্মলকে জিজ্ঞেস করে, নির্ম্মল কি হয়েছে বলো না । নির্ম্মল বলে দেখো পারুল তোমাদের ব্যাপারটা অন্যরকম। বন্ধুদের মধ্যে অন্তরঙ্গ যথেষ্ঠ ছিল তাই সবাই চেপে ধরে নির্ম্মলকে । নির্ম্মল বলে দেখো মেয়েদের চাকুরী হোক বা না হোক চিন্তাটা বাবার ঘাড়ে । সেই ভাবেই বাবারা তৈরী থাকেন । লেখাপড়া শিখেছো তো বেশ ভাল , চাকুরী যদি নাই বা পেলে দায়িত্বটুকু পরিবার নেবে । কিন্তু ভেবে দেখো যতই লেখাপড়া শিখি না কেন যতক্ষন চাকুরী না করব ততক্ষন মনের ভাষা মনেই থাকবে । কারণ একটাই উত্তর আমি বেকার । এভাবে একদিন বুড়ো শালিক হয়ে পড়বো । জীবনের মনের কোনো কথা তখন আর মন খুলে বলা যায় না । পারুলের মনে কিন্তু একটা শঙ্কা হয়েছিল । কিন্তু নির্ম্মল তা বুঝতে দেয়নি । নির্ম্মল বলে উঠে ছেলেরা রোজগার না করতে পারলে শুধুই বোঝা । নিজেরও বোঝা, পরিবারেরও বোঝা । যাই হোক এত সবের মাঝেও সুবিমলদার বিয়েতে আদর আপ্যায়ণ , আনন্দের কোনো ঘাটতি ছিল না । বিয়ের আনন্দের পর বন্ধুরা চলে যায় , সবাইতো ব্যস্ত হন্যে হয়ে ঘুরছে একটা কাজ জোগাড় করার উদ্দেশ্যে। তাই এখন কারো সাথে কারো খুব একটা বেশী যোগাযোগ নেই ।

কিছু দিনের মধ্যেই পারুলের বিয়ে ঠিক হয়ে যায় । বর সাইন্স এর টিচার। দিনক্ষন ঠিকঠাক , পারিবারের লোকজন পারুলকে বলে তুমি তোমার বন্ধুদের নিমন্তন্ন করো । পারুল পুনরায় বান্ধবী মিনতির সাথে যোগাযোগ করে মিনতির মাধ্যমেও সাথে নিয়ে বিভাশ ও পলাশকেও নেমন্তন্ন করে আসে । পরের দিন রবিবার , কাজের তাড়া কম । বিভাশ , পলাশকে, পারুল অনুরোধ করে চল আগের মতো চারজন মিলে নির্ম্মলের তেবারিয়া গ্রামে গিয়ে নির্ম্মলকে নেমন্তন্ন করে আসি । এক কথায় সবাই রাজি । পরদিন সকাল দশটায় চার বন্ধু মিলে রওনা সেই স্মৃতি গ্রাম তেবারিয়াতে । পিচ্‌রি রাস্তা ছেড়ে ধানক্ষেতের আল ধরে বন্ধুরা গন্তব্য স্থলমুখী । জমির আল পেরিয়ে বাঁক নিতেই এলাকার পুরানো বাড়ী জহিরুল হকদের , সেই বাড়ীর কোনাতে আসতেই এক গৃহবধুর প্রশ্ন কোথায় যাবেন ? কোথা থেকে আসছেন ? সত্যি চারবন্ধু রোদের মাঝখানে হেঁটে এসে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এরূপ প্রশ্নে স্বভাবতই বন্ধুদের মন গুমোট হয়ে গেছে । তাহলে কি ...... হয়েছে নাকি ? চার বন্ধুতে গ্রামের এক কাঁঠাল গাছের নিচে দাঁড়াই । রুমাল দিয়ে মুখ মোছে । গ্রামের লোক নির্ম্মলকে নিমু বলে ডাকে । গ্রামের লোকেদের সাথেই আলোচনা হয় সবাই যেন ভারাক্রান্ত । বন্ধুরা যা বুঝার বুঝে ফেলল , বিভাশ বলে ফেলল , তাহলে কি কারণে ওর বাড়ী যাচ্ছ।

ওই বাড়ীতে আজ নির্ম্মল নেই । এদের পরিবার এবং গ্রামের সাথে আমাদের যেটুকু সর্ম্পক সবটাই নির্ম্মলের সূত্র ধরে। সুতরাং এখন যাবার প্রয়োজনই বা কি ?

হঠাৎ একটি ছেলে দূর থেকে তাদের দেখে বাইসাইকেল নিয়ে এসে ওদেরকে থামায় , নিজের

পরিচয় দেয় কান্তি বলে এবং বলে আমি নির্ম্মলের পাড়ার ছোট বেলার বন্ধু । সুতরাং কান্তির অনুরোধ তো উপেক্ষা করা যায় না । আমরা চললাম্ নির্ম্মলের গৃহাভিমুখে । বিশ্বাস হচ্ছিল না যে নির্ম্মল নেই । মনে মনে ভাবছিলাম নির্ম্মল আমাদের দেখা মাত্র স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে চিৎকার দিয়ে এগিয়ে আসবে । কিন্তু বাড়ীতে ঢোকা মাত্র পুকুরের উত্তর পাড়ের পেয়ারা গাছটা দেখিয়ে কান্তি বলে উঠে - আমিই তো ওকে এ গাছ থেকে নামালাম । সে কি দৃশ্য । কখন নির্ম্মল এ কান্ড করেছে , কে বুঝবে বলো ? আমি ভাবছিলাম যদি গাছের ডালটা ভেঙ্গে পড়ত তবে তো নির্ম্মল বেঁচে যেতো । বাড়ীতে গিয়ে দেখি বাড়ীটা যেন ছন্নছাড়া । কান্তি বলে উঠে পোষ্টমর্টেম , থানা পুলিশ এমনকি শ্মশানের কাজটা অব্দি আমিই সামাল দিয়েছি । জীবদ্দশায় ও কাউকে কষ্ট দেয়নি, মরনেও কাউকে জ্বলাতন করেনি ।

বন্ধুদের মনে হতাশ লাগলো । মনে হলো শ্যামল ধানের ক্ষেত , মানুষ জন, সুবিমলদা , নুতন বৌদি সবাই আছে কিন্তু নেই আমাদের বন্ধু নির্ম্মল । সবার মুখে ওর মৃত্যুর কথা শুনতে শুনতে আর ভাল লাগছিল না , তবে তেবারিয়া গ্রামে শিক্ষিত যুবক নির্ম্মলের মৃত্যু এক বিরাট ঘটনা । পুকুর পাড়ে একটা ছাতা দিয়ে তার ছাঁই ভস্ম যেন নীরবে ঘুমিয়ে আছে । নির্ম্মল খুব সিরিয়াস ছিল পড়াশুনার ব্যাপারে এমনকি বন্ধুত্বের ব্যাপারেও । তাহলে বন্ধুরা তো তার শ্মশানের দিকে এক পলকে তাকিয়ে আছে । কিন্তু নির্ম্মলতো আজ নির্জীব শুধুই কালো ধোঁয়া । কান্তি ও সুবিমলদা হঠাৎ আমাদের বলে উঠে আচ্ছা ভাই, তোমরা জান কি নির্ম্মলের সঙ্গে কারো কিছু ছিল কি না ?

মানে ? অর্থাৎ ও কোনো মেয়েকে ভালবাসতো কিনা ? কারণ বাড়ীতে তো কখনও কিছু বলেনি । পারুল বলে উঠে এমন ও তো হতে পারে যাকে ভালবাসত হয়ত তাকেও কখনো কিছু বলেনি ।

অন্যরা বলে উঠে দীর্ঘদিন ধরেই তো নির্ম্মলের সঙ্গে চলেছি , অন্তরঙ্গও ছিল , বেশ ফ্রি তাহলে এমনটা হলে সে বলবে না কেন ? পারুলের মনে কিন্তু একটা সংশয় ছিল । ভেবে উঠে মন খুলে হয়ত বা নির্ম্মল যদি কিছু বলত হয়ত এভাবে তাকে আত্মবিসর্জন দিতে হতো না । ইউনির্ভাসিটির পড়া শেষ হবার পর যে যার বাড়ী চলে গেছে । কিন্তু এই বন্ধুদের মধ্যে কিন্তু যোগাযোগ ছিল । আসলে লেখাপড়া শেষ হবার পর সবকিছুই ফাঁকা ফাঁকা লাগে , বন্ধুরা হারিয়ে যায় , মনের কথা , ব্যাথা বলার মত কেউ থাকে না । পড়াশুনার সময় বেকারত্ব শব্দটা ওরা শুনত কিন্তু বুঝত না । কিন্তু আজ যেন অসহ্য যন্ত্রণা , বয়সও বেড়ে যাচ্ছে । যৌবণ যখন মন প্রাণ খুলে পরম আকাঙ্খা নিয়ে হাজির কেবলমাত্র বেকারত্ব শব্দটি অর্থ উপার্জনের অভাবে যৌবনের সুখ , ভোগ সব বিসর্জন দিতে হয় , কাঙ্খিত চলে যায় অন্যের হাতে , অপরের হয়ে । নির্ম্মল সব সময় বলতো ভাই জীবনের লড়াই

যেখানে জয়ের আশা নেই , জয় পেলেই স্বার্থক জীবন , নহেতু নিরর্থক । এসব কথা গুলো নির্ম্মল কিন্তু পারুলকে কয়েকবার বলেছিলো । আরও বলেছিল দেখ এতো কথা বলে আর বাড়ী যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না ।

কিন্তু নির্ম্মলের ঘরে ঢুকে সবাই অবাক হলো । পারুলতো কাউকে আগে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে বলেনি । তবে যে দিন বিয়ে ঠিক হয়েছে সে দিনকার ডেটটুকু নির্ম্মল জানল কিভাবে । প্রবাদ আছে আত্মহত্যার সময় মানুষের ভ্রম হয় । তাই বোধহয় নির্ম্মলেরও হয়ে গিয়েছিল । কারণ যেদিন পারুলের বিয়ের দিন পাকাপাকি ঠিক হয়েছে , পারুল ও প্রদীপ (পারুলের হবু বর) এর ফটো দেওয়ালে খুব সুন্দর করে এঁকে লিখেছে তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখী হোক । নিম্নে তারিখ ।

তাহলে নির্ম্মল পারুলের হবু বর থেকে শুরু করে সবার নাম , পরিচয় সমস্ত রেখেছিল কিন্তু কেউ জানল ও না বুঝল না ।

এবার চার বন্ধুতে মিলে নির্ম্মলের ঘরে খোঁজাখুজি শুরু করল । পাওয়া গেল একখানা চিরকুট, যাতে লিখা আছে আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় । পারুল ও প্রদীপ সুখী থেকো , ভাল থেকো ইতি নির্ম্মল ।

নির্ম্মলের দাদা সুবিমল চারবন্ধুর জন্য মিষ্টি এনেছিল । খিদে থাকলে ও সংকোচ খেতে পারছিল না । সুবিমলদার চোঁখে জল প্রাণপনে আটকাতে চেষ্টা করলে কি আর আটকানো যায় । বন্ধুদের অস্বস্তি হচ্ছিল । কেন এল এ বাড়ীতে ?

বন্ধুরা চলে যেতে চাইলে বাড়ীর লোক বার ন করে । শেষমেষ না খাইয়ে ছাড়বে না । ইচ্ছে না থাকলেও সবাই মিলে খেতে হলো । পারুল যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে । কিন্তু ওর কি দোষ ? পুকুর পাড়ের পেয়ারা গাছটা এখনো ঠাঁই দাঁড়িয়ে , কিন্তু নির্ম্মল আর নেই । চারবন্ধু মিলে পুনরায় চলল। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ একটা ধোঁয়া অনুভুত হলো । নির্ম্মল ডাকছে আরে ভাই তোরাতো আমাকে সঙ্গে নিচ্ছিস না? কেন আমাকে ভুলে গেলি । বন্ধুরা নির্ম্মলকে দেখতে পাচ্ছিল না । নির্ম্মল বলে উঠল বন্ধুকে এত ভয় পাচ্ছিস কেন ? বন্ধুরা ছুটছে , কারণ বন্ধুদের পেছনে সূর্যাস্তের রাঙ্গা আভা লেগেছে । তারপরই সন্ধ্যার অন্ধকার । নির্ম্মল তাদের পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল । নির্ম্মল এখন স্বাধীন। কেউ এখন নির্ম্মলকে আর কিছু বলবে না। কিন্তু সে যে অস্তিত্ববিহীন সে নিজেও তা বুঝে । নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে এবং মন খুলে ভালবাসতে গিয়ে বেকারত্বের অভিশাপ তাকে পৃথিবী থেকে সেরিয়ে দিল । পারুলের গোপন কান্না বুঝতে পেরে নির্ম্মলের এখন কান্না পাচ্ছে । কিন্তু কি হবে এখন! এখন নির্ম্মলের কেউ নেই , আপনজন , সে এখন কালো ধোঁয়ায় মিশে যাওয়া এক বাতাস । তার যন্ত্রণা চোখে দেখা যায় না । সেকি শিক্ষিত না বেকার তা কিছুই নেই আছে শুধু কালো ধোঁয়া ।

আমি ও বাঁচব

রাজধানী আগরতলা থেকে দশ কিলোমিটার দুরত্বে শহরতলীর বড়জলা গ্রামে আমার জন্ম । আমার নাম রুমাশ্রী রায়। বাবা নিরুপম রায় , মা উমা রায়, আমার বাবা কারখানার শ্রমিক , বয়স ষাটোর্ধ্ব । বড় ভাই অনিমেষ রায় । ছোটবেলা থেকেই দেখেছি টানাপোড়নে চলে আমাদের সংসার। সংসারের টানাপোড়নে বাধ্য হয়ে আমার মা একটি প্রাইভেট ফার্মে নয় টাকার বিনিময়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে । আমার বাবা সহজ সরল স্বভাবের পরিশ্রমী মানুষ । এতো পরিশ্রমের পড়ে ও বাবা কখনো মানষিক দিক দিয়ে ক্লান্ত হন না । মা , বাবা উভয়েরই ইচ্ছা আমাকে ও দাদাকে লেখাপড়া শেখাবে , কিন্তু হলো না দাদা ছোট বয়েস থেকেই পড়াশুনার প্রতি উদাসীন , ২/৩ বার ফেল করে ও ক্লাস সেভেন উর্ত্তীন হতে পারেনি ততক্ষনে আমি ক্লাস সেভেন এ উঠি গেছি । তাই বলে লজ্জায় দাদা পড়াশুনা ছেড়ে বহিরাজ্যগামী লরীতে সহ চালকের কাজে যোগ দেয় । আমাদের বাড়ীতে ছোট্ট একটি নড়বড়ে বসতঘর , পাশে একটি রান্নাঘর । বাড়ী বলতে শুধু তাই , ঝুপড়ী থেকে একটু ভালো। দাদা , বাড়ীতে খুব কম আসতেন , প্রথমে দু /তিন মাসে একবার পরবর্ত্তীতে বছরে ১/২ বার । দাদার চিন্তায় চিন্তায় বাবা দিনে দিনে রুগ্ন হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু অর্থাভাবে বাবাকে কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছিল । এ ভাবে তিন - চার বছর গড়িয়ে যাই । একদিন দাদা ভরদুপুরে একটি লরী চালিয়ে বাড়ীর সামনে আসে , খুশীতে আমি দৌড়ে যাই , দাদা বলে রুমু আমি এখন ড্রাইভার হয়েছি তোর জন্য একটি শাড়ী এনেছি । বাবার জন্য কুর্তা আর মায়ের জন্য শাড়ী , হঠাৎ আমার নজরে পড়ে দাদার গাড়ীর ভেতরে বসে আছে অল্প বয়স্ক একটি বৌ। কৌতুহলে দাদাকে জিজ্ঞাসা করি দাদা বউটি কে? একটু লজ্জা ভরা মুখে দাদা বলে তোর বৌদি । আমি চুপটি করে মাকে ঘটনাটুকু মাকে বলে আসি। মা যদিও কান্নাকাটি করেছে তবুও সমাজের ভয়ে নতুন বৌ ঘরে তুলে নিয়ে আসে কিন্তু বউকে রাখবে কোথায় সম্বল তো একটা ঘর । যাই হোক পড়ন্ত বেলায় সারাদিন ঘাটুনি খেটে বাবা বাড়ীতে

আসেন । স্বভাবতই অপ্রত্যাশিত ঘটনা সমূহ ক্ষোভে বাবা বলে উঠেন তোর মতো ছেলে আমার দরকার নেই । সামান্য কথাতেই দাদা বাবার মন বুঝলো না রাগ দেখিয়ে বউকে নিয়ে লরী চালিয়ে চলে গেল । সে গেল , আজও গেল , আর কোন সহায়তা তো নেই , কোন খোঁজ খবরও নেই । বাবা যেন বধির হয়ে গেছে শোকে , দুঃখে । একদিন আক্ষেপ করে বাবাকে বলতে শুনি , " হে ভগবান কোন পাপ তো করিনি , কেনই বা আমাকে এতো কষ্ট দিচ্ছ ।" তখন ভাবি যদি আমি ছেলে হতাম হয়তো বা বাবার কিছুটা দুঃখ ঘুচাতে পারতাম । আমি দেখতে পেতাম বাবা এখন আর কাজ করতে পারেন না । হাঁফিয়ে যান তবুও কাজ করেন । ২০০২ ইং আমি মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবো । জোর কদমে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছি । কারণ দৈন্যদশার মধ্যেও বাবা আমার কোন কিছু ঘাটতি রাখেন নি। যথাসম্ভব চালিয়ে গেছেন । একদিন সন্ধ্যায় শুনতে পাই মা , বাবা একান্তে অনেক সময় ধরে কথা বলছেন । কৌতূহলী মনে কান পেতে শুনি বাবা বলছেন মাকে দ্যাখো রুমু বড় হয়ে গেছে । আমার বয়স বেড়েছে। কখন কি হয় । আমি থাকতে থাকতে তাকে পাত্রস্থ করা দরকার । সম্বন্ধটা খারাপ নয়। মা -কে বলতে শুনি মাধ্যমিক পরীক্ষাটা দিয়ে নিক না , বাবা বলেন শুভ কাজ , দ্যাখো মাধ্যমিক পাশ করে কি -ইবা করবে । পরীক্ষা তো শ্বশুর বাড়ী গিয়ে ও দেওয়া যাবে , প্রয়োজনে দিনক্ষন ঠিক করে আমরা কথাটা বলে নেবো । আমি গুমরে কেঁদে উঠি । কিন্তু পড়শীরা ও মা বাবাকে বুঝাল ভাল সম্বন্ধ দেরী করলে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে । কালক্ষেপ না করে মা -বাবা আমার বিয়ে ঠিক করলেন । আমি জানতাম না মা - বাবা গোপনে গোপনে আমার বিয়ের জন্য গয়না থেকে শুরু করে সবকিছুই ঠিক করে রেখেছে , কায়ক্লেশে নিজেরা কষ্ট স্বীকার করে । ২০০২ ইং মার্চ মাসের ৯ তারিখ আমার বিয়ের দিন । ছেলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সদরের ছেলে , নাম তার শুভজিৎ । নির্দিষ্ট দিনে কপর্দক শূন্য হয়ে আমার মা - বাবা শুভজিৎ এর সাথে আমাকে বিয়ে দেয় । বিয়ের পর ২/৩ মাস খুব ভাল ভাবেই চলে প্রথমটাই শ্বাশুড়ী মায়ের শাসনকে মা - মেয়ের শাসন বলেই মনে মনে ভাবতাম , শ্বাশুড়ী মা বলতেন অল্প বয়সের বৌ - নির্বোধ , তাই নিয়ন্ত্রণ রাখা দরকার । সংসার জীবনের প্রথমটাই এই শাসনকে কখনো আমি বিপজ্জনক মনে করিনি । কিন্তু আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পারি আমার অস্তিত্ব , চেতনাকে হত্যা করা হচ্ছে । নির্বোধ স্বীকারোক্তী ছাড়া এ সংসারে আমার ঠাঁই নেই । আমার স্বামী রাত্তিরে দেরী করে বাড়ী ফিরত ব্যবসার কাজ সামলে এরই সুযোগে শ্বাশুড়ী মায়ের প্রত্যক্ষ মদতে আমার মত যুবতী বৌ - এর ঘরে ঢুকে পড়ত আমার মেঝ দেবর, মুখে মদের গন্ধে বুঁদ হয়ে থাকত। পশুর মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইতো । কোনক্রমে প্রাণপনে ছুটে শ্বাশুড়ী মায়ের কাছে ছুটে এলে বলতো ন্যাকামি করিস্ নে । তুই কোথাকার সতী আমি জানি , নাটক না করে ঘরে যা না হলে এ বাড়ীর ভাত উঠে যাবে । বাপের বাড়ীতে যাওয়া ও আমার জন্য

বারন ছিল । তার মাঝেও একবার বাড়ীতে গিয়েছিলুম । কিন্তু মা , বাবার দশা দেখে কিছু বলার সাহস হয়নি । ভাবলাম আবার কি তাদের বোঝা হবো , একদিন রাত্রিতে স্বামীকে বললাম তোমার মেঝ ভাই আমাকে প্রচন্ড উত্যক্ত করে । মাকে বলেছি কিন্তু মা উল্টো গালাগাল দেয় । ও মা একি হিতে বিপরীত , আমার স্বামী মাঝ রাত্তিরে ছাগল ভেড়ার মতো আমাকে নির্দ্দয় ভাবে মারতে শুরু করে । বলে উঠে তোর এতবড়ো সাহস আমার ভাইয়ের নামে কলঙ্ক লাগাচ্ছিস্ । আমার কান্না শুনে শ্বাশুড়ী মা আমার ঘরে আসে চুলের মুঠি ধরে আমাকে মারে আর স্বামীকে বলে তোর কপালে ছিল নষ্ট মেয়ে । এ যেন আমার দেবর রাজেশকে অলিখিত ছাড়পত্র দেয়া পাশবিকতার জন্য । যা ভাবলাম তা -ই হলো সময়ে অসময়ে আমার দেবর রাজেশ আমার ঘরে ডুকে পড়ে , অশালীন ব্যবহার , ধস্তাধস্তি করে । কিছু বলার জো নেই এভাবে সে আমার দেহের অধিকার দিয়ে নেয় । এ যেন তার ভোগ পন্য , স্বামী আমার কাছ থেকে দুরে কেটে পড়ে প্রায়শই রাত্তিতে ঘরে আসে না শুনেছি কোন নিষিদ্ধ পল্লীতে রাত কাটায় । কিন্তু স্ত্রী হিসেবে আমার বলার অধিকার কোথায় ? এ রূপ অপমানজনক ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি দেখে আমি ভাবি আমার স্বামীর জামাইবাবু মানুষ এবং পরিবারের সবাই উনাকে মানেন সুতরাং হয়তো বা উনার কাছে মন খুলে বললে কিছু সুরাহা হতে পারে । একদিন দুপুরে আহ্লাদিত হয়ে রুমাশ্রী জামাইবাবুর কাছে যান বিচার পাওয়ার আশায় । কে জানে ভাল মানুষের বেশে দেবেন্দ্রবাবু যে বুড়ো দানব । যাওয়ার পর বেশ ভালই ব্যবহার করলেন । বললেন সব ঠিক হয়ে যাবে দ্যাখ ওদের আমি ঠিক করে দেবো ইত্যাদি ইত্যাদি । ভাল মানুষী দেখিয়ে হঠাৎ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় দেবেন্দ্রবাবু । ততক্ষনে রুমাশ্রী বুড়ো দানবের কু -মতলব টের পেয়ে দেবেন্দ্র বাবুর পায়ে চেপে ধরে বলে জামাইবাবু আমি আপনাদের মেয়ের মতো । আমাই রক্ষা করুন কিন্তু না হলো না রুমাশ্রীর কাতর অনুরোধেও বুড়ো দানবের হাত থেকে রক্ষা পেলো না রুমাশ্রী ।

পুনরায় পাশবিকতার স্বীকার । রাগে ক্ষোভে রুমাশ্রী পায়ের জুতো দিয়ে বুড়ো দানবের গালে মারে । বুড়ো দানব দেবেন্দ্র বলে উঠে তোর পক্ষে সংসার করা হবে না তুই তো পুরুষের বাপ। রুক্ষ, অ্যাগ্রেসিভ । রুমাশ্রী বুঝলো না পুরুষত্বই বা কী ? মেয়েলিত্বই বা কী ? অর্থাৎ তাদের পাশবিকতাই আনুগত্য? কিন্তু এ ভাবে কি একটি মেয়েকে জীবন ধারন করা যায় এ প্রশ্নটুকুই ঘুরপাক খায় রুমাশ্রীর মনে । রুমাশ্রী ঘরে ফিরে আসে । রুমাশ্রীর উপর অমানুষিক অত্যাচার সম্পর্কে এলাকার মেয়েছেলেরা কিছু কিছু টের পায় কিন্তু পাশবিকতার খবর কেউ জানে না । যাই হোক রুমাশ্রী মুখ বুঁজে থাকে , এলাকার মানুষ গ্রাম্য বিচার সভা ডাকে যেখানে সিদ্ধান্ত হয় রুমাশ্রীর উপর কোন অত্যাচার হবে না। পারিবারিক অসঙ্গতির কথা মাথায় রেখে রুমাশ্রী অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে তারপরে ছ মাস মোটামুটি ভালই চলে কিন্তু স্বামী তার ঘরে আসে না । একদিন রুমাশ্রীর শ্বাশুড়ী রুমাশ্রীকে বলে তাদের আত্মীয়ের বিয়ে হবে আসামের দিস্পুরে সেখানে তাকে যেতে হবে । প্রথমটাই রুমাশ্রী

রাজী না হলেও শেষ পর্যন্ত শ্বাশুড়ীর চাপের কাছে রুমাশ্রীকে মাথা নত করতে হয় । এবার ছোট দেবর শুভ্রাংশু বৌ দিকে নিয়ে রওয়ানা হন। যদিও রুমাশ্রীর চোখে মুখে অনিচ্ছার ছাপ ছিল । অর্থাৎ সে যাইতে নারাজ কিন্তু তার কিছু করার উপায় নেই। অবশেষে দেবর শুভ্রাংশু বৌদিকে নিয়ে এক বাড়ীতে উঠে যেখানে বিয়ে বাড়ী তো দুরে থাকুক মনে হয় যেন ভুতুড়ে বাড়ী । যাই হোক ভরসা দেবর , অন্তনঃ ছোট দেবরকে রুমাশ্রী ভাই এর মতো দেখতো কিন্তু না ওরা যেন একই পথের যাত্রী ছোট দেবরের কাছে ও বৌদি রুমাশ্রী ভোগ পণ্য । স্নান টান সেরে রুমাশ্রী শুভ্রাংশুকে জিজ্ঞেস করে কোথায় বিয়ে বাড়ী ? কোথায় তুমি আমাই নিয়ে এলে রুমাশ্রী কেঁদে উঠে , বলে শুভ্রাংশু আমাকে আমার বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও । প্লীজ ভাই আমাকে এ ভাবে আর লাঞ্চিত করো না । ও বলে কিছু হবে না এখানেই তোমাকে আবার বিয়ে দেবো । মধ্য রাত্রিতে চার ষন্ডা চেহারার লোক ভুতুড়ে বাড়ীতে এসে ডুকে । দেবর রুমাশ্রীকে বলে নাও তোমার স্বামীরা এসে গেছে তোমার আর চিন্তা নেই। রুমাশ্রী দেবর শুভ্রাংশুর পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করে কিন্তু কোন লাভ হয় না । রুমাশ্রী বুঝতে পারে সে পণ্য এর মতো বিক্রি হয়ে গেছে ঐ রাত্তিরে দানবদের দানবিকতায় রুমাশ্রী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে । ক্রেতা দানবেরা ভাবে রুমাশ্রী মারা গেছে এই ভেবে ওরা কেটে পড়ে । পরদিন সকালে রুমাশ্রীর সংজ্ঞা ফিরলে কতিপয় অপরিচিত শুভানুধ্যারীর সহযোগীতায় রুমাশ্রী পিতৃলয়ে ফিরে আসে । এ- বার আরা মুখ বুজে সহ্য করা নয় ভেবে রুমাশ্রী আইনের দরজায় কড়া নাড়ে । মা জানত না মেয়ের এতো দুর্দ্দশা । হতবাক পিতা বিমর্ষ হয়ে পড়ে । দুই সামাজিক সংস্থার বদান্যতায় রুমাশ্রী একটি কাজ যোগাড় করে নিয়েছে , যা তার বৃদ্ধ মা ব্াবার জন্য ও সহায়তা হয়েছে । একদল পাষান্ড , বর্ব্বর দানবের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে রুমাশ্রী প্রতিবাদের পথ বেছে নিয়েছে । আইনের কষাঘাতে রুমাশ্রীর অত্যাচারীরা সবাই এখন হাজতবাস করছে । রুমাশ্রী এখন পরিচালিত নিজস্ব বুদ্ধি ও ব্যক্তিসত্তা নিয়ে। রুমাশ্রীর প্রশ্ন ছিলো আমি কি ভোগ পণ্য । দুর্বত্যদের অত্যাচারের ইতিহাস তাকে শিখিয়েছে নিজের ভরসায় বেঁচে থাকতে । জীবনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ করতে । পথ যতই জটিল হোক না কেন , সংঘর্ষে জীবন বেঁচে থাকে । রুমাশ্রী বলে উঠে আমি ভোগ পণ্য নয় । সমাজে মাথা তুলে আমিও বাঁচব ।

আমার মায়ের ঠিকানা

কে তুমি ? আমি সওদাগর ,মানে টাকারজলা থানাধীন শ্যামাচরণ পাড়ার সওদাগর দেববর্মা । বুড়ীমা নদীর তীরে বনের পাশে গ্রাম । নিজের হাতে তৈরী বাদ্য যন্ত্রটি , সুন্দর কাঠ পালিশ তৈরী মাঝখানে একটুকরো কাঁচের অংশ তার উপর দিয়ে তার জড়ানো । এই যন্ত্রের শব্দ মনে হয় মধু জড়ানো । এই যন্ত্রেই বের হয় বাংলা , হিন্দী , ককবরক নানাহ্ ভাষার সুর আর এই সুরের সাথে গলা মিলিয়ে গান গায় সওদাগর । শহর , গাঁ গেরামের হাট মাড়িয়ে এ জেলা থেকে অপর জেলায় এমনকি দূরদর্শন , টি, বির পর্দায় ও বটে । তবুও গ্রামে এলে যন্ত্রের শব্দে ও সওদাগরের গলায় আওয়াজ মিলে জমে যায় আসর । সওদাগরের গানের আওয়াজ শুনে বের হয়ে আসে ঘরের বৌ , বাবুরা এমনকি ছোকরারা ও ভিড় জমায় । গানের মাঝে মাঝে ছোকরারা সিটি দেয় এবং অঙ্গভঙ্গী করে নেচে ওঠে , তখন সওদাগরের গান এবং যন্ত্রের আওয়াজ ও দ্রুত হয় । একটাকা - দু টাকা , বাবুদের পকেট থেকে বের হয় । ছোকরারা পছন্দের গান গাওয়ার জন্য ফরমায়েশ দেয় । বয়স্করা বলে সওদাগর , তোমার গানে জাদু আছে ।কিন্তু সওদাগরের বয়স হয়েছে , এক পুরনো সাইকেল নিয়ে নিজ গ্রাম হয়ে টাকারজলা হয়ে জম্পুইজলা হাট পর্যন্ত এদিকে গোলাঘাটি , ব্যাদ্দারদিঘী হয়ে বিশালগড় পর্যন্ত চলাচল । জম্পুইজলা যেতে পরিশ্রান্ত হলে মাঝখানে বুড়ীমা নদীর তীরে শুভ্রু দেববর্মার চা - য়ের দোকানে বসে এক - কাপ চা খেয়ে গলা ভিজিয়ে নেয় । অনুরোধ এলে এক দুটো গান গেয়ে মানুষকে আনন্দিত করে ফের বাই সাইকেল চেপে চলে , বর্তমান যুগের গায়কদের মতো সুন্দর নয় সওদাগর । মাথায়ও ঝাঁকড়া চুল নেই । চোখ গুলো ছোট তার উপর হাই পাওয়ার চশমা । ভাঙ্গা গালপাট্টা । থ্যাবড়ানো নাক। শুষ্ক শরীর । সাদা কোর্তা ও সাদা ধুতি পড়ে নির্ম্মল মন নিয়ে সাথে নিজের তৈরী দোতারা যন্ত্রটি নিয়ে , বাই সাইকেল চেপে আপন মনে চলে সওদাগর । কেউ প্রশ্ন করলে কি গান গাইবে সওদাগর , হিন্দী , ককবরক না বাংলা সাথে সাথে হেসে জবাব . তোমর মন

যা চায় তাই গাইব । সওদাগর যখন তখন গান বানাতে পারে এ তার আর এক গুনাবলী । তার নিজস্ব তৈরী যন্ত্রে এবং আবেগ দিয়ে গান গাওয়ার ভঙ্গীতে লুকিয়ে আছে যাদু ।

জম্পুইজলাই চলছে উপজাতিদের ত্রিং উৎসব হঠাৎ ভরদুপুরে টাকারজলার হাটের উপরে পুরানো মন্দিরের বট গাছের তলায় দাড়িয়ে নিজস্ব ভাষা দিয়ে তার যন্ত্র বাজাতে বাজাতে খুব আবেগ দিয়ে সওদাগর গান গাইছে, অনেক লোক জড়ো হয়ে আছে কিন্তু সবাই একদম চুপ, ভিড়ে দাঁড়ানো বউদের চোখ জলে ছলছল । গলা দিয়ে কথা আসছে না । হঠাৎ এক বৃদ্ধ বলে উঠে এতো দুঃখের গান কেন গাইছো সওদাগর, কি হবে সবার চোখে জল এনে একটু ফুর্তির গান গাও আনন্দের দিনে। সওদাগর বলে ওঠে এ গান গাইছি সমাজ শোধরানোর জন্য । অর্থাৎ তার ভাষায় গানে সে বুঝাতে চাইছে আর যেন মা বোনদের সিঁথির সিঁদূর না ঝড়ে আর যেন কোন যুবক ভুল পথে না যায়, সমাজ যেন মৈত্রীর বন্ধন হয় ।

সওদাগরের নিজস্ব যন্ত্রের ঝমরঝম শব্দও তার কণ্ঠে আওয়াজ ইতিমধ্যেই হাটের মানুষকে তার চারধারে নিয়ে এসেছে । গান শুনে মুদির দোকানদার হিসেব ভুল করছে । চুড়ি -ওয়ালার হাত থেকে পড়ে তার গোটা কয়েক চুড়ি ভেঙ্গে যায় । বিরক্ত হয়ে চুড়ি ওয়ালা বলে শ্যালা হাটের সব মানুষ ডেকে তামাশা করছে আর নাকি আমার পেটে লাথি । মহেন্দ্র বলে উঠে সওদাগর বটতলায় বসে আছে তাতে হাট বাজারের আবার কী সমস্যা ? চুড়ি ওয়ালা বলে দেখো না । বটতলায় ওকে ঘিরে গুড়ের মৌ মাছির মত ভীড় লেগেছে ।

কান পাতলেই ওর যন্ত্রের ঠনঠন আর মেয়ে পটানো গান, যোয়ান স্বামী ছেড়ে দেখো ওখানে ভীড় জমিয়েছে । শ্যালা যাদু জানে আর বাজারের ও আজ বারোটা বাজিয়েছে, সওদাগরের যন্ত্র আর গানের তালে মানুষ মাতোয়ারা হয়ে তার কাছে ভীড় করেছে । হয়ে এসেছে পড়ন্ত বিকেল । রোদ্রের ঝিলিক বুড়ীমা নদীর উপর এসে গেছে । রামধনুর রং বন জঙ্গলের গায়ের উপর খেলা করছে । অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে । হাট আস্তে আস্তে ফাঁকা হতে থাকে । নদীর উপরে কাঠের সেতু। সেতু পেরিয়ে কিছু দূর পাকা রাস্তা পেরোয়ে গ্রামের মেঠো পথ ধরে যেতে হবে সওদাগরকে । হাটের কাগজে জিলিপির মিষ্টি কুকুর চেটে খাচ্ছে । গান গাওয়া শেষে সওদাগর পয়সা গোনে তারপর শম্ভুর দোকানে এক কাপ চা খেয়ে গলা ভেজায় । তখনও দু- চারজন লোক বাজারে দাঁড়ানো । ওসব খেয়াল করার সময় নেই সওদাগরের । কুর্ত্তার পকেটে পয়সা পুড়ে । নিজের তৈরী দো- তারাটা পিঠে ঝুলিয়ে, বাই সাইকেল নিয়ে উঠে পড়ে । এক বারও ফিরে তাকায় না । কিন্তু পাশেই দাঁড়ানো ছিল উসকো - খুসকো চুলে টলটলে জল ভেজা চোখে এক মেয়ে অন্ধকারে সে একা!

বুড়ীমা নদীর তীরে অরণ্য ঘেরা পাহাড়ে ছনবাঁশ দিয়ে তৈরী সওদাগরের কুঁড়ে ঘর । সারাদিন

দরজা বন্ধ । ছন্নছাড়া একাকীত্ব জীবন । একাকী মনে আছে চাঁদের ঝলসানো আলোতে বুড়ীমা নদীর তীরে বসে নিজের যন্ত্রটা নিয়ে জীবনের কত বছর ধরে গান গেয়েছে সওদাগর । সংসার বলতেই মনে পড়ে শুভলক্ষীর কথা । সে তো অনেক আগেকার কথা ।

মা - বাবার ঘরে অনেক ভাই বোন ছিল, তাই বাপের খাওয়াবার মুরোদ ছিল না । চৌদ্দ বছর বয়সে উত্তর ত্রিপুরার পঞ্চম নগরের জমিদার মঙ্গল দেববর্মার মেয়ে শুভলক্ষীর সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং সওদাগর চলে যায় ঘর জামাই হয়ে । সওদাগরের পৈতৃক ভিটা ছিল ধনবিলাস গ্রামে, আজ ধনবিলাস, পঞ্চম নগর সবই সওদাগরের কাছে স্মৃতি । সওদাগর যখন বিয়ে করে তখন তার বয়স চৌদ্দ আর শুভলক্ষীর বয়স ন বছর । নাক দিয়ে গড়গড় করে সিকনি গড়ায় । লালচে রং এর মাথায় চুল ।

সওদাগর অতসব বুঝেনি । সে জানে বিয়ের পর শুভলক্ষীকে নিয়ে যাবে নিজের ঘর ধনবিলাসে। কিন্তু আর কখনো যাওয়া হয়নি, এখন তো সওদাগর ষাটর্দ্ধো বৃদ্ধ । মরমিয়া গান গেয়ে গ্রাম শহর উজোর করে চলে । সেই ছোটবেলার বিয়ের দিন, সওদাগর ও কাঁদে, শুভলক্ষী ও কাঁদে, শুভলক্ষীর নাক দিয়ে সিকনি ঝরে, সবার কত হাসাহাসি, যাই হোক শ্বাশুড়ী মাতা বুঝিয়ে সুজিয়ে দুজনকেই সান্তনা দেয় । সওদাগর বলে আমি কবে বাড়ী যাবো । সবাই হেঁসে বলে এখন এটাই তোমার ঘর । শ্বাশুড়ী বলে আমরাই তোমার মা বাপ, দক্ষিণ ভিটার ঘরটুকু তোমার ঘর ।

পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে সওদাগর রাতের আধাঁরে শুয়ে শুয়ে চুপচাপ কাঁদে । কেউ দেখে না শুধু মনে পড়ে শুভলক্ষীর কথা আর ফেলে আসা - তিন মাসের আদরের মেয়ে সুপ্রিয়ার কথা । মনে পড়ে শৈশবের পঞ্চম নগর বালোড়ারী স্কুলের কথা, গ্রামের রাস্তা । আমবাগান, কাঁঠাল বাগানের কথা । তেতুই তলার কথা । যদিও সবই স্মৃতি ।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে যদি শুভলক্ষীর জন্য ভালবাসা, তবে হঠাৎ বিচ্ছেদ কেন ? কারণ নাবালক সওদাগরের শ্বশুরালয়ে ছিল সকাল থেকেই কাজের তাড়া । গোয়াল ঘর সাফ কর, মহিষ নিয়ে জমিতে যাও, লাঙল দাও । জমি থেকে ঘাস কেটে আন, ধানের আঁটি মাথায় নিয়ে আস্, ধান ঝাড়, ইত্যাদি ইত্যাদি । সারাদিনে শুভলক্ষীর দেখাটি মিলেনি, শুভলক্ষী লাতা বুলায়। মায়েদের সাথে ধান সিদ্ধকরে, পাছ্ড়া বুনে । রাতের বেলা নানির সাথে নানির ঘরেই শুয়ে থাকে । শুভলক্ষীর নাকি বিয়ে হলেও বিয়ের ফুল ফুটে নাই ।

সওদাগরের একদম ভাল লাগত না । শৈশবেই বন্ধুহীন হয়ে সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ । সে পুরানো তেঁতুল গাছের নীচে বসে থাকে । পাতাঝরা বটগাছের পেছনে লুকিয়ে একলা থাকা কোকিল পাখীকে মনে মনে খুঁজে বেড়ায় । বনে কোথায় বনশালিক ডিম পেরেছে তা খুঁজতে যায়, এদিকে ছাড়া পাওয়া মহিষগুলো ধানক্ষেত উলট পালট করে ফেলে, দেখে শ্বশুর মশাই বেত দিয়ে

বেদম প্রহার করে । দুঃখে ক্ষোভে সওদাগর একদিন পালিয়ে ধনবিলাস নিজ গ্রামে পালিয়ে আসে কিন্তু তার বাপের বিন্দুমাত্র দুঃখ হলো না , বলে নিজের ভাত নেই শ্যালা কোত্থাকে খাওয়াবো , কালই সকালে চলে যা।

সকালেই সওদাগর পুনরায় বাড়ী থেকে বের হয়ে রওয়ানা দেয় , গ্রামের মাঝখানে বন্ধুদের খেলাধুলো । শৈশবের গ্রাম , নদী একা একা দাঁড়িয়ে অনেক কেঁদেছিল কিন্তু কি করবে ভাগ্যের পরিহাস , সওদাগর পুনরায় ফিরে এলো শ্বশুরালয় । এবার কাজের মাত্রা দ্বিগুন বেড়ে গেল , সাথে উপহার লাথি , কিল , বেত্রাঘাত , জামাই বলে কোন সমাদর বা খাতির ছিল না । এভাবে সওদাগর একুশ বৎসরে পা দেয় , সবার অলক্ষ্যে সওদাগর - শুভলক্ষী একে অপরের সাথে মিলে , শুরু হয় গোপন প্রনয় । এ ভাবে শুভলক্ষী সন্তান সম্ভবা হয় , সওদাগর মনে মনে খুব খুশী হয়ত তার উপর জুলুম কমবে । কিছু দিন পর সওদাগর - শুভলক্ষীর অকৃত্রিম ভালবাসার ফল জন্ম নেয় এক ফুটফুটে মেয়ে। আতুর ঘরেই সওদাগর মেয়ের নাম দেয় সুপ্রিয়া । কিন্তু কিছু দিন যাবার পর সওদাগরের উপর পরিবারের লোকজনের অত্যাচার বাড়তে থাকে এই বলে এতদিন ছিল দুপেট এখন তিন পেট এর উপর ঠিক ভাবে কাজ করিসনে । যাই হোক সব লাঞ্চনা গঞ্জনা সয়েও সওদাগর মুখ মুঝে থাকে ভাবে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে । কিন্তু না এক রাত্তিরে সওদাগর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে । পরের দি৲ সকালে জমিতে যেতে পারেনি , সেদিন বিকেলে তার শ্বশুর সম্বন্ধী তাকে দারুণ ভাবে গ্রামের লোকের সামনে লাঠিপেটা করে । এবার এই অপমান যুবক সওদাগরের মাথা হেট করে দেয় ।

রাতের আঁধারে বেকার যুবক সওদাগর প্রিয়তমা শুভলক্ষী ও প্রাণসম কন্যা সুপ্রিয়াকে ফেলে অজানা উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় । হাটে , গঞ্জে কখনো যাত্রাদলের নাটক , কখনো কীর্ত্তন দলের বাঁশুরিয়া, এভাবে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘুরতে শুরু করে ঠিকানা বিহীন ভাবে । এ ভাবেই তার হাতঘড়ি হয় দো- তারা বাঁজানোর আর পল্লীগানের সুর দেওয়ার । একা বিস্বাদভরা জীবন অন্য কিছু ভাবার সময় কোথায় । অনেক জায়গাতে সুঠাম যুবক সওদাগরকে বিয়ের প্রস্তাবও দেয় । কিন্তু না সওদাগর অনঢ়, এ যেন বিশাল সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে ভেসে আসা সওদাগর । এ ভাবে একদিন সওদাগর রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত বিশাল পল্লীগায়কের পরিচিতি নিয়ে আসে । সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে বহু বসন্ত কেটে গেছে , যখন সওদাগরের বয়স ৫২ বৎসর এবং নিজে কিছুটা সচ্ছল তখন সে শুভলক্ষী ও সুপ্রিয়ার খোঁজে পঞ্চম নগর যায় কিন্তু না শুভলক্ষীকে ও পেল না , না পেল তার মেয়ে সুপ্রীয়াকে , ভারাক্রান্ত মনে নিজ জন্মস্থান ধনবিলাস গিয়ে দেখে মা বাবা মরে আদ্যশ্রাদ্ধ হয়ে গেছে । আর এ গ্রাম তার শৈশবের গ্রাম নেই আধুনিকতার ছোঁয়া সেই পুরানো বন্ধুরাও নেই । সওদাগর জন্ম ভূমিতে পরদেশী ।

সওদাগরের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে কিন্তু আজ বয়সের হাতছানি সওদারগকে শুভলক্ষী , সুপ্রিয়ার

কথা ভাবিয়ে তুলে ।একটি ছোট্র ঠিকানা ও আছে কিন্তু ঠিকানাটা যেন চিঠি বিহীন । কোথাও অসহায় মা মেয়েকে দেখলে পকেট থেকে দশ , পাঁচ টাকার নোট বের করে বলে তোমাদের টাকার দরকার । নাও টাকা, বলে হাত বাড়িয়ে দেয় ।

ইচ্ছা না থাকলেও মানুষের অনুরোধে দো -তারা বাঁজিয়ে গান গেতে হয় । মানুষের মনোরঞ্জন ও সওদাগরকে এখন খুশী করতে পারে না । এত সবের পরে ও হাটে এসে গান গায়তে হয় সওদাগরকে। প্রায়শঃই সওদাগর দেখতে পায় দূরে দাঁড়িয়ে উস্‌কো , খুসকো চুলে টলটলে জলভেজা চোখে এক মেয়ে (যুবতী) তার দিকে তাকিয়ে আছে । আসর ভাঙ্গার সাথে সাথে চলে যায় । এতদিন ব্যাপারটা দেখেও সওদাগর কিছু বুঝে উঠতে পারেনি , কারণ গান গেয়ে ক্লান্ত হয়ে সে শম্ভুর দোকানে এককাপ চা খেয়ে গলা ভিজিয়ে চলে যায় , কারণ সওদাগরের কোন পিছুটান নেই । কিন্তু ঐ দিন সওদাগর ভাবে কেন মেয়েটি জলভরা চোঁখে দাড়িয়ে রইলো । আসর শেষে ২/৩ দিন সওদাগর মেয়েটিকে ডাকে, কিন্তু না অভিমানী মেয়েটি অপেক্ষা না করে কান্না ভরা মুখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় ।

সওদাগরের বুকে প্রচন্ড ব্যাথা লাগে , এই হাটে এখন আসতে না চাইলে ও কেন জানি এখন তাকে আসতে হয় । বোধ হয় রক্তের টানে , এত সবের মানে বুঝি না সওদাগর হয়তো মনের নিরব যন্ত্রণা তাকে টেনে নিয়ে আসে ।

এখন সওদাগর রাতে ও ঘুমাতে পারে না । মেয়েটির কথা ভাবে । মনে পড়ে শুভলক্ষীর কথা। মাঝে মাঝে অকুতোভয় হয়ে দরজা খুলে বনের দিকে তাকিয়ে থাকে ঝি ঝি পোকার ডাক শুনে , ভাবে যদি তার শুভলক্ষী তাকে ডাকত । নিজের দুঃখ আড়াল করতে নিজস্ব ভঙ্গীতে সুর দিয়ে শ্যামাচরণ পাড়ার জঙ্গলে মাঝ রাতে বসে বসে দো - তারা বাঁজিয়ে গান গায় । ভাবে যদি শুভলক্ষীকে পাই একটি বার তবে বলবো , শুভ তুই ছাড়া আমার আর কেউ নাই রে লক্ষী রাগ না করে একবার আস্‌ না।

এক সন্ধ্যায় হাটে গানের আসর শেষ কুড়ানো পয়সা গুলো কুর্তার পকেটে পুড়ে । দো - তারা কাঁধে ঝুলিয়ে সাইকেল নিয়ে ঘরে যাইতে চাইলে , আর এগোতে পারে না সওদাগর । হারিয়ে যাওয়া শুভলক্ষী আর সুপ্রিয়া তাকে যেন দাঁড় কীরয়ে রেখেছে । বুড়ীমা নদীর হাওয়ার থির থির করে কেঁপে উঠে সওদাগর । কাঁধের দো- তারা যেন বেজে ওঠে । বসে পড়ে সওদাগর । উসকো কুসকো চুলে মেয়েটি ছুটে আসে বলে বাবা আপনি কে ? সওদাগর প্রশ্ন করে তোমার নাম কি ? মেয়েটি বলে উঠে আমি সুপ্রিয়া । সওদাগর জিজ্ঞেস করে তোমার মার নাম কি শুভলক্ষী । বলতেই মেয়েটি কেঁদে উঠে। সওদাগর বলে তোমার মা কোথায় ? মেয়েটি বলে উঠে ছোট বেলায় বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে সুদুর পঞ্চম নগর গ্রাম থেকে , কিছুদিন বাদে মা পাগল হয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে । তারপর থেকে অনেক খুঁজেছি মাকে পাই - নি । খুঁজতে খুঁজতে ভিখারিনীর বেশে আজ আমি এখানে । বলতে পারো আমার মায়ের ঠিকানা, সওদাগর বলে উঠে আমার দিন কেটে গেছে খোঁজাখুঁজিতে ।

আগামীর পথ কে জানে ?

আমার মনে হয় আধুনিকত্ববাদের যুগে নিজেদের প্রগতিশীল বলে প্রচন্ডভাবে জাহির করি , কিন্তু বাস্তবটা হলো আমরা তার চাইতে অনেক বেশী রক্ষণশীল ও আত্মকেন্দ্রিক । রক্তচোষারা এখনও সম্পূর্ণ স্বভূমিকায় , বিন্দু বিসর্গ ভুলের ও ক্ষমা নেই । স্বার্থ ও বিনিময় দুটো শব্দের বন্ধুত্ব হয়ে আছে আজো, দাম না দিয়ে কোনও কাজ করানো খুবই মুস্কিল । তারপরেও ভাবি জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, সৃষ্টি এবং শ্রেষ্ঠ মানুষকে কঠোর সময়স্রোতে ও মনে রাখা উচিত । আমার বিশ্বাস নশ্বর দেহের পতন হয় কিন্তু সৃষ্টির ধ্বংস হয় না । তাই তো সামাজের ইতিহাস । জীবন মাটির সম্পর্ক , ভুমিতেই শেষ । এ নিয়েই বাস্তবতার নিরীখে লেখা খন্ড গল্পকাহিনী ।

বাঁশের কঞ্চির সুঁচালো ডগা দিয়ে তৈরী বাঁশের বেড়া বাড়ীর চারধারের শোভা বর্দ্ধন করে আছে । গ্রাম্য কলোনী আভিজাত্যতার কোন ছাপ নেই । কলোনীর নাম নারায়নপুর কলোনী । নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার সুখেন বাবুর । ভিঠিতে মাটির কোঠা , বাড়ীর সামনে কিছু ফুলের গাছ । এ ছাড়া কিছু সব্জীর গাছ । স্ত্রী , দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান নিয়ে সুখেন বাবুর সংসার । বড় মেয়ের নাম অপর্না , মাঝে ছেলে অনিমেষ , ছোটমেয়ের নাম সুপর্না । সুখেন বাবু ছোট একটা কারখানাতে শ্রমিকের কাজ করে । সকালে বেড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ঘরে ফিরে আসে । ঘরে স্ত্রী ও বসে নেই পুরানো কাগজে তৈরী ঠোঙা বানিয়ে মহাজনদের দোকানে বিক্রী করেন । এ ভাবেই দিন কেটে যায় সুখেন বাবুর । প্রচন্ড আর্থিকঅনটনে ও সংসারে কখনো কোন অশান্তি স্থান করে নিতে পারেনি । ক্রমে সুখেন বাবুর বড় মেয়ে অপর্না স্থানীয় গ্রামের স্কুলে নবম শ্রেনীতে উঠে । এর মাঝেই হঠাৎ সুখেন বাবুর স্ত্রী শীলাদেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন । ক্রমে ক্রমে শীলা দেবী প্রচন্ড রুগ্ন হয়ে পড়েন । সুখেনবাবু আর্থিক অস্বচ্ছলতার মাঝে ও অনেক চেষ্টা করেন স্ত্রীকে সুস্থ করার জন্য । কিন্তু না! বিধি বাম , শেষ রক্ষা হলো না । অচিরেই শীলাদেবী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন । শুরু হয় সুখেনবাবুর

দুঃশ্চিন্তা । মেয়ে বড় হয়ে গেছে , তার উপর দু -চারটে পয়সা যা ছিল স্ত্রী শীলা দেবীর অসুস্থতার কারণে এখন সুখেনবাবু কপর্দকশুন্য। এভাবে কেটে যায় আরো দু বছর। অর্থাভাবে অপর্নার পড়াশুনা বন্ধ । ছোট ভাই অনিমেষ ক্লাস নাইনে পড়ে , বোন (ছোট) সুর্পনা ক্লাস সেভেনে পড়ে । সুখেনবাবু যেন দিক বিদিক শুন্য হয়ে আছে । নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা ।

একদিন সন্ধ্যায় সুখেনবাবু ছেলেমেয়েদের বলে উঠে দেখ তোর মা মারা যাওয়ার পর আমার সংসারটা যেন অন্ধকার হয়ে গেছে । অপর্না বলে উঠে বাবা তুমি ছিলে নদীর স্রোতের মতন । এখন ক্যামন য্যান থম মারা মানুষ ।

সুখেন বলে উঠে , মা কী করি বল , দিনকাল খারাপ হয়ে গেছে । বাঁচার জন্য কাঁড়ি টাকা চাই, কেপিটাল চাই । যার পকেটে নোট আছে সে এগিয়ে যাচ্ছে ।

তারপর সুখেনবাবু চুপ করে থাকে । পাশের বাড়ীর রাজা বাবুদের বাড়ীর মেয়ের বিয়ে । সানাই বাজছে । শব্দটা তার বুকের ওপর উঠে আসে । বড় মেয়ে অপর্না বড় হয়ে গেছে , স্কুল বন্ধ, ঘরে বসিয়ে রাখাও ঠিক নয় । চিন্তায় চিন্তায়সুখেন বাবুর মনটা যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায়।

সুখেনের দীর্ঘশ্বাস পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে । ভাবে আমরা তো পোড়া কপাল । স্ত্রী শীলাও আমাকে ছেড়ে অকালে চলে গেল । এখন ছেলে মেয়েদের নিয়ে আমি কি করি । গরীবদের কান্না , দুঃখ ভালবাসা , হৃদয় এ সবের কোন দাম নেই । কেই বা শুনে । সুখেন খাটতে খাটতে হা- ক্লান্ত , ছেলে মেয়েদের মুখে ভাত দিতে হবে যে । সুখেন ভাবে জীবন তার সাথে মস্করা করে আর সর্বনাশীর হাসি হাসে । আলো বুঝানো অন্ধকার ঘরে সুখেনের আচমকা ঘুম ভেঙ্গে উঠে । ক্লান্ত শরীরে তাকিয়ে থাকে মনে হয় শীলা বলছে তুমি ভাববে না , সব ঠিক হয়ে যাবে ।

ভাবনা চিন্তার জগৎ , কিন্তু সময় যে আপন গতিতে দ্রুত বেগে চলে গেছে কিন্তু দুর্ভাগ্য তো ফুরায় নি । ক্রমে তিনটি বছর কেটে গেল । একদিন সকালে সুখেন কারখানায় যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে এমন সময় এলাকার মুরুব্বী শ্যামল ঠাকুর সুখেনের বাড়ীতে উপস্থিত । বলে উঠে সুখেন তোর সাথে দু -টো কথা আছে । সুখেন বলে কাকাবাবু আমি সন্ধ্যায় কারখানা থেকে এসে আপনার সাথে দেখা করব । এই বলে সুখেন কারখানার উদ্দেশ্যে আর শ্যামল ঠাকুর গৃহভি মুখে চলে যান। সন্ধ্যায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সুখেনবাবু বাসে চড়েন ঘড়ের উদ্দেশ্যে কারণ এখনতো ঘরে আর শীলা নেই , বাইরে সময় নষ্ট করার কোন সুযোগ নেই । বাস থেকে নেমে সুখেনবাবু ঘড়ে না গিয়ে সোজা চলে যান এলাকার প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিত্ব শ্যামল ঠাকুরের বাড়ীতে । শ্যামল ঠাকুরের বাড়ীর উঠোনে গিয়েই হাঁক মারেন শ্যামল কাকা , আমি সুখেন বলছিলুম সন্ধ্যায় আসব। এসে পড়লাম । শ্যামল ঠাকুর জিজ্ঞেস করেন সুখেন ঘরে যাস্নি সুখেন বলে উঠে না কাকা । শ্যামল ঠাকুর বলে

উঠেন হাত মুখটা ধুঁয়ে নে। তারপর একটু কিছু খেয়ে নে তারপর কথা বলব। এই বলে শ্যামল বাবু ছেলের বউকে ডেকে পাঠান বলেন বৌ মা সুখেনকে কিছু খেতে দাও। সুখেন, শ্যামল ঠাকুরের বাড়ীতেই টিফিন করে। তারপর বারান্দায় কাঠের পাটাতনের উপর বসে পড়ে। শ্যামল ঠাকুর আরাম কেদারায় বসে আরাম করছিল। সুখেন জিজ্ঞেস করে কাকা বাবু সকালে কেন খবর দিয়েছিলেন। শ্যামল ঠাকুর বলে উঠেন অতো অস্থির হলে চলবে। বস্ না বলব। কিন্তু সুখেনের অস্থিরতা ছেলেমেয়েদের জন্য তো আর কাউকেও বলা যাচ্ছে না। যাই হোক এলাকার মান্যবর শ্যামলবাবু উনার কথা ওতো ফেলা যায় না। কিছুক্ষন বাদে শ্যামলবাবু সুখেনকে জিজ্ঞেস করে, সুখেন তোর বড় মেয়ে অপর্না তো বড় হয়েছে বিয়ের ব্যাপারে কিছু ভাবছিস কি ? উত্তরে সুখেন বলে উঠে ভাত খাওয়ার জো নেই কাকা, মেয়ে বিয়ে দেবো কোত্থকে। শ্যামলবাবু বলে উঠেন বাবা যখন হয়েছিস পিতার কর্তব্য তো তোকে করতে হবে রে ? এলাকার লোক নিশ্চিত তোকে কিছু না কিছু সাহায্য করবে। সুখেনের প্রশ্ন কাকা কে নেবে আমার মেয়েকে। শ্যামলবাবু বলেন তা তোকে ভাবতে হবে না। একটা ভাল ছেলের সন্ধান পেয়েছি। বামুটিয়ার শুধাংশু মিত্রের ছেলে কমলের। বেশ জায়গা সম্পত্তি ও আছে তা ছাড়া আছে বাপ দাদার আমলের ধানের ব্যবসা, পাত্র মন্দ নয়। পরিবারটুকু ও ভালো। তোর সম্বন্ধে ও রা জানে। যে ভাবেই হোক ওরা অর্পনাকে দেখেছে পছন্দ ও করেছে। এখন সুখেন তুই ছেলেকে দেখে নে, তারপর বাকী কথা। উভয়পক্ষের কথপোকথনের মাঝে কমল ও অর্পনার বিয়ে ঠিক হয়। কন্যাদান দায়গ্রস্থ পিতা। সুখেনের নিদ্রাবিহীন চোখ। সুখেনের সচতুর ছেলে বলে উঠে বাবা এখন ভাববার সময়ই নই। দিদিকে বিয়ে দিতে হবে। ছেলে অনিমেষ বাবাকে বুদ্ধি দেয়, বাবা বাড়ীর অর্ধেকাংশ বিক্রি করে ফেলো। কত বার ঋন করবে। ছেলের যুক্তি নিয়ে সুখেন বাড়ীর পেছনের অংশটুকু বিক্রি করে বড় মেয়ের বিয়ে দেয়। পরবর্তীতে অর্পনা ও সুখের ঘর সাজাই, ক্রমেই দু-বৎসর বাদে অর্পনা পুত্র সন্তানের জননী হয়, সুখেন দাদু হয়। কায়ক্লেশে অনিমেষ বি. এ পাশ করে। সুখেন এখন দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ছেলে অনিমেষ পাঁড়াগায়ে ছাত্র পড়াই আর সুখেন যা রোজগার করে তা দিয়ে কোনক্রমে সংসার চলে কিন্তু ব্যাটার এখন চিন্তা সুর্পনা মাধ্যমিক পাশ করেছে। বাবা ছেলের কাজের জন্য সারাদিন বাইরে থাকে। সুতরাং সুপর্নাকে তো পাত্রস্থ করতে হয়। বাবা ছেলে মিলে চেষ্টার ক্রটি নেই। বিধাতারই ইচ্ছা, লক্ষীলুঙ্গা পঞ্চায়েতের তেবাড়িয়া গ্রামের স্বচ্ছল পরিবার সাধন বাবুর। ওই পরিবার থেকে ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় সুর্পনাকে তাদের ছেলে কিংঙ্করের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য।

সুখেন মনে মনে খুশী হয় কিন্তু বরপক্ষের দাবী দাওয়া যে বেশী। যাই হোক সুখেনের ছেলে অনিমেষ বাবাকে বলে অতো ভাববে না। সুপর্নাকে যদি ভাল বিয়ে দেওয়া যায় ভাবো তো তোমার

আর চিন্তা কিসের । আমি তো আছি । সুখেনের শুভাকাঙ্খী বলতে গ্রামের বৃদ্ধ শ্যামল ঠাকুর । শ্যামল ঠাকুর সুখেনকে বলেন , সুখেন আমি তোকে নগদ হাজার দশেক টাকা দেব । ভাববিনা মেয়ে বিয়ে আটকাবে না । যাই হোক শ্যামল ঠাকুরের পরামর্শে ও মধ্যস্থতায় সুর্পনার বিয়ে ঠিক হয় । কিন্তু অতো দাবী কিভাবে দেওয়া । অবশেষে ব্যাপ /ব্যাটা মিলে যুক্তি করে ফেললো ভিটে মাটি বিক্রি করে ভাড়া চলে যাবে । তাই হলো সুখেন পিতৃপুরুষের ভিটে মাটি বিক্রি করে দিলো । শুধু অনুরোধ ছিল মেয়ের বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যে সুখেন মাটি ছেড়ে দেবে । যেমন কথা তেমন কাজ । সুপর্ণার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পাঁচ দিনের মাথায় সুখেন ও ছেলে অনিমেষ ভাড়া বাড়ীতে চলে যায় । যদিও প্রচন্ড দৈন্যদশা কারণ বর পক্ষ্যের সম্পূর্ণ দাবী দাওয়া সুখেন পূর্ণ করে দিয়েছিল । বাপ , ছেলের রোজগারে দিন চলে । বিয়ের ২ মাস পরে ঘন ঘন ২/৩ বার সুপর্ণা বাবা ও দাদার কাছে আসে কিন্তু বাবাও দাদার করুন অবস্থা দেখে কিছু বলতে পারে নি । সুপর্ণা দু -বার বড়বোন অপর্ণার বামুটিয়ার বাড়ীতেও যাই। দিদিকে বলে দিদি আমি আর কষ্ট সহ্য করতে পারি না । আমার শ্বাশুড়ী আরতী বালা , ননদ টিংকু সাথে টিংকুর জামাই ও আমাকে প্রচন্ড মারধোর করে বাবার কাছে থেকে কুড়ি হাজার টাকা আনার জন্য । আমি অনেক বলেছি আমার বাবা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছে । এমনকি বাড়ী বিক্রি করে ভাড়া থাকে , বাবা কোত্থকে টাকা দেবে । কিন্তু না তারা কোন কথা শুনতে রাজী না। দেখো দিদি তাদের অবস্থা ভালো , ছোট একটি চা - বাগান ও আছে তারপরেও তারা আমাকে প্রচন্ড কষ্ট দেয় । দিদি আমি সহ্য করতে পারি না। আমার মনে হয় দিদি ওরা আমাকে মেরে ফেলবে । ছোট বোনের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনে দিদি অর্পনা স্বামীকে সব বলে অপর্নার স্বামী কমল । সুপর্ণার শ্বশুড় বাড়ী গিয়ে তাদেরকে অনেক বুঝান এবং তাদেরকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আসেন । তারপর মাস দুয়েক সুপর্ণা ভাল ছিল পুনরায় নরপিচাশকরা স্বমূর্ত্তি ধারণ করে অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুন বাড়িয়ে দেয় । বিয়ে হয়েছে সুপর্ণার মাত্র চার মাস । এর মাঝে একদিন দুপুরে কিংঙ্কর সুপর্ণাকে বেধরক মার মারে । সুপর্ণার পেটে আঘাত লাগে। যন্ত্রণায় সুপর্ণা কাতর হয়ে উঠে । বিকেলে যন্ত্রণা অসহ্য আকার ধারণ করে । এমতাবস্থায় সুপর্ণার শ্বাশুড়ী আরতীবালা ছেলে কিংঙ্করকে ডেকে পাঠান । কিংঙ্কর এলে আরতীবালা একটি ছোট্ট শিশি (বোতল) এনে কিংঙ্করকে বলে ঔষধ খাইয়ে দে একেবারে ভাল হয়ে যাবে পুড়ামুখী । কিংঙ্কর জোর করে সুপর্ণার মুখে ঔষধ ঢেলে দেয় । সুপর্ণা চিৎকার দিয়ে উঠে আমার বুক মুখ জ্বলে যাচ্ছে । কিন্তু না নরখাদকরা সুপর্ণার কোন কথা না শুনে পুনরায় জোর করে খাইয়ে দেয় এবং তার পরে চলে যাই । সুপর্ণার আর্ত চিৎকারে গ্রামের লোক এসে সুপর্ণাকে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে । সেখানে ডাক্তারবাবু সুপর্ণাকে সিরিয়াস দেখে জি.বি হাসপাতালে পাঠান। জি. বি হাসপাতালে সুপর্ণা তার উপর ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ ডাক্তার সহ সবাইকে

বলে । ৩ দিন জি.বি হাসপাতালে কষ্টভোগ করার পর ডাক্তারদের অক্লান্ত চেষ্টায় ও সুপর্ণাকে বাঁচানো সম্ভব হল না । ভর দুপুরেই পূর্ণ যৌবনা নিষ্পাপ হতদরিদ্র সুখেনের ফুলের মতো মেয়ে সুপর্ণা অত্যাচারীদের নির্ম্মম কষাঘাতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় । সুখেন ভেবে ছিলো মেয়ে তার সুস্থ্য হবে কিন্তু বাস্তব উল্টো হলো । সন্ধ্যায় যখন ভাড়াবাড়ীতে সুখেনের কাছে খবর এলো তার আদরের মেয়ে সুপর্ণা মারা গেছে । শুনা মাত্র সুখেন বুকের যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । সবাই মিলে সুখেনকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেই কিন্তু পথের মধ্যে সুখেন প্রাণ ত্যাগ করে। অভাগা অনিমেষ বাবা , বোনের চিতা সাজায় শেষ কৃত্য সম্পন্ন করে। আইন হয়তো অনিমেষদের বিচার দেবে । কিন্তু সুখেন সুপর্ণারা তো আর ফিরে আসবে না । অনিমেষ পিতৃ মাতৃহীন , বোনের অকাল প্রয়ানে শোকগ্রস্থ দিক বিদিক শুন্য যুবক , নেই তার স্থানী ঠিকানা। অনিমেষের জীবন জীবন মাটির সম্পর্ক সব ভুমিতেই শেষ । আগামী পথ কে জানে ?

জীবন পথের সন্ধানে

নিখোঁজ কেশবের বেঁচে থাকার সম্ভবনা নেই বললেই চলে। স্বামীহীনা একলা নারী বুঝতে পারে এই সমাজজীবন আদতে এক আদিম সভ্যতা ।একা একা দুঃসহ প্রতীক্ষা অসহ্য হয়ে ওঠে যত দৃঢ়চেতা হোক না কেন , তখনই মনের গোপনে অন্তজ্বালা প্রস্ফুট হয়ে বলে ওঠে আশ্রয় দাও ? হে ধরিত্রী ।

২০০০ ইং এপ্রিল মাসের এক তারিখ প্রতিদিনকার মতো কেশব দেব সরকার সকাল ৯ টায় অফিসের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন , স্ত্রী সাবিত্রীকে বলে যায় সন্ধ্যায় আগে ফিরার সময় বাজারটুকু করে নিয়ে আসবে । প্রতীক্ষা । কেশব ষ্টেটেষ্টিকস্ এর ইনভেষ্টিগেটর ডেপুটেশানে জম্পুইজলা ব্লক অফিসে আছেন । দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা, রাত ঘনিয়ে আসে কেশববাবু ঘরে ফিরে আসেনি , কোথায় খোঁজ নেবেন সাবিত্রী ।সাবিত্রীর মনে যেন তুফান আগুন খেকো হাওয়া বইতে শুরু করেছে ।উপদ্রুত এলাকা জম্পুইজলা কি জানি হয়েছে মনে অশিনী সংকেত , এর মাঝেই যেন কার মুখে শুনতে পেল ডেডবডি পাওয়া যায়নি । কার ডেডবডি , কিসের ডেডবডি , ভাবতে ভাবতে আকুল হয়ে পড়েন সাবিত্রী , ভাবেন মেয়ে সংঘমিত্রাকে কিছু বলবেন , তাও পারলেন না ।খোঁজাখুঁজি শুরু ক্রমে ক্রমে সাবিত্রী আত্মীয়পরিজনদের খবর দেন ।চলে খোঁজ খবর , অনেক খোঁজাখুজির পর

জানতে পারেন কেশববাবু অফিসে যাওয়ার সময় উনার সাথে ছিলেন শহরের বাসিন্দা অপর দুই কর্ম্মচারী একজন গ্রুপ " ডি" কর্ম্মচারী ৫২ বছর বয়স্ক জোৎস্না দেবনাথ, অপরজন ডি, আর ডব্লু বরুন দেবনাথ সবার বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল প্রতিটি পরিবারের লোক প্রচন্ড উৎকন্ঠায় আছে কেহই বাড়ী ফেরেনি। অতঃপর বিভিন্ন দিক দিয়ে খোঁজ নেওয়ার পর জানা গেল কেশববাবু, জোৎস্না দেবনাথ, বরুন দেবনাথ তিনজনেই আগরতলা থেকে জম্পুইগামী জিপে করে এক অফিসে যাওয়ার পথে একদল যুবক (সম্প্রীতির শত্রুরা) তাদেরকে গাড়ীথেকে ছাগল ভেড়ার মতো টেনে হ্যাচরে নামিয়ে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় এবং সবাই ছিল অস্ত্রধারী। সেই থেকেই কেশব দে সরকাররা নিখোঁজ। সাবিত্রীদেবীর মনে কতো ভাবনা, কেশব ফিরে আসবেই, নয়তো কী কী ঘটনা ঘটবে তা ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে পড়েন সাবিত্রীদেবী। পুলিশে খবর পৌছায়, তল্লাসী হয় কিন্তু কেশব আজো নিখোঁজ। কত খবর কত রটনা কিন্তু না আজো কেশব ফিরে আসেনি। দরজায় কেউ কড়া নাড়লেই সাবিত্রী দেবী ভাবে হয়ত কেশব ঘরে এসেছে, কিন্তু না দরজা খুললেই কোন আগন্তুক। সেই মর্মভেদী প্রশ্ন, কি কোন খবর পেলে, উৎকন্ঠার শেষ নেই কেশববাবুর মা, বাবা, ভাই বোনদের, চোখের জল আর হাহাকার কিন্তু সাবিত্রীদেবী সমেত পরিবারের লোকদের কোন সমস্যা হাল করতে পারেনি। সাবিত্রীদেবী ভাবেন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়া যদি জীবন হয় তবে যাকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকা সেই মানুষটাই যদি হারিয়ে যায় তবে জীবনধারণ সত্যি বড় মুশকিল। ভাবনার শেষ হয় না, অনেকে সান্তনা দেয় এ রকম অনেক মানুষ অপহৃত হয়েছে ফিরে ও এসেছে। অতো ভাববে না। কেশবতো এক বছর বাদেও ফিরে আসতে পারে। আত্মীয় স্বজনেরা বলে সাবিত্রী তোমাকে কিন্তু কেশবের মেয়ে সংঘমিত্রার কথা ও ভাবতে হবে। এ ভাবে একমাস গড়িয়ে গেল। না কেশবের কোন খোঁজ খবরই পাওয়া গেল না। এমনকি তার সাথে যারা গিয়েছিলো সেই জোৎস্না ও বরুনের ও কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। থানা, বাড়ী, মহল্লা, গ্রাম অনেক খোঁজ নেওয়া হয়েছে কিন্তু না কোন ক্লু কেহই পেলনা এ দিকে কেশবের বাবা রিটায়ার্ড পোষ্টাল অফিসার উপেন্দ্রবাবু দিনে দিনে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। দৃঢ়চেতা মানুষটি যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলছেন। বড় সন্তানের নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়ার পর থেকেই উৎকন্ঠা ও অঘুম আস্তে আস্তে উপেন্দ্রবাবু দুর্ব্বল হয়ে পড়ছিলেন মনের অসম্ভব যন্ত্রণা কারো কাছে ব্যক্ত করার মতো জো উনার ছিল না। ছেলের চিন্তায় চিন্তায় রুগ্ন হয়ে অবশেষে বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। দুঃশ্চিন্তার নির্ঘুম রাত ১২ জুন ২০০০ ইং উপেন্দ্রবাবুকে চিরনিদ্রায় রেখে প্রানবায়ু চলে যায়। টেবিলের উপর সাজানো কেশববাবুর ছবি যেন বলে উঠে আমার জন্য চিন্তা করো না সাবিত্রী। সাবিত্রী বলে উঠে ছবিটা যেন আমার মনে শ্মাশানঘাটের মতো হাহাকার করে ওঠে, আমি ও তো মানুষ, এভাবে কতদিন, সবাই সাবিত্রীকে সান্তণা দেওয়ার প্রয়াস

করে সাবিত্রী যেন অর্ধউন্মাদ । ঘরটা যেন মধ্যরাত্রির নিঝুম আবাসন মনে হয় কেশবের আত্মা তাকে কিছু বলতে চায় কিন্তু পারছে না । সাবিত্রীর সারা শরীর ভূকম্প প্রবন । অপেক্ষার দিন রাত ফুরোয় না , মনে হয় অপেক্ষার এক একটি মুহূর্ত গলে যাওয়া মোমবাতির মতন অনবরত ঝরে পড়ছে । বুকে হাহাকার অনিশ্চয়তা রাতের অন্ধকার যেন কফিনের ছেড়া কালো কাপড়ের টুকরো - সাবিত্রীর অসহায়ত্বের কথা বিপন্নতার বোধটুকুকে খুঁচিয়ে নাড়া দিচ্ছে । রাস্তা , ঘাটে , ঘরে যেই দেখুক শুধু বলে উঠে কি সাবিত্রী কেশবের কোন খোঁজ পেলে , প্রতিনিয়ত অযাচিত জিজ্ঞাসা যেন কারো কারো কাছে আত্মসুখ , আর তার সিঁথির হাতের শাখা মনে হয় কিছু সমালোচকের কাছে তির্যক দৃষ্টি । কেহ বা টিটকারী মেরে বলে , - বৌদি , কেশবদা কখন ফিরে এলেন । কে বোঝে কার ব্যাথা ব্যাঙ্গ রসিকতা , খুঁচানি যে আমাদের নব্যসমাজের আনন্দ , আদিমদের তাহলে দোষ কোথায় ? দিন রাত সময় কেটে যায় , কেশবের কোন হদিশ নেই , কেশব আজ অতীত স্মৃতি ফটো অ্যালবামে বন্দী । কেন না এতো দিন পর নিখোঁজ ব্যাক্তিটির বেঁচে রইবার সম্ভাবনা নেই কারণ না করলো কোন সন্ত্রাসদলের পক্ষ থেকে মুক্তিপনের দাবী বা না পাঠালো কেউ চিঠি ,বা না করলো কেহ টেলিফোন । ৩৯ বছর বয়স্কা সাবিত্রী জীবনের সব সুখ আহ্লাদ ভুলে গেছে কিন্তু চোখে ভেসে আসে জীবনের কত আলাপন ফেলে যাওয়া সময়ের আনন্দ , আমেজ মিশিত ভালবাসা , একমাত্র কন্যা সংঘমিত্রাকে নিয়ে কতশত ভাবনা । আজ শুধু অপেক্ষা তা যেন আলোছায়া নিবিড় । ইদানিং সাবিত্রী যেন আকাশভারী বোঝা সামলাচ্ছে ।এখানে সমবেদনা থেকে সমাজের কটাক্ষটাই যেন বেশী জীবনের অস্তিত্বটুকুই যেন চিরে চিরে দিচ্ছে , তবু ও সাবিত্রী ভাবে আমি কেশবের জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করব । এক এক সময় কাজে বেরোলেই অনেকের সামনা সামনি হতে হয় দেখা হলেই একটাই প্রশ্ন কি কেশবের কি কিছু খবর পেলে কিন্তু সাবিত্রীকে জিজ্ঞেস করে কেশবের বেঁচে থাকা বিষয়ে কোন তথ্য জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়ার মতো কিছু নেই । সাবিত্রী বুঝে যে যাই বলুক সাবিত্রীর অপেক্ষাই মনের মধ্যে কেশব বেঁচে থাকে । সুতরাং স্ত্রী হয়ে সাবিত্রী কখনো অপেক্ষার অবসান চাইবে না । কেননা স্ত্রী চায় স্বামী কেশব বেঁচে থাকুক ।

সমস্ত প্রকার চেষ্টাই বৃথা কিন্তু কেশব ফিরে আসেনি মাস গড়িয়ে বছর , শুধু অপেক্ষাই রইল সাবিত্রী , তাকে যে কেশবের একমাত্র কন্যা সংঘমিত্রাকেও মানুষ করতে হবে । তার জীবনের হাল করে দিতে হবে । ওঝা , বৈদ্য , জ্যোতিষ আরো কত কী মনের আবেগে যে যেখানেই বলেছে সেখানেই গেছে একমাত্র যেতে পারেনি বিধাতার দরবারে । কারন সাবিত্রী তো জানত কেশবের প্রয়োজনটুকুতো অবহেলা করা যায় না । সাবিত্রীর স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরে খান খান । ১লা এপ্রিল ২০০০ এর ঝড়ো বিপর্যয়ের পর বিন্দুমাত্র কোন সন্ধান সুত্র পেল না সাবিত্রী । কেশবের ফটোগ্রাফ ও দেওয়া হয়েছে । কিন্তু সবই নিস্ফল । পুত্রশোকে সহ্য না করতে পেরে কেশবের পিতৃবিয়োগের পর আস্তে

আস্তে মাতৃদেবী ও বিছানায় লুঠিয়ে পড়েন একদিন কেশবের মা ও পুত্রশোকে ইহোলোক ত্যাগ করে চলে যান কিন্তু সাবিত্রীকে বাঁচতে হবে মেয়ে , সংঘমিত্রার জন্য । অনেকে টিপ্পনী কাটে সাবিত্রীকে বলে স্বামী ছাড়া কি অঙ্গের শাঁখা সিঁদূর মানায় ? কিন্তু সাবিত্রীর কি করার আছে । কেশব নেই তার তো কোন দলিল ছিল না । কেশবের ডেড - বড়ি পাওয়া যায়নি , তবে কোত্থেকে হবে পোষ্টমর্টেম কোথায় পাবে ডেথ সার্টিফিকেট । পোড়া কপাল যেন পাল্টায় না । টেবিলের উপর কেশবের ফটোটুকু যেন সাবিত্রীকে জীবনে পথ চলার উদ্দম, সাহস জোগায় । স্বপ্নভাষী কেশবের ফটোটুকু যেন নিষ্পলক স্ত্রী সাবিত্রী ও মেয়ে সংঘমিত্রাকে পথ দেখায় । মনে হয় কেশব বলে দিচ্ছে সাবিত্রী বিপদে বিচলিত হবে না । মনটুকু বড় রেখো জীবনে আটকাবে না , কে কি বলল অতকিছু দেখার জন্য ফিরে তাকাবে না , সাবিত্রী ভাবে তোমার অভাবটুকু প্রচন্ড কষ্ট , তোমাকে ছাড়া কি ভাল থাকা যায় কেশব , জীবনের দায়িত্বটুকু ঠিকভাবে পালন করতে পারব কি না , এ যে আমার শঙ্কা , মনে হয় কেশব বলে রাস্তার দুরত্ব যতই হোক । সাবিত্রী তোমাকে বাঁচাতে হবে চলতে হবে নিজের রাস্তায় । পোষাকে মানুষের মন বদলানো যায় না । অপেক্ষার রাস্তা ফুরায় না। কেশবের নির্দেশিকার রাস্তায় হেটে চলেছে সাবিত্রী। সংঘমিত্রাকে ঘর সাজিয়ে দিয়েছে , মাতাপিতা উভয়ের কর্তব্যটুকু যেন আজ সাবিত্রীর একার কাঁধে সংঘমিত্রা স্বামী নিয়ে সুখে থাকুক তাই আজ সাবিত্রীদেবীর কাম্য । মেয়ের সন্তানের আদর যেন সাবিত্রীর মনের ক্ষতের উপসম । তবুও একটা সময়ে কেশবের স্মৃতি সাবিত্রীকে ভয়ানক তাড়া করে। ফেলে আসা দিনগুলো ভাবনার জগৎ এ আলোড়িত করে তুলে । কিন্তু কেশবতো আজোও এলো না। বর্বররা যদি কেশবের প্রাণও ছিনিয়ে নেয় তবে কেন অন্তত কেশবের দেহটুকু দিলো না অন্ততঃ শেষ দেখা দেখার জন্য । কে শোনে অতসব কথা । কেই -ই বা দেবে অতশত প্রশ্নের উত্তর । কেশবের সাথে সেই জ্যোৎস্নাদেবী ও বরুন ও তো ফিরে এলো না । তারা ও তো নিখোঁজ সেই উৎকন্ঠা তো তাদের পরিবারে ও কেউ বা হারিয়েছে , স্বামী , কেউ বা স্ত্রী , সন্তানরা হারিয়েছে মা , বাবা । অন্ততঃ ডেডবডি যদি পাওয়া যেতো পরিবারগুলো কনফিউসড থাকত না । সবাই বুঝতে পারে বর্বররা ওদের প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে । হয়ত পাহাড় , জঙ্গলের কোন অজানা গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে নিথর দেহগুলো কিন্তু পরিবারগুলো প্রতীক্ষা কিভাবে শেষ হবে তার উত্তর কে দেবে। বিনা কারণে হত্যায় কি পাবে বর্বররা ? হিংসাতো কখনো শেষ কথা বলতে পারে না কিন্তু পরিবারকে ছন্নছাড়া বানিয়ে দেয় । এ ভাবেই কিনা , রাত্রি , দিন , মাস , বছর ,অতিক্রান্ত কিন্তু কেশবরা আজো ঘরে ফেরেনি । প্রতিদিন সূর্য্য ওঠে আবার অস্ত ও যায় কিন্তু সাবিত্রীদের অপেক্ষার পথ যেন ফুরোয় না । এক অসহ্য যন্ত্রণা নিয়েই তাদের বেঁচে থাকতে হয় জীবন পথের সন্ধানে । সময় কারো অ পেক্ষায় থাকে না , সময় বদলে যায় ।

তিনটি খুন

শোকস্তব্দ , ওরা প্রচন্ড যন্ত্রনায় আছে , শ্মশানে নিস্তব্দ রক্তাক্ত হিমশীতল দেহগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে । বাবার নিথর দে, রক্তাক্ত মায়ের মুখ , উপুড় হয়ে দিদার শবদেহ । জীবনবোধ সন্তানের কাছে কান্নাভরা প্রলাপ হয়ে ওঠে । সন্তানের জীবন লক্ষহীন জীবনযুদ্ধ কথা হচ্ছিল ২৮ বৎসরের শান্ত , সুঠাম যুবক দুলুর সাথে । ভালো নাম আশুতোষ চক্রবর্ত্তী , কথা বলতে বলতে দুটি চোখ ছলছল হয়ে উঠে জলে । বললাম কেঁদো না শক্ত হও । বলল বাবার নাম পরিমল চক্রবর্ত্তী , বাবার কথা কিছুই মনে নেই । শুধু স্মৃতি তাড়া করে । ১৯৮০ সালের ১৭ই জুন তখন আমার বয়স ২ বৎসর ৪ মাস । জীবনের কিছু বুঝার আগেই বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমাদের বাড়ী ছিল সিধাই থানাধীন বড়কাঠাল এলাকাতে । পুরানো কালীমন্দিরের পাশে ছিল আমাদের বাড়ী । ১৭ই জুন ১৯৮০ ইং ঠিক ভরদুপুরে একদল হামলাকারী সম্প্রীতির শক্ররা একযোগে আমাদের গ্রামে হামলা চালায় । দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে বাড়ী ঘর বন্দী গৃহপালিত পশুর পোড়া গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠে । আমাদের পরিবার রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন উপজাতি সমাজের বয়স্করা যেমন সুশীলা দেববর্মা, ননী দেববর্মারা । কিন্তু হিংস্র হামলাকারীদের সামনে তারা অসহায় হয়ে পড়ে। হামলাকারীরা তাদের উপর ও আক্রমণ শুরু করে । চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা , আক্রান্ত মানুষের চিৎকার আর বন্দী বোবা প্রাণীদের গগণভেদী আর্তনাদ নিরুপায় প্রাণ নিয়ে যে যেদিকে পথ দেখে পালাতে শুরু করে । আকস্মিক ঘটনার হতভম্ভতা কাটিয়ে আমার বাবা পরিমল চক্রবর্ত্তী আমাকে বুকে জড়িয়ে ও মাকে সাথে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করে । হয়ত বাবা জানতেন না সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব ফেলে রেখে উনাকে চিরদিনের মতো পালাতে হবে । কিন্তু রাস্তা পালিয়ে আসার পর বাবা পুনরায় আক্রমণের মুখে পড়ে । ঘাতকের তীরের ফলা সজোরে এসে

আমার বাবার বুকে বিঁধে । স্ত্রী সন্তানকে রক্ষার দায়িত্বতো বাবার কাঁধে , বাবা সজোরে টান মেরে বুক থেকে তীরের ফলা বের করে দৌড়তে থাকেন , রক্তাক্ত আমার বাবার বুক ঘাতকের তীরের ফলা আমার বাবার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে । দুর্গম পথ অতিক্রম করে বাবা তখনকার মতো মাকেও আমাকে রক্ষা করেছেন । তারপর বাবা হাসপাতালের শয্যায় প্রাণত্যাগ করেন । ঘাতকের শানিত অস্ত্র বাবার প্রাণ কেড়ে নিল আর আমরা হলাম ছন্নছাড়া । বাড়ীঘর , জমি পুকুর , গাবদি পশু কোথায় কি হয়েছে তার খোঁজ তো বিধাতার খাতায় । জীবনের দৈন্যদশা শুরু হয় । আমার 'মা' পারিবারিক দায়িত্ব নিজ কাধে নিয়ে নেন।

পরবর্তীতে বেশ কিছুদিন সরকারী সহায়তায় স্কুলে , তারপর এখানে - ওখানে থাকতে হয় । কিছুকাল পর সরকারী সহযোগীতায় বড়কাঠাল থেকে চার কি.মি সামনে নোয়াগাঁও গাঁও পঞ্চায়েতের অধিনে উরাবাড়ীতে পুনঃ বসতি স্থাপন করেন। আমার মা মিনুরাণী চক্রবর্ত্তী । মায়ের চোখের জলই ছিল আমার মায়ের জীবনে সান্তনা । আমাদের মুখ দেখে পুরনো অতীত ভুলে মা সন্তানদের আঁকড়ে ধরে পথ চলতে শুরু করেন । তখন আমরা দু- ভাই , দু বোন । বাবার মৃত্যুর সময় আমার মা ৭ (সাত) মাসের অন্তঃসত্বা ছিলেন । নতুন বসত ঘরে আমার বোন লক্ষীর জন্ম । অনন্যোপায় মা মানুষের বাড়ীতে ঝি এর কাজ করতেন । লোকচক্ষুর অন্তরালে চোখের জলে আমার মায়ের বুক ভাসত । ঝি এর কাজ করে সংসার সামলানো কষ্টকর দেখে বুকে পাথর চাপা দিয়ে আমার বড়ভাই হারাধন চক্রবর্ত্তীকে আগরতলা এক দোকানে পেটে ভাতে কর্মচারী হিসেবে দিয়ে দেন । তখন দাদার বয়স মাত্র সাত বছর । হেসে খেলে চলার পথ যে নেই । জীবন জীবিকার বাঁচানোর জন্য অন্ততঃ একমুঠো ভাত তো পাওয়া যাবে তাই দাদা হাসিমুখে গতর খাটতে শুরু করেন । স্ত্রীর সামনে নির্দোষ স্বামী খুন , এ আবার কোন ধরনের প্রতিবাদ । এই খুনীদের মতলবটা কি ? দুলু অর্থাৎ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী পুনরায় বলে ১৯৮৮ সালে যখন আমার বয়স দশ বৎসর ৮ মাস , মা আর পারছিলেন না সংসারের বোঝা বহন করতে । আমার মা তখন আগরতলা সৎসঙ্গ আশ্রমে আমাকে আমার শ্রদ্ধাভাজন রমাশংকর ত্রিবেদী মহাশয়ের হাতে তুলে দেন । সত্যিই আশ্রমের স্নিগ্ধ পরিবেশ আশ্রমের কর্মকর্তাদের আদর স্নেহে এবং রমাশংকর ত্রিবেদী মহাশয়ের সহযোগীতায় , আমি বলব ভগবানের অশেষ কৃপায় আমি বড় হতে থাকি এবং লেখাপড়াও শুরু করি । আমি আশ্রমে থেকেই দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করি । তখন আমার মা উরাবাড়ীতে মধ্যম বোন জয়ন্তী চক্রবর্ত্তী এবং ছোটবোন লক্ষীকে নিয়ে থাকত। অনেক কায়ক্লেশে , এলাকার লোক তথা আমার মামার সহযোগীতায় মা বড়বোনকে কোন প্রকারে বিয়ে দিয়ে দেন ।

আমি আশ্রমে লালিত পালিত , আর দাদা দোকানের কর্মচারী , এভাবেই টানা পোড়নে

চলতে থাকে আমাদের জীবন রথ । পরবতীর্তে দাদা কাকড়াবণ নবোদয় বিদ্যালয়ে রাধুনির কাজ ও করে বেশ কিছুদিন । বর্তমানে দাদা নেপকো -তে শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালায় ।

আমি মাস দু -মাসে উরাবাড়ীতে গিয়ে মাকে দেখে আসতাম । আর্থিক কষ্টে আমাদের ভাই বোনদের লেখাপড়া তেমন শেখা হয়নি । ১৯৯১ এ বহু কষ্ট করে মামা ও দিদার সাহায্যে মা আমার মধ্যম বোন জয়ন্তীকে বিয়ে দেয় । তারপর মাও ছোট বোন লক্ষী উরাবাড়ীতে থাকত । মায়ের কষ্ট লাঘবের জন্য আমার দিদা উদয়পুর থেকে এসে মায়ের কাছেই থাকতেন । দিদা , পুরানো দিনের মানুষ কিছু লেখাপড়া জানতেন এবং এলাকায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করাতেন এবং তার ফলে যে টাকা পয়সা পেতেন তা দিয়ে আমার মাকে সাহায্য করতেন । মায়ের কষ্ট কি কোন মা সহ্য করতে পারেন। আমার দিদিমার নাম ছিল নিরুপমা চক্রবর্ত্তী । সত্যিই দিদিমা বৃহৎ মনের মানুষ ছিলেন । তখন ও প্রায়শই শোনা যেতো এ গ্রামে উগ্রবাদী এসেছে , ও গ্রামে উগ্রবাদী এসেছে আমাদের পাশের উপজাতি পল্লীতে এই হিংস্র উগ্রবাদীদের 'বলংবরক' বলে ডাকে অর্থাৎ জঙ্গল মানুষ । গত কয়েক বছরে এই জঙ্গল মানুষরা অনেক মানুষের প্রাণ কেড়ে হিংস্রতার জন্য প্রচারের আলোতে এসেছে । গ্রাম জ্বালিয়ে , মানুষ খুন করে একটা টাটকা আর্তনাদের পরিবেশ তৈরী করে । তৈরী হয় ত্রাসের আবহ। গ্রামের ঘরের দোরে দোরে সন্ধ্যা ঘনাতে না ঘনাতেই খিল পড়ে , আলো নিভে যায় । ইতিহাস তাদের ক্ষমা করে না । চোখের সামনে স্বামীকে মরতে দেখেও তাকে রক্ষা করতে না পারার ঘৃণা সবসময় ছিল মিনুরানী চক্রবর্ত্তীর । উগ্রবাদীদের বিচারে তো আর আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ নেই। বিবেকহীন নির্বোধ এই সন্ত্রাস কি হবে তার ফল ? নিরীহ মানুষদের মেরে নিপীড়ন করে যারা , তাদের কাজ কোন প্রকারে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় । প্রতিবাদ জানাতে হবে আরো সোজাসুজি তাদের পৈশাচিক কাজের বিরুদ্ধে ।

১৯৯৮ সনের , ১৯ই ফেব্রুয়ারী বুধবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৫ টা ১৫ মিনিট, মা রান্না ঘরে রান্না করছিলেন । দিদিমা নিরুপমা চক্রবর্ত্তী আমাদের গ্রামেই একবাড়ীতে বাচ্চাদের পড়াশুনা করাচ্ছিলেন । এমন সময় পৈশাচিক, নরখাদক উগ্রবাদী আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে । চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা , মানুষের চিৎকার বোবা গৃহপালিত প্রাণীদের আর্তনাদ , এলোপাথারী গুলির আওয়াজ , প্রাণ বাঁচাতে মানুষ এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে । আমার বয়স্ক দিদিমা জানত আমার মা মিনু চক্রবর্ত্তী কানে খুব কম শোনেন । মেয়েকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে দিদিমা প্রাণপনে কালীদাস দেবের বাড়ীর পাশ দিয়ে এগোতে থাকেন । বাচ্চাদের নিরাপদ জঙ্গলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে । দিদিমা দেখেন নীলাভ শিখা নিয়ে সমস্ত গ্রামে আগুনের দাউ দাউ করে জ্বলছে আর মুহুর্মুহু গুলীর আওয়াজ । প্রাণভয় ত্যাগ করে দিদিমা রাস্তায় বেরোতেই বর্বরদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিদিমার

বুক গুলিতে ঝাঝড়া করে দেয় । উপর হয়ে দিদিমা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । রাস্তায় রক্তের বন্যা বহে যায় । দিদিমা পারেনি কিছু বলতে , না পেরেছে স্নেহের মেয়ে মিনুকে রক্ষা করতে ।

এদিকে গ্রামের লোক প্রাণ নিয়ে পালাবার আগে মাকে পালাবার জন্য চিৎকার দিয়ে ডাকেন কিন্তু আমার মা যে শুনতে পান না । ততক্ষনে আমাদের ঘরের আগুনের তাপ মার গায়ে লাগে , হতচকিত হয়ে মা বুঝতে পারেন গ্রাম আক্রান্ত। ততক্ষনে খুনীরা আমাদের বাড়ীর উঠোনে হাজির , ছোটবোন লক্ষী যে জন্মাতে দেখলো না বাপের মুখ , পেলনা মায়ের মমতার স্পর্শ । সন্তর্পনে বাড়ী পেছনে বাঁশঝোপে লুকিয়ে পড়ে মা , ঘর থেকে লক্ষী লক্ষী বলে বের হতেই ওৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছোড়ে আমার মায়ের উপর , কে দেখবে আমার অভাগী বোন লক্ষীকে , মা ধরাশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন , আমার মায়ের সারামুখ , দেহ রক্তাক্ত। বর্বরদের রক্তের হোলি খেলায় ।

নির্বোধ , মাতাপিতা হারা ছোটবোন বাঁশের ঝোঁপে বসে দেখতে পায় কিভাবে হিংস্র হায়নারা আমার মায়ের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে । প্রাণভরে অবুঝ বোন সারারাত ঘুপটি মেরে বসে থাকে । সে তো জানত না ওরা বাবার প্রাণ নিয়েছে কিন্তু শেষ অব্দি তার ভালবাসার মমতার স্পর্শ মমতাময়ী মায়ের প্রাণ কেড়ে নেবে , সাথে দিদিমার প্রাণও । তার গগনভেদী চিৎকার যেন মুখ ফোটে না কিন্তু বুক ফেটে যায় । ঘাতকরা কি এতো নিষ্ঠুর ?

ঘাতকবাহিনী নির্বিচারে গৃহদাহ , গণহত্যা , এমনকি বোবা প্রাণ হত্যা করে হত্যালীলার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গ্রামের জ্বলন্ত আগুনের পাশ দিয়ে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে যায় । অগনিত পশু , বাড়ীঘর জ্বলে গেছে , আমার দিদিমা নিরুপমা চক্রবর্ত্তীর মা,মিনু চক্রবর্ত্তী শুধু নয় , এ ছাড়া ও আমাদের গ্রামের আরো তিনজনকে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করে । তারা হলেন পরেশ দেবনাথ, জ্ঞানবালা দেবনাথ , বিনোদ দেবনাথ ।

পরদিন ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ইং রাজ্যের সমস্ত পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় " নির্বিচারে আগুনে ও গুলীতে জ্বলছে মানুষ ও গবাদি পশু"

পরবর্তীতে সবার সহযোগীতায় ২০০১ ইং মার্চ মাসের ২৯ তারিখ আমি পশ্চিম জেলা শাসকের অফিসের চাকুরী পাই । হয়ত ভাই হিসেবে বোন লক্ষীকে বিয়ে দিয়ে আমি ভাইয়ের কর্তব্য করেছি কিন্তু কে দেখাবে তাকে বাবার মুখ , যে জন্মের পূর্বেই পিতৃহারা , ঘাতকরা তাদের শানিত অস্ত্রে কেড়ে নিয়েছে বাবার প্রাণ , তার ভরসা মমতাময়ী দিদিমা ও প্রাণসম 'মা" কে ফিরিয়ে দেবে তার কাছে ।

বাবা ,মা , দিদার নৃশংস খুন ঘাতকদের কিছু আসে যায় না কিন্তু আমরা বেঁচে আছি এক ভয়াবহ স্মৃতি নিয়ে ।

অ্যাডভেঞ্চার

উষাবাজার রাস্তা ধরে খানিকটা সামনে এগিয়ে এলেই রাস্তার ডানপাশে সুবিশাল একটি বটগাছ। বটগাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় শ্মশানবন্ধুদের বসার জন্য তৈরী মজবুত শেটঘর, শেটঘরের পাশেই শ্মশানকালী মন্দির। সকাল সন্ধ্যা মানুষ পূজো দেয় । কালী মন্দির এর পিছনটা একটু নীচু যেখানে তৈরী শ্মশানঘাট, শ্মশানঘাটের পাশদিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে ছিনাই নদী, নামেই নদী মৃত প্রায় সংকীর্ন তার চলার পথ। এই শ্মশানঘাট বহু পুরানো এবং হাজারো মানুষের অন্তিম সৎকারের স্বাক্ষী। আজোও সৎকার চলছে, মাঝে মাঝে যুবাদের হরিবোল ধ্বনি আর আগুনের লেলিহান শিখায় শবদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ছিনাই নদী তার দুর্ব্বল শরীরের নির্গত জল দিয়ে

শ্মশানে ধুয়ে মুছে দিচ্ছে ।

অমূল্য ও অঞ্জনা

শ্মশান পার হয়ে বাম দিকে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা , কোথাও ছোট গর্ত , কোথাও কংক্রিট উঠে আছে । এই রাস্তা ধরে ছিনাইহানী গ্রাম । প্রচন্ড শান্ত গ্রাম । ছিনাইহানীর নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার অন্নদাচরণ দাসের ঘরে জন্ম অমূল্য দাসের পারিবারিক টানাপোড়নে লেখাপড়া ও বেশীদূর এগোয়নি। সে যাইহোক অমূল্যের যৌবনে পদার্পন যৌবন রং বাহারী কখনো কখনো টানাপোড়ন ও ভুলে যায়। প্রথমটাই চোখ দেখাদেখি পরবর্তীতে একটু আধটু হাসি , এভাবেই একদিন মুখ ফেটে বের হয়ে আসে অমূল্য অঞ্জনার ভালবাসার কথা । পরিণত ভালবাসার ছোঁয়া কিছু একটা করতেই হবে জীবন বাঁচানের তাগিদে , কাঠখড় পুড়িয়ে অমূল্য আগরতলা একটি চাকুরী ও যোগাড় করে ফেলে। অমূল্য অঞ্জনা বাধে সুখের সংসার । ক্রমে অমূল্য এর দুই মেয়ের জন্ম ছোট মেয়ের নাম পিয়ালী, আর্থিক দিক দিয়ে অমূল্য আগের চাইতে অনেকটা ভালো । মা ,বাবার আদরে দু টো সন্তান বাড়তে থাকে । বড় মেয়ে পায়েলকে নিয়ে মা বাবার স্বপ্নের শেষ নেই । ছোটবেলা থেকে বরাবরই পায়েল পড়াশুনাই ভালো ছিল , একটানা ভাল ফল করে পায়েল মাধ্যমিক পরীক্ষায় উর্ত্তীন হয় । আবেগ আপ্লুত বাবা মেয়ের ভবিষৎ স্বপ্ন দেখে মেয়েকে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করে ।

মজলু ও ছেলে তাকিকুল

গরীব পরিবারে জন্ম গ্রহন করে মজলু মিঞা প্রচন্ড টানাপোড়নে চলে মজলুদের জীবন । জীবন ধারনের তাগিদে ঊষাবাজারের বনেদী এলাকায় মজলু চলে আসে । চলে কঠোর পরিশ্রম ,মজলু ভালো টিউভ ওয়েলের কাজ জানতো , সারাদিন হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে পয়সা রোজগার করত । ভাগ্যের চাকা মজলুর ঘুরে যায় যখন সে নরসিংগড় হাইস্কুলে চতুর্থশ্রেণীর চাকুরী পায় , মজলু জীবনসঙ্গীনি হিসেবে আঙিয়া বেগমকে বিয়ে করে । সুখের সংসার কিন্তু একটি নীড়ের তো প্রয়োজন , মজলু বসে থাকার লোকনয় । সরকারী চাকুরীর পর ও অবসর সময় চলে মজলুর হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম ,এলাকায় এলাকায় টিউবওয়েলের কাজ করে সৎপথে দুটো পয়সা বাড়তি রোজগার করে । ক্রমে মজলুর তিনটি সন্তান হয় বড়ছেলের নাম সফিকুল , মেঝো ছেলের নাম তকিকুল । মজলুর নেশা ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবে , মানুষের মতো মানুষ করবে । সফিকুল বার ক্লাস পর্যন্ত পড়াশুনা করে সঙ্গী সাথীদের আড্ডায় পড়ে যায় ক্রমে লেখাপড়া ও উবে যায় মেঝ ছেলে কলা বিভাগে সুখময় উচ্চতর বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে পড়ে , ছোট ছেলে ষষ্ট শ্রেণীতে পড়ে । প্রচন্ড পরিশ্রম করে মজলু সংসার সাজায় এবং আস্তে আস্তে দক্ষিন নারায়ন পুরে বসত বাড়ী তৈরী করে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে জীবিকার্জ্জন শুরু করে । ছেলেদের দুষ্টমি মাঝে মাঝে মজলুকে ভাবিয়ে তোলে।

তকিকুল ও পায়েল

তকিকুল ও পায়েল একই স্কুলে পড়াশুনা করে এবং একই ক্লাসে। উভয়েই অপ্রাপ্ত, একই ক্লাসে পড়া ছাত্র - ছাত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া স্বাভাবিক সেখানে সন্দেহের কোন কারণ থাকে না। কিন্তু বাধ সাধে তাদের চলাফেরা, ব্যবহার, স্কুল, প্রাইভেট টিউশনি সবই চলতে থাকে, কিন্তু মা অঞ্জনা লক্ষ করতো পায়েল কখনো ও কখনো পড়তে বসে হারিয়ে যায়, ভাবতো মেয়েদের পৃথিবীটা কত ছোট আর ছেলেরা রাতে বিরেতে ঘুরতে পারে আড্ডা মারে কিন্তু মেয়েরা যেন ঘর কোনে বন্দী বিহঙ্গ, বিধাতা কেন মেয়েদের এই কষ্ট দিয়েছেন ? স্কুলে তাকিকুলের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে কখনও কখনো বন্ধুরা টিপ্পনী ও মারে, মাঝে মাঝে দেখা যেতো পায়েল স্কুলে নেই, তাকিকুল ও নেই, এক দু -জন বন্ধুর সহায়তায় বিমানবন্দরের পাশে কোন স্থানে চুটিয়ে গল্প করতো, গল্পের ভেতরেই উভয়ে ভালবাসার বীজ বুনে। কখনো দেরী হলে তকিকুল পায়েলকে এগিয়ে দিয়ে যেত বাড়ীর রাস্তা অব্দি। লোকের নজরে পড়লেও ভাবত হয়তো এক ক্লাসে ছাত্র - ছাত্রী তাই বন্ধুত্বের ভালবাসা, কিন্তু ততক্ষনে তকিকুল ও পায়েলের ভালবাসার ঘনত্ব বেড়ে গেছে। হঠাৎ একদিন পায়েল মাকে বলে তার বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে ভাল লাগে না, সে কলা বিভাগে পড়বে। মা বাবা অ মূল্যকে জানায়, বাবা ভাবে পড়াশুনাটা ছাত্রে মর্জিতে হওয়াই কাম্য ,তাই মেয়েকে বিভাগ পরিবর্ত করতে বাধা দেয়নি। কিন্তু বিভাগ পরিবর্তন যে গাঢ় ভালবাসার চিহ্ন তখনো ও সপুরিবারের কেহই আঁচ কারতে পারেনি। কখনো কখনো বন্ধুর বাইক নিয়ে তকিকুল সবার অলক্ষ্যে পায়েলকে নিয়ে ঘুরাঘুরি ও করতো। এতো সাবধানতার মধ্যে ও অনেকের নজরে তা পড়ে যায়। অনেকে ঘটনাটুকু মা অঞ্জনার আকারে প্রকারে বলেও দেয়, তাছাড়া পায়েলের মা অঞ্জনা মেয়ের ঔদ্ধত্যে কথা এক দু বার বাবা অমূল্যকেও বলে। সহজ সরল প্রকৃতির অমূল্য বলে তুমি মেয়েকে কি শিক্ষাই দিয়েছ যদি কেহ প্রলোভন দেখায় তবে কেন প্রলোভিত হবে। আমার বিশ্বাস আমার মেয়ে অমনটা কখনো হবে না। এরই মাঝে একদিন মা অঞ্জনা পায়েলকে বকুনি দেয় পায়েল মায়ের কাছে মোবাইল ফোন দাবী করে বলে উঠে প্রাইভেট টিউশনে যাই - সবার মোবাইল আছে আমাকে একটি মোবালই কিনে দাও। মা বলে উঠে রোজগার করে মোবাইল কিনিস। কথায় কথায় মেয়ে মার সঙ্গে বাকবিতন্ডা শুরু করে। অঞ্জনা রাগে বলে এতটুকু মেয়ে এতো বড় আব্দার, তুই আমাকে চিনিস্ না। পায়েল চিৎকার দিয়ে বলে উঠে আমি তোমাকে ভাল করেই চিনি তুমি তো বাবাকে ভৃত্য বানিয়ে রেখেছো, আর ছোটবেলা থেকে কখনো বলতে পারবে আমার কোন ইচ্ছাকে মূল্য দিয়েছ, তুমি যা বলেছ তাই শুনতে হয়েছে। আমি কি পুতুল, নাচের পুতুল তুমি যেভাবে নাচাবে সেভাবেই নাচবো। প্রচন্ড তর্কাকর্তি হয় মাও মেয়ের মাঝে, যাই হোক মাসীর মধ্যস্ততায় এ বারের মতো মা - মেয়ের ঝগড়া থামে। অমূল্য

আসতেই অঞ্জনা সব কথা বলে । অমূল্য ভাবে মেয়ে বড় হয়েছে এখন বুঝিয়ে শুঝিয়ে মেয়েকে শান্ত করাই হবে তার উপযুক্ত কর্তব্য । অমূল্য সারাদিন পরিশ্রম করে ঘরে আসে , যাইহোক তবুও তো পিতা , মেয়ে পায়েলের পড়ার ঘরে ডুকে মেয়েকে বুঝাতে চেষ্টা করে । কিন্তু হিতে বিপরীত । পায়েল আবেগঘন গলায় চিৎকার দিয়ে বলে উঠে আমাকে বুঝাতে হবে না , আমি সব বুঝি তোমার কোন ব্যক্তিত্বই নেই , তুমি মায়ের হাতের পুতুল , মা যা বলে সব ঠিক , আমার কথার কোন দাম নেই , এই বলে আচমকা কান্না জড়ানো গলায় বাবাকে জড়িয়ে ধরতেই অমূল্যের মন গেল যায় বলে উঠে ঠিক আছে বল ভালকরে পড়াশুনা করবি । তবে কালই তোকে মোবাইল ফোন কিনে দেবো । মেয়ে তার কথা হাসিল করে নেয় পরদিনই অমূল্য মেয়েকে মোবাইল ফোন কিনে দেয় । পায়েলের জীবনে লাগে আধুনিকতার বাধনহীন ছোয়া, সাথে রোমাঞ্চ , মনে মনে কাঙ্খিত ভালবাসা । তকিকুল , পায়েলের ভালবাসা মোটামুটি সহপাঠিদের কানে কানে , মুখে মুখে অভিভাবকদের কাছে পৌছায় উভয়ের মা - বাবাই শাসন করে কিন্তু তাই বলে ভালবাসা অন্ধ , আইনের সংজ্ঞা বুঝে না । বয়সের বাধন মানে না , বন্ধুদের সহায়তায় লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে ওখানে চলে ওদের প্রেমের গভীর কথাবার্তা । হয়ত উভয়ের উপরেই পারিবারিক চাপও বাড়তে থাকে । উভয়ে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় ঘর বাধার । কিণ্তু সুযোগটা তো করে নিতে হবে । সময় সুযোগ বুঝে তকিকুল ও পায়েল ২০০৬ ইং জানুয়ারী মাসের ২৭ তারিখ স্কুলে আসার কথা বলে শ্মশান দেবীকে স্বাক্ষী রেখে গাড়ীতে চেপে চম্পট দেয় । ঘন্টা দু- ঘন্টার যাওয়ার পর খবর চাউর হয়ে উঠে , উত্তেজনার পারদ ও চরতে থাকে । শুরু হয় এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি কেউ জানে না ওরা কোনদিকে পালিয়েছে । সারাদিন দৌড়ঝাপ । পায়েলের সাথে যোগাযোগের অবলম্বন সেই মোবাইলে টেলিফোন করলে কম্পিউটারে উত্তর ভেসে আসে সুইচ অফ । যাই হোক টানা পোড়ন যাবতীয় অস্থিরতা নিয়ে পায়েল ও তকিকুল গিয়ে আশ্রয় নেয় জীবানিয়া থানার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে । সেখানে তকিকুলের এক বাল্যবন্ধু পরেশের বাড়ী । বন্ধুত্বের খাতিরে পরেশ তাদেরকে বিতাড়িত করতে পারেনি । পরেশ মাকে বলে উঠে মা ওরা আমার বন্ধু । আজ ওরা আমাদের বাড়ীতে থাকবে , পরেশের মা বলে উঠে বাবু আমরা কিন্তু গরীব মানুষ আমরা যা খাই তাই খেতে হবে , আজ রাতে ভাত আর আলুসেদ্দ । শোবেই বা কোথায় একটাই তক্তাপোশ তাতে পরেশের অসুস্থ বাবা পড়ে থাকে । অগত্যা মাটিতেই শুতে হবে , পায়েলকে পরেশের মার সাথে দিয়ে তকিকুল আর পরেশ কোথাও ব্যাবস্থা করে নেবে । পরেশের মা - বাবা কিছু বলতে চাইলে পরেশ বলে চুপ কর , পরেশ শ্রমিকের কাজ করে তবুও তো বন্ধুত্ব ।

এদিকে খোঁজাখুঁজিতে ক্লান্ত হয়ে পায়েলের বাবা অমূল্য দাস মা অঞ্জনা , মাসী সঞ্জু ও কয়েকজন এলাকার লোক নিয়ে রাত ১০টা ১৫ মিনিটে স্থানীয় থানায় এসে হাজির , হাউমাউ করে

কেঁদে উঠে বলে একটা কিছু করুণ । আমি অসুস্থ মানুষ আমার মেয়েকে এনে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। অভিযোগে লিখান তকিকুল তার মেয়ে পায়েলকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে , শুরু হয় দৌড়ঝাপ , পুলিশ তদন্ত । তকিকুলদের বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে গভীর রাত প্রায় দুটো ,পুলিশ পাড়ি দেয় নরসিংগড় থেকে জিরানীয়া থানা এলাকায় । সাহায্য নেয় জীরনিয়া থানা পুলিশের , তখন জয়নগর গ্রাম যেন সভ্যতার ঘুমন্তনগরী , সঠিক ঠিকানায় পুলিশ হানা দেয় , পেয়ে যায় তকিকুল ও পায়েলকে, নিয়ে আসে তাদের থানায় , ওরা হয়তো জানে না আইনী জটিলতা ওদের অপ্রাপ্ত বয়সটুকু ততক্ষনে অপহরনের মোকাদ্দমা হয়ে গেছে । থানায় মায়ের সামনে পায়েলকে জিজ্ঞেস করা হয় তোমার মা কেম ন , পায়েল বলে উঠে ভাল না , তদন্তকারী অফিসার জিজ্ঞেসা করেন কেন । উত্তর মা শুধু বেশী শানে করে , পুলিশ অফিসার বলে উঠে তোমার মতো মেয়েদের পৃথিবীটা খুব ছোট । মায়ের উপর তোমার রাগের কারণ যে তোমাকে ভালোর জন্য , এখন যে শাসন করবে সেই তোমার কাছে শত্রু হবে , পায়েলের মা অঞ্জনা রাগ করে বলে উঠে উশৃঙ্খল , মিথ্যাবাদী মানবিকতাহীন । কাউকে শ্রদ্ধা করতে জানো না । তোমার এই অবুঝ ভালবাসায় তুমি কি পাবে । জেনে রেখো যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু পাবে না । পায়েল বলে উঠে যাই পাই আমি তোমার সাথে যাব না । আমি তকিকুলকে ছাড়া বাঁচব না । পুলিশ অফিসার বলেন সিদ্ধান্ত দেবে আদালত আমরা কিছু বলব না । আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে।

পরদিন ২৮/১/২০০৬ ইং তকিকুল ও পায়েলকে আদালতে সোপর্দ্দ করা হয় যাবতীয় তথ্য প্রমানাদি সহ । এয়ারপোর্ট থানার ৭/২০০৬ , ৩৬৬ ধারা মতে আদালত অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে তার পিতার হাতে তুলে দেয় ।

পায়েলের যেন স্বপ্ন ভাঙ্গে, ভাবে অ্যাডভেঞ্চার জীবনের বাস্তব পথ নয় । সবাই বলে পায়েল ভালকরে পড়াশুনা কর । এটা পড়াশুনার সময় , চোখ ছলছল করে পায়েলের চোখ থেকে জল নেমে আসে । পায়েল মা অঞ্জনাকে বলে উঠে “ মা” আমি তোমাদের কথাশুনে চলব , তুমি আমাকে ছোটবেলার মতো বুঝিয়ে দাও । যাতে অপরিণত জীবন আমার আর ভুল না হয় ।

পতিতা

অনুজ্জ্বল রাতের আলো , এক ঘুমের পর জেগে বসি অস্থায়ী বিছানায় । মিহি আলোর ভরা রাতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি না , চারপাশে কোন দেওয়াল নেই , মাথার উপরে কোন ছাদ নেই , হয়তো পাশে শুয়ে আছে আমার মতোই বাজারী নেড়ী কুকুর । সামনে হাটে বৃদ্ধ নাইট গার্ড বসে বসে ঝিমোচ্ছে । পুলিশের টহলদারী গাড়ী ঝিমি ঝিমি চোখে নৈশ পাহাড়া দিচ্ছে। কখন ক্লান্ত শরীরে ধরিত্রীর নির্মিত বিছানায় শুয়ে গেছি কে জানে । হঠাৎ ঘুম ভাঙে খানিক হতাশার জন্ম হয় কিন্তু হিমেল হাওয়া বাতাসের সব উড়িয়ে দেয় আবার ঘুমিয়ে পড়ি খোলা আকাশের নীচে কখনো মহারানী তুলসীবতী বিদ্যালয়ের সামনে কখনোও বা গোবিন্দ বল্লভ হাসপাতালের কোন পাশে । এক ঘন্টা ঘুমানোর পর কখনো ঘুম ভেঙে যায় ঝিরঝির বৃষ্টি আর ধমকা হাওয়ায় জীবনের মানে খুঁজে পায় না, এর মাঝে ভোরের প্রথম আলো কিছুটা সজীবতা দেয় । ভাবি বেঁচে থাকার অর্থটা খুঁজে পাওয়ার

জন্যই বুঝি আমার গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় ।

আমার মতো কত মেয়ের জীবন যে রাস্তায় রাস্তায় কেটে গেছে তার খবর কে রাখে । ব্যস্ত মানুষ , যান্ত্রিক জীবন , শহর সভ্যতা , তার মাঝে কটাক্ষ , কটুক্তি এই বলে আমি " পতিতা"।

দক্ষিণ ত্রিপুরার শিলাছড়িতে আমাদের বাড়ী ছিল , এখন আছে কি নাই তা বলতে পারব না। বাবা ছিলেন একজন সরকারী কর্মচারী , দক্ষিণ ত্রিপুরার এডিসি এলাকার কোন এক পি, ডব্লিও ডি অফিসে কাজ করতেন । আমরা দু-বোন আমার নাম সোমা পাল । বাবার নাম ছিল নিকুঞ্জ পাল, মা আরতী পাল , আমার বয়স যখন দু বৎসর তখন মা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান । মা মারা যাওয়ার পর আমার বড় মাসী আমার বড় বোন ঝুমাকে কোলকাতায় নিয়ে যান । শুনেছি দিদির লেখাপড়া শেষে দমদমে বিয়ে হয়েছে কিন্তু দিদিকে তারপর আমি কখনো দেখিনি । এখন হয়তো দেখলেও চিনব না, ১৫/২০ বৎসর আগের কথা , ছোটবেলার স্মৃতি অনেক কিছুই মুছে গেছে, মা মারা যাওয়ার কিছুদিন বাদে বাবামণি চাকমা নামে এক যুবতীকে বিয়ে করে । কিছুদিন ভালভাবেই যায় তারপর আমার সৎমার গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্ম হয় । শুরু হয়ে যায় আমার দুদর্শা। লেখাপড়া তো আর প্রশ্নই উঠে না । সৎ মার সাথে সাথে বাবার কাছেও আমি ধিক্কারের পাত্র হয়ে যাই। মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করি কিন্তু সবই বিফল । ১৯৯৯ সালে বাবা হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তখন আমার বয়স ১৫/১৬ বৎসর হবে । বাবার মৃত্যুর পর এ বাড়ীতে থাকার আর কোন পরিবেশই আমার ছিল না । সকাল / বিকেল আমার উপর অকথ্য অত্যাচার মারপিট চলতে থাকে। আমার কষ্ট দেখে সহ্য করতে না পেরে আমাদের পাড়ার এক কাকীমা আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে ' ঝি' এর কাজ করতে পারবি তাহলে তোকে আগরতলায় এক ভাল বাড়ীতে দিয়ে দিতে পারি । এক কথায় আমি রাজী । জীবনে এই প্রথম আমার ঘর থেকে বের হওয়া, তারপর কখনো আর গৃহমুখে যাওয়া হয়নি, কোন খবর ও বলতে পারব না । পাড়ার কাকীমা , আমাকে একটি বনেদী পরিবারে এনে দেন সত্যিই পরিবারের লোকজন থেকে আমি মেয়ের আদর পেতাম , উনারা স্বামী - স্ত্রী , উনাদের একমাত্র মেয়ে কর্ণাটকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে । উনারা সারাদিন অফিসে থাকেন । পরিবারের আমিই যেন কর্ত্রী ; উনাদের থেকে এমনকি দিদি ছুটিতে আসলে দিদির থেকে খুব আদর পেতাম , যেন আমি সত্যিই এ বাড়ীর ছোট মেয়ে । কিন্তু সত্যি বলতে কি - একটা কথা আছে হতভাগিনীর কপালে সুখ সহ্য হয় না - আমারও তাই হয়েছে । এতো আদর , আনন্দ , সুখ আমি কখনোও ভুলতে পারব না । এমনকি দিদি আমাকে ছুটিতে এলে জিনসের প্যান্ট, শার্ট পড়িয়ে দিদির সাথে দিদির বান্ধবীদের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন । সবখানেই ছোটবোন বলে পরিচয় দিতেন । সুখ সবার কপালে সহ্য হয় না ।

বাড়ীতে কেহ থাকে না , বাড়ীর সামনে ব্যস্ত রাস্তা , ওপারে ঔষধের দোকান । কখনোও বা বাড়ীর মালিকের জন্য ঔষধ কিনতে ঔষধের দোকানে যাওয়া বা একাকীত্ব ঘুচাতে কখনো গেইটের সামনে দাঁড়ানো ইত্যাদি । প্রায়ই সোমার চোখে বছর ৩৫ এর এক সুঠাম যুবক চোখে চোখ মেলাত । সোমার ভাবনা আমি বাড়ীতে ঝি এর কাজ করি , কি ভাবে এ সব সাহস করি । কখনোও সোমার চোখে পড়ত ঐ যুবা ঔষধের দোকানে বসে । খুব সহজেই সোমার কানে খবর পেল ছেলেটি উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে । নাম তার নীলাঞ্জন রায় চৌধুরী । সব জেনে সোমা নিজেকে কুঁচকে নেয় । কিন্তু যুবকের চোখ বরাবরই যেন সোমার উপর নজর রাখে ।

একদিন ঔষধের দোকানে ঔষধ কিনতে গেলে নীলাঞ্জন সোমার পরিচয় তথা আদ্য প্রান্ত জেনে নেয় এবং উভয়ের মুখেই একটু মুচকি হাসি ফুটে উঠে । মনের গোপন কথা , চোখে যেন ফুঁটে উঠেছে । একদিন বাড়ীর সদর দরজায় সোমা দাঁড়ানো , সোমা দেখতে পায় নীলাঞ্জন পানের দোকানের সামনে সিগারেট ধরাতো । তা দেখে হঠাৎ করে সোমার মধ্যে এক হাহাকারের বাতাস উঠে যেন মুহূর্তেই সোমা আনমনা হয়ে যায় এক পলকে ৩৫ বছরের সুদর্শন নীলাঞ্জনকে দেখে নিল । সোমা মনে মনে ভাবে ভালবাসা কি অপরাধ ? বড় ঘরের ছেলের সঙ্গে কি গরিব ঘরের সুন্দরী মেয়ের বিয়ে একেবারেই হয় না । হবে না কেন , সে ভেবে নিলো আমি জীবনে মনে করি একটা সুযোগ নিলাম । কার ভাগ্য কোথায় বাঁধা আছে কেউ কি বলতে পারে । তারপর পুনরায় ভাবে না বামুন হয়ে আকাশের চাঁদ নিয়ে ভাবা ঠিক না । এই ভেবে সোমা পুনরায় ঘরে ডুকে পড়ে । মিনিট দশ - এক পর সদর দরজায় কলিংবেল বেজে উঠে । সোমা ভাবে ও মা মাত্র ১১ টা বাজে কাকীমা কি এসে পড়েছেন, ভেবে দৌড়ে দরজা খুলে নীলাঞ্জনকে দেখতে পেয়ে লজ্জায় ও ভয়ে মুখ লাল হয়ে ওঠে । নীলাঞ্জন বলে উঠে আমি জানি এখন বাড়ীতে কেউ নেই , চারটের আগে কেউ ফিরবে না আর কেউ কিছু বলবেও না । সবাই আমাকে চেনে । তোমার ভয় পাওয়ার কিছুই নেই কারণ সত্যিই আমি তোমাকে ভালবাসি । সোমার মুখ থেকে একটি আওয়াজও বের হয়নি , নীলাঞ্জন কম করেও সোমা থেকে ১৫ বছরের বড় হবে । অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর সোমা বলে উঠে আমি 'ঝি' এর কাজ করি । আপনাদের মতো বাবুদের কথা ভাবাও আমার জন্য অন্যায় । যাই হোক ভাবের আদান প্রদানের পর আবার দেখা হবে বলে নীলাঞ্জন নিঃশব্দে চলে যায় । এই ভাবে সবার অগোচরে নীলাঞ্জন ও সোমার প্রেম নিবেদন শুরু হয় কখনো রাস্তায় দেখা , কখনো দোকানে কখনোও বা মালিকের ঘরে । বেশ কিছুদিন পর ছোট্ট শহরের গলির অনেক লোকের চোখে পড়ে । নীলাঞ্জন কখনো ও বা বাইক নিয়ে পার্কে , এখানে ওখানে সোমাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে । ক্রমেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে নীলাঞ্জনের বাড়ীতে খবর পৌঁছে যায় এবং সোমার বাড়ীর কর্তা ও খবর জেনে ফেলে । ততক্ষণে সোমা ছ- মাসের

অন্তঃস্বত্বা। এখন কি উপায় । সোমা নীলাঞ্জনকে তার সমস্যার কথা বলে । একদিন চুপিসারে বাড়ীর মালিককে কিছু না বলে সোমা বাড়ী থেকে নীলাঞ্জনের সাথে পালিয়ে যায় । শহর থেকে অনতিদূরে নীলাঞ্জন সোমার জন্য বাড়ী ভাড়া করে নেয় এবং গোপনে যোগাযোগ করে । পারিবারিক প্রচন্ড চাপে নীলাঞ্জনের পক্ষে এই মেয়েকে বিয়ে করা সম্ভব নয় এ ব্যাপারটুকু নীলাঞ্জন ভাল করেই বুঝতে পেরেছে । তাই সোমাকে নিয়ে অনেক হাতুড়ে ডাক্তার এমনকি কোলকাতা গিয়ে ও গর্ভ নষ্টের প্রয়াস চালায় নীলাঞ্জন কিন্তু বিফল মনোরথ , অবশেষে ভাড়া বাড়ীতে সোমা এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় । আমাদের সমাজ তা মেনে নেয় না । ভাড়া বাড়ী থেকে উৎখাত হয়ে সোমা দরজায় দরজায় ঘুরে । নীলাঞ্জনা তার কাছে থেকে দুরে সরে গেছে , শুধু একদিন বলে তুমি আমার থেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে কোথাও চলে যাও । কিন্তু অনাহার , অর্ধাহার ক্লান্ত সোমার কাছে দশ হাজার টাকায় ভালবাসা বিক্রি হয়নি । এমনকি অনেকের কথা শুনে ও ভালবাসার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগের কথাও ভাবেনি। একদিন নীলাঞ্জনের পরিবারের লোক সোমার থেকে তার সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তার পর থেকে সে নিজের সন্তানের ও কোন খবর জানে না । শুধু বিধাতার কাছে প্রার্থনা ছেলেটা যেন ভাল থাকে , মানুষ হয় । একদিন নীলাঞ্জনের বনেদী পরিবারের কুটকৌশলে সোমা মিথ্যা চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার হয় । দীর্ঘদিন হাজতবাস করে । হাজত থেকে বের হওয়ার পর কোথাও ঠাঁই হীন সোমা , রাতে ঘুরত্রে খদ্দেরের খোঁজে । দেহ ব্যবসা করে খোলা আকাশের নীচে ,স্কুল বারান্দা, হাসপাতাল যেন তার রাতের শয্যা । বহুবার দেহ ব্যবসার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছে কিন্তু এখন আর তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই । তবু ও অন্তরের মমতা ভোরবেলা নীলাঞ্জনদের বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে যায় এবং দেখে ভারাক্রান্ত মুখে নীলাঞ্জন দোতলার উপর মুখ ব্রাস করছে। সোমা ভাবে যদিও আমি ওর জীবনসাথী নই , কিন্তু ওর বিপদে আমি ওকে রক্ষা করবই । নীলাঞ্জন আজ ও কুমার । সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে বলে হয়তো .... পারেনি । তবে লুকিয়ে ঝুকিয়ে আজোও নজর রাখে । ভালবাসার নির্মম পরিণতি সোমা আজ শহরে দেহপসারিনী । হয়তো ভাগ্যের উপর দোষ দিয়ে সোমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছে । মনে যন্ত্রণা হচ্ছে । ভাবে এই লোকটাইতো আমার কাছে এসেছিল সম্বন্ধের জন্য । আভিজাত্য ও বৈভবের গরিমা ভালবাসাকে নসাৎ করে দিল । সোমা ভাবে হয়ত এই মিথ্যা ভালবাসায় না গেলে আমাকে নরকের দুয়ারে বসে শরীর বিক্রি করতে হত না । এই লোকটা তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেনি অথচ নরকের দিকে ঠেলে দিয়েছে । ওদের টাকা আছে কিন্তু মন নেই যারপরনাই আমি আজ " পতিতা"।

ক্লান্তিহীন উন্মাদিনী

অগণিত রাস্তা দিয়েই ছুটে যায় মানুষের জীবন স্রোত , সময় চলে গেছে স্থানে স্থানে রেখে গেছে স্মৃতিচিহ্ন ।

চারিদিকে সবুজের সমারোহ । প্রকৃতির সাজানো পাহাড় ও ঘন জঙ্গল , পাহাড় ঘেষা জঙ্গ'লর মাঝখানে দিয়ে ঝিরঝির করে আপন গতিতে চলছে বুড়ীমা নদী । প্রাকৃতিক বাহারী সৌন্দয্য দিয়ে গড়া " গুরুদয়ালপাড়া" সম্পূর্ণ উপজাতীয় গ্রাম । শান্ত , স্নিগ্ধ পরিবেশ । আর্টিফিসিয়্যাল শব্দটি এখানে বেমানান । সরল , সুন্দর সংস্কৃতি । নেই কোলাহল । সবুজ বণানী , দু পাহাড়ের মাঝে শস্য শ্যামলা ধানক্ষেত । আনন্দমুখর লোক ,অথচ অস্বাভাবিক পরিশ্রমী । গরু , মোষ , ছাগল , হাঁস শূকর ভরা এই গ্রাম ? ইন্দ্রিয় উৎকর্ণ করে , দলা পাকানো ভয় ও ত্রাস নিয়ে স্ত্রী ও দু সন্তান নিয়ে সন্ধ্যা হতেই জুবুথবু বসে থাকেজগবন্ধু ঘোষ । পড়ন্ত বিকেলে উগ্রবাদী গোষ্ঠীর প্রবল সংঘর্ষ তুমুল গূলীর আওয়াজ রাতের নিষ্ঠুরতা , মনকে ফালাফালা করেছে । শিশুসন্তানদের ঘুম ভেঙ্গে যাবার আশঙ্কায় স্বর্ণলক্ষী সন্তানদের বুকে জড়িয়ে বাঁশের তৈরী মাচায় , ঘরের বিছানায় চোখে মুখে ভয় নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে । বাতাসে বাঁশের তৈরী দরজায় ধাক্কা লাগতেই জগবন্ধুর হিমধরা গলা শুকিয়ে শ্বাস - প্রশ্বাস বন্ধ হবার অবস্থা হয় । স্বর্ণলক্ষীর ভাই ইতিপূর্বে হুশিয়ারী দিয়েছে জগবন্ধুকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে । প্রায়শই পাহাড়ের মুহুর্মুহু গুলীর আওয়াজ , সময়ের কোন তোয়াক্কা নেই , এ যেন নিত্ত নৈমিত্তিক ঘটনা । বেশ কয়েক বছর ধরেই এভাবে চলছে , সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই অঘোষিত কারাফিউ শুরু হয়ে যায় । দোকানপাট বন্ধ , সর্বত্র নিস্তব্ধতা । সন্ধ্যার পর মানুষ বাড়ীর বাইরে যেতে নারাজ নিতান্তই প্রয়োজন ছাড়া ।

প্রতিনিয়ত রক্তঝড়ার ঘটনা শুনতে শুনতে এখন আর মানুষের মনে কোন হেলদোল নেই।

স্বর্ণলক্ষী শুনেছে উগ্রবাদীরা নানাহ্ ফরমান জারী করেছে । এমনকি তাদের ফরমানের নির্দেশ অনুযায়ী পোষাক পরতে হবে নয়তো সমূহ বিপদ । নিজ জাতি ছাড়া অন্য জাতি সমুদয়ের কোন ছেলেকে বিয়েও করা যাবে না । কিন্তু কি করা যাবে । ওর স্বামী তো অ- উপজাতি । স্বর্ণলক্ষীর ভয় শুধু স্বামীর জন্যই নয় । সন্তানের জন্যও । ভাই রণজিৎ দেববর্মা উগ্রবাদী দলের প্রতাপশালী সদস্য । স্বর্ণলক্ষী ভাবে দাদা কি অতো হীন কাজ করতে পারবে । স্বর্ণলক্ষী জগবন্ধুকে বলে চলো আমরা অন্যত্র চলে যাই , কষ্ট করে খাব তবুও অন্তত শান্তিতে একটু ঘুমোতে পারব ।

জগবন্ধু বলে কোথায় যাব , কি করব ? বললেই কি কোন কাজ পাওয়া যাবে । যা হবার হবে । তুমি আমাদের সন্তান দুটোকে দেখে রাখ ।

স্বর্ণলক্ষী বলে উঠে , প্রায়শই ঘটনা ঘটছে , মানুষ খুন হচ্ছে । রাত্রটা আমার অতল আতঙ্কে কাটে । কিন্তু জগবন্ধুও কিংকর্তব্যবিমূঢ় । ভাবে আমার ছেলে সাহেব , মেয়ে রীতা তো রণজিৎ এর ভাগ্নে ভাগ্নী । কেনই আমার ফুলের মতো শিশুদের উপর রুষ্ট হবে ।

কে জানত এত সুন্দর প্রকৃতির সবুজ গায়ে , হানাহানিতে তাজা লাল রক্তের দাগ লাগবে। অর্নিবান শ্মশান তৈরী হবে । এখানকার সবুজ পাহাড়ে সবুজ মনের শিশুরা মন খুলে হাসত , হাত না নাড়িয়ে প্রকৃতির কোলে খেলত, কেন সৌন্দর্যের গায়ে এতো দাগ লাগল ।

এতো পুলিশ , টি. এস . আর , নিরাপত্তা বাহিনীর লোক তো আগে এখানে ছিল না , কেনই বা তাদের অনেককে অকারণে প্রাণ দিতে হয় , মনে মনে এ প্রশ্ন স্বর্ণলক্ষীর । নিশীথের প্রভাত কি সংবাদ নিয়ে আসে কে জানে ? এতোকিছুর মাঝেও জগবন্ধু কিন্তু এ গ্রাম ছেড়ে যেতে রাজী নয় । এর মাঝে রণজিৎ বেশ কয়েকবার হুমকী ও দিয়েছে । একবার জগবন্ধুকে প্রচন্ড মারপিটও করেছে । অন্যান্য উপজাতীয় মেয়েদের মতো স্বর্ণলক্ষীও সহজ সরল স্বভাবা । স্বামী ও সন্তানদের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা , নানাহ্ সব্জী গোদক তৈরী করে স্বামীর প্রিয় খাবার খাওয়ায় । কঠোর পরিশ্রম করে সংসার আগলে রাখে । তারপরেও সাজগোছ সম্পর্কে স্বর্ণলক্ষী যথেষ্ঠ সচেতন । চিরাচরিত পাছড়া পড়ে সেজে গুজে বিনুনীতে ফুল দিয়ে সেজে স্বামীর প্রতীক্ষা করে প্রতিদিন । জগবন্ধু স্থানীয় জম্পুই বাজারে সব্জী বিক্রি করে যা নাকি স্বর্ণলক্ষী তার জমিতে ফলায়।

জগবন্ধু জম্পুইজলার কালীকৃষ্ণ গ্রামে বড় হয় । ছোটবেলা থেকেই এখানে বড় হওয়ার সুবাদে ভাল " ককবরক " ভাষাও জানে । গ্রামে ককবক ভাষাতেই কথা বলে ।

বান্ধবীদের সঙ্গে স্বর্ণলক্ষী এসেছিল জম্পুইজলা বাজারে হাটবারে । হঠাৎ বেপরোয়া বৃস্টি তুফান শুরু হয় । সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে । নদীর জল ফুলে উঠে । তখন বাজারে ছিল জগবন্ধু । বান্ধবী মায়াবতী জগবন্ধুকে নিজস্ব ভাষায় বলে উঠে আমরা গুরুদয়াল পাড়ায় থাকি । এখন রাত্রি হয়ে গেছে কিভাবে যাব । কোথায় বা থাকব। জগবন্ধু বলে উঠে বাড়ীতে আমার মা - বাবা আছেন , বৌদিও

আছে , আমার বাড়ী বাজারের পাশে । ভয়ের কোন কারণ নেই আপনারা আমাদের বাড়ীতে কষ্ট করে রাত কাটিয়ে যান কারণ এই দুর্যোগে নদী পার হয়ে বাড়ীতে যেতে পারবেন না । আপনাদের ওদিকের লোক অনেকেই আজ আমাদের গ্রামে থাকবে । সকালে ওদের সাথে চলে যেতে পারবেন। চিন্তার কিছু নেই ।

স্বর্ণলক্ষীভাবে , যুবক ছেলেটির যথেষ্ঠ মমতা , মায়া , চল আজ আমরা এখানেই থেকে যাই, আর কোথাও তো যাবার জায়গা নেই । অগত্যা জগবন্ধুদের বাড়ীতেই , স্বর্ণ ও মায়া খেয়ে দেয়ে জগবন্ধুর মায়ের সাথে ঘুমিয়ে পড়ে ।

পরদিক সকালেই বোনের চিন্তায় ভাই রণজিৎ ও বাবা মহেন্দ্র জম্পুই আসে এবং খোঁজে নিয়ে জগবন্ধুদের বাড়ীতে যায় এবং জগবন্ধুর এই উপকারের জন্য স্বর্ণলক্ষীর ভাই রণজিৎ ও বাবা মহেন্দ্র , জগবন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল । পাশাপাশি জগবন্ধু ও তাদের পরিবারের লোকজনদের আমন্ত্রণ ও জানিয়েছিল । মহেন্দ্রবাবু টাকারজলা জম্পুইজলা এলাকার বিস্তির্ণ ভূমিতে সন্ত্রাসবাদীদেরকার্যকলাপের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার । আক্ষেপের সুরে মহেন্দ্র দেববর্মা জগবন্ধুর বাবাকে বলেছিলো দেখুন কিছু বিভ্রান্ত কাল্পনিক স্বপ্নধারী বিপথগামী বিবেচনাহীন মানুষের জন্য ভাতৃ ঘাতী খুনোখুনি , কিভাবে নিরীহ প্রাণের বলি চরানো হচ্ছে । জগবন্ধুর বাবা বৃদ্ধ হরিমোহন ঘোষ বলে উঠে দেখুন না আজ যারা মারছে কাল তাদের কেহ না কেহ হয়ত নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে নয়তো গোষ্ঠী কোন্দলে মারা পড়ছে , গুলি বন্দুকের নল থেকে বেরিয়ে গেলে কাউকে চেনে না । অস্ত্র মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে না ররঞ্চ ধ্বংসকে আমন্ত্রণ জানায় ।

তবুও কেন খুনোখুনি খেলার অবসান হয় না । এখানে শিশুরা সংস্কৃতি শেখার আগে এ কে রাইফেলের গল্প শোনে , সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকেই এর অবসান ঘটাতে হবে ।

বৃদ্ধ হরিমোহন ঘোষের কথাগুলো প্রৌঢ় মহেন্দ্র মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং বলে উঠেন সত্যিই আপনি ঠিক বলেছেন । এভাবে চলতে দেওয়া যায় না । স্বর্ণলক্ষী বড়দের কথা শুনেছিল । ভেবেচিল সত্যিই তো এতসব কারজন্য , কিসের স্বার্থে । যাই হোক কথপোকথনের পর মহেন্দ্রবাবু পুনরায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজ গ্রামের উদ্দেশ্যে মেয়েকে নিয়ে রওয়ানা হন । স্বর্ণলক্ষী যাওয়ার সময় জগবন্ধুকে ধন্যবাদ জানায় দুযোর্গপূর্ণ রাত্রিতে আতিথেয়তা করার জন্য ।

যাইহোক দিন কেটে যায় । জগবন্ধুর ও এতসব কথা আর মনে নেই । সময় আপন গতিতেই চলে ।

একদিন দুপুরে জগবন্ধু দেখতে পায় স্বর্ণলক্ষী ও তার বান্ধবী মায়াবতী দেববর্মা উভয়ে জম্পুই বাজারে এবং তার দিকে আসছে । হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে স্বর্ণলক্ষী প্রশ্ন করে আপনি কি ঘাবড়ে গেলেন নাকি, জগবন্ধুর সহাস্য উত্তর , কেন ? মায়াবতী বলে উঠে আপনি আমার বান্ধবীকে

কি যাদু করেছেন কে জানে সে তো আপনাকে ভুলতেই পারে না । জগবন্ধু বলে আমার নামটাই তো জগৎ এর বন্ধু সুতরাং আমাকে ভুলা কি সহজ ব্যাপার । নামেই তো আমার যাদু । মায়াবতী প্রশ্ন করে তাহলে ভুলার উপায় কি ? জগবন্ধু বলে উঠে , ভুলতে চেষ্টা করলে মনে আরো বেশি গেথে থাকবে। স্বর্ণলক্ষী লাজুক মুখে মুচকি হাসে । জগবন্ধু কিন্তু ভাবতেও পারেনি স্বর্ণলক্ষীর সঙ্গে তার পুনরায় দেখা হবে বা তাদের সর্ম্পক নিবিড় হবে ।

তারপর তিনজন মিলে মিষ্টির দোকানে । স্বর্ণলক্ষীর চোখে করুণা ভরা ভাষা কিন্তু মুখে লজ্জা । জগবন্ধুর বুঝতে বাকী রইলো না স্বর্ণলক্ষীর মায়াভরা চোখের রহস্য জগবন্ধুর জীবনে এক নতুন দিগন্তের আহ্বান জানায় । তবুও জগবন্ধু বলে উঠে কি জন্য আজ আসা হলো বাজারে । মায়াবতী কর্তৃত্বের স্বরে বলে উঠে এখনো কি বুঝার বাকী আছে । ন্যাকামি করবেন না ।

মিষ্টির দোকানেই জগবন্ধু ও স্বর্ণলক্ষীর নিরব ভালবাসার জন্ম হয় , মধ্যস্থতায় মায়াবতী ।

আস্তে আস্তে ব্যাপারটুকু মহেন্দ্রবাবুর কর্ণগোচরে আসে কিন্তু জগবন্ধু ভালো ছেলে বলে মহেন্দ্রবাবু ও জানে তা - ছাড়া মেয়ের প্রতি ভালবাসা মহেন্দ্রবাবুর বাধা দেবার মতো মানষিকতাও ছিল না ।

এবার স্বর্ণলক্ষী সরাসরি জগবন্ধুকে তাদের বাড়ীতে যেতে বলল । তারপর ওরা দুই বান্ধবী মিলে চলে যাওয়ার পর জগবন্ধু ভাবে বিধাতা সত্যিই তুমি বিচিত্র । মায়াবতী বকবক করলে ও স্বর্ণলক্ষী কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে মনের সব কথাই বলেছে ।

কিছুক্ষণ একাকী জগবন্ধু বিভোর হয়ে ভাবছিল , কিভাবে কি ঘটে গেল । কিছুদিন পর জগবন্ধু স্বর্ণলক্ষীদের বাড়ীতে যায় । আতিথেয়তা তো পেয়েছিলো কিন্তু রণজিৎ যেন জগবন্ধুকে কি বলে শাসিয়ে গেল ।

এতো সংশয় মনের গভীর আর্তনাদ দুটো প্রাণে তীব্র বাসনা তবুও পরিস্থিতি একে অপরের সাথে মনখুলে কথাবলাও মানা । কিন্তু আশ্চর্য স্বর্ণলক্ষী বিন্দুমাত্র সংশয়হীন , দ্বিধাহীন মনস্থির , একদিন জগবন্ধুকে বলে উঠে তুমি কি ভয় পাচ্ছ ? জগবন্ধু বলে দুশ্চিন্তা তো আছেই । কারণ তোমার ভাই রণজিৎ তো আর আমাদের মতো সাধারণ নয় । যা ইচ্ছা তাই করতে পারে ।

স্বর্ণলক্ষী বলে উঠে আমি ওসব পরোয়া করিনা , তুমি ? জগবন্ধু বলে উঠে ভয়ংকর দুর্যোগ তো প্রতিদিন আসে না। সুতরাং তুমি মেয়ে হয়ে যদি পার তাহলে আমি পারব না কেন ? তবুও স্বর্ণলক্ষী জগবন্ধুকে বলে তুমি সাবধানে থেকো । কোথাও একা যেও না । জগবন্ধু বুঝতে পারে স্বর্ণলক্ষী মনের আবেগ স্বর্ণলক্ষীর ভালবাসা জগবন্ধুর মনে পরশমণির ছোঁয়ার মতো রণন তোলে । স্বর্ণলক্ষী জগবন্ধুর হাত ধরে বলে তুমি কিন্তু কখনো আমাকে ভুল বুঝো না । আমি তোমাকে ছাড়া

বাঁচতে পারব না , স্বর্ণলক্ষী বলে তুমি রণজিৎ থেকে একটু সাবধানে থেকো । কোন প্রকার অসুবিধে হলে আমাকে জানাবে । সতর্ক থেকো । তোমার জন্য আমার সারাদিন চিন্তা লাগে । জগবন্ধু ভাবে যারা উগ্রবাদী ওরাও তো মানুষ - কারো ভাই , কারো স্বামী , কারো পুত্র । যেহেতু জগবন্ধু ও স্বর্ণলক্ষী সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে এখন অনর্থক র্ভাবনা । জগবন্দু বলে এতো চিন্তা করবে না । একদিন ভর দুপুরে রণজিৎ জগবন্ধুকে বলে এখান থেকে চলে যা , নয়তো তোকে মরতে হবে । বিপদ বুঝে জগবন্ধু কোন প্রত্যুত্তর করেনি ।

একদিন সন্ধ্যায় মায়াবতী জগবন্ধুকে বলে আর দেরী করা ঠিক হবে না এক্ষুনি পালিয়ে যাও স্বর্ণকে নিয়ে । যেমন কথা তেমন কাজ , ওই রাত্তিরে জগবন্ধু ও স্বর্ণলক্ষী মায়াবতীর দেখানো পথে পালিয়ে যায় । মায়ের মন্দিরে শপথ করে একে অপরের জীবনসাথী বানিয়ে নেয় । জাতি - উপজাতি এসব কথা তো আর ভালবাসার অভিধানে লিখা নেই ।

তৈরী হয় জগবন্ধু ও স্বর্ণলক্ষীর স্বপ্নের সুখের সংসার । কিন্তু তারা না গেল কালীকৃষ্ণ পাড়া, নাই বা গেল গুরদয়ালপাড়া। প্রথমটায় এখানে ওখানে ইতস্তত জীবন কাটাতে শুরু করল জগবন্ধু ও স্বর্ণলক্ষী । এর মাঝেই স্বর্ণলক্ষী বুঝাতে পারে সে 'ছ' মাসের গর্ভ বহন করেছে । তাদের ভালবাসার ফ্‌ল অচিরেই ধরিত্রীতে ফুটবে । স্বর্ণলক্ষী এখন আর তেমনটা বাইরে কাজ করতে পারে না মোটামুটি গৃহবন্দী । জগবন্ধু সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে রোজগার করে । এর মাঝেই জন্ম হয় স্বর্ণলক্ষী ও জগবন্ধুর আশার ফসল । ফর্সা ও সুন্দর ফুটফুটে ছেলে । জগবন্ধু আদর করে নাম দেয় " সাহেব"। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম জগবন্ধু ক্লান্ত হয়ে পড়ে তার শরীরেও দুর্বলতা দেখা দেয় । যে যুবক নিজের ঘরে ভাত , পুকুরের মাছ খেত তাকে নিয়ে এতো পরিশ্রম , এই ভেবে স্বর্ণলক্ষী জগবন্ধুকে বলে চল এভাবে আর কতদিন ? সাহেব দু বৎসরের হয়ে গেছে , পুনরায় স্বর্ণলক্ষী তিন মাসের গর্ভ বহন করছে । এখন বাড়ী যাব , এখ ন আর কেউ কোন আপত্তি করতে পারবে না । তারপরও যদি কিছু হয় আমি মরতে রাজী । অনেক ভেবে চিন্তে জগবন্ধু ও স্বর্ণলক্ষী তাদের ছেলে সাহেবকে সাথে নিয়ে ও পেটের সন্তান নিয়ে যায় বাপের বাড়ী গুরুদয়াল পাড়া । সন্তান বৎসল পিতা মহেন্দ্রবাবু মেয়ে জামাইকে নাতিসহ সাদরে গ্রহণ করে । এর মাঝে এত ঘটনা জগবন্ধু জানত না । জগবন্ধুর বাবা জগবন্ধুর চিন্তায় অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন । এ খবরও জগবন্ধু জানত না । জগবন্ধুর মনে প্রচন্ড কষ্ট হয় , স্বর্ণলক্ষী জগবন্ধুকে বুঝিয়ে বলে সবই ভাগ্যের পরিহাস । তুমি এভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। জীবনের রাস্তা অনেক লম্বা । কিছুদিন বাদে স্বর্ণলক্ষী ঘরে মেয়ে সন্তানের জন্ম হয় । আদর করে জগবন্ধু ও স্বর্ণলক্ষী মিলে মেয়ের নাম দেয় রীতা । স্বর্ণলক্ষী বাবাকে ভাই রণজিৎ এর কথা জিজ্ঞেস করে । বাবা মহেন্দ্র বলেন সে তো অনেকদিন ধরেই উগ্রবাদী দলের সাথে আছে । বাড়ী ঘরে আসে

না । একদিন শীতের রাতে হঠাৎ স্বর্ণলক্ষীর ঘরের দরজায় টুকা মারতেই স্বর্ণলক্ষী উঠে পড়ে । দরজা খুলতেই দেখতে পায় ভাই রণজিৎ তার পেছনে এ কে রাইফেল হাতে তার দুই সহযোগী , স্বর্ণলক্ষী ভাইয়ের পায়ে জড়িয়ে ধরে । রণজিৎ দুই সাকরেদ সহ ঘরে ঢুকে পড়ে । ঢুকেই বিছানার মধ্যে বসে থাকা জগবন্ধুকে সজোরে ঘুসি মারে । জগবন্ধুর নাক দিয়ে অনর্গল রক্ত ঝড়তে শুরু করে । সাহেব আর্তনাদ করে কেঁদে উঠে । স্বর্ণলক্ষী বলে উঠে ভাই আমাকে মেরে ফেলো ওকে কিছু করো না , রণজিৎ বলে উঠে স্বর্ণলক্ষী আমার একমাত্র বোন আর তুই এই ফায়দা তুলছিস নাকি?

রণজিৎ ক্রুদ্ধস্বরে স্বর্ণলক্ষীকে বলে উঠে আমরা লড়ছি স্বাধীন ত্রিপুরার জন্য আর তুই আমার বোন হয়ে কি তার দাদাগিরি করবি ।

স্বর্ণলক্ষী পুনরায় রণজিৎ এর পা চেপে ধরে বলে দাদা আমি কিছুই চাই না , শুধু স্বামী সন্তানদের নিয়ে বাঁচতে চাই।

রণজিৎ বলে , না -আমার সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি । সুতরাং ওই দালালের সাথে যদি তুই থাকিস তোকেও কেউ বাঁচাতে পারবে না । তোকেও আর বেশী সময় দিতে পারব না। আমি আবার আসব । তখন আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না । তুই এই দুশমনকে পরিত্যাগ কর।

রণজিৎ ও তার সাকরেদরা চলে যাবার পর জগবন্ধু ও স্বর্ণলক্ষী অনেক আলোচনা করে । জগবন্ধুর আঘাতে বনৌষধি লাগায় । স্বর্ণলক্ষী বলে চলো আমরা দুরে কোথাও চলে যাই । এবার জগবন্ধু প্রতিবাদের স্বরে বলে কেন যাবো , কোথায় যাবো । আমি স্বাধীনভুমির নাগরিক । আমি সরকার বিরোধী অসংবিধানিক কোন কাজ করিনি । তোমার ভায়ের মতো উগ্রবাদীর হুমকীতে কেন চলে যাবো । মরতে হয় এখানেই মরবো।

স্বর্ণলক্ষী প্রচন্ড ঘাবড়ে যায় বলে সে যদি আবার আসে জগবন্ধু বলে উঠে আসুক । স্বর্ণলক্ষী কথা বাড়ায়নি , কারণ সে লক্ষ্য করে জগবন্ধুর ভেতর একটা জেদ জন্মেছে , প্রতিরোধ , প্রতিশোধের। জগবন্ধু বলে ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ - তা কেবল ভবিষ্যই জানে ।

এর মাঝে ইতস্তত সংঘর্ষের খবর আসে । গোলাগুলীর প্রচন্ড শব্দ শোনা যায় । মানুষ অভ্যস্ত ওসবের খবর কে রাখে । খামাখা সময় ব্যয় । একদিন ভরদুপুরে কাজকর্ম সেরে জগবন্ধু স্বর্ণলক্ষী , তাদের সন্তান সাহেব ও রীতাকে নিয়ে ভাতঘুম যাচ্ছিল । এমন সময় তুফানের বেগে অনবরত কর্কশ শব্দে রণজিৎ জগবন্ধুকে ডাকতে ডাকতে এক লাথিতে দরজা খুলে ঘরে ডুকে পড়ে। রণজিৎ এর পেছনে ওর চারজন সাকরেদ এ কে রাইফেল নিয়ে কসাই এর মতো চেহারায় ঘুর্ণিঝড় তোলে ঘরে ঢুকে পড়ে । জগবন্ধু ভয়ার্ত পাখীর মতো আর্তনাদ করতে থাকে , কারণ সে বুঝেঝে তার কোন উপায় নেই ।

স্বর্ণলক্ষী স্বামী , সন্তানদের আগলে বলে উঠে , যদি মারবে ভাব তাহলে আমাদের চারজনকেই মেরে ফেলো । ফুলের মতো দুটি শিশুকে দেখেও তোমার কোন মমতা জাগে না । সাকরেদেরা চুপ দাঁড়িয়ে । স্বর্ণলক্ষী বলে আমার কাছে থেকে স্বামী , সন্তানদের সরিয়ে যদি তুমি শান্তি পাও তাহলে তাই হোক । রুদ্রমূর্তি নিয়ে স্বর্ণলক্ষী বলে উঠে আতংক্ক ও ত্রাসের জীবন থেকে মৃত্যু অনেক শ্রেয় । প্রতিদিন মরার চাইতে একদিনে একসাথে মৃত্যু অনেক ভালো , আগে আমাকে মারো । অবুঝ সাহেব বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে , ভাষাহীন রীতা বর্ব্বরদের সামনে সরলতার হাসি হাঁসে । কিন্তু ওদের যে মনও নেই , মানসিকতাও নেই । হঠাৎ রণজিৎ ছোট্ট শিশু সাহেবকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে চিকচিক ধারালো দা হাতে নিয়ে কন্যা কোলে স্বর্ণলক্ষীকে ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে জগবন্ধু কে ঝাগল ভেড়ার মতো টানাহ্যাচড়া করে চারজনসহ জঙ্গলের পথে রওয়ানা হয় । স্বর্ণলক্ষী স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য পিছু ধাওয়া করে । উদ্যত রুদ্রমূর্তি স্বর্ণলক্ষী উন্মাদের মতো চিৎকার করে বেরিয়ে পড়ে কিন্তু স্বামীকে সে বাঁচাতে পারেনি । আজও পায়নি স্বামীর নিথর দেহ কিন্তু পেয়েছে পাহাড়ের মেঠো পথে স্বামীর রক্তের নিশানা । আজো পাহাড়ের পথে পথে ক্লান্তিহীন স্বর্ণ খুঁজে চলেছে স্বামীকে উন্মাদিনীর বেশে ।

অজানা রাস্তা

মাঝ রাতে শোবার ঘরের ছিটকিনি খুলে দেখি বাইরে নিঝুম অন্ধকার , কিন্তু স্বপন তাহলে কোথায় , কেন এল না । এত রাতে বাড়ীর কাউকে ডাকলে তারাই বা কী করবে ? পশ্চিমের ভিটেতে বয়স্ক শ্বশুর শ্বাশুড়ী তা ছাড়া তো বাড়ীতে কেউ নেই । নিজেও বা কোথায় যাবে সন্ধ্যা , একে তো জমকালো অন্ধকার তাছাড়া বিছানায় শুয়ে আছে দু - মাসের নির্বোদ শিশু গৌরী । সন্ধ্যা ভাবে এভাবে কতদিন , মাসাধিক কাল যাবৎ স্বপনের চলাফেরা সন্ধ্যার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না , কিন্তু অশান্তির ভয়ে সন্ধ্যা কাউকে কিছু বলেনি । কিন্তু কতকাল সংসারের মুখ বুঁজে থাক যায় । আবার কোন অঘটন ঘটলে সবাই সন্ধ্যাকে দোষ দেবে । সারারাত হারিকেন জ্বালিয়ে দু মাসের শিশুকন্যা গৌরীকে কোলে নিয়ে রাত কাটিয়ে ছিল সন্ধ্যা । রাত প্রভাত হতেই সন্ধ্যা বুঝতে পারে শ্বশুর মশাই গোয়াল ঘর থেকে গরু মহিষাদি বের করছে । অনেক ভেবে চিন্তে সন্ধ্যা মনস্থির করে আজ শ্বশুর শ্বাশুড়িকে বলে দেখবে স্বামী স্বপনের উশৃঙ্খল জীবনের কথা । শ্বশুর সন্ধ্যাকে জিজ্ঞেস করে উঠে তুমি রাতে ঘুমাওনি , মুখ চোখ যেন তোমার উসকো খুসকো হয়ে আছে , রাতে কি গৌরী খুব যন্ত্রণা করেছে । নাকি ? সন্ধ্যা আরো ভাবে আমার অভিযোগ যদি কোন উল্টো প্রতিক্রিয়া হয় , এভাবে অনেক ভেবে চিন্তে সন্ধ্যা সকালের প্রাথমিক কাজ সেরে রসুই ঘরে যায় গৌরীকে শ্বাশুড়ী মা প্রতিমার কোলে উঠিয়ে দেয় । কিছুক্ষণ বাদে শ্বাশুড়ী সন্ধ্যাকে প্রশ্ন করে সন্ধ্যা , স্বপনের কি এখনো ঘুম ভাঙ্গল না ! এবার সন্ধ্যার ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে যায় , নিঃশব্দে দু-চোখ গড়িয়ে জল বের হতে শুরু করে , কি হয়েছে তোমার প্রশ্ন করতেই শ্বাশুড়ীর বুকে আপ্লুত স্নেহে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে মা, আজ মাস খানেক যাবৎ প্রায়শই আপনার ছেলে রাতে ঘরে থাকে না । কখনো ভোরে ফিরে কখনো শেষ রাতে মাগো অসহ্য যন্ত্রণা , শ্বাশুড়ী প্রতিমা বলে উঠে তাহলে কেন এতোদিন মুখ বুঝে চুপ করে আছো , আরো আগে আমাকে জানালে পারতে । শ্বাশুড়ী শ্বশুড় নবদ্বীপ দাসকে সমস্ত ঘটনা জানায় । অবস্থা সম্পন্ন গৃহস্থ নবদ্বীপ বাবু প্রচন্ড স্বাভীমানী । সকাল গড়িয়ে দুপুর ছেলে স্বপন টালমাটাভাবে হেলে দুলে ঘরে ডুকে । নবদ্বীপবাবু ও স্ত্রী প্রতিমা প্রচন্ডভাবে স্বপনকে গালাগাল দেয় এবং নবদ্বীপবাবু

পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন এ সংসারে এ ভাবে চলা যাবে না - তুমি নিজেকে পরিবর্তন করো । যাক তারপর কটা দিন ভালভাবেই চলে , খানিকটা মান অভিমান , ২/৪ দিন কেটে গেলে তা -ও ঠিক হয়ে যায় । মা ,বাবা শ্বশুড়, শ্বাশুড়ীর আদরে ফুটফুটে গৌরী বড় হতে থাকে । নবদ্বীপবাবু নাতনী গৌরীর বয়স যখন " ছ" মাস তখন ধুমধাম করে তিন গ্রাম নেমন্তন্ন করে নাতনীর অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করে। আর্থিক স্বচ্ছল গৃহস্থ নবদ্বীপবাবু একমাত্র সন্তান স্বপনকে ডেকে বলেন স্বপন বাবা দেখো আমার বয়স হয়েছে আস্তে আস্তে সংসার , সম্পত্তির দায়িত্ব নিয়ে নাও । এখন আমাদের ধর্ম কর্ম করতে দাও । স্বপন মুখে কিছু বলল না শুধু ঘাড় ঝাঁকাল।

কিছুদিন পর স্বপন , একদিন সকালে বাবা নবদ্বীপের পাশে দাঁড়িয়ে বলে বাবা আমার দু - হাজার টাকার প্রয়োজন , আমাকে দু টি হাজার টাকা দাও , নবদ্বীপবাবু বলে ওঠেন সংসারতো তোর - তুই সবকিছু বুঝে নে বাবা । স্বপন বলল তা ঠিক আছে বাবা, এখন তুমি আমাকে দু -হাজার টাকা দাও । নবদ্বীপবাবু সিন্দুক খুলে স্বপনকে দু হাজার টাকা বের করে দেন , কিছুক্ষণ বাদে স্বপন পোশাক পরে সোজা বের হয়ে যায় , তারপর একদিন যায় দু -দিন যায় স্বপন আর ফিরছে না দেখে নবদ্বীপবাবু পাগলের মতো হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন আত্মীয় স্বজন , বন্ধু বান্ধব , এ রাজ্য ও রাজ্য কিন্তু না স্বপনের দেখা পাওয়া গেল না , বয়স্কা স্বপনের মা প্রতিমা দেবী অর্ধ উন্মাদের মতো সারাদিন আবোল - তাবোল বকছেন । সন্ধ্যা ছ মাসের গৌরীকে নিয়ে অসহায় , একমাত্র চোখের জল সঙ্গী। নবদ্বীপবাবু শোকে স্তব্ধ , বাকশক্তিহীন পাথরের মতো । সন্ধ্যা যেন শিশু কন্যা , শোকগ্রস্থ শ্বশুড় ,শ্বাশুড়ীকে নিয়ে দিকবিদিক শূন্য অবস্থায় পড়েছে ; কিন্তু এভাবে তো চলবে না । পথ চেয়ে চেয়ে বছর ফুরিয়ে গেছে স্বপনের কোন দেখা নেই । আস্তে আস্তে নবদ্বীপবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন , একদিন সন্ধ্যাকে মৌনতা ভেঙ্গে বলেন মা আমি আর বেশী সময় নেই , এখন তুমিই ছেলে হয়ে সংসার সামলাও । তোমার শ্বাশুড়ী মাকে লক্ষ্য রেখো । ঐ রাতেই নবদ্বীপবাবু মারা যান । অঝোড়ে বৃষ্টি দুর্যোগের রাত , সন্ধ্যা এখন প্রচন্ড শক্ত , লোকজন ডেকে শ্বশুড়ের শেষ কৃত্য করেন । শ্বাশুড়ী মা তো এখন কিছুই জানে না । বুঝে না, কিছু বললেই বলে উঠে স্বপন এসেছে । শ্বশুড় মারা যাওয়ার তিন মাস বাদে সমস্ত অপেক্ষার শেষ করে একদিন সন্ধ্যার শ্বাশুড়ী প্রতিমাদেবী সবাইকে ফাঁকি দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন । এ বারেও সন্ধ্যা নিজেকে সামলে শ্বাশুড়ীর শেষ কৃত্য অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সমাধা করে । সন্ধ্যার সুখ দুঃখের কথা শোনার আর কেউ রইল না । এক পা দু পা করে গৌরীর ছ বছর বয়স হয়ে গেছে । সন্ধ্যাই গৌরীর মা - বাবা সব! গৌরীকে লেখাপড়া শিখাতে হবে নানাহ অসুবিধা, প্রচন্ড সমস্যা ঘরে আর কোন লোক নেই । ঘরের বৌ সন্ধ্যা মানষিক দৃঢ়তা নিয়ে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নেয় , সকাল বিকেল আজো ও স্বামীর নামে সিঁথিতে সিঁদুর চড়ায় । গৌরীকে গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয় । গুটি গুটি পায়ে গৌরী মায়ের হাত ধরে স্কুলে যায়

,বছরের পর বছর কেটে গেছে । না , স্বপনের কোন দেখা নেই । স্কুলে সহপাঠিরা গৌরীকে তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করে , গৌরী উদাসীন হতবাক চেয়ে থাকে , ঘরে এসে মার কাছে জানতে চায় মা বাবা কোথায় ? কখন আসবে ! সন্ধ্যার কাছে তো এ প্রশ্নের জবাব নেই উত্তর শুধুই চোখের জল, আর অজানা প্রতিক্ষা । আস্তে আস্তে গৌরী বড় হয়ে উঠে , মায়ের মনের ব্যাথা বুঝতে পেরে আর কখনো বাবা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে না , তবে বাবার প্রতি একরাশ ঘৃণা তার মনে , গৌরী সুশ্রী , শান্তস্বভাবা , স্কুলে সবাই ওকে স্নেহ করে। মায়ের পরিচর্যায় গৌরী বড় হয়ে উঠে এবং ভালভাবে স্থানীয় স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করে । গৌরী তো তার সুখের খবর মাকে দিয়ে তার দায়িত্ব পালন করেছে কিন্তু মা কাকে শোনাবে তার গৌরী ভাল রেজাল্ট করেছে । শোনার যে আজ কেউ নেই। ১৯৭১ এ জানুয়ারী মাসে সন্ধ্যার বিয়ে হয় স্বপনের সাথে । তা যেন ক্ষণস্থায়ী ছেলেখেলা । ১৯৭৩ এর এপ্রিলের ১৮ তারিখ তার যবনিকা , অপেক্ষাই অপেক্ষাই যেন সন্ধ্যার চোখ স্থির হয়ে গেছে । সন্ধ্যার থামলে চলবে না - গৌরীর জীবনের কথা ভেবে তাকে এগোতে হবেই , গৌরীকে সন্ধ্যা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি করে দেয় । মায়ের মুখ উজ্জ্বল করে গৌরী দ্বাদশমান পরীক্ষায়ও ভাল রেজাল্ট করে । এ -বার কিন্তু সন্ধ্যার অন্য চিন্তা মেয়ে বড় হয়েছে , কলেজের পড়াশুনা করতে হলে মেয়েকে শহরে যেতে হবে । যা সন্ধ্যার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। মেয়ে বড় হলে মধ্যবিত্ত পরিবারের মা বাবাদের যে চিন্তা , সেই চিন্তায় আক্রান্ত সন্ধ্যা , মেয়েকে ভাল বর দেখে ঘর সাজিয়ে দিতে হবে। কিন্তু গৌরীর পড়াশুনার অদম্য নেশা । কিন্তু মায়ের কথা ভেবে কিছু করার উপায়ও নেই । ঘরের আলো নিভিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা ভাবে গৌরী চলে গেল আমার সংসার বলে থাকবেই কি ? সবই তো খাঁ খাঁ । দেখে ঘরে গৌরী বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে । সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু আসলে গৌরী মায়ের কথাই ভাবছে । বান্ধবীদের গৌরী অনেকবার বলেছে মায়ের অসহায়ত্বের কথা ভাবলে আবার বুক ধড়ফড় করতে থাকে , আমার মা আর কত কষ্ট করবে বল , আমি বিয়ে থা করব না , মার সাথেই থাকব। আর যদি বিয়ে করতেই হয় ছেলেকে আমার মায়ের গ্যারান্টি দিতে হবে । কত ছেলের আলাপ আসছে কিন্তু গৌরীকে টলানো গেল না , মায়ের চাপ সহ্য করে গৌরী মাকে বলে আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না । যাই হোক এলাকার স্বজ্জন লোকের সাথে আলাপচারিতায় রাজধানী আগরতলা থেকে একটি ভাল ছেলের সম্পর্ক আসে গৌরীর জন্য । ছেলেটির নাম সমর । সরকারী চাকুরী করে , দেখতে শুনতে সুঠাম , ভালো ছেলে । কিন্তু গৌরীর প্রথম শর্ত আমি বিয়ে করতে রাজী মায়ের মনের কথা ভেবে তবে আমার পক্ষে মাকে ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব । যাই হোক সমীর রাজী সে গৌরীকেই বিয়ে করবে । কারণ সমীর ও জানতো শ্বাশুড়ী সন্ধ্যা দেবীর মৃত্যুর পর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিক সমীরই হবে । শুভদিনে ঘটা করে ২০০১ ইং ৭ই ডিসেম্বর সমীর - গৌরীর বিয়ে হয় । সমীর শর্তমতো শ্বশুরবাড়ীতেই থাকে এখান থেকেই অফিস করে । সুন্দর ভাবেই চলছিল । এরই মধ্যে গৌরী অন্তঃসত্বা হয় এবং শুভ দিন সময়ে গৌরী এক পুত্র

সন্তানের জন্ম দেয় ।গৌরী ও সমীর মিলে ছেলের নামকরণ করে সাগরদ্বীপ ।সাগর বড় হতে থাকে , এরই মধ্যে সমীর হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ে , গৌরী মায়ের দুর্দশার কথা ভেবে দিন রাত সমীরের মাথার কাছে থেকে দূর দুরান্ত বেলুড় হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে স্বামী সমীরকে সুস্থ করেন । কারণ গৌরী দেখেছে মায়ের মানষিক আর্তনাদ , বাবা কি তা গৌরী কখনো বুঝতেও পারেনি। আদর পাওয়া তো দূরে থাক, গৌরী কখনো মাকে কিছুই বুঝতে দেয়নি , তার ভেতরে কি চলছে।

বিয়ের ছ- মাস পর থেকেই গৌরীর উপর চলত অমানুষিক অত্যাচার । সে যেন অর্থই অনর্থের মূল ।টাকা পয়সা দিয়ে গৌরী কখনো সমীরকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি , তার মধ্যেও যদি তৃতীয় কেহ থেকে থাকে তা গৌরীর অজানা ছিল তবে মনে মনে গৌরী সব সহ্য করত ।অনেক সময় মায়ের চাপা কান্না সাগরদ্বীপ হতচকিত হয়ে ভয়ার্তি চোখে জেগে উঠত । সমাজ বলবে মা মেয়ের একই দশা , এ - কথা ভেবে গৌরী স্বামীকে বুঝাত , মন পেতে চেষ্টা করত কিন্তু নিস্ফল , রাতেই যেন সমীরের চেহারা পাল্টে যেত তার উপরে মাঝে মধ্যে স্বামীর অপেক্ষায় রাত জেগে বসে থাকত ।কিন্তু না রাতে ফিরতই না ।অমানুষিক শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে কতদিন চলা যায় ।সাগরদ্বীপ বড় হয়েছে , কিছু বুঝতে পারে । গুটি গুটি পায়ে মা গৌরীর মতোই মায়ের হাত ধরে স্কুলে যায় । সন্ধ্যাদেবীও তো মা , উনিও বুঝতে পারেন মেয়ের উপর কি ঝড় বইছে কিন্তু নিজের ভাঙ্গা কপালের কথা ভেবে সমীরকে অনেক বুঝান কিন্তু সমীর তো পাল্টানোর লোক নয় ।ক্রমে পড়শীর কানে খবর পৌঁছে , সবাই বুঝান কারণ এই গ্রামের সবাই জানে শান্ত স্বভাবা গৌরী কত নরম মনের মানুষ ।কিন্তু না , ২-১ দিন ভাল ব্যবহার পেলেও সমীর পুনরায় নিজের রূপ ধারণ করে ।গৌরী ভাবে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপরও ভাবে আমাকে শান্ত হতে হবে , শান্ত হয়ে ভাবতে হবে, আরও একটু চেষ্টা করতে হবে সমীর ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু না বিধি বাম ।একরাতে সমীর গৌরীকে এম ন প্রহার করে , গৌরী অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং মাথা দিয়ে অনর্গল রক্ত ঝড়তে শুরু করে ।ভয়ার্ত সন্তান সাগরদ্বীপ চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠে ।কোমল শিশুও রেহাই পায়নি বর্বরতার ।এই বর্বর ঘটনা দেখে সন্ধ্যাদেবী সহ্য করতে পারেন নি , কারণ উনিও মা , গ্রামের লোক আসে গৌরী ও সাগরদ্বীপকে গোবিন্দ পন্থ বল্লভ হাসপাতালে নিয়ে যায় , এবার সন্ধ্যাদেবীর ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে যায় ।যে মহিলা জীবনে শুধু ঘাত , প্রতিঘাত আর অসহ্য কষ্ট পেয়েছেন তবুও মেয়ের জন্য মুখ বুঁজে সব সহ্য করেছেন আজ উনি কিছু মানতে নারাজ ।সন্ধ্যাদেবী আজ যেন ভয়ংকর রুদ্র মূর্তি , অসুর নাশিনী দেবী ।বলে উঠেন মেয়েকে তিলে তিলে মরতে দেবো না ।কোন বাধা মানবো না , নরপিশাচকের বিচার চাই । সেই যেতে হলো মোকদ্দমায় । সুস্থ হয়ে গৌরী মাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কেঁদে উঠে । মা আমাকে ছেলে নিয়ে বাঁচতে দাও। সমীর শ্রী ঘরে, ওর ঔদ্ধত্য সুখের সাজানো সংসার ছাড়খাড় , গৌরী ছেলেকে লতার মতো জড়িয়ে ধরে গুটি পায়ে এগিয়ে চলছে অজানা ভবিষ্যতের পথে ।

দুটি জীবনের অবসান

সুবোধ যাওয়ার আগেই সাধনকে বলে রেখেছিল কালাপানিয়া গ্রামের রাস্তা , তার উপরে বর্ষায় জমে আছে কাদাজল, সুতরাং পুরো রাস্তা কিন্তু গাড়ী দিয়ে যাওয়া যাবে না । এক মাইলের মতো রাস্তা হাটতে হবে । এই খবর জেনে সাধনের কিন্তু বেশ অস্বস্তি হল কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। এ যে বন্ধুত্ব রক্ষা । হাঁটতে হাঁটতে সূর্য যেন ডুবে যাচ্ছে কিন্তু বন্ধু সুবোধের দেওয়া বর্ণনা মতো কোন গ্রামের চিহ্ন নেই ।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করে দেখা গেল অদূরে ছোট্র গ্রাম , গ্রামে ঢোকার আগে একটি খালের উপর বাঁশের সাকো তৈরী যা পার হয়ে গ্রামে পৌঁছতে হবে । অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে । সুবোধ সাধনকে বলে কিরে বন্ধু বিরক্ত হচ্ছিস নাকি - সাধন বলে না রে, একটা কথা আছে পরের উপকার করতে গেলে নিজেকে কিন্তু দুর্ভোগ পোহাতে হয় ।

সুবোধ বলে প্রথমে তো চল্ দেখবি দারুন মজা হবে । শ্বশুরবাড়ীর মজাটাই আলাদা । সমস্ত কষ্ট ভুলে যাবি । সাধন বলে তা ঠিক আছে , শ্বশুরবাড়ী তো তোর , যত আনন্দ আহ্লাদ সবটাই তো

তুই পাবি জামাই বলে , কিন্তু আমি ?

সুবোধ বলে উঠে আরে বন্ধু অজ গায়ে শ্বশুড়বাড়ী হলে কি হবে । আমার শ্যালিকা কিন্তু দারুন স্মার্ট , দেখতেও বেশ সুন্দর । নাম যেমন পুষ্প , দেখতেও কিন্তু পুষ্পের মতো । বিয়ের আগে দেখলে কি আরতিকে বিয়ে করতাম । সাধন বলে তোর শ্যালিকা তো মেয়ে এবং দুনিয়ার অন্য মেয়েদের মতো একই জাতের । বিশেষত্ব আর কি ? সুবোধ বলে গেলেই বুঝবি।

কথায় কথায় সাধন সুবোধের সাথে গিয়ে উঠে সুবোধের শ্বশুড়বাড়ী । মেঘলা আকাশ , সন্ধ্যা হয়ে গেছে , গ্রামের বাড়ী , বিশাল উঠোন , দেখতে পেল বিশাল বড় দুটো মাটির কোঠা, পাশে গোয়ালঘর । এই গ্রামে এখনো বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটেনি । দুটো ঘরেই মাটির প্রদীপ জ্বলছে । সুবোধ বাড়ীর উঠোনে গিয়ে হাক দিতেই ঘর থেকে বেড়িয়ে এলো মেঘলা আকাশে জোছনার মতো ফুটফুটে এক মেয়ে । সুবোধকে দেখেই হাসিতে লুটিপুটি খাচ্ছে । জামাইবাবু শব্দটা শুনতেই বুঝে নিলাম এই জোছনাময়ী সুবোধের শ্যালিকা হবে । ওরা আনন্দে এতই উৎফুল্লিত মেঘলা আকাশে ইলিশগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে তা যেন ওদের খেয়াল নেই । সাধন আকস্মিক উদ্বেল ভালবাসার ছবি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই এবং খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে ,যাই হোক বন্ধু সুবোধ বলে উঠে বন্ধু ভিজে লাভ নেই চল ঘরে ঢুকি । সাধন মনে মনে ভাবে রাস্তাটা যতদূর মনে হচ্ছিল , এখানে পৌছার পর ততদূর মনে হল না। ঘরে ঢুকে সাধন দেখতে পায় ঘরটা খুব সুন্দর সাজানো গুছানো । যেন ওদের আগমনী বার্তা আগেই পৌছেছিল । ঘরের ভেতর কাঠের পাটাতন বিছানো যার উপর দুটো সুন্দর বিছানা করা । হাত - পা ধুয়ে সুবোধের সাথে সাধন ও বিছানায় বসে পড়ে । আরো খানিকটা সময় কেটে যায় । মেয়েটি কিছু জল খাবার নিয়ে পুনরায় ঘরে ডুকে , এবার সুবোধ - সাধনকে পরিচয় করিয়ে দেয় , সাধন , আমি যে বলেছিলাম এই আমার শ্যালিকা পুষ্প - পুষ্প দু হাত জোর করে সম্মান জানায় সাধনকে । সুবোধ বলে তোকে কি বলেছি এখানে আসলেই তোর ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে । সাধন কিন্তু চুপ চারিদিকের প্রকৃতির আস্বাদন নিচ্ছে । জল খাবার খাওয়ার পর সাধন মাটির কোঠার থেকে বের হয়ে পেছনে দেখতে পায় বিশাল এক পুকুর এবং বাড়ীগুলো বেশ ফাঁকা ফাঁকা । তারপর সুবোধের সাথে অপর ঘরে সাধন ডুকে দেখতে পায় ষাটোর্ধ এক বয়স্ক মানুষ হুকো খাচ্ছে , পাশে এক পঞ্চাশোর্ধ মহিলা তাঁত বুনছে , সুবোধ পরিচয় করিয়ে দিল , সাধন উনারা আমার শ্বশুড় শ্বাশুড়ী । সাধন , সুবোধের সাথে উনাদের পা ছুয়ে প্রণাম করে ।

বৃদ্ধ মহিলা নিরুত্তাপ , হঠাৎ বৃদ্ধ সুবোধকে বলে উঠে , সুবোধ বাবা পুষ্প বড় হয়েছে , আমার তো তুমিই জামাই তুমিই ছেলে । ওর জন্য ছেলে দেখ । সুবোধ বলে নিশ্চিন্তে থাকুন । চুপচাপ, কিন্তু মনে মনে সাধন ভাবে বন্ধু সুবোধ এক ডিলে দু -পাখী শিকার করতে চাইছে , আরো

ভাবে মেয়েটা পছন্দের , যদি সুবোধ রাজী থাকে , আমার কোন আপত্তি নেই । যাই হোক মুখ ফুটে তো আর এসব বলা যায় না । যদি সুযোগ হয় তবেই বলব । সুবোধ সাধনকে বলে উঠে দেখ সাধন আমার শ্বশুড় প্রচন্ড দুঃখী , এখানে উনার অনেক বিষয় সম্পত্তি ছিল কিন্তু উনার বড় ছেলে স্বপন তখন ২৪ বৎসরের যুবক , হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে । শ্বশুড়মশাই ভূ - সম্পত্তি বিক্রি করে অনেক পয়সা খরচ করেও স্বপনকে বাঁচাতে পারে নি । আজ প্রায় নিঃস্ব । তবু ও আমার শ্বশুর যোগেশ বাবুর একটা বিশাল মন আছে । মাঝে মধ্যে তুই যদি আমার সাথে এখানে অসিস্ তা হলে উনারা খুব খুশী হবেন । উনাদের তো দেখার মতো এখন আর কেউ নেই । সাধন অযাচিত এই নিমন্ত্রণে মনে মনে খুশী হলেও কিছু প্রকাশ করেনি কিন্তু পুষ্পকে নিয়ে ঘর বাধার এক সুপ্ত বাসনা সাধনের মনে উকি ঝুকি দিতে শুরু করে । কিন্তু একদিনেই তো আর সব প্রকাশ করা যায় না । সাধন ভেবে নেয় আমি আর সুবোধ দু'জনেই তো একসাথে ফার্মে শ্রমিক হিসাবে কাজ করি , একদিন সুবোধকে বলব যদি সে রাজী হয় তা হলে আমি ওর শ্যালিকা পুষ্পকে বিয়ে করব । কারণ দেখে যা বুঝলাম বাড়ীর বড় জামাই হিসেবে সুবোধই এ বাড়ীর কর্তা এবং শেষ কথা । রাতে বেশ মজা করে খাওয়া দাওয়া সেরে অধিক রাত পর্যন্ত চলে গল্পো । রাতের খাওয়া মিটে গেছে অনেকক্ষণ । বলতেই হয় বললাম পুষ্প তুমি সত্যিই দারুণ রেঁধেছো। অনেক রাত পর্যন্ত পুষ্প ওর জামাইবাবু সুবোধ এবং আমার সাথে গল্প করে ওর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে শুতে গেল । রাতে কিন্তু সাধনের ঘুম এল না । এ পাশ , ও পাশ করে পুষ্পের কথা যেন ছবির মতো ঘুরে ফিরে আসছে সাধনের চোখে , রাত ফুরিয়ে গেছে , ভোরের আলো , প্রথমে দরজা খুলেই সাধন দেখতে পেল পুষ্পকে । একটু ইতস্তত করে সাধন পুষ্পকে উঠানে একা পেয়ে বলে উঠে কাল রাতে আমি এক মুর্হুতও তোমাকে ভুলতে পারিনি । পুষ্প বলে উঠে মানে ! মানে তোমাকে দেখার পর আমি সারা রাত শুধু তোমার কথা ভাবছি , পুষ্প পুনরায় বলে এর মানে ও বুঝলাম না । কী বলতে চাইছেন আপনি ? সাধন বলে আমি বলতে চাইছি যে আমার কী হয়েছে আমি জানি না , আমি যেন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আছি , ভাষা নেই মুখে সব বলার । শুধু এতটুকু বলতে পারি তোমার সাথে পরিচয়ের পর শুধু তোমাকে নিয়েই ভাবছি ।

পুষ্প বলে উঠে এখন তো বাড়ীতে ফিরে যাবেন । ফিরে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে । আপনার মতো শহরের মানুষের অনেক রকম রূপ থাকে , আমরা গ্রামের মানুষ এতকিছু বুঝি না , তা ছাড়া অতোকিছু বুঝার দরকারও নেই । মনে কিছু থাকলে মন থেকে সবকিছু সরিয়ে নিন্ । যোগাযোগ না থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে । শহরে ফিরে গিয়ে শহরের মেয়ে বিয়ে করুণ , না হয় শহরের মেয়ের সাথে প্রেম করুণ , একথা বলে ফিকা মুখে পুষ্প চলে যেতেই সুবোধ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে । সাধনকে বলে কি রে তুই জেগে গেছিস । চল তৈরী হয় , গিয়ে কাজে তো যেতে হবে।

শহরের রামনগরে সুবোধ সাধনের বাড়ী । সকালেই চা - বিস্কুট খেয়ে সুবোধ - সাধন , সুবোধের শ্বশুর যোগেশ বাবু শ্বাশুড়ী লক্ষীবালা এবং পুষ্পের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুবোধের কালাপানিয়া শ্বশুড় বাড়ী থেকে চলে আসে । সাধনের যেন আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না কিন্তু অযাচিতভাবে তো কারো বাড়ীতে থাকা যায় না । তার উপর সুবোধও তো চলে আসছে । আস্তে আস্তে বেশ কটা দিন চলে যায়। সুবোধ - সাধন এক সাথেই কাজ করে । সাধন দু -বার সুবোধকে বলেও ফেলে সে পুষ্পকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু সুবোধ তাতে যেন কর্নপাতই করেনি । এরই মাঝে পুষ্প সুবোধের বাড়ীতে বেড়াতে আসে । আগেও নাকি প্রায়ই আসত । পুষ্প সুবোধের বাড়ীতে আসার পর সময় পেলেই সাধন সুবোধের বাড়ীতে গিয়ে পুষ্পের সাথে কথাবার্তা বলতো । সুবোধের কাছে কোন রকম উত্তর না পেয়ে একদিন সাধন , সুবোধের স্ত্রী আরতীকে বলে বৌদি তোমার বোন পুস্পকে আমার খুব ভাল লাগে , তোমরা যদি মনে কর আমি ওর উপযুক্ত পাত্র তবে আমি পুষ্পকে বিয়ে করতে চাই । আরতী যেন হাতে চাঁদ পেয়েছেএ , রাতে বোন পুষ্পকে জিজ্ঞেসা করে সাধনদাকে তোর কেমন লাগে । পুষ্প বলে যেমনই লাগুক আমি বিয়ে করব না । আরতী আহ্লাদিত হয়ে স্বামী সুবোধকে বলে পুষ্পকে সাধনদার সাথে বিয়ে দিলে ভালইতো হতো । তুমি কি বল । সুবোধ বল কেন কি দরকার । এ নিয়ে সুবোধ ও আরতীর বেশ বাকবিতন্ডা ও হয় । যাইহোক এভাবে আরও বেশ কিছুদিন কেটে যায়। একদিন সুবোধ পুষ্পকে বাড়ী পৌছে দিয়ে পরদিন ফিরে আসে । বাড়ীতে এসে সুবোধ আরতীকে বলে পুষ্পের এ বিয়েতে মত নেই সুতরাং এক্ষুনি এসবের দরকার নেই । আরতী বলে তুমি যখন বাড়ীতে গিয়েছো বাবার সাথে কথা বললেই পারতে । কিন্তু সুবোধ রেগে তেড়ে উঠে । এভাবে আরো কয়টা দিন কেটে যায় । আরতীর দুশ্চিন্তা বাবা থাকতে থাকতে বোনটার বিয়ে না হলে পরবর্তীতে অসুবিধে হয়ে যাবে । একদিন সাধন আরতীকে বলে কি বৌদি কোন খবর আছে কি ? আরতী বলে সাধন দা আমি তোমাকে জানাব । হঠাৎ একদিন খবর আসে আরতীর বাবা খুব অসুস্থ, সুবোধ বাড়ীতে নেই , তড়িঘড়ি আরতী সাধনকে ডেকে পাঠিয়ে বলে সাধনদা , আমি মুশকিলে পড়েছি বাবা অসুস্থ , বলুনতো কিভাবে যাই । এ কথা শুনতেই সাধন বলে বৌদি ভাববেন না আমি আপনাকে নিয়ে যাবো । সাধন আরতীকে নিয়ে পৌছে যায় কালাপানিয়া আরতির বাপের বাড়ী। গিয়ে দেখে বাবা তার অসুস্থ , মা বাবার মাথায় জলের ধারা দিচ্ছে , আরতি মাকে জিজ্ঞেস করে মা পুষ্প কোথায় । মা লক্ষীবালা বলে ও তো সুবোধের সাথে তোর বাড়ীতে গেছে কাপড় চোপড় কিনবে বলে । আরতি মনে যেন কেমন একটা সংশয় জাগে । আরতী নিজেকে সামলে নেয় কারণ কাউকে বলার কোন জো নেই । এরই মাঝে আরতী অসুস্থ বাবাকে বলে বাবা তুমি সাধনদাকে তো দেখতে পাচ্ছো ভালো মানুষ , উনার সাথে পুষ্পকে বিয়ে দিলে , এ কথা বলতেই যোগশবাবু কেঁদে উঠে , সাধনের হাত চেপে ধরে বলে বাবা তুমি কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে রক্ষা কর । সাধন তো এমনিতেই

রাজী, কারণ সাধন পুষ্পকে বড় ভালবাসে । পুষ্পের কথা শুনলেই সাধন যেন কেমন হয়ে যায় । সাধন ভাবে পুষ্প না হলে ওর জীবন বৃথা কিন্তু পুষ্প বিয়ের কথা উঠলেই এড়িয়ে গেছে বারবার । গ্রামের বাড়ী রাত নটা , ঝি ঝি পোকাদের গোঙ্গানী শব্দ এ ছাড়া কিছুই নেই। এমন সময় পুষ্প জামাইবাবু সুবোধের হাত ধরে বাড়ীতে আসে । গভীর রাত পর্যন্ত নানা রকম বাক - বিতন্ডা চলে অবশেষে পুষ্প বড়বোন আরতী এবং বাবা যোগেশ ও মা লক্ষীবালার চাপে মুখে বাধ্য হয়ে সাধনকে বিয়ে করতে রাজী হয়।

পারিবারিক পরিস্থিতিতে সুবোধ ও সাধন পুষ্পের বিয়েতে সম্মতি প্রদান করে ।

পুষ্প বসা অবস্থায় ছিল , সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল । মুখে চোখে কোথাও একটুকু বিকার নেই । বিয়ের দিন তারিখ মোটামুটি পাকা কিন্তু পুষ্পের চেহারাটা মনে হল যেন কোন গভীর গহ্বরে পড়ার মুহুর্তের মতো । সাধন ভাবে মেয়েরা বিয়ের কথা হলে একটু বোকা বনেই থাকে , তা ছাড়া বাপের বাড়ী ছেড়ে আরেকটি নতুন ঘর , কেমন হবে নতুন মানুষজন হয়ত এসব চিন্তা ভাবনা ওর মাথায় ঘুরছে । সাধন একা । মা বাবা অনেক আগেই মারা গেছেন । সুতরাং কারো সাথে বোঝাপড়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না উপরন্তু বন্ধু সুবোধ তো আছেই ।

এক শুভ দিন ক্ষণে ঘটা করে পুষ্প ও সাধনের বিয়ে হয় । যথেষ্ঠ আমন্ত্রিত, সবাই বলে ওদের মানিয়েছে বেশ সুন্দর। সাধন ও বৌ ভাতে অনেক বন্ধু , পড়শীদের আমন্ত্রণ করে ।

ভালভাবেই কাটতে শুরু করে সাধন - পুষ্পের সংসার । সুবোধ প্রায়শই আসত সাধন বাড়ীতে থাকলে যথেষ্ঠ সমাদরও করত । সাধন ভাবে পুষ্পের বড়বোন আরতিদি কেন আসে না , একদিন সাধন গিয়ে আরতীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসে এবং প্রশ্ন করে আপনি কেন ছোটবোনকে দেখতে আসেন না । প্রত্যুত্তরে আরতী বলে উঠে সুবোধ সময় পায় না আরতীকে নিয়ে যেতে । সাধনের মনে একটু খটকা লাগে । এ আবার কি সুবোধ তো সময়ে অসময়ে আমার বাড়ী যায় , তবে কি সে পুষ্পের বড় বোন আরতীকে কিছু বলে না , তাদের দু -জনের কি মনের মধ্যে কোন রকম .... তারপর ভাবে থাক ওসব ভাবনা । এ তো তাদের স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার । আরতী কিন্তু আর আসে নি পুষ্পের বাড়ীতে । এরই মাঝে সুবোধ প্রায়শই ফার্মে আসে না কিন্তু সাধন গিয়ে দেখতে পায় সুবোধ পুষ্পের সাথে কথায় মশগুল । সাধন গেলে ওরা উভয়ে অস্বস্তিতে পরে । ওদের ব্যবহার সাধনের সন্দিহান লাগতে শুরু করে । সাধন এক রাতে পুষ্পকে কিছু জিজ্ঞেস করতেই পুষ্প সাধনের উপর তেড়ে উঠে , বলে আমার জামাইবাবু তোমার মতো ছোটমনের মানুষ নয় আর কোনদিন যদি এরকম কথা বল তবে আমি তোমার বাড়ী চেড়ে চলে যাবো । সাধন বিতর্ক গড়ায়নি কারণ সাধন পুষ্পকে প্রচন্ড ভালবাসে । সে মনে করে পুষ্প ছাড়া তার জীবন বৃথা । আরো কিছুদিন কেটে যায় । প্রায়শই সাধনের চোখে সুবোধ পুষ্পের অসংলগ্ন ব্যবহার চোখে পড়ে । সাধন মানসিক দিকে ভেঙ্গে পড়ে

তার   তো বলার মতো কোন লোক নেই । একদিন সাধন সাহসে ভর করে ফার্মের কাজ সেরে সোজা আরতীর কাছে যায় এবং আরতীকে বলে উঠে আজ আপনাকে কিছু বলতে এসেছি । যদি আপনাকে খারাপ না ভাবেন তবেই বলবো । আরতি বলে আরে বলো না আমি তোমাকে খারাপ ভাববো না । সাধনের চোখ জলে ছলছল করে উঠে , তারপর সাধন বলে সুবোধ ও পুষ্পের অসংলগ্ন ব্যাবহারের কথা এমনকি সুবোধ যে ফার্মে যায় না তাও বলে । আরতী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে, বলে ভাই আমি আর অশান্তি সইতে পারি না । পুষ্পের বিয়ের পর সে ঘরে টাকা পয়সা ও দেয় না। ঘরের জিনিস বিক্রি করছে কিছু বললেই ঘরে ভয়ানক অশান্তি , এমনকি ওর একমাত্র শিশুপুত্র রূপমের দিকেও নজর দেয় না । ভাই আমি সব বুঝি কি করবো বলো । উপরে থুতু মারলে নিজের গায়ে পড়ে । তুমি একটা কিছু কর ।

ওই রাতে আরতি সুবোধকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেই ঘরে হুল্লোড় বেঁধে যায় । রাত ব্যাপী চলে ঝগড়া , আরতী অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে ও সুবোধকে ফেরাতে পারেনি । একদিন আরতী বাচ্চা রূপমকে নিয়ে দুপুরে পুষ্পের বাড়ীতে আসে। বোনকে অনেক বুঝায় । সেখানে ও দুবোনের মধ্যে প্রচন্ড ঝগড়া হয় । আরতী ভাগ্যের পরিহাস ভেবে ঘরে ফিরে আসে । এরপর ৪/৫ দিন সুবোধ আর পুষ্পের বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় নি । এ দিকে পুষ্প ও সাধনের সাথে গা ছাড়া ব্যবহার শুরু করে। কিছুদিন বাদে সাধন পুনরায় টের পায় সুবোধ পাল্টায়নি , যেমন ছিল তেমনই আছে । কিন্তু সাধন ও তো যুবক , তারও তো ধৈর্যের সীমা আছে । ভালবাসা তো একতরফা হয় না । সাধন সমস্ত প্রকার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয় । অপরদিকে আরতী সুবোধকে সামলাতে পারেনি , চোখের জলই শুধু আরতীর ভাষা ।

একদিন সাধনের নৈশকালীন ডিউটি পরে ফার্মে । যথারীতি সাধন সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া সেড়ে ডিউটিতে আসে। সেদিন সুবোধেরও ডিউটি ছিল কিন্তু সুবোধ ডিউটিতে আসেনি । সাধনের সংশয় বাড়ে । মধ্য রাত্রিতে সংশয়ের বশীভূত হয়ে সাধন কাউকে কিছু না বলে ফার্ম থেকে ঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে । এদিকে সুবোধ জানে - সাধন ডিউটির ব্যাপারে খুব সিরিয়াস এবং সাধনের ডিউটি সম্পর্কে ফার্মেও যথেষ্ঠ সুনাম আছে । কিন্তু সাধনের যে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। সাধন গভীর রাতেই বাড়ীতে আসে এবং সন্দেহ ভরা মনে নিজের বসতঘরের দরজায় দাড়ায় এবং স্পষ্ট শুনতে পায় তার ঘরের ভেতর সুবোধ এবং পুষ্পের আলাপচারিতা । পুষ্প সুবোধকে বলে আপনি আমাকে মুক্তি দিন । যত দ্রুত সম্ভব আমাকে নিয়ে যান । সুবোধ বলে উঠে আর - ক টা দিন সবুর করো । আমি তোমাকে নিয়ে কোথাও চলে যাবো । এসব কথা শুনে সাধন নিজেকে সামলাতে পারেনি । চিৎকার দিয়ে বলে উঠে পুষ্প দরজা খোলো । হঠাৎ সাধনের ঘরে শ্মশানের নিরবতা কিন্তু সাধন তো সব শুনেছে , তার রক্ত যেন রাগে টগবগ করছে । খানিকটা সময় কেটে গেলেও পুষ্প

দরজা খুলছে না দেখে সাধন দরজায় সজোরে লাথি মারে । পুষ্প তড়িঘড়ি দরজা খোলে সাধন ঘরে ঢুকে দেখতে পায় তার ঘরের পেছনের দরজা খোলা , সাধনের বুঝতে অসুবিধে হয় নি অবস্থা বেগতিক দেখে সুবোধ পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে কিন্তু পুষ্পের স্পর্দ্ধা এতটুকুও কমেনি । সে ঝাঁঝালো কণ্ঠে সাধনকে আক্রমণ করে বসে, বাজে ভাষায় বকুনি দিয়ে । উত্তেজিত সাধনও জিজ্ঞেস করে ঘরে এতসময় সুবোধ কি করছিল । এ কথা বলতেই যেন আগুনে ঘৃতাহুতি ঘটে । পুস্প বলে তোর ঘর আর করব না। এই বলে বেরিয়ে পড়ে সাধন জোর করে ঘরে ঢুকতেই পুষ্প সজোরে সাধনের গালে চড় কষিয়ে দেয় । ঘরে ঢোকামাত্র শুরু হয় প্রচন্ড বাক বিতন্ডা । এক সময় সাধনের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে । রাগের বশীভুত হয়ে সাধন দু- হাত চেপে ধরে পুষ্পের গলায় , চাপ দেয় হাতের চাপে কখন পুষ্পের প্রাণবায়ু চলে গেছে সাধন তা বলতে ও পারেনি । হাত ছাড়তেই পুষ্প মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । সাধনের সম্বিত ফিরে । সাধন মাথায় জল দেয় কিন্তু না , যা ঘটার ততক্ষণে ঘটে গেছে।

অন্তঃদহনে সাধন জ্বলে উঠে । সাধন কেঁদে উঠে , বলে আমারও তো সাধ ছিল ঘর বাধার কিন্তু পুষ্প তুমি বুঝলে না । সাধনের স্বগতোক্তি জীবনটাই বৃথা , সাধন পুষ্পের নিথর দেহ জড়িয়ে ধরে খাটে রাখে । তারপর রাতভর জেগে চিরকুট লিখে এবং শেষ লাইনে তার লেখা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলাম । পরদিন অনেক বেলা গড়িয়ে গেছে কিন্তু সাধনের ঘরের দরজা বন্ধ দেখে প্রতিবেশীরা জড়ো হয় এবং দরজাখুলে দেখতে পায় পুষ্প বিছানায় শুয়ে আছে । আর পুষ্পের গলায় কাপড় জড়ানো অবস্থায় সাধন ফাঁসীতে ঝুলছে । অন্যের অপকর্ম ঘুচাতে গিয়ে সাধনের সোনার সংসার ভেঙ্গেচুড়ে তছনছ । দু'টি জীবনের অবসান , সাধনের শেষ পরিণতি আত্মহত্যা ।

আমি অনাথ

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। রোববার সকাল। ছুটির দিন। ঘরের সমানে একটি কাঠের চেয়ার নিয়ে হাতে বদ্ধ বই বাইরের দিকে একপলকে তাকিয়ে বসেছিল সুমন, অন্যান্য সম বয়সী অনেক সাথীরা থাকে, কথা বলে, খেলাধুলা করে সময় কাটানো যায় কিন্তু আজ সাথীরা কেউ নেই। এক মাসের ছুটিতে সবাই চলে গেছে। এই ঠিকানায় তো কম দিন হল না সুমনের। দেখতে দেখতে ৫টি বছর কেটে গেছে সরকারী আবাসস্থলে। তিন বৎসর বয়সে নরসিংগড় অনাথ শিশুদের আবাসস্থলে " আমাদের ঘর " এ আসা। দিন গড়িয়ে রাত কাটিয়ে সুমন আজ ৮ বৎসর বয়সের ছেলে। জীবন কখন কাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করায় তা যেন ভাগ্যের হাতে সমর্পিত। যে শিশু বুঝল না, কিছু, পেলনা মা -বাবার স্নেহ মমতা ,ভাগ্য তার নামের পেছনে অনাথ শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। বেশ

কিছুদিন ধরে মেজাজ মর্জি ভাল যাচ্ছে না সুমনের । কেবলই শরীরের অশান্তি দিনে রাতে তাড়া করে বেড়াচ্ছে ওকে । শরীরের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় প্রচন্ড ব্যাথা , সাথে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর ।

নরসিংগড় প্রাইমারী চিকিৎসককেন্দ্রের ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করেছেন সুমনকে তারপরেও শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না দেখে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সুমনকে নিয়ে যাওয়া হয় রাজধানী আগরতলায় " ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালে শিশু বিভাগে শুরু হয় নানাহ পরীক্ষা নিরিক্ষা , ডাক্তারবাবুদের অপত্য স্নেহ বর্ষিত হয় সুমনের উপর , রোগাক্রান্ত , শীর্ণকায় সুমন স্নেহের জোয়ারে ভেসে যায় । কিন্তু মাঝরাতে অনাথ সুমনের বুকফাটা কান্না তো আর চোখে দেখা যায় না । মনে হয়। সেই বিখ্যাত পংঙিত " বণ্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে " কিন্তু সুমন যে মাতৃহীন , নির্দয় বিধাতা শৈশবে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে তার মা, তার ও আগে কেড়ে নিয়েছে তার বাবাকে । কাকে বলবে সে তার মনের গোপন ব্যাথা , কোথায় জানাবে তার শৈশবের আবদার । হয়ত সাধারণ্যে না দেখা তার গোপন কথা মনের ভেতর কুঁড়ে কুড়ে তাকে খাচ্ছে তাই নিঃসঙ্গ ও চুপচাপ থাকতে ভালবাসে । সাত দিন হাসপাতালের বিছানায় থেকে ডাক্তারবাবুদের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে সুমন তার সরকারী ঠিকানায় ফিরে আসে । মাতৃস্নেহের ঘাটতি তা তো থেকেই যায়, সে যে যত আদরই করুক না কেন । যদিও তার মতো অনাথ শিশু আরো আছে যারা তাকে ভাইয়ের মতো দেখে যেমন সবচেয়ে ছোট ৪ বৎসরের পৌষালী গোস্বামী তেমনি জয়ন্তী দেববর্মা কিন্তু তারপরেও একটি কথা থেকেই যায়, পৌষালী , জয়ন্তীদের মা আছে । পুঞ্জীভুত ক্ষোভ , ব্যাথা আনন্দ মায়েদের কাছে জানাতে পারে । মান, অভিমান করতে পারে কিন্তু সুমনের যে বলার কেউ নেই । অন্তর্যামী বিধাতা কি তা পরখ করেচেন ? সুমন কিন্তু জীবন নিয়ে অলস বসে নেই , সে লেখাপড়া করে ,স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে , মনের গোপন যন্ত্রণা নিঃশব্দে লুকিয়ে রেখে বইয়ের ভেতরে ডুবে থাকে , তার মনের গোপন ইচ্ছা আমি মানুষ হবো , নিজের পায়ে দাঁড়াব বাকী ভবিষ্যতই বলতে পারে । মাইক , গান বাজনা , উৎসব হুল্লোড়েও সুমন নির্বিকার । কারণ তার কাছে আনন্দটা ও যেন বিষাদ । বৃস্টির সাতসকালে সরকারী অনাথ শিশুদের আবাসস্থলের সামনেই দেখা যায় সুমন বই খাতা নিয়ে বসেছে, প্রশ্ন করতেই খুব ক্ষীণ স্বরে উত্তর আমার নাম সুমন দাস । কোন ক্লাসে পড় ? তৃতীয় শ্রেণীতে , পাশে বসতেই ক্ষীণ হাসি দিয়ে বসতে বলল , আবেগ আপ্লুত চেহারা নিয়ে বড্ড কষ্টে মুখ থেকে দুঃখের ছাপ ঘুচিয়ে ভদ্র শান্ত ব্যবহারে পাশে এসে দাড়াল , বাবা কি করেন , মৃদু কণ্ঠে উত্তর - আমার বাবা নেই । তাহলে তুমি এখানে কিভাবে এলে, উত্তর এলো আমার এক আত্মীয় আমাকে এখানে এনে দিয়েছে । আমি তখন ছোট , পরে জেনেছি আমার তিন বছর বয়সে আমাকে এই আশ্রমে এনে দিয়েছে । তখন থেকেই আমি এখানে আছি । তুমি কখনো ছুটি যাও না, কোথায় যাব , কে নেবে,ভাবলেশহীন তার অকপট উত্তর । বাবাকে দেখেছো , সুমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে . আস্তে আস্তে করে উত্তর দিল - না আমি বাবাকে দেখিনি । শুনেছি আমার বাবার নাম সুকুমার দাস

। সুমন পৃথিবীর আলো দেখার আগেই তার বাবা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে , সে যে নিছক দুর্ঘটনা । ভূমিতে ভূমিষ্ট হয়ে সুমন তার একমাত্র সম্বল মায়ের বুক চেপেই বাঁচতে চেয়েছিল । কিন্তু কে জানে, কেন বিধতা এত নিষ্ঠুর । তার শৈশবেই তার মা দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে আক্রান্ত । এমনিতে স্বামীহীনা , কঠিন দরিদ্রতা পেট বাঁচানোই যেখানে দায় সেখানে চিকিৎ সা তো দুরূহ ব্যাপার । এই দুরাবস্থায় যন্ত্রণা বুকে চেপেই মা কোলের শিশুকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সরকারী অনাথ শিশু আশ্রমে পাঠিয়ে দেয় অন্তত আমার ছেলেটা বাঁচুক এই বলে । সুমনের জন্য খাদ্য , পোষাক , লেখাপড়া , স্বাস্থ্য সরকারী বিধি বিধান অনুসারে সবই আছে কিন্তু কোথায় পাবে সে মায়ের প্রকৃত স্নেহ । যে পায়নি পিতৃস্নেহ, দেখিনি বাবাকে , স্মৃতিকোঠরে রাখার জন্য দেখিনি বাবার ফটো । শুধু জেনেছে বাবার নাম জড়িয়ে ধরার স্বপ্নে আঁকড়ে ধরেছিল মায়ের বুক তাও ক্ষণস্থায়ী ।

সুমনকে জিজ্ঞেস করতেই বলে উঠে আমার মায়ের নাম ছিল সবিতা দাস । সুমনের চোখ ছলছল করে উঠে । দু - চোখ গড়িয়ে নিঃশব্দে বাঁকা ঠোঁটে জল নেমে আসছে । শৈশবটাই তার কাছে অন্ধকার , কালো যমদূতের হাতছানি , নিজেকে সামলে নেয় সুমন । শিশু অথচ যথেষ্ট বোধগম্যতা আছে সুমনের । স্নেহের ভিখারী ।

আবেগঘন গলায় সুমন বলে উঠে , আমি কিছুই বুঝিনি , হঠাৎ দুপুরে আমি একা বসে আছি, দুর্গাপুজো , আমার মত ছোট মেয়েরা পুজোতে আনন্দ করছে , আমি ভাবছি আমার মায়ের কথা । কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম আমার মা সুস্থ হবে আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে যাবো । মনে মনে ঠাকুরকে বলতাম ভগবান আমার মাকে সুস্থ করে দাও । কিন্তু না ভগবান আমার কথা পাত্তা দেয়নি, বরঞ্চ রাগ করে আমার মাকে নিয়ে গেছে । আমি শুনেছি আমার মা হাসপাতালে কিন্তু আমি তো ছোট কিভাবে মাকে গিয়ে দেখবো । মার সাথে আমার দেখাও হয়নি আর কথা বলাও হয়নি । আমি আমার মাকে ও খুঁজে পাইনি ।

অষ্টমী পুজোর দিন সকালে আমাকে কোলে নিয়ে " আমাদের ঘরের " (অর্থাৎ) অনাথ শিশুআবাসে) কাকু বলে সুমন চল তোর মার শরীর বেশী খারাপ, দেখে আসি । আমি ভাবি আমার মা হয়ত 'সুমন' বলে ডাকছে । আমি মার কাছে যাবো ভেবে আত্মহারা হয়ে উঠি । ভাবি মার কাছে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরব , বলব মা আমি তোমার কাছে থাকব , আমি তোমাকে ছেড়ে আর যাব না। এই ভাবতে ভাবতে অফিসের কাকুর কোলে করে গাড়ী দিয়ে রওয়ানা হই । কিন্তু না , মাকে তো দেখতে পাইনি । বলি কাকু মা কোথায় , দেখি কাকু কাঁদছে , কাকুর চোখে জল । কাকু আমাকে নিয়ে সোজো চলে আসে শ্মশানে । এসে দেখি আমার মা শ্মশানে ঘুমিয়ে আছে আর আমার মায়ের চিতা জ্বলছে , মাকে আমার আর স্পর্শ করা হয়নি। মা ,বাবার মতো আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে । সেই থেকে আমি পিতৃ - মাতৃহীন অনাথ সুমন ।

সংকীর্ণ জীবন পথ

দুই পৃথক রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমারেখায় তখনো কাঁটা তারের বেড়া তৈরী হয়নি, সমস্ত সীমান্তে সীমান্তে রক্ষীদের পদচারনা প্রায় অসম্ভব , তার মাঝেই এপাড় সীমান্ত ওপার সীমান্তে নানাহ ঘটনা ঘটে , কখনো ঝগড়া ঝাটি, কখনো মৈত্রী , কখনো আবেগ , কখনো ভালোবাসা , বাংলাদেশ ও ভারতের অঙ্গ রাজ্য ত্রিপুরার সীমান্তে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কড়াকড়ি কম নেই কিন্তু তারপরেও ভালবাসার টানেই হোক বা অন্য প্রয়োজনেই হোক উভয়েই সীমান্তের নাগরিকরা চোরাগোপ্তা যাতায়ত করে পাসপোর্ট বিহীনভাবে বা কোন বৈধ কাজগপত্র ছাড়াই । তা অজানা কিছু নয় ।

চারদিকে উচু - নিচু ঝোপঝাড় , টিলাভুমি যেমন আছে তেমনি আছে চাষাদের সমতলভুমি। অনেক জায়গাতে আছে পুকুর , নালা , নদী বা খোলা প্রান্তর কোথাও কোনও কোনও বাড়ীর পাশ দিয়েই গেছে দু দেশের সামান্ত । অবৈধ প্রবেশের কথা তো আকছাড় সোনা যায় । যেহেতু ভাষা , এক আচার আচরণ ও প্রায় এক , এ ছাড়া এ রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের পিতৃভিটাভুমি অধুনা বাংলাদেশে ছিল এবং এখনোও অনেক আত্মীয় পরিজনেরা উভয় দেশেই আছে সেহেতু সান্ত্রীর কড়াকড়ির মাঝেও গোপন যাতায়াত সম্পুর্ণরূপে বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব , সীমানার বাধা মানুষ টপকে যায় ।

দেশভাগ তো আর মনকে ভাগ করতে পারে না । এপার - ওপার লেনদেন , চোরাচালান নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্থান বদল করে । ত্রিপুরার সীমান্তে একটি গ্রাম দক্ষিণ বগাদী , ওপারে গ্রামের নাম কাশিমপুর , দক্ষিণ বগাদি গ্রামের সম্পন্ন কৃষক অমরেশের ছোট ছেলে গৌতম প্রায়শই বাধা টপকে ওপার গ্রামে যায় বন্ধুত্বের টানে কখনো কখনো ওপারেই রাত্রি যাপন করে ।

ওপারের কাশিমপুরে ঝকঝকে প্লাটফর্ম নেই কিন্তু রেল গাড়ীতো আছে , যা এপারে নেই বন্ধুদের সাথে ওপারে গিয়ে ট্রেনে ভ্রমণ করে আসে । ঘরে ফিরে এপারের বন্ধুদের কাছে ভ্রমণ

অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে । অতি নিরীহ গৌতম ও প্রলোভনে পড়ে কখনো কখনো এপার -ওপারের চোরা ব্যবসায় যুক্ত হয় । অনেক মেয়েরা ও অর্থ উপার্জনের জন্য দরিদ্রের কারনে এই পথে নেমে পড়ে । জেনেশুনে আর্থিক অসঙ্গতির কারনে অনেকেই এই অপরাদের ফাঁদে পা বাড়ায় ।

গৌতম খালি ধু ধু মাঠ অতিক্রম করে সীমান্ত পার হয়ে চলে যায় ওপার বাংলায় , ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কাশিমপুর গ্রামে , সেখানে গৌতমের বন্ধুর অভাব নেই । গ্রামের মাঝে বিশাল শিমুল গাছ , আর এই শিমূল গৌতমের ভালবাসার স্বাথী। শিমুল গাছ পার হয়ে মেঠো রাস্তা ধার কিছুটা এগোলেই মহম্মদ আবুল কাশেমের বাড়ী । এপার ওপাড়ের ব্যবসায় হোক কিংবা সীমান্তের ভালবাসার টানেই হোক গৌতম কিন্তু প্রায়শই কাশিপুরে যেতো , এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরে বেড়াত । হঠাৎ করে কেউ দেখলে হয়তো অবাক হবে এবং ভাবতে বাধ্য হবে সীমান্তের বাধা গৌতমের ভালবাসার কাছে কোন বাধাই নয়। এ যেন গৌতমের শৈশবের বাগিচা কখনো সারাদিন ক্ষেতে খামারে কাজ গৌতম ক্লান্ত হয়ে যেতো , সারাদিনের ধকলের পর যদি ও কখনো কাশিমপুরে না যেতে পারলে ক্লান্ত গৌতম দু চোখে কৌতুহল নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে সীমান্তে তাকিয়ে থাকত আর ভাবত এই খোলা মাঠটুকু পার হলেই তো কাশিমপুর শুরু । উঠতে বসতে সমস্যায় জর্জরিত গৌতম কাঙালের মতো তার স্বপ্নের গ্রামের স্বপ্নিল ভাবনাটুকুতে হারিয়ে যেতো । তার মনে পড়ে যাচ্ছিল কাশিমপুরের আবুল কাশেমের বাড়ীর কথা ।

দু একদিন বাদে বাদে গৌতম কাশিমপুর যেতো । কাশিমপুর গেলে আবুল কাশেমের বাড়ীতে গৌতমকে যেতেই হবে ।গৌতমের কাছে আবুল কাশেমের বাড়ী পবিত্র ভালবাসার পুন্যভূমি। আবুল কাশেমের মেয়ে নার্গিস আক্তার ১৬ বছরের তরুনী , ফুটফুটে হাসিভরা মুখ আর ২২ বছরের তরুন গৌতম উদ্দাম প্রাণশক্তির অধিকারী । একটু - আধটু দেখাদেখি , লোকচক্ষুর আড়ালে মুচকি হাসি । না দেখা হলেই যেন উভয়ের মনে শূন্যতা । জাত , পাত ধর্ম বর্ণ , এতো ভালবাসার কাছে মূল্যহীন , অজাগতিক , গৌতম আর নার্গিসের চোখ দেখাদেখিতেই ভালবাসার জন্ম হয় । নার্গিসের চিন্তাভাবনা জাতি বৈষম্যের উর্ধ্বে । গৌতম স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির যুবক , অতসব ভেদাভেদের তোয়াক্কা করেনা । দু - চারদিন গৌতম সীমান্ত পার হয়ে না গেলে নার্গিস শিমূল তলায় বাস একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সীমান্তের দিকে । মনে হয় যেন একাগ্রচিত্তে সাধনায় বসে আছে । ভালবাসা এবং কৌতুহলবড় মারাত্মক জিনিস । গৌতমের অনুপস্থিতি প্রাণ চঞ্চল নার্গিসকে শিমূলতলায় চুপচাপ বসিয়ে রাখে । এ অপেক্ষার কোন উত্তর নেই , কেবল মনই জানে অপেক্ষার গভীরতা , বৈশাখে মেলা বসেছে গাজী বাবার দরগার মাঠে এ পারের ভাগলপুরে । গৌতম ভাবে এক বছর পর গাজীবাবার দিঘার পাড়ের মেলা কি শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবে তাকে ? মনে মনে কি যেন মানত করে গৌতম । পরদিন সাত

সকালে ঘুম ভাঙিয়ে গৌতম সীমান্ত পার হয়ে ছুটে যায় আবুল কাশেমের বাড়ী । নার্গিসকে বলে ' চল' তোমাকে আমাদের এখানে দরগার মেলা দেখিয়ে আনি'। নার্গিস ভাবে ভিন দেশের গ্রামে কোথাও যে একটা সুস্পষ্ট মিল আছে , সেটা আরও একবার অনুধাবন করল নার্গিস। গ্রামের অন্যদের সাথে গৌতমের দেখানো পথে সীমান্ত পার হয়ে নার্গিস এসে পৌছে ভাগলপুরের মেলায় । এ যেন বাধনহীন আনন্দ - কথার যেন শেষ হয় না । অগনিত মানুষ মেলার আনন্দে মশগুল , কখন যে গ্রামের লোক নার্গিসকে রেখে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশে চলে গেছে তা নার্গিসের কোন খবর নেই । মোটা তেতুঁল গাছের আড়ালে গৌতম আর নার্গিসের কথা ফুরায়নি কিন্তু রাত যে ফুরিয়ে গেছে মেলার ময়দান ফাঁকা , ভোরের পাখীদের কলরবে গৌতম ও নার্গিসের সম্বিত ফিরে আসে কিন্তু অনেক কথা যে এখনো বাকী , আবার দেশে গ্রামে ফিরে যেতে হবে । দায়িত্বটুকু তো গৌতমের, ওকে পৌঁছে দেওয়ার , সীমান্তে পা বাড়াতেই দেখা যায় সীমান্তে সীমান্তে রক্ষীদের পায়চারি , কিন্তু নার্গিসকে তো দ্রুত ফিরতে হয় । জঙ্গল , ঝোপেঝাড় চোরাকাটা পার হয়ে গলি পথে গৌতম পৌঁছে যায় ওপার সীমান্তে কাশিমপুর গ্রামে , ফেরার পথে তো আবেগ তাকে রাস্তা ভুলিয়ে সীমান্তরক্ষীদের সামনে হাজির করে দেয় । ভালবাসার উপহার সাতসকালের বেত্রাঘাত , যাইহোক ভালবাসার উষ্ণ স্পর্শ কোন আঘাত মানে না , বাধা মানে না সীমান্ত টপকায় গৌতম নির্দ্ধিধায় । নার্গিসের চলাফেরা, হাবভাব সবটাতেই গ্রাম্য সরলতা , সে লুকিয়ে দেখেছে গৌতমের প্রত্যাগমন । আসলে গৌতম আর নার্গিসের নিটোল পবিত্র প্রেম অন্য প্রেমিক / প্রেমিকার ভালবাসা থেকে অনেক আলাদা । যার উপসংহারে চরম সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গৌতম নার্গিস উভয়কে মেনে নিতে হয়েছিল জীবনের চরম সত্যটাকে । আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এখনো এতো উদার হয়ে উঠেনি । সুতরাং দু'দেশের ভিন সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়ের অকৃপণ ভালবাসার স্বীকৃতি মেলা যে কতো কঠিন তা কেবল বাস্তব পরিস্থিতিই জানে । ও - পারে নার্গিসের এলাকায় গৌতমের সাথে মেলামেশা বারণ এবং পাশাপাশি শাস্তির হুমকী , এ পারে গৌতমের এলাকায় ও সমান উত্তেজনা , এভাবে চলতে দেওয়া যায় না । উক্তি , কটুক্তি , হুমকী সবই চলছে কিন্তু আবার বলতে হয় ভালবাসার কোন গন্ডী নেই , ভালবাসা বাধন মানে না , প্রাণভয় জানে না । গৌতম নার্গিস উভয়ে জাতি বৈষম্যের উর্ধ্বে । অজগায়ের মেয়ে হয়েও নার্গিস মানবতার পুজারী আর গৌতম যেন সেই পথের দিশারী । উভয়ে প্রতিবার মিলনের পর ঘরবাধারআশায় দিন গোনে । উভয়ের মনের ভেতর অগাধ বিশ্বাস । তাদের মনের কতা কতটুকুই জানে অন্যরা । তাদের যন্ত্রণা মানুষ বোঝেই বা কতটুকু । হয়ত একটু ছোঁয়াছুয়ি , চোখে চোখে ঈশারা, তারপর লোকচক্ষু অন্তরাল থেকে সরে যাওয়া। এভাবে কতদিন । গৌতমকে কটুক্তি করে অনেকে বলে ছিঃ তুই কি মুসলমান বিয়ে করবি । অন্যদিকে নার্গিসের উপর নজরদারী হিন্দু

ছেলের সাথে কিভাবে মুসলমান মেয়ের বিয়ে হয় , এ আমরা হতে দেবো না । পাশাপাশি চলে নার্গিসের বাবা আবুল কাশেমের উপর হুমকী , যদি কিছু হয় তবে তোমাকে গ্রাম ছাড়তে হবে । গৌতম আর নার্গিসের কোন পরোয়া নেই। এদিকে উত্তেজনার পারদ বাড়ছে , গৌতম আর এখন সীমান্ত পার হয়ে ওপারে যেতে পারে না । হাটতে হাটতে রোজই সীমান্ত পার থেকে দেখে তার মনের মানুষ নার্গিসকে দেখা যায় কি না । আড়ালে আড়ালে নার্গিস ও দেখে গৌতমকে দেখা যায় কি না ।

শীতের সন্ধ্যারাত , হাড় কাঁপানো শীত , ইংরেজী সনটা ২০০৪ , সোমবার রাত ৭ টা হবে। শীতের প্রকোপে সবাই গৃহমুখী , চাঁদের আলো আর অবছা কুয়াশা যেন এক স্বর্গীয় হাবভাব নিয়ে কারো অপেক্ষায় , নীল আলোর মতো প্রকৃতির সৃষ্টি নার্গিস , ভীতসন্ত্রস চোখ নিয়ে শুনশান প্রান্তরে গুটি গুটি পায়ে বেরিয়ে পড়ে নিস্তব্ধ সীমান্ত পার হয়ে যায় , অজানা গ্রামের উদ্দেশ্যে , মনে মনে ভাবে আর লুকোছাপার দরকার নেই । যা হবার হবে সোজা গ্রামে ডুকে যাবো , ডুকতেই সোজাসুজি সামনের মানুষটাই চোখে চোখ পড়ল , দুর্যোগ ভয়ঙ্কর রাত্রিতে ঝুঁকি নিয়ে আসার কথা বর্ণনা করা হলো না নার্গিসের , বুকফাটা কান্নায় গৌতমের কাছে আত্মসমর্পন করে । গৌতমও যে এ সময়ের প্রতীক্ষায় । নার্গিস বলে উঠে এই রইল আমার জীবনের সর্বস্ব তুমার । গৌতম নার্গিসের কাছে সীমান্ত আর বাধা নয় মানুষই বড় বাধা । রাতের আধারেই গৌতমের হাত ধরে নার্গিস পাড়ি দেয় অজানা পথের উদ্দেশ্যে । রাতের অন্ধকার , বন্যপথ , দুর কাঁহাতক মানবহীন শুধু দু'জন দু'জনের মুখ দেখা যায় । একটু থেকে নার্গিস বলে কোথায় যাব আমরা নিঃশব্দে গৌতম নার্গিসের হাত ধরে চলতে থাকে , নার্গিস পা টিপে টিকে গৌতমের পেছনে পেছনে বোধহয় গভীর রাতে হাটতে হাটতে ক্লান্তিতে নার্গিসের পা বেসামাল হয়ে যায় । এভাবেই অন্ধকার ছিঁড়ে ভোরের আলো ফুটে উঠে । তখন কোন শব্দ নেই , নার্গিস - গৌতমের মুখে , গৌতম মনে মনে ভাবে জীবন প্রায় মূল্যহীন । বাঁচার তাগিদে গৌতম , তার প্রাণপ্রিয় নার্গিসকে , মনিকা নাম দিয়ে খয়েরপুর এলাকার এক প্রত্যন্ত গ্রামে এক দূর আত্মীয়রে বাড়ীতে উঠে । গৌতম এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে ভাবতে পারেনি । অস্বস্তি ছিল পাশাপাশি দু -টো বাঁচতে হবে গুরু দায়িত্বটুকুও গৌতমের উপর । সত্যি প্রকাশ হবে এই ভয়টুকু তো ছিলোই । এদিকে গৌতমের বগাদী এলাকা পাশাপাশি সীমান্তে রক্ষী বাহিনীদের ঘন ঘন আনাগোনা , ফ্ল্যাগ মিটিং । বাদানুবাদ ইত্যাদি মাসাধিক কাল । দিনমজুরের কাজ করে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে নার্গিস ওরফে মানিকাকে নিয়ে দিনাতিপাত করতে থাকে । ঘুমোতে পারে না নার্গিস , চোখে ভেসে আসে শৈশবের কাশেমপুর গ্রাম , কাশেমপুরের প্লাটফর্ম থেকে ট্রেন ছুটছে বাঁশঝাড় তোলপার করে যেন সবুজ রং এর বাঁশবন , কিন্তু নার্গিস ভাবে প্রতিকূল অবস্থা কি সংঘাতিক, শৈশবের ঘটনা মনে পড়লেই শিউরে ওঠে নার্গিস । নার্গিস ভুলতে পারেনি অতীত স্মৃতি । এ ভাবে

টানাপোড়নের মাঝে গৌতমের তিন - চার মাস সময় কেটে যায় । একদিন গৌতম সাহসে ভর করে ভাবে , আমি নিজ বাড়ীতে যাবো । যাবার পূর্বে গৌতম , তার প্রিয়তমা মনিকাকে (নার্গিস)নিয়ে মায়ের মন্দিরে যায় । মন্দিরে 'মাকে' স্বাক্ষী রেখে মনিকার সিঁথিতে সিঁদুর চড়ায় । প্রতিজ্ঞা করে হাজারো ঝড় তুফানের মাঝে ও মনিকার হাত ছাড়বো না । মেঘাচ্ছন্ন কালো মেঘে মন্দির থেকে বের হতে মনিকার সিথির সিঁদুর যেন গৌতমকে মনে করিয়ে দেয় মনিকা শাপভ্রষ্ট স্বর্গলোকের মানবীমূর্ত্তি, তার সৌন্দর্যে আকাশের কালোমেঘ পর্যন্ত উবে গেছে । গৌতম মনিকাকে নিয়ে ফির আসে নিজ গ্রামে কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে , শান্ত হয়নি নিজ পরিবার । গৌতম স্থান পায়নি পিতৃভূমিতে , মনিকারতো প্রশ্নই আসে না । কতিপয় আত্মীয় পরিজন গৌতমকে বলে মনিকাকে ছেড়ে দাও তাহলে তোমার কোন অসুবিধে হবে না । গৌতমের উত্তর জীবন ছেড়ে দিলে দেহ তো মৃত , তা কি সম্ভব। চলতে থাকে গৌতম মনিকার সংঘর্ষের জীবন । দুর্ধর্ষ ফুটবল প্লেয়ার গৌতম জানে বাধা ভাঙ্গতে । চলতে জীবনের প্রতিটি মুহুর্তের সাথে লড়াই , হাত ছাড়েনি মনিকার । এক ভোরে সূর্যোদয়ের আগে মনিকার কোলে হাসি ফুটে উঠে এক নবাগত অতিথির । এ যে গৌতম আর মনিকার প্রাণের ফসল। উভয়ে মিলে নামকরণ করে গৌরব। ভবিষ্য এ গৌরব করবে আশা নিয়ে । আজ এক - পা দু -পা করে মনিকা গৌতমের হাত ধরে এগিয়ে চলছে গৌরব সংস্কীর্ণ জীবন পথে । ভিটেমাটি নেই বলে থেমে থাকেনি গৌতম মনিকা , এগিয়ে চলেছে আকাঁ বাঁকা দুর্গম পথে ঠিকানার খোঁজে।

পাহাড়ের বুক ফাটা কান্না

কনকণে বাতাস, এক শীতের পড়ন্ত বিকেলে তাদের দেখা গেল পাহাড়ী গিরিকন্দরের অখ্যাত গ্রাম লুংফুং এ। যেখানে ইট সনেটের ,পীচের তৈরী রাস্তা ও নেই , নেই বিদুৎ, নেই পাঠশালা, নেই কোন হাট। কেবল আছে প্রকৃতির মনোরম ভাবে সাজানো গহন অরণ্য আর উচু উচু পাহাড় তার মাঝে গিরিকন্দরে ইতস্ততঃ টংঘর যা জুমিয়াদের বাসস্থল আর সাথে তাদের গৃহপালিত কতিপয় পশু । নীরব শান্ত প্রকৃতির কোলে , প্রকৃতির উপাদান ছন, বাশেঁর তৈরী ঠং ঘরে বসা সহজ - সরল চেহারার একজোড়া ছেলে মেয়ে , যাদের সম্পর্কটা কোন প্লেটোনিক মার্কা সম্পর্ক নয়, কিন্তু মনে হলো উদার প্রকৃতির খাঁটি ভালবাসা , কৌতুহলবশত ঃ নাম জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটি বলে উঠল তার নাম " রিস্া " ছেলেটি বলল তার নাম " কুবুই" মনে হলো শুরু আমাদের দেখে লজ্জা

পেয়েছে কারণ নাম বলার পরপরই ঘটাং করে দু জন দুদিকে চলে যায়। রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে, কিছুক্ষন বাদেই দেখা গেল অন্ধকার উঠে গেছে। আশ্চর্য ! আকাশ একদম ফরসা ইতস্তত পাহাড়ী কুড়েঁঘরগুলোর বাশেঁর তৈরী দরজাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। পুরো লুংফুং পাহাড়ী মহল্লায় যেন শ্মশানের নিস্তব্দতা। যেভাবেই হোক তাবুদিয়ে অস্থায়ী শিবির করে সেই আস্থানায় আমরাও আশ্রয় নেই। প্রচন্ড শীত হাত, পা হিম হয়ে যাচ্ছে। দাঁত কপাটির কাঁপুনিতে যেন কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে গেছে, ভাবছিলাম এই পাহাড়ী এলাকায় মানুষগুলো কি ভাবে বেচেঁ আছে। প্রতিদিন জীবনের জন্য কি প্রচন্ড সংঘর্ষ করতে হয়, ভাবাই দায়খ। ভোরের আলো ফোটার আগেই শোনা যায় পাহাড়ী মহল্লার লোকগুলোর অচেনা কণ্ঠস্বর। তারা বিছানা ছেড়ে উঠে পরের দিনের জীবন জীবিকার সংঘর্ষে হাত রাড়াতে। অধিকাংশ মাঝবয়সী লোকের চোখের কোটর নিস্প্রভ, শীর্ন হাত- পা - শরীর। একমাথা উলোউলো রুষ চুল, মুখে পাতলা পাতলা লম্বা লম্বা বস্ত দিনের দাঁড়িগোঁফ, পড়নে ময়লা কাপড়। দেখেই বোঝা যায় বড়ই অকিঞ্চিৎকর লোক ওরা। ওরা থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী, ওদের নিয়ে সংসারের কোন হিসাব নিকেশ নেই।

আমাদের অস্থায়ী শিবিরের পেছনে ঘন পাহাড়ী জঙ্গল, উচুটিলা, সামনে গ্রামের মতো। সত্যি বলতে কি গ্রাম বা বস্তি কিছুই বলা যায় না। জঙ্গল, পাহাড়ে ঘেরা কিছুটা ফাঁকা উচু টিলাতে এক জায়গায় জড়ো হওয়া কিছু গাছ বাঁশ আর ছন দিয়ে তৈরী টং ঘর। উচু করে তৈরী টং ঘর গুলো মনে হয় আত্মাক্ষা করতে চাইছে কোন ভয়ানক বিপদ ও আতঙ্ক থেকে। দেখলেই মনে হয় যে কোন সময় অতকির্ত বিপদ এসে তাদের নিমেষে ধুলিসাৎ করে দেবে। এই জায়গার নাম লুংফুং, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার টাকারজলা থানাধীন এক পাহাড়ী অঞ্চলের নাম। এই অঞ্চলে "কাইপেং" উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা বাস করে। এই পাহাড়ের লালমাটির সঙ্গেই তাদের জীবন - জীবিকার সম্পর্ক। কারণ অন্য কোথা ও যাবার উপায় নেই বলে। এই সবুজ পাহাড়ের উচু কঠিন জমিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ওরা জুম চাষ করে।জুমে ধান, পাট, শব্জী, মকাই ইত্যাদি ফলায় উপার্জন বলতে পাহাড়ী জুমের ধান সহ সামান্য কিছু ফসল আর বন জঙ্গল কেটে বাঁশ ,ছন বিক্রি করে সামান্য রোজগার। তাতে হাত ভরে কিছুই আসে না। দুঃখটা তাদের সবক্ষর্নের সঙ্গী। লুংফুং পাহাড় তিন পাশে দাঁড়িয়ে আছে বড়মুড়া পাহাড় বস্তদূর বিস্তৃত গহন জঙ্গল। লুংফুং এর বাসিন্দরা এই জঙ্গল থেকে জ্বালানির লাকড়ি সংগ্রহ করে। এই পাহাড়ে শীতের মরশুমে সকালে রাতে ভারী কুয়াশঅ জমতে শুরু করে তখনই পাহাড় বাড়তি ভয়ের কারণ হয়ে দাড়ায়। জুমের আগুনের কারণে কখনো পাহাড়ে হানা দেয়, কখনো বা দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে দেয় টংঘর গুলো, কখনো বুনো শুকরের পাল জুমের ধানগুলো তছনছ করে দেয়। গরিব মানুষদের নিঃস্ব করে দেয়।এখান ছেড়ে কোথাও যাবার উপায় ও নেই, কোথায় যাবে। সবচেয়ে ভয়ংঙ্কর উগ্রবাদী নামক জঙ্গল দুৎসুরা অনেক সময় রাতে

বিরেতে মহল্লায় আসে , এই পাহাড়ী জনপদের লোকেরা তাদেরকে খোসামোদ করে ,কুর্নিশ করে , তাদের জন্য খাবার তৈরী করতে হয় । তারপর ও কত শাসন ,নিদের্শ , বাধ্য হয়েই লুংফুং এর অধিবাসীদের মৃত্যুর সেঙ্গই ঘর করতে হয়। মাসে ছ মাসে কখনো এই মহল্লাই , পুলিশ নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা আসে, ওরা ও হুমকী ধমকী দেয় , এই মহল্লায় উগ্রবাদী আসে বলে। কোথায় যাবে ওরা জেঙ্গলদুৎদের খাওয়া দাওয়া ব্যবস্থা না করলে খোসামোদ না করলে নির্ঘাতি মৃত্যু , আর ওদের জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করলে ও যদি সরকারী বাহিনীর কাছে খবর পৌছায় তাহলে সন্তান সন্ততি ফেলে জেলের কালকুঠুরি। কোন রাস্তায় যাবে ওরা । জীবনের বিকল্প পথই বা কি ? শীতের দুপুরে সারাদিন বসে বসে এক প্রৌঢ় সমতে ঘটনাগুলো বলল। রুগ্ন শরীর প্রৌঢ়কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম প্রৌঢ়ের নাম "সাম্প্রই " দেখতে পেলাম সাম্প্রাই আস্তে আস্তে খানিকটা দুর গিয়ে ঘাড় ঘুড়িয়ে বামপাশে তাকাল। কিছুটা দুরেই তাদের বহল্লা সে আলাদা ভাবে দেখতে চাইল নিজের টং ঘরটা কিন্তু না তার চোখের সামনে সবটাই একই মনে হল । দিনের আলো প্রায় নিভে যাচ্ছে , অপুষ্টি , অর্ধপেট খাবারে সাম্প্রাই বয়সের তুলনাই অন্টো বদ্ধের মতো হয়ে গেছে উপরন্তু চোখে ও কম দেখতে পাই , মনে হচ্ছিল যে তার নিজের টংঘরটি ঠাওর করতে পারছে না । মনে হয় অনন্ত আকাশের নীচে একটু ঢাকা দেবার খানিক ব্যবস্থা । শুধু সাম্প্রাই কেন , এই মহল্লার বে আধিবাসীদের একই ষঅবস্থা কারো পায়োর নীচে শধু জমিন নেই , ধুকঁতে ধুকঁতে সন্তান সন্ততি নিয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকা । দু বেলা পেট ভরে খাওয়ার সংস্থান নেই কারোর।

এই মহল্লায় রাতে বাতি জ্বলে না , খাওয়ার ব্যবস্থাই যেখানে হইনা কেরোসিন তেল পাবে কোথায় ? তাই মহল্লায় লোক যা কিছুই ব্যবস্থা করেঁ সন্ধ্যার আধাঁর নামার আগেই খেয়ে নেই। সাম্প্রাই যেন মানষিক দিক দিয়ে বিধ্বস্ত। যাই হোক ওদিনের মতো যে নিজে খাওয়াটুকু সেরে নিয়েছে কিন্তু অন্ধকার টংঘরে পাহাড়ী প্রচন্ড কনকণে শীতের সাম্প্রাইএর স্ত্রী ও মেয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে সম্প্রাই ফেরার অপেক্ষায় । মা , মেয়ে জানে যেমন করেই হোক কিছু চাল জোগার করে আনবে সাম্প্রাই । কারণ চাল আনবে বলেই সাম্প্রাই ঘর থেকে বের হয়েছে । যত দিন যাবৎ বুনো আলু আর বাঁশ কড়ুল সেদ্ধ করে ঘরের সবাকে গিলতে হয়েছে । ঘরে পাখীকে দেওয়ার মতো ও কোন দানা নেই। সাম্প্রাই কেন ? এই মহল্লাই প্রতিটি ঘরেই একই অবস্থা । বাঁচার জন্য ওদের প্রতিদিনকার লড়াই । লড়াই করে শেষ হবে তাও অজানা, সাম্প্রাইকে কে দেবে চাল, আটা । তবু চাল নিয়ে ঘরে ফিরবে সাম্প্রাই এই আশা নিয়ে ঘরে বসে আছে মা "সাম্প্রারি" আর মেয়ে 'রিসা'।

সাম্প্রাই যে এখন ভবঘুরে , সংসারের টানা পোড়ন আর ভাল লাগে না । সংসারের চেচাঁমেচি, অশান্তি সে কানেই তোলে না ।খাবার পেলে খায় না পেলে ও কাউকে কিছু বলতে নারাজ। পরদিন সকালে তাঁবুর সামনে বসে বসে " সাম্প্রাই " রোদ পোহাচ্ছিল । শীতের ঘুম ভেঙ্গে তাবু

থেকে বের হয়ে দেখতে পেলাম সাম্প্রাই চুপচাপ ঠাঁই বসে আছে। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে সাম্প্রাইকে দিলাম সাথে হাতে দিলাম দু খানা রুটি ।দেখতে পেলাম সাম্প্রাই চুপি সারে দু খানা রুটি পরনে ময়লা কাপড়ের ভাঁজে লুকিয়ে নিল । জিজ্ঞেস করলাম সাম্প্রাই রুটিগুলি না খেয়ে কেন লুকিয়ে নিলে ? নিস্প্রভ চোখের কোটর থেকে জল নেমে এলো । বলে উঠল বাবু কাল তো তোমার আমার সাথে অনেক কথা বললে । আমাকে খাওয়ালে কিন্তু আমার ঘরে যে স্ত্রী কন্যা সারারাত না খেয়েছিল, কে দেবে তাদের খাওয়ার, মেয়েকে ফেলে মাও এখন বেশী জুমে যেতে পারে না । যে দুর্ব্বল পরিশ্রম ও করতে পারে না তার উটর ঘরে আর কেউ নেই মেয়ে রিসা তো দিনেদিনে ধিঙ্গি হয়ে উঠেছে , কারণ উঠতি বয়স খেন লাউয়ের ডগার মতোই বাড়বে কিন্তু আমি তো বাবা, ছেলেটাকেতো বাঁচাতে পারলাম না । এখন তো সম্বল মেয়েটা আর অসুস্থ স্ত্রী । তাদের জন্য তো কিছু করতে হয়। কিন্তু শরীরে তো শাক্তি নেই কি ভাবে যে কি করব , তাই ভেবে পাই না ।আমার স্ত্রী সাম্প্রারী ও সব বোঁঝে, ছেলে হারিয়ে দিনরাত একচোখে ভগবানকে গাল দেয় । প্রশ্ন করতেই বলল এখন বন জঙ্গলে একা ঘুরে বেড়াই , যদি জঙ্গল দৎসুদের সাথে দেখা হই তবে দু হাত ধরে চিত করে ওদের শুইয়ে দিবো। জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি পারবে ? সাম্প্রাই বলে উঠল ওদের হাতে বন্দুক আছে , পুত্রের মৃত্যুর বদলে তো নিতে পারব না কিন্তু সংসারটা তো বাঁচবে। তা কি ভাবে ! সাম্প্রাই বলে উঠে মহল্লার লোকেরা বলে উগ্রবাদী যদি কাউকে গুলি করে মারে তবে নাকি সরকার থেকে এক লাখ টাকা পাওয়া যায় ।চাকুরী ও দেই , তাই ভাবলাম টাকাটা দিয়ে আমার সাম্প্রারি বেঁচে যাবে ।আর মেয়ে তো সবে আঠারো বছর , যদি একটি চাকুরী পায় সে ও বেঁচে যাবে ।তাই বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই যদি ওদের স্বাক্ষাৎ পায়, কিন্তু ইদানীং আমার ছেলের মৃত্যুর পর ওরা এদিকে আসেনি বা কখন আসবে তাও জানি না । জানার কৌতূহল - সাম্প্রাইকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার ছেলের নাম কি ছিল । সাম্প্রাই বলল তার ছেলের নাম ছিল গরেং । কি ভাবে মারা গেল সে। একথা বলতেই শীর্ন হাত - পা শরীরের লোমটা যেন নিজের শাক্তির দ্বিগুন ক্ষমতা নিয়ে ফুঁসে উঠল । চিৎকার দিয়ে আমাকে বলল সে মারা যায় নি তাকে খুন করেছে তারপর নিস্তেজ হয়ে সাম্প্রাই মাটিতে বসে পড়ল। বলল কাইপেং মহল্লা তখন ঘুমে আচ্ছন্ন পূর্ণিমার চাঁদ তখন মাঝ গগনে , হঠাৎ করে ৪/৫ জন লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমার টংঘরে উপস্থিত, এক লাথি মেরে আমার ঘরের বাঁশের দরজা ঘুলে ফেলল,শব্দ শুনে আমি মাচাং এর উপর উঠে বসলাম, আমার স্ত্রী সাম্প্রারি ও ঘুম থেকে হতচকিত হয়ে উঠে পড়ে । মেয়ে রিসা ভয়ে মাচাংএর কোনে লুকিয়ে যায়। আমার ছেলে গরেং সারাদিন খাটুনি খেটে অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। হ্যাঁ তিনদিন আগে সরকারী বাহিনীর লোকেরা এসেছিল,আমার ছেলে গরেংকে তারা অনেক প্রশ্ন ও করেছিল শেষে বলেছিল তাদের খাবার খাওয়ার জন্য জল এনে দিতে ।ব গরেং মাটির কলস নিয়ে পাহাড়ী ছড়া থেকে শীতল গল এনে সরকারী লোকদের তৃষ্ণা মেটাতে দিয়েছিলেন। কিছুক্ষন বাদে

সরকারী বাহিনীর লোকেরা চলেযায় । এতটুকুই জিজ্ঞেস করলাম তবে বিপত্তি কোথায়? সাম্প্রাই বলে উঠে তা তো আমার জানা নেই । ওই রাত্তিরে প্রথম৪/৫ জন আমার টংঘরে ঢুকে পড়ে বাইরে দেখতে পায় আরো বেশ কয়েকজন বন্দুক উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার রক্ত হিম হয়ে যায়। ওরা আমার ঘুমন্ত গরেং কে টেনে হ্যাচড়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে ফেলে । বলে তুই নিরাপত্তা বাহিনীর লোকদের কি বলেছিস্। আমার সরল স্বভাবের ছেলে গরেং বলে না আমি তো কিছুই বলিনি শুধু তাদেরকে জল খাইয়েছি। বলে চল্ , তুই আমাদের সাথে । ওদেরকে পথ দেখিয়েছিস্ আমাদের ও পথ দেখাতে হবে। ভয়ে আমার ছেলে গরেং আর্তচিৎকার করে উঠে, বাবা আমাকে বাচাঁ ও , মা আমাকে বাচাঁও , তার আর্ত চিৎকারে মহল্লার লোকজন ও ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ে। কেউ কেউ এগিয়ে আসতে চাইলে জঙ্গল দৎসুদের বন্দুকের হুমকীতে কেউ এগিয়ে আসার সাহস পায়নি। আমি ও আমার স্ত্রী জঙ্গলদৎসুদের পায়ে ধরে ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চায় । আমার স্ত্রীর বুকফাটা কান্না ও ওদের মন গলাতে পারেনি। ওরা আমার সামনে আমার ছেলে গরেংকে ছাগল ভেড়ার মতো টেনে হ্যাঁচরে নিয়ে যায় । চোখের সামনে ছেলের ভয়াবহ দেখেছি কিন্তু বাবা হয়ে ছেলেকে বাঁচাতে পারিনি । সেই থেকে আমার স্ত্রী অসুস্থ, আজো অসুস্থ। কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, আর আমি ওদের সন্ধানে এখন ও ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি আমার ছেলের দেহ ও খুঁজে পাইনি তবে তাকে নিয়ে যাওয়ার ২/৩ দিন পর দৎসু সীমান্তে তার গায়ের জামা পেয়েছি, তা ও কালশিটে রক্তের দাগ জমাট বেঁধে আছে । অনেক খুঁজেছি যদি ছেলের দেহটা ও একবার দেখতে পারি কিন্তু না গরেং এর শব ও খুঁজে পাইনি । অনেকমে কাতর অনুরোধ করে জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু জঙ্গল দুৎসুদের ভয়ে কেউ আজো মুখ খুলেনি। আমার গরেং পৃথিবীতে নেই তা আমি নিশ্চিত কিন্তু আমরাযারা বেঁচে আছি সবাই জীবন্মৃত। সাম্প্রাইর মৃখে বাস্তব ভয়াবহতার কথা শুনে খানিকটা বিমর্ষ হয়ে মুষড়ে পরি । ভাবলাম ক - টা দিন একটু খেয়ে বাঁচুক , এই ভেবে ১০ কিলো চাল ও ১০ কিলো আটা , ডাল , সাম্প্রাইকে দিয়ে দিলাম, কিন্তু বিষয়টা হলো , এই খাবার গুলো নিয়ে যাওয়ার শারিরীক ক্ষমতা ও সাম্প্রাইয়ের নেই । চুপাস যাওয়া মুখ থেকে ক্ষীন হাসি ফুটে উঠল সাম্পাইয়ের। বলল বাবু একটু সবুর করুণ আমার মেয়ে এসে জিনিষ গুলো নিয়ে যাবে । খানিকক্ষন - বাদেই সাম্প্রাইএলো মেয়েকে নিয়ে । দেখেই অবাক হলাম, আরে আমরা যখন এই মহল্লায় ডুকে প্রথমে যেই টং ঘরটুজুতে গিয়েছিলাম সেখানে তো এই মেয়েটিকেই দেখেছিলাম সে বলেছিল তার নাম " রিস্া" বড্ডলাজুক মেয়ে একটি ছেলে তার সাথে গল্প করছিল সে বলেছিল তার নাম "কুবুই" সাম্প্রাইকে বললাম তোমার মেয়েকে তো আমরা এখানে এসেই দেখেছি তবে জানি না , এই মেয়ে যে তোমার । লাজুক অথচ এখ পাহাড়ী সৌন্দর্যে ভরপুর রিস্া, সাম্প্রাই বললো হ্যাঁ ঐ দিন যে ছেলেটা আপনারা দেখেছেন সে ছেলেটা আমার ছেলে "গরেং" এর বন্ধু "কুবুই" ওকে দেখেই আমার স্ত্রী সাম্পারি অন্ততঃ কিছুটা মানষিক শান্তি লাভ

করে। একথা ও কথার মাঝেই আমাদের অস্থায়ী ক্যাম্পের সামনে দিয়ে এল তরতাজা যুবক যাচ্ছিল। চোখে পড়তেই সাম্প্রাই বলে উঠল , এই তো কুবুই যাচ্ছে। সাম্প্রাই ডাক দেওয়ার মাত্র ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ে। নজরে পড়তেই চিনতে পারি। যাই হোক মেয়ে "রিস্া" ও সাম্প্রাই মিলে আমাদের দেওয়া সামগ্রী নিয়ে পাহাড়ী জঙ্গলের গা - ঘেষে নিজেদের আলয়ের পথে পা বাড়াই, পেছনে পেছনে কুবুই।

সাম্প্রাইয়ের ভাবনা মেয়েতো বড় হয়েছে। কখন কি দুর্ঘটনা না হয়ে যায়। মেয়েকে ঘরে রাখা ও একদায় । মেয়েকে যে পরের ঘরে পাঠাতে হয় । কিন্তু মুখে বললে তো আর হয় না কিছু খরচাপাতির তো দরকার কিন্তু হাত পা গুটিয়ে ও তো বসে থাকা যায় না । মেয়েটার তো একটা গতি করা দরকার, কিন্তু প্রয়োজন সবটাই কিছু পেটের ক্ষিদের আগুন মেটানোটা তো সবচেয়ে আগে। সাম্প্রাই কিন্তু এখন নিজের জন্য ভাবে না । দুটি প্রাণ যে তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে।তাদের জীবনের কথাই ভেবে সাম্প্রাই, মহল্লার লোক সাম্প্রাইর মতোই দিন দরিদ্র তবু ও " রিস্ার" কথা ভেবে মহল্লার লোক আমাদের তাবুতে আসে। সাথে আসে কুবুই এর "বাবা" "কথার" আর মা "খুমালী" চলে বৈঠক। বৈঠকের প্রথমেই কুবুই এর বাবা "কথার" আর মা "খুমালী" বলেন রিসা কে তাদের পছন্দ এবং রিসা এবং তাদের ছেলে কুবুই এর বিয়ে দেবে। কিন্তু প্রশ্ন অনুষ্ঠান কুবুই এর দরিদ্র অথচমহান পিতা বলে ফেলল আমার ঘরে একটা শূকর আছে পুরো মহল্লাকে আমি মাংস খাওয়াব। গ্রামবাসী সম্মিলিত ভাবে বলে উঠল আমরা সবাই একপোয়াকরে চাল আর শুকনো কাঠ দেব। আমাদের তাবুতে এ আলোচনা সভা যেন স্বর্গীয় আসর । এক অভাবনীয় আনন্দ আর অনুভূতি । অবশেষে আমরা ও বলে ফেললাম এইবিয়েতে আমরা দু- হাজার টাকা দেব। আমরা সবাই নেমন্তন্ন পেলাম । পাঁচদিন বাদে বিয়ে। পাহাড়ী ফুলে সজিত বিয়ের মন্ডপ , ফুলের সুবাসে বন যেন মাতোয়ারা কোথা ও নাচ, কোথা ও গান, কোথা ও বাঁশের বাশীর করুণ বিদায় স্বর । যক ভাষাহীন দৃশ্য অনুভব করলাম । পাহাড়ী মেয়েরাপাহাড়ী ফুলে সজিত হয়ে বিয়ের আসরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেরা পাহাড়ী ফুল আর পাতা দিয়ে মাথায় মুকুট বেঁধেছে। ভাবলাম সংস্কৃতির পথে সভ্যতার কি অভাবনীয় রুপ। গোটা অনুষ্ঠান ক্যামেরাবন্দী করলাম। "কুবুই" "রিস্ার" হাত ধরে বলে না,না আমরা মরব না। আমরা দু- জনা বাঁচতে এসেছি, সবাইকেসাথে নিয়ে ,সবাই মিলে শান্তি ফেরাব। দু-জনা . দু - জনের হাতে ধরে হাসি আর আনন্দে উদ্বেল হয়ে পড়ে যেন এক অপরুপ স্বর্গীয় ভালবাসার অনুভূতি । উদ্বেলিত ভালবাসা আর আনন্দে যেন চারিদিক মাতোয়ারা। নীল আকাশে পূর্নিমার গোল চাঁদ, তার মাঝে ভাসছে দুটি - তারা। শুভ্র পূর্নিমার আলোতে কুবুই ও রিসা লুংফু পাহাড়ের কান্না ভুলে, ভালবাসার আগামী পথকে স্বাগত জানাই। এই লুংফুং হয়ে উঠুক আমাদের ভালবাসার পীঠস্থান।

প্রতিদ্বন্দী কোথায়

শৈশব যৌবনের মাঝখানে জীবনস্বপ্ন দেখে জীবনের একটা টার্গেট তৈরী করেছিল বিনায়ক, বিনায়ক জানত না তার জীবন স্বপ্ন তার জীবনের টার্গেট একদিন কুনকো বাতাসে উড়ে যাবে, তাই হয় মধ্যবিত্ত/ নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের অনেক ছেলেই শৈশব যৌবনের সন্ধিক্ষনে অনেক স্বপ্ন দেখে জীবনকে জীবনের রুপ দেওয়ার জন্য কিন্তু সেই স্বপ্নের টার্গেট মিস্ হয়ে যায়। এটাই নিদারুণ বাস্তব । এই প্রখর বাস্তব না মানতে পেরে অনেক চীবনই এলোমেলো হয়ে যায়, হয়ত বা একটা ক্ষুদ্র অংশের যুবকের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় , তাও কঠোর জীবন সংগ্রামের ফলে অনেক কাঠ - খড় পুড়িয়ে । বাস্তব জীবন তৈরী করতে বাধা কোথায় , প্রতিপক্ষ কে ? তা বিনায়ক জানে না । না দেখে

না জানা প্রতিপক্ষের সাথে কতটা সময় লড়া যায় । একটা সময় যেন নিজের মনের ভেতর থেকে কেউ বলে দেয় প্রতিদ্বন্দিতা থেকে কেটে পড়। চলে যা বহুদূরে।

বিনয়ক নিঃসঙ্গ একাকী ভগ্নহৃদয়ে ভারাক্রান্ত মনে এক টুকরো কাগজ নিয়ে তাতে পদ্যাকারে লিখে তার জীবনের স্বগতোক্তি। যদি ও কে আছে শোনার তা জানা নেই। যেমন প্রতিপক্ষ কে?

"জীবনের পেছনে ছুটতে ছুটতে বহুপথ অতিক্রম করে আজ মাঝ রাস্তায় প্রতিপক্ষ দাঁড়ানো একই রাস্তায় সে ও আমার মত বিধ্বস্ত জীবনে।

আমি ভাবিনি কখনো তার সাথে দেখা হবে, যে আমার
মতো মাঝবয়সী
ঠাওর করে দেওতে পায় নিস্তব্দ মানুষটি , কিন্তু উদ্বেক আর
হিংস্রতা তার চোখে
বিধ্বস্ত মনের মানুষটি, হাসি তার উবে গেছে, একপলকে
কি যেন দেখে আছে।
আমি জন কোলাহলের ফাঁকে , তার মূখের প্রতিচ্ছবি দেখি,
সারিবদ্ধ মানুষ অনুষ্ঠানে ধেয়ে যায় মাঝখানে বিজ্ঞজনের
হুমকী আর কথার ফুলঝুড়ি।
আকস্মিক দক্ষিণা বাতাস তেড়ে এসে বলেগেল, লোকটাকে বলো
চলে যেতে , বহুদূরে
বিধ্বস্ত মনের মানুষটি, হিংস্র চোখে ক্ষীন স্বরে বলে উঠে আমি ভালবাসি জীবনকে , তবে মৃত্যুকে ভয় করি না ।

আমার সোনার হরিণ চাই না, কিছুই নাই বা হলো , অন্তত জীবনটাকে জানতে চাই। তার কথাগুলো নিঃস্তব্দসমুদ্র ঢেউয়ের মতো , যার মাঝখানে থেকে বেরিয়ে এসেছে বিষাক্ত ঝাঁঝ। কৈশোর যৌবনের অবুঝ স্বপ্ন সন্ধ্যা মাঝবয়সে এসে বুকে ব্যাথা দেয় । জীবন যৌবনের বহুকাঙ্খিত স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে , কাপুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীর গোপন আক্রমনে।

বিধ্বস্ত লোকটি আপাদমস্তক ঘৃনায়, অপমানে, অক্লেশে নিজেকে জ্বালিয়ে দেই।

জীবনের বিশাল যুদ্ধভুমিতে প্রতিদ্বন্ধী লুকিয়ে আছে, তবু ও না দেখা প্রতিপক্ষের সাথে এ লড়াই চলবে কতদিন।

জীবন, সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে, কাঁলো পেঁচারা ডানা মেলে ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে আসছে। অশুভ ডাকে - বিধ্বস্ত লোকটিকে চলে যেতে বলে, দৃঢ়তার সাথে লোকটি দাঁড়িয়ে বলে আমি ভালবাসি জীবনকে ।

আত্মসমর্পণ নয়।

হতাশা জড়িয়ে রেখেছে আষ্টেপৃষ্টে, তারপর ও বিনায়ক যেন মনের ভেতর থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পাই। ভেঙ্গে গেলে চলবে না , উঠে দাঁড়াও, প্রতিনিয়ত সংঘর্ষই তোমাকে দিতে পারে তোমার জীবন, তোমার প্রয়োজনীয়তাই তোমাকে পথ দেখাবে। কিছুক্ষন বাদেই বিনায়ক বিরক্ত হয়ে মনে মনে ভাবে মালা যতসব মিছিমিছি ভাবনা ।এক একসময় বিনায়কের মনে হয় - পিতৃপুরুষের ভাগে পাওয়া ঘরখানা ছেড়ে চলে যাই অন্যকোথাও ভবঘুরে হয়ে। জীবনটাই যেখানে স্তব্দ সেখানে ঘর নিয়ে ভাবনাই লাভ কি ? মন যেদিন সিদ্ধান্ত দেবে সেদিন পালাব এখান থেকে। এক নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারে জন্ম বিনায়কের । ছোটবেলা থেকেই দেখেছে সংসারেরর টানাপোড়ন, ছোটবেলা থেকেই দু- টো পয়সা রোজগারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুয়েছে বিনায়ক বহুকষ্ট করে এম, এ পাশ করেছে। সরকারী বেসরকারী যেখানেই ইন্ট্যারভু দিয়েছি সবাই আশ্বাস দিয়েছে চাকুরী হয়ে যাবে । এখন চাকুরী হবে বললেই রাগে যেন বিনায়কের মুঠি------ হয়ে আসে । বিনায়ক তার ঠিকানার সাথে বন্ধু দিবাকরের টেলিফোন নাম্বারটা দিয়েছিল যাতে করে যোগাযোগ টুকু রক্ষা করা যায়। দিবাকর বিনায়কের ছোটবেলার ঘনিষ্ট বন্ধু ।দিবাকর বেশ স্বচ্ছল , দিবাকরের বাবা একটি রাষ্টায়াত্ব ব্যাংকের ম্যানেজার, মা ও ব্যাঙ্ক কর্মচারী দিবাকর মা, বাবার একমাত্র সন্তান, কিন্তু শৈশব থেকেই দিবাকর বিনায়কের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু । দিবাকর এম, কম পাশ করার পর এম, বি,এ পড়ে অধুনা এক প্রাইভেট র্ফামে এক্সকিউটিভ হিসাবে কর্মরত। বেশ মোটা অংকের বেতন পায় ।দিবাকর বিবাহিত তার একটিছোট ছেলে ও আছে। দিবাকর এবং বিনায়কের বন্ধুত্ব আজো ও অটুট । দিবাকর চায় বিনায়ক একটি চাকুরী পেয়ে যেন জীবনটাকে ভালভাবে চালাতে পারে। প্রতিবার নানাহ প্রতিষ্ঠানে ইন্টারভ্যু দিলে কতৃপক্ষ বলে আপনার ইন্টারভ্যু ভাল হয়েছে। চিন্তার কোন কারণ নেই । যথাসময়ে খবর পেয়ে যাবেন। কিন্তু না, বাস্তবটা সম্পূর্ণ বিপরীত , দেখা যায় না - জানা - না শোনা কোন নাম চাকুরী পেয়ে গেছে, যাকে ইন্টারভ্যুবোর্ডে ও বিনায়ক দেখেনি। এ ভাবেই স্বপ্নকেরি করে চলেছে বিনায়ক কিন্তু আজো ও বুঝে না তার প্রতিপক্ষ কে ? দিবাকর অনেক সময় চেষ্টা করে বিনায়ককে কিছু আর্থিক সাহায্য করতে কিন্তু স্বাভিমানী বিনায়ক তা প্রত্যাখ্যান করে । একসাথে গুটি গুটি পায়ে বিনায়ক দিবাকরের জীবনের পথচলা শুরু , প্রাইমারী স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি পযন্ত্য। বিনায়ক বরাবরই ভাল ছাত্র ছিল, ভয়াবহ দৈন্যদশার মধ্য দিয়ে জীবনের শিক্ষা, বিনায়কের পিতা ভাবত ছেলেটা লেখাপড়া শিখে একদিন সংসারের আর্থিক অনটন ঘুচাবে ।কিন্তু সে ভাগ্য বিনায়কের বাবা বিপিনবাবুর হয়নি । বিনায়ক চোখের সামনে দেখেছে তার বাবা রোগ যন্ত্রনায় ধুঁকতে ধুঁকতে মরেছে চিকিৎসার অভাবে। ছেলে হয়ে ও পরিবারের ভরণ পোষন দিয়ে বাবার চিকিৎসার খরচ চালাতে

পারেনি । এই মর্মন্তুদ ঘটনা বিনায়কের মনে পড়লেই সে মানষিক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু কিছু করার উপায় যে তার নেই। তার মাঝে বাবা মৃত্যুর আগে ছেলের বৌ দেখবে শখ করাতে , বিনায়কের মা ও প্রতিবেশীরা মিলে এলাকারই মেয়ে শিউলীর সাথে বিনায়কের বিয়ে দেয়। শিউলী ও গ্যাজুয়েট তাদের একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে আছে,তার নাম "বিদিশা" বিদিশা ও প্রাইমারী স্কুলে যায় । পেট বাঁচানোর দায়ে শিউলীকে একটি বিড়ি ফ্যাক্টরীতে কাজ নিতে হয় কিন্তু মাসে ৭/৮ শ টাকার বেশী তার রোজগার হয় না তবু ও ভাবে যদি বিনায়ককে কিছু সাহায্য করা যায় । বিনায়ককে দেখলে পুরানো বন্ধুরা চিনতে কষ্ট হয় । অনেক প্রাইভেট স্কুলে চাকুরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে । কতৃপক্ষ বলে বি, এড এর প্রয়োজন। কিন্তু পয়সার জন্যতো বিনায়কের বি, এড পড়া হয়নি এখন কি করা নামীদামী শিক্ষকেরা ত্রে টিউশনি করে , সে জায়গায় তাকে কে দেবে টিউশনি। তারপরে ও দিবাকরের স্ত্রী অপর্ণার সহযোগীতায় কয়েকটি টিউশনি যোগার করে । সকাল বিকাল বাড়ী বাড়ী ঘুরে হাজার দু-য়েক টাকার টিউশনি আর শিউলীর রোজগারের ৭/৮ শ টাকাই বিনায়কাদের পরিবারের চলার সম্বল । বিনায়কের বৃদ্ধা মা ' রেনুবালা' প্রায়শই অসুস্থ থাকে বাধ্যক্য জনিত রোগে , সরকারী হাসপাতালের অষুধ দিয়ে কোনরকমে চালিয়ে দেই শিউলী। ইদানীং মা বিনায়কের কাছে একটা আবদার করছে ঘন ঘন, বাবা তুই আমাকে একটা চশমা কিনে দে? আমি চোখে আবছা দেখছি। শান্ত প্রকৃতির বিনায়ক মাকে শান্তনা দেয় মা তুমি একটু সুবুর কর কিছুদিন বাদেই আমি তোমার চশমার একটা ব্যবস্থা করছি। রেণুবালার প্রত্যাশার রাত শেষ হয়নি কিন্তু জীবনের সময় ফুরিয়ে আসছে। চশমাটুকু রেনুবালার প্রত্যাশাই রয়ে গেল, একমাত্র ছেলে বিনায়ক পারল না মায়ের প্রত্যাশা পূরণ করতে । এক প্রচন্ড শীতের ভোর রাতে চশমার প্রত্যাশা বুকে চেপে রেখে মা রেণু বালা বিনায়করে ছেড়ে পাড়ি দিয়েছেন অন্য কোন ঠিকানায়, রেখেগেছেন বার্ধ্যকের শীতল নশ্বর দেহ, সাথে ছেলের টানাপোড়নের সংসার। পড়শীদের সহায়তায় নদীর পাড়ে বিনায়ক মায়ের সৎকার করে, মায়ের নশ্বর দেহ পঞ্চভুতে বিলীন হয়ে যায়, শান্ত বিনায়কের চোখে মুখে ক্রোধ, কিন্তুভাগ্য ছাড়া তার কথা শুনবে ই বা কে? বিনায়ক ভাবে কি জীবন দিলে বিধাতা বাবার মুখে ও দিতে পারলাম না পেট ভরে ভাত, না পারলাম চিকিৎসা করতে । মায়ের একটি সাধারণ ইচ্ছা শুধুই একখানা "চশমা" তাও পারলাম না মাকে দিতে । লেখাপড়া শিখে ও কেন পারলাম না জীবনকে জীবন দিতে।বিনায়ক বিধ্বস্ত, যৌবনের তার হাসি উঠে গেছে, সে শান্ত, নিস্তব্দ, কিন্তু উদ্বেগ আর হিংস্রতার চোখে দেখে আছে মায়ের শ্মশানের ছাইগুলোর দিকে । রাজপথে মানুষের কোলাহল, আনন্দকোন কিছুতেই তার ভ্রুক্ষেপ নেই । মনে ভয়াবহ যন্ত্রণা ভাবে এখনো ও তো দুটো প্রাণ স্ত্রী ও কন্যা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। নইতো চলেযেতো বহুদূরে। মনে মনে শান্ত বিনায়ক রক্ত লাল হিংস্র চোখে ভাবে জীবনকে

ভালবাসি বলে কি মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারি না জীবন বাঁচানোর জন্য। বিনায়ক ভাবে আমি রাজসিক কিছু চাই না শুধু ভালভাবে বাঁচতে চাই, তবে তাতে কেন বাধা, কিন্তু বিনায়ক জানে না তার প্রতিপক্ষটা কে ? বিনায়কের বুক থেমে যেন বাধ ভাঙ্গা ঢেউ এসে তার জীবনটাকেই এলোমেলো করে দিচ্ছে।

এতসব ভাবনার মাঝেই একদিন বাল্যবন্ধু দিবাকর - বিনায়কের পিতৃিপুরুষের ঝং ধরা টিনের ভাঙ্গা ঘরে এসে উপস্থিত, দিবাকর বলে উঠে বিনায়ক, ব্রাদার আমার মনে হয় এবার তোর জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো। আশাবাদী মনে বিনায়কের যেন ক্ষীন আনন্দ লেগেছে। শিউলী দিবাকরকে জিজ্ঞেস করে, দিবাকর দা আপনি বললেই কি চাকরিটা হবে? দিবাকর বলে - না ব্যাপারটা অমন নয় আমি বিনায়ককে পাঠাচ্ছি। ওখানে বিনায়ককে কোয়ালিফাই করতে হবে। তবে - - - - শিউলী জিজ্ঞেস করে তবে কি ? আমার ধারনা চাকরিটা বিনায়কের হয়ে যাবে। কারণ নতুন কোম্পানী দেখছি তো অনেকেই যাচ্ছে - মোটামুটি পারফর্ম করলে কোম্পানী কতৃপক্ষ চাকুরীতে নিয়ে নেবে। কারণ ওদের অনেক লোকের দরকার, তারপর ইংরেজীটা মোটামুটি বলতে পারলে আর স্মার্ট থাকলে আমি মনে করি কনফর্মি। বিনায়কের বরাবরই ইংরেজীতে ভালো । বন্ধু দিবাকরের কথাই বিনায়ক এক বুক ভরা আশা নিয়ে গেলো, দু - ঘন্টা অপেক্ষা করার পর,বিনায়ককে কোন কিছু জিজ্ঞেস না করেই। রিসিপ্‌শন থেকে বিনায়ককে বিদায়করে দিলো । শিক্ষিত যুবক বিনায়ক বুঝতে পারলো , চাকুরী নট্‌ বিনায়ক ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠে। অদ্ভুতমুখভঙ্গিমা করে এই শালা লাথ বলে কুকু করে কেঁদে উঠে যেন রাজপথে লাথি খাওয়া কোন কুকুর ছানারমতো । ঘরের বেঝে শুয়েছিল শিউলী আচমকা আর্তনাদের আওয়াজে ধড়মড় করে জেগে উঠে শিউলী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বিনায়কের দিকে । বুঝতেই পারে না বিনায়ক এমন করছে কেন? শিউলী অবুঝ মেয়ে বিদিশা, বাবার চোখমুখ দেখে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে । এ কী অদ্ভুত সমাজ, যেখানে আমরা বাস করি বলে উঠে বিনায়ক। আমার যৌবনের স্বপ্ন আমার বুকে পাথর ছুড়েছে কিন্তু কেন, কেই বা আমার জীবনে ইষান্বিত হয়ে আমাই আক্রমন করছে। ঘৃনা , অপমান বিনায়ককে খুঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে ভাবে এ ভাবে চলবে কতদিন? শিউলী বিনায়কের হতাশা দেখে মেয়েকে বিনায়কের কাছে রেখে সন্ধ্যায় ছুটে যায় বিনায়কের ছোটবেলার বন্ধু দিবাকর ও তার স্ত্রী অর্পনার কাছে। দিবাকর ও অর্পনা এসে বিনায়ককে শান্তনা দেয় কিন্তু বিনায়ক তো আর শিশু নই, সে বুঝে জীবনের মানে। সন্ধ্যায় বিনায়ক ভারাক্রান্ত মনে বাড়ীর দক্ষিনে খোলামাঠে বসে বাড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে স্ত্রী শিউলী আর মেয়ে বিদিশার কথা । মাথার উপর খোলা আকাশ । অজস্র তারা, শুভ্র জোছ্‌না রাত্র । আহা প্রকৃতির এত সৌন্দয্য তবু ও তারাদের যেন খুশি উৎসারিত হচ্ছে না। শিউলী খুঁজতে খুঁজতে

মাঠের ধারে বিনায়ককে দেখতে পাই । শিউলী বলল - তুমি থাকলেই চলবে ফের কেন চাকুরীর চিন্তা। বিনায়ককে উত্তর বিহীন শুধু জিজ্ঞেস করল বিদিশা কোথায়? শিউলী বলে উঠে ঘরে পড়াশুনা করছে । বিনায়কের সংক্ষিপ্ত উত্তর পড়াশুনা করে কি হবে? শিউলী বলে উঠে দ্যাখ একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এতো ভাববে না । জীবনটাকে তোমার মনের ঐশ্বর্য্য দিয়ে আমরা আবার সাজিয়ে তুলবো। দ্যাখো আমরা একদিন পারবই শুধু তুমি ঠিক থাকলেই হবে। শিউলীর এতকথা বিনায়কের কর্ণগোচরে গিয়েছে কি না তা কেবল বিনায়কই জানে , এভাবেই সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলো, বিনায়ক ভাবতে থাকে তার মা - বাবা , শৈশব - যৌবন, জীবনের স্বপ্ন বন্ধুত্ব, পড়াশুনা। কিন্তু বাস্তবে তো সবই স্বপ্ন, এই স্বপ্নের উপর ভর দিয়ে তো এতটা পথ চলা , কিন্তু আজ তার বয়স হয়ে গেছে চল্লিশেব উপর তার জন্য এখন সরকারী বা বেসরকারী কোন চাকুরীর দরজাই খোলা নেই। সে এখন প্রৌঢ়। কিন্তু স্ত্রী সন্তানের দায়িত্ব যে তার কাধেঁ । ভাবতে ভাবতে দক্ষিনা বাতাস তার শরীর শীতল করে দেয়। মনে হয় বাতাস থেকে ভেসে আসছে একটিই কথা বিনায়ক তুমি চলে যাও বহুদূরে।কিন্তু কি ভাবে যাবে সে স্ত্রী - সন্তান ছেড়ে বিশ্বাসঘাতকের মতো। তা যে সম্ভব নয় নয় , বিনায়ক মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে উঠে দৃঢ়তার সাথে বলে উঠে না আমি পালাব না । জীবনকে নিয়ে পথ চলা সেখানে কখনো আত্মসমর্পণ করব না ।

পরদিন সকালে বিনায়ক ঘুম থেকে জেগে উঠে শিউলীকে বলে আমার তাড়া আছে । শিউলী বলে কোথায় যাবে তাড়াতাড়ি করছ কেন? বিনায়ক বলে আমার খুব দরকার আছে, তাড়াতাড়ি যাব . শিউলী অবাক হয় । অন্যান্য দিন তো বিনায়ক অতো তাড়াহুড়ো করে না।

বিনায়ক বেরিয়ে পড়ে দ্রুত গতিতে শুধুই জানতে / আবিষ্কার করতে তার “ প্রতিপক্ষ কে”?

****

আমি মেরেছি

রুপালীর আধপোড়া শরীরটাকে লেপ মুড়ি দিয়ে ভাসুর সদানন্দ আর বড় ছেলে রুপম কোনপ্রকার উঁচামুড়া গ্রামের নীচে মাচাং করে নিয়ে আসে। প্রদীপ দৌড়ে গিয়ে দুর্গাবাড়ী থেকে কোন প্রকারে একটি অটোভ্যানের ব্যবস্থা করেনিয়ে আসে । উঁচামুড়া গ্রামের ভেতরে যেতে হলে দু টোই রাস্তা একটা তেবারিয়া গ্রাম হয়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে রাস্তা তারকাটার পাশ দিয়ে ভাগলপুর হয়ে উঁচামুড়া গ্রাম, রাস্তা ভাল হলে ও জঙ্গলার্কীণ , এ ছাড়া এত রাতে এ রাস্তা দিয়ে কোন চালক গাড়ী চালাবার ঝক্কি নেবে না, একে তো নির্জন, তার উপর একমাইল - আধ মাইল অন্তর অন্তর সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর চৌকি, নানাহ প্রশ্ন - উত্তর ।কেন এই রাস্তাই , তার উপর বর্ডারিং রাস্তায় রাতে নৈশকালীন কার্ফু বলবৎ আছে। বিকল্প রাস্তা সত্তর কলোনী, বিনপাড়া হয়ে উঁচামুড়া গ্রাম, এবড়ো তেবড়ো ইটের তৈরী রাস্তা , সত্তর কলোনী থেকে উঁচামুড়া গ্রামে যেতে ও সেই নির্জনতা , সেগুন বাগান রাবার বাগান, দলবেধেঁ শেয়ালের ছুটোছুটি , এ রাস্তায় গাড়ীঘোড়া কম চলাচল করে তাই

ইটের উপর সবুজ রং এর শ্যাওলা জমে আছে । সন্ধ্যার পর এ রাস্তায় দিয়ে যেতে শরীর ছম্‌ছম্‌ করে উঠে, কিন্তু কিছু করার নেই এই গ্রামেরই ছেলে প্রদীপ , চোখের সামনে পাড়ারই বৌদি রুপালী শেষ হয়ে যাবে তা তো হতে পারে না । অটো ভ্যান গাড়ীটি নিয়ে সত্তর কলোনী হয়ে বিনপাড়া হয়ে উঁচামুড়া গ্রামে পৌছা গেলো না , কারণ দু পাশের জমির মাঝখানে কাঠের সেতু সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। অগত্যা সদানন্দ, রুপম, প্রদীপ আর ভ্যানের চালক সহদেব মিলে চ্যাং দোলা করে লেপ মুড়িয়ে রুপালীকে ভ্যানের মধ্যে উঠিয়ে রাত দু টো নাগাদ এসে সোজা পৌছল গোবিন্দ পন্থ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। কেশবের বউ আত্মহত্যা করতে গেছিল কেন তার উত্তর খোঁজার সময় নেই । সদানন্দ নিশ্চিত এ বৌ প্রাণে বাঁচবে না । সারা শরীর যে ভাবে পুড়েছে তাতে ২৪ ঘন্টা টিকলে হয়। হাসপাতালে নিয়ে যেতে ও অনেক ঝুকি নিতে হয়েছে। পুলিশ কেস হবেই । সদানন্দ রুপালীকে বাঁচানোর সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল। অমাবস্যার রাত , সন্ধ্যা থেকেই ছিল লোডশেডিং। এ ছাড়া ও উঁচামুড়া গ্রামে প্রায়শই ক্যারেন্ট থাকে না । হঠাৎ আগুনের হল্কা দেখে চিৎকার - চেঁচামেচিতে পাড়ায় লোকজন জড়ো হয়েছিল । উঁচামুড়া গ্রামে মাত্র ৬/৭ পরিবার লোকের বাস, সীমান্ত এলাকা , চোর ডাকাতের ভয়ে লোকজন এখান থেকে বেশ কয়েকবৎসর আগেই অন্যত্র চলে গেছে। যারা আছে জমি জমা গবাদি পশু নিয়ে তবে এলাকার লোকজন মোটামুটি স্বচ্ছল। সদানন্দ আর প্রতিবেশীরা হ্যারিকেনের আলোয় যতটা করা সম্ভব তারা করেছিল। যারা প্রথম দেখেছে অনেকে বলেছে রুপালীর আগুন নেভাতে কেশবের দু হাত ও ঝলসে গেছে । লেপ চাপা দিয়ে রুপালীকে উঠানোর সময় সদানন্দের হাতে ও খানিকটা ঝলসে গিয়ে চামড়া উঠে গেছে। তাতে ঔষুধ লাগিয়ে তবেই ঘর থেকে বেরিয়েছে সদানন্দ । প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার অটোভ্যানে চালিয়ে রুপালীকে হালপাতালে এনেছে তারা। রুপালীর প্রাণের ঠুকপুকানি আছে সেটা মাঝে মাঝে ঠাহর করছে সদানন্দ। হাসপাতালের ইমাজেন্সী ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখেছে সত্তর শতাংশ জ্বলা। সুতরাং চব্বিশ ঘন্টা ও টিকবে কি না বলা দায়। সকাল সকাল সব আত্মীয়স্বজনকে ও খবর দিতে বলা হয়েছে ।

রুপালীর আত্মীয়স্বজন বলতে বাপের বাড়ির লোকজনেরা। তারা থাকে কল্যাণপুর , ব্লক অফিসে পেছন দিকে বাড়ী। বড় বোনথাকে খোয়াই শহর থেকে বেশ কিছুদূরে সোনাতলা গ্রামে । ঠাকুরচাঁদ দত্তের মেঝো ছেলে কেশবের সঙ্গে রুপালীর বিয়েটা ও হয়েছিল সুন্দর । আর আজ রুপালীর অন্তিম শয্যার পাশে কেশব নেই । বিয়ের প্রথম জীবনটা তো ভালই ছিল । বিয়ের দু - বছরের মধ্যে তাদের একটি মেয়ে সন্তান ও হয় । তার নাম রাখা হয়েছিল " ধৃতি"। ঠাকুরচাঁদ বাবু ভাবত কত ভাল বিয়ে দিয়েছে সে কেশবের । এখন সবাই ভাবছে কিভাবে খবর দেওয়া রুপালীর বাপের বাড়ীতে । ঘটনা তো স্বাভাবিক নয় , মৃত্যু ও অবধারিত সুতরাং থানা - পুলিশ হবেই । বেশ

কিছু টাকা পয়সা খরচ হয়ে যাবে , সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু আত্মহত্যা সেটা ও তো প্রমাণ করতে হবে। না জানি পুলিশ এসে রুপালীর কোন জবানবন্দি লিখেলিখে নিয়ে গেছে। আর কী বিপদে দত্ত বাড়ী পড়তে পারে , তার কিছুই তো জানা নেই । বড় দুঃখ হচ্ছে রুপালীর জন্য । খুব ভাল মেয়ে ছিল। কেশবটা কোথায় গেল । এমন দুর্যোগে কোন প্রান্তে চলে গেছে কে জানে? বাপের বাড়ীতে খবর দেওয়া দরকার, হয়তো মৃত্যুর আগে বাপের বাড়ীর লোক চলে আসতে পারে। রুপালীর বাপের বাড়ীর লোক শুনলে পরিস্থিতি কী হবে।

পশ্চিমত্রিপুরা জেলার নরসিংগর থানা এলাকার এক সীমান্তে গ্রাম উঁচামুড়া। ঠাকুরচাঁদ দত্তের বাড়ীটাই সব থেকেই বড় । ইটের তৈরী রাস্তা থেকে আধ মাইল মতো জমির মাঝখানে দিয়ে গিয়ে, বাঁশের তৈরী সেতু পার হয়ে টিলা ভুমিতে অবস্থিত উচাঁমুড়া গ্রাম । এই গ্রামের পেছনে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। এই গ্রামটির চর্তুদিকে ঘিরে আছে "চা" বাগান, সেগুন বনের বাগান, রাবার বাগান, শ্যামলা জমি, মাঝে খরস্রোত খাল, গ্রামটির মধ্যে মাঝারি ধরনের পুকুর নানাহ ফলের বাগান । প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর গ্রাম দূর থেকে ছবির মতো মনে হয়। ঠাকুরচাঁন দত্তের বাড়ীতে ডুকতেই এক বিশাল চওড়া মাটির দেওয়াল দেওয়া টিনের ঘর ভিটে পাকা । অপর ভিটিতে বারো বাই দশের ঘর, একটা পাঁচ বাই পাঁচের বাথরুম আর একটা পাকা পায়খানা ঘর, আর একটা কাঁচা ঘর, গবাদি পশুর জন্য। এতটা করার পর আর খরচা করতে ইচ্ছে হয়নি। বারো বাই দশেব ঘরে কেশব রুপালীকে নিয়ে থাকে। ঠাকুরচাঁন দত্তের বাড়ীতে ঢোকার দুইদিকে রাস্তা আছে। ছোট ছেলে অরুপ দত্ত বাইরে কাজ করে , বিয়ে ও করেনি মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসে। বড়ছেলে সদানন্দ অর্থাৎ রুপালীর ভাসুর স্ত্রী ও দু ছেলে নিয়ে বড় ঘরটার মধ্যে থাকে। হাঁড়ি এখন ও আলাদা হয়নি। একটাই রান্নাঘরে সকলের আহার। সুতরাং ঠাকুরচাঁদ দত্তের সংসার এখন ও ভেঙ্গে যায়নি। এ বাড়ীতে উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া কোন ও কিছুর অভাব নেই । ১৫ কানি জমি, একটি পুকুর কাঠালবাগান, রাবার বাগান, মাঝারি "চা"য়ের বাগান ইত্যাদি। জমি জমার দেখাশোনা করে বড়ছেলে সদানন্দ এবং কেশব। বারো ক্লাশের পর কেশবের আর পড়া হয়ে ওঠেনি। ছোট ছেলে অরুপ বি,এ পাশ করেছে। সে এয়ারপোর্ট এ জেট এয়ারওয়েজ ছোট খাট একটা কাজ করে। অরুপ এ ছাড়া ও ইলেকট্রিকের কাজটা ও ভাল জানে । অবসর সময়ে এ কাজটুকু করে ও কিছু টাকা কামাই করে। কেশব জমির ফসল কখনো নিজে কখনো শ্রমিক দিয়ে নরসিংগর বাজারে আনে। আর ওই গ্রামের লোকের অস্থায়ী ঠিকানা, নরসিংগর বাজারের ননীরায়ের হোটেলে, কেহ কোথায় গেলে সাইকেলটুকু ননীরায়ের হোটেলে রেখে যায়। কেশব, অরুপ ওরা সময়ে সময়ে সাইকেল ননীরায়ের হোটেলেই রেখে যায় । অনেক সময় ননী রায় বিরক্ত হয়ে বলে আমার কোন কাজ নেই শুধু তোদের জিনিষআর সাইকেল পাহারা দেওয়া। অরুপ বয়স

আটাশের অরুণ ছেলে , লম্বা-চওড়া, সুদর্শন। অরুপকে বিয়ে করিয়ে দিলেই যেন ঠাকুরচাঁন দত্তের ইহকালের কাজের সমাপ্তি। তাই বুড়ো মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে । ঠাকুরচাঁন বাবুর স্ত্রী রেনুবালা দত্ত বলে ছেলেমানুষ একটু দাড়াঁতে দাও না । এমন তো সাংঘাতিক বয়স হয়নি কিছু দিন বাদে ওবিয়ে নিয়ে ভাবা যাবে ।
গোবিন্দপন্থ মেডিক্যোল কলেজ হাসপাতাল সুত্রে খবর পেয়ে নরসিংগর থানার মেঝবাবু কাগজ পত্র নিয়ে তৈরী হাসপাতাল যেতে হবে। মৃতুকালীন জবানবন্দী নিতে হবে প্রয়োজনে কেইস্ ফাইল হবে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যাক । পরেশ রায় থানার মেঝবাবু । দায়িত্ব অনেক, তার উপরে এয়ারপোর্ট , ভি,ভি, আই, পি দের আনাগোনা । সুতরাং ঝক্কি অনেক সব ঝক্কি কেউ কি আর পোয়াতে চায়। তা - ছাড়া গ্রামের মধ্যে কেস বলতে, চুরি মারপিট,কারেন্টের তারে হুকিং, মদ বিক্রি ,জুয়া খেলা কখনো বা আত্মহত্যা, সবসময় সবটা করা ও যায় না , ধরা ও যায় না , কিছু না কিছু চাপ তো আছেই । তবে আত্মহত্যা, আত্মহত্যার চেষ্টা এসব কেইস গুলোতেযেন পরেশবাবুর মজা হয়, কারণ প্রতিটি আত্মহত্যার পেছনেই কারণ ও গল্প লুক্কায়িত থাকে। এটা ও তার চাকুরীর অভিজ্ঞতা। বিকেল তিনটায় পরেশবাবু হাসপাতালে পৌঁছে । থানার জীপ গাড়ী নিয়ে সাথে দু -জন কনষ্টেবল নিয়ে এসেছে হাসপাতালে রুপালীর বাপের বাড়ীর লোকের জটলা নানাহ্ কথাবার্তা । রুপালীর বড়দিদি শেফালী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে বোনের দুর্দশা দেখে , শেফালীর স্বামী রমাকান্তবাবু স্কুলের শিক্ষক । উনি স্থানীয় সোনাতলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শেফালীর একছেলে, একমেয়ে দু -জনের স্কুলে পড়াশুনা করে। রুপালীর বড়ভাই ফোর্সে এ চাকুরী করে। বাড়ীতে নেই উনি বর্তমানে কাশ্মীরে। রুপালীর পড়েই ছোটভাই অনিমেষ। অনিমেষ রাগে ক্ষোভে আগুন হয়ে আছে। কেশবদেরকে ছাড়ব না বলে মাঝে মাঝে হুংঙ্কার ও দিচ্ছে। নরসিংগর থানার মেঝবাবু পরেশ রায় ডাক্তারের সহযোগীতায় রুপালীর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী নিয়ে নেন। রুপালীর শারিরীক অবস্থা ক্রমাবনতি ঘটেছে, যে কোন সময় মারা যেতে পারে। পরেশ বাবু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যান উঁচামুড়া গ্রামে সারাদিন খাওয়া নাওয়া হয়নি। রুপালীর জবানবন্দী সন্ধানে ও পরেশবাবু কাউকে কিছু বলেননি। এদিকে রুপালীর বাপের বাড়ীর লোকের উত্তেজনার পারদ ক্রমশর বাড়ছে। রুপালীর স্বামী কেশবকে কেউ খুঁজে পাচ্ছে না । রুপালীর ছোট ভাই বলে কতক্ষন পালিয়ে থাকবি। উঁচামুড়া কেশবদের বাড়ীতে গিয়ে সমস্ত কিছু ঘুটিয়ে দেখল পরেশবাবু । বাড়ীর উঠানে পোড়া মাটির সোদা গন্ধ, কেশবের শোবার ঘরে কেরোসিন , আর পোড়া কাপড় আর চামড়ার উদ্ভট গন্ধ, সিল্ক শাড়ীর পোঁড়া টুকরা ও খুঁজে পাওয়া গেল। মেঝবাবু পরেশ রায় মোটামুটি ওই গ্রামের আবাল - বৃদ্ধ বনিতা কাউকে বাদ দেয়নি দফায় দফায় জিজ্ঞাসা করেছে। হঠাৎ পরেশবাবু চোখে পড়েছে একটা ছেঁড়া খাতা খাটের নীচে পড়ে আছে।পরেশবাবু

খাতাটা কুড়িয়ে নিলেন তাতে যেন কি লিখা আছে। পরেশবাবু কেশবের ঘরটা ভাল করে দেখল। পোড়া কাপড়ের টুকরো , একটি দশ লিটারের মতো খালি জেরিকেন,খুলে শুঁকে দেখল, কেরোসিনের গন্ধ, ওটাকে জিপে তুলে নিল। কেশবের ঘরটা ও সিল করে দেওয়া হল। তারপরই পরেশবাবুর জীপ ছুটল হাসপাতালের উদ্দেশে । পরেশবাবু বুঝতে পারল সহসা থানায় ফেরা হবে না। রুপালীর বড়বোন শেফালী ফুপিঁয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অনেকে সান্তনা দিচ্ছে । রুপালীর ঘরে ঢোকার অনুমতি নেই কারও । পুলিশ দেখে অরুপ কেঁপে গেল বাবাকে আর বড়ভাই সদানন্দকে কেশবের ঘরের ডায়েরীর কথা জানাল অরুপ । এলাকার লোক আত্মীয় স্বজন সবাইকে জিজ্ঞেসাবাদ করে ---------
----- থেকে একসময় পরেশবাবু রুপালীর বড়বোনের জামাই রমাকান্তবাবুকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে যায়। পরেশবাবু জিজ্ঞেস করল, আপনার কি মনে হয় রুপালীর এই ঘটনাটুকু আত্মহত্যার ঘটনা। রমাকান্তবাবু দৃঢ় স্বরে বললেন, না কোন গর্ভবতী মেয়ে কেনই বা আত্মহত্যা করবে। কোন কারণ ছাড়া।

পরেশবাবু জিজ্ঞেস করল আপনি তাহলে কেস করবেন?

রমাকান্তবাবু বললেন আমিই তো সব নয় ওর ভাই পরিবারের লোক আছে, তাদের সাথে কথা বলে বুঝা যাবে।

আর কেস করলেই তো রুপালীর ফিরে আসবে না । সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রুপালী মারা যায় । কাউকে কিছু না জানিয়ে পরেশবাবু ঢুকে যায় রুপালীর ঘরে । সারা শরীর মলম লাগিয়ে হাল্কা সাদা কাপড় ঢাকা দেওয়া আছে। মুখের অবস্থা ও বীভৎস। মাথার চুলগুলো পুড়ে গেছে, পরেশবাবু মনে খুব কষ্ট হয় রুপালীর মুখের দিকে তাকিয়ে । মুখই মানুষকে পরিচিতি দেয়। শরীরের বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন পরিচিতি নেই। সকলেরই এক। ডেডবডি আর সার্টিফিকেট নিয়ে রাত দশটা নাগাদ সবাই বটতলা মহাশ্মশানে। সবাই এলো কিন্তু কেশব আসেনি। পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলো রুপালী। অপঘাতে মরা মানুষের শ্রাদ্ধশান্তি তিনদিন পরে হয় । পরেশবাবু আজ সাধারন পোশাকে হোটেল মালিক ননীরায়ের সাথে স্বাক্ষাৎ করে। ননীরায় বলেন স্যার কাউকে বলবেন না। ঘটনাটার কারণ শুধুই মিছিমিছি সন্দেহ। রুপালীর বড় ভাই মুকেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জোওয়ান তারই ছোটবেলার বন্ধু শিবজ্যোতি এবং সুকেশের মধ্যে প্রগাড় বন্ধুত্ব এবং পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। শিবজ্যোতি রুপালীকে মায়ের পেটের বোনের মতো স্নেহ করত। সে প্রায়শই আসত রুপালীর বাড়ীতে কারণ শিবজ্যোতি ওরকে শিবু সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর

জওয়ান এবং রুপালীর বাড়ীর কাছেই তার ক্যাম্প ছিল। ডিউটি না থাকলে সে বোনের কাছে এসে তাদের পরিবারের লোকজনদের সাথে কথাবার্তা বলে যেত । কেশবের এই ব্যপারটুকুই পছন্দ ছিল

না , রুপালী কেশবকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলো তোমার জন্য তো আমি ভাইকে বলতে পারবো না , আপনি আসবেন না। এনিয়ে প্রায়শই ঃ রুপালী এবং কেশবের মধ্যে বাকবিতন্ডা হতো । কেশবের আর একটা সন্দেহ ছিল শিবজ্যোতি এখানে এসেছে মাস ছয়েক হয়েছে , আর রুপালীর পাঁচ মাসের গর্ভবতী, তিনবৎসর পর রুপালীর পেটে সন্তান এসেছে। তাই কেশব রুপালীকে সন্দেহ করত হয়ত শিবজ্যোতির সাথে রুপালীর অবৈধ সর্ম্পক আছে । রুপালী এই কথাটুকু তার মৃতুকালীন জবানবন্দীতে মেঝবাবু পরেশরায়কে বলেছিল এবং আরো অনুরোধ করেছিল পরেশবাবু যেন শিবজ্যোতিকে এব্যাপারে কিছু না বলে,রুপালীর আরো বলে বড়ভাই মুকেশ আর শিবজ্যোতির মধ্যে কোন ফারাক নেই । শিবজ্যোতি মায়ের পেটের ভাই থেকে কোন অংশে কম নয় আর মুকেশ বলেছিল শিবু যখন ওখানে আছিস্ তুই রুপালীকে লক্ষ্য রাখিস্। রুপালী কেশবের প্রতিদিনকার ব্যবহার তার ঘরে থাকা পুরানো ডায়েরীতে সবসময় লিখে রাখত। ভাই বোনের সর্ম্পক এমন কালিমা লাগাবে স্বামী কেশব তা রুপালী কখনো ভাবতে ও পারেনি যার কারণে রুপালী কেশবের এই ঘটনাগুলো কখনো কাউকে বলেনি এমনকি নিজের বাপের বাড়ীর কাউকে ও বলতে পারেনি। রুপালী ভাবে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। শিবুদা ও তো আর বেশী দিন থাকবে না । কাজতালীয় ভাবে রুপালীর এই ঘটনার আগে দিন শিবজ্যোতি এখান থেকে বদলী হয়ে অন্যত্র চলে যায় । যাওয়ার সময় রুপালীর সাথে দেখা ও করে যায়, বলে যায় নিজের দিকে খেয়াল রাখিস্ রুপালী । কিন্তু কেশব জানে না শিবজ্যোতি বদলী হয়ে চলে গেছে। সে রাতে ও গভীররাত পযর্ন্ত কেশব এবং রুপালীর মধ্যে ঝগড়া হয় । ক্ষোভে অপমানে চুপ করে থাকে আর বলে পেটের এই সন্তানটির জন্য আমাকে বাঁচতে হবে নয়লে এই দুনিযায় আর থাকতাম না। মনে হয় এই সুযোগটাই কেশব বেছে নিয়েছিল পরদিন কেশব বাজার থেকে দশলিটার কেরোসিন কিনে অনেকক্ষন ননীরায়ের হোটেলে চুপচাপ বসেছিল। কেশব ননীরায়কে তাদের অশান্তির কথা বলেছিল । ননীরায় বলেছিল কেশব তুই মিছিমিছি রুপালীকে সন্দেহ করছিস্ কেশব বলে ননীদা তুমি বুঝবে না, তবু ও ননীবাবু বলেছিল কেশব মাথাগরম করে কোন কাজ করিস্ না। সাড়ে সাতটায় কারেন্টের লোডশেডিং এর সুযোগে কেশব ঘরে ডুকে এবং একটি মোমবাতি জ্বালায় রুপালীর ঘরে ডুকতেই দরজাটুকু বন্ধ করে দেয়, গ্রামের সন্ধ্যা সবাই যার যার ঘরে সুযোগ বুঝে কেশব রুপালীর মাথায় পুরো দশলিটার কেরোসিন ডেলে দেয়। মোমজ্বালিয়ে আগুন তো তৈরী ছিলো । কেশব রুপালীর সিল্ক শাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মূহুর্তে আগুন দাউ দাউ করে রুপালীর শরীরে জ্বলে উঠে, রুপালীর চিৎকার যেন বাতাসে মিশে যায়। রুপালীর সন্তান বাঁচানোর জন্য কেশবকে ঝাপটে ধরে রুপালীর শরীরের আগুনে কেশবের দুটো হাত ঝলসে যায় বুকে ও ক্ষত হয় তারপরই কেশব দরজা ঘুলে কেটে পড়ে। অগুনের হল্কা দেখে কেশবের বড়ভাই সদানন্দ আসে , প্রতিবেশীরা আসে । ততক্ষনে যা ঘটনার ঘটে গেছে, যদি ও সদানন্দ রুপালীকে বাঁচাতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে।

কিন্তু রূপালীকে বাঁচানো যায়নি ।থানার মেঝবাবু তদন্ত গুটিয়ে এনেছে, তাকে তক্কে তক্কে পনেরদিন কাটানোর পর একদিন খবর পেয়ে পরেশবাবু তেলিয়ামুড়ার এক মাসীর বাড়ী থেকে কেশবকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। কেশব ও ভয়ানক অসুস্থ। তার হাতে পচন ধরেছে। সে বলে উঠে স্যার আমি নির্দোষ ।আমি ভয়ে পালিয়েছি। সুচতুর তদন্তকারী পরেশবাবু থানায় এনে কেশবের সাথে দীর্ঘ আলাপচারিতার পর যখন ক্রমে ক্রমে ঘটনার সমস্ত আদ্যপান্ত বলতে শুরু করে তখনই কেশব ভেঙ্গে পড়ে। রুপালীর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী আর ডায়েরীর প্রতিদিনকার দিনলিপি কেশবকে মর্মাহিত করে তুলে কিন্তু তখন আর ভূল শোধরানোর সময় নেই পরেশবাবু জিজ্ঞেস করেন, কেশব তুমি কি অনুতপ্ত? কেশব ডুকরে কেঁদে উঠে বলে , স্যার আমার মিছিমিছি সন্দেহ আমার স্ত্রী হত্যার কারণ। স্যার আমি খুনী, সাজা আমার প্রাপ্য।

জীবনের যবনিকা

ছিনাইহানী গ্রাম আগরতলা এয়ারপোর্ট পৌছার আগেই শ্মশানের ডানদিকে লালমাটির মোটা রাস্তা ধরে দু পাশে জমি পার হযে খানিকটা উচুঁ টিলা অতিক্রম করে সুন্দর সাজানো গ্রামটুকু , সিঙ্গাবিল পঞ্চায়েতের অধিনে । দু পাশের জমিগুলোর শেষ প্রন্তে বড় এমটা পুকুর আছে । পুকুরের পূর্বদিকে খেতের শেষ সীমানায় প্রদীপ সরকারের বাড়ী , পুকুরটি ভট্টাচার্য্যদের পূর্বপুরুষদের তৈরী । পুকুরে সারা বৎসরই জল থাকে , পুকুরের মাছ আধাকিলোর উপর সাইজ হলেই ভট্টাচার্য্যেরা মাছগুলি চুক্তি সহকারে বিক্রি করে দেয় । কারণ মূল বাড়ীর বাইরে মাছ রাখা ইদানীং অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বিষদিয়ে মাছ মেরে ফেলে অথবা রাতে মাছ চোরেরা মাছ চুরি করে নিয়ে যায় ।পুকুরের পাড়ে বাঁশঝাড় ও গোটা কয়েক কলা গাছ । পুকুরের পারের উপরদিকে প্রয় একএকর জায়গায় আছে ভট্টাচার্য্যদের

বিশাল সেগুন বাগান । মাঝে বাগানের উচুটিলার খাদে ছোট ছোট অংশ ধানখেত ।খেতের ভিতর ছোট বড় ডোবাগুলো কাতির্তক মাসের শেষে শুকিয়ে আসে তাই এই ডোবাগুলোতে পাঠ ডোবানোর চলে না, স্থানীয় ক্ষুদ্র চাষী প্রদীপ সরকার ছিনাই এর খাল বেধেঁ সেখানে পাঠ গাছ ডোবাই । পাঁড়ার ছেলেবুড়োর দল শুষ্ক ডোবার খোলাজলে কই শিঙ মাগুর মাছ হাতড়ে বেড়াই । দৈবাৎ বড় মাগুর মাছ ধরা ও পড়ে । প্রদীপ খুব পরিশ্রমী মানুষ , দিন রাত ক্ষেত খেটে ভাল ফসল ফলায় , এ কথা গ্রমের সবাই জানে । আড্ডা, গপ্পো কিছুই নেই , কেবল সন্ধ্যায় গ্রামেব লোকদের সাথে বসে বাড়ীর উঠোনে হরিকীর্ত্তন করা ছাড়া, প্রদীপের ছোট সংসার , প্রদীপ তার বিধবা মা, স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রসন্তান প্রশান্ত । প্রশান্তের জন্মের পর প্রদীপ পুরো গ্রামকে নেমন্তন করে খাইয়েছিল । বড়দের কাছে হাতজোড় করে বলেছিল আপনারা সবাই তাকে আর্শীবাদ করুণ যাতে সে লেখাপড়া শিখতে পারে, আমার মতো না হয় । প্রশান্ত আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে , মা বাবার আদর তো আছেই সাথে ঠাকুরম্মার স্নেহ আদর । গ্রামের বালোয়ারী স্কুলের হাতে খড়ি । ক্রমেই বালোয়ারী স্কুলের গন্ডি পার হয়ে প্রশান্ত উষাবাজার এলাকায় খ্যাতনামা স্কুল " সুখময় বিদ্যানিকেতনে " ক্লাশ ওয়ানে ভর্ত্তি হয়। প্রতিদিন সকালে প্রদীপেব স্ত্রী পূরবী সকালে ছেলে প্রশান্তকে সাজিয়ে গুজিয়ে কপালে কালো কাজলের টিপ পড়িয়ে স্কুলে নিয়ে আসে । প্রদীপের ছেলে স্কুলে যায় তাতেই খুব খুশী । প্রদীপ মাকে বলে দেয় মা ঘরেরর গরুর দুধ এককোঁটাও বিক্রি করবে না । এই দুধ তুমি ও প্রশান্ত খাবে । চলতে থাকে প্রদীপের সুখের সংসার । ইদানীং প্রদীপ মাটির কোটা ঘর তৈরী করেছে উপরে দিয়েছে ঢেউটিন । এই ঘরের ভেতর ছেলের গৃহশিক্ষক পড়াবে বলে একটি ছোট্র আলাদা রুম করেছে । তাতে সাজিয়েছে টেবিল চেয়ার দিয়ে । প্রদীপের বুড়ো মা ও খুব খুশী । প্রদীপের ছেলে বড় হয়েছে এখন ক্লাশ ফাইভে পড়ে । একা একা স্কুলে আসে । প্রদীপ যেন গর্বিত পিতা । এরই মাঝে বয়োঃজনিত রোগে প্রদীপের মা জাহ্নবীদেবী মারা যান । যদি ও প্রদীপ ডাক্তার , বৈদ্য অনেক দেখিয়েছে কিন্তু এ তো সময় সবাইকে একদিন যেতে হবে । প্রদীন সাধ্যমতো মায়ের শ্রদ্ধা শান্তি , পরলৌকিক কাজ সব করেছে । পুরো গ্রাম নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে । আস্তে আস্তে প্রদীপের ও বয়স বাড়ছে ক্ষেত খামারে হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর ফলে প্রদীপকে বযসের তুলনায় একটু বেশী বুড়ো বলে মনে হয় তবে প্রদীপ কিন্তু ভেঙ্গে যাওয়ার মানুষ নই। ছেলের শিক্ষা প্রদীপের মনে আনন্দ যোগায় । ১৯৭৬ সালে প্রদীপের ছেলে প্রশান্ত সুখময় স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করে । প্রদীপ সাধ্যমতো সবাইকে মিষ্টিমুখ করান কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রদীপের যেন আশাভঙ্গ হয়ে যায় , ছেলে প্রশান্ত প্রদীপকে সাফ জানিয়ে দেই সে আর পড়াশুনা করবে না । পড়তে তার ভালো লাগে না , আর পড়েই বা কি হবে । ছেলের এই সিদ্ধান্ত প্রদীপকে ভয়ানক আশাহত করে , প্রদীপ মানষিক

দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ে কিন্তু বলবেটা কাকে? প্রদীপ দেখতে পায় ছেলে ১০ টা ১১টার আগে বাড়ী ফিরে না , তার এখন অনেক বন্ধু বান্ধব ।১দিন দু দিন বাদে বাদে মার কাছে টাকা পয়সা চাই ,না পেলেই গালমন্দ। এভাবে বেশ কিছুদিন কাটার পর প্রদীপ একদিন ছেলেকে ডেকে বলে দ্যাখ প্রশান্ত তোর যদি লেখাপড়া করতে ইচ্ছে না করে তবে বসে থেকে কি করবি, ক্ষেত গেরস্থী শুরু কর , এখন তো আর আমি আগের মতো খাটুনি খাটতে পারি না তুই যদি বাবা একটু হাত বাড়াস্ তবে তো ভালই হয় । সংসার ও ভাল চলে , তা ছাড়া আমি যা করেছি সব তো তোর জন্যই । কাজে একটু মন লাগা পরদিন দুপুরে প্রদীপ জমিতে, প্রদীপের স্ত্রী প্রমীলাকে রান্না ঘরে কাজ করছিল , এমন সময় প্রশান্ত ঘরে ঢুকে "মা" "মা" চিৎকার দিলে প্রমীলা বলে আমি রান্না ঘরে আছি, তুই এখানে আয় । প্রশান্ত রান্না ঘরের দিকে এক পা - দু- পা বাড়িয়ে আসতেই প্রমীলা বলে , প্রশান্ত ভাত খেয়ে যা প্রশান্ত মাকে বলে আমি ভাত খাব না যতক্ষন পযর্ন্ত তুমি আমাই কথা না দাও । প্রমীলা বলে কিসের কথা প্রশান্ত বলে আগে বলো তুমি আমার কাজটা করে দেবে কি না ?প্রমীলা বলে আমি কি কোন রোজগার করি নাকি রে, তোর কি কথা আগে বল, তবে আমি তোর বাবাকে বলব , প্রশান্ত বলে না তুমি বলো , তুমি দেবে কি না , তুমি বললেই বাবা রাজী নইলে আমি আর ভাত খাবো না । প্রমীলা বলে উঠে াগে বল্ । প্রশান্ত মায়ের হাত নিজের মাথায় চেপে ধরে বলে মা, আমার একটাই দাবী আর কখনো তোমাদের কাছে কিছু চাইবো না ।মায়ের মন নরম হয়ে যায় , প্রমীলা বলে ঠিক আছে তুই বল আমি তোর বাবাবে বুঝাব । প্রশান্ত বলে মা আমার দ্বারা ক্ষেত খামারের কাজ হবে না , আর দ্যাখ না বাবার পক্ষে ও এ কাজ বেশীদিন করা সম্ভব হবে না । যুগের সাথে তাল মিলিয়ে একটা ভাল সুযোগ আছে আগরতলা এয়ারপোর্ট থেকে আগরতলা পযর্ন্ত যদি একাকী অটো চালানো যায় তা হলে প্রতিদিন ভাল রোজগার হবে। আমাদের সংসারের ও কোন টানাপোড়ন থাকবে না তা -ছাড়া গাড়ী তো থাকবেই । প্রমীলার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয় কিভাবে প্রদীপকে ছেলের এ সব কথা বলবে। অন্যদিকে প্রশান্ত ও নাছোড় বান্দা। উভয় সমস্যাই প্রমীলা একদিকে স্বামী ভক্তি অন্যদিকে পুত্রস্নেহ কারণ প্রমীলা জানে প্রদীপকে এ সব বুঝানো চারটিখানি কথা না । যাই হোক ছেলেকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বলে তুই খেয়ে নে আমি তোর বাবাকে বুঝাব। প্রশান্ত বলে মা তুমিই পারবে বাবাকে বুঝাতে।প্রশান্ত নেয়ে খেয়ে চলে যাই । সন্ধ্যায় প্রদীপ ক্ষেত খামারের কাজ সেড়ে স্নান করে উঠোনে বসলে প্রমীলা কাকুতি মিনতির স্বরে স্বামী প্রদীপের পাশে দাঁড়ায় । প্রদীপ বলে উঠে কিছু বলবে নাকি বল্। প্রমীলা বলে কি ভাবে যে বলি , কথা দাও রাগ করবে না তবে বলতে পারি । প্রদীপ বলে বল্ বল্ প্রমীলা বলে প্রশান্ত বলেছে একটি অটোগাড়ী কিনতে রোজগার পাতি খারাপ হবে না । শুনেই প্রদীপ অগ্নিশর্ম্মা । বলে তাই তো লেখাপড়া ছেড়েছে । বেশ ,- অটোগাড়ী কিনব তো কিনুক না,

নিজের পয়সা দিয়ে । আমাকে জিজ্ঞাসার কি আছে । আর আমি পয়সা দেবো কোথেকে । আমার দু টুকরো জমি ছাড়া আছে টা কী আমাকে ও- সব কিছু বলো না , ওর যা ভাল লাগে তাই করতে বলো ।

রাত দশটায় ছেলে প্রশান্ত ঘরে আসে প্রমিলা ছেলেকে বলে , তোর কথা গুলো আমি তোর বাবাকে বলেছি, তোর বাবা বলে দিয়েছেন উনার কাছে দু - টুকরো জমি ছাড়া আর ফুটোকড়ি ও নেই সুতরাং উনার পক্ষে কিছুই সম্ভব না । যদি তুই পারিস্ তুই নিজে অটোগাড়ী কিনে নে্ । মায়ের কথা শুনে প্রশান্ত যেন ভেতরে ভেতরে তেঁতে উঠে , বলে মা তুমি বাবাকে জিজ্ঞেস কর উনি তো বলেছিলেন, আমি যতটুকু পড়তে চাই , উনি পড়াবেন , প্রয়োজনে ভিটে মাঠি ও বেচেঁ দেবেন । এখন আমি দাড়াতে চাচ্ছি, দুটো পয়সা রোজগার করতে চাচ্ছি তাতে উনার আপত্তি টা কোথায় ? প্রমীলা বলে তবে তুই পড়াশুনা কর না বাবা,
ছেলে প্রশান্ত বলে পড়াশুনা করে কি হবে বল্ মা, পড়াশুনা যা করার করেছি । এরবেশী প্রয়োজন নেই , আর আমি তো উনার জমি ,বাড়ী, বিক্রি করতে বলিনি , একটা লোনের জন্য শুধু উনার জমি কাগজ ব্যাঙ্কে দেখানোর কথা বলেছি । এ ব্যাপারে আমি ব্যাঙ্কের সতীশকাকুর সাথে কথা বলে ফর্ম ও নিয়ে নিয়েছি । এতটুকু যদি আমার জন্য তোমার করতে না পার তবে করবে টা কি ?

প্রদীপ পাশের ঘর থেকে মা ছেলের সব কথা শুনেছে , কিন্তু ছেলের মায়ের সাথে এই ঔদ্ধত্য প্রদীপের কাছে সীমাহীন বলে মনে হয় । প্রদীপ ভাবে এমন শিক্ষা তো আমরা প্রশান্তকে দেয়নি । তবে নতুন নতুন বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ছেলেটা দেখছি জাহান্নামে যাচ্ছে । প্রদীপ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ছেলেকে জিজ্ঞেস করে তুই কি ভাবছিস্ , তুই যা বলবি , যা করবি ,যা চাইবি,সব আমি মেনে নেবো, নিজের রোজগারে কর্ । কেউ বাধা দেবে না । পুনরায় প্রদীপ নিয়তার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে , কারণ প্রদীপের মনে ইচ্ছে ছিল ছেলেকে ভাল লেখাপড়া শেখাবে। কিন্তু প্রদীপের অন্তরাত্মা যেন প্রদীপকে বলে দিয়েছে । প্রশান্তের সিদ্ধান্তগুলো প্রচন্ডভুল। কিন্তু বাবা হিসেবে প্রদীকেরই বা কি করার আছে । বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান প্রশান্ত জানে মা বাবার দুর্বলতা । রাতে প্রদীপ সরকারের ঘরে কারো খাওয়া দাওয়া হয় নি । সকালে উঠে প্রশান্ত মাকে বলে, মা আমি বাড়ী ছেড়ে চললাম, আর কখনো বাড়ী ফিরে আসবো না । মায়ের মন, তার উপর একমাত্র সন্তান, মা প্রমীলা, ছেলে প্রশান্তের পিছু ধাওয়া করে । বলে বাবা তুই আমাদের ছেড়ে যেতে পারবি না । ছেলের এই কান্ড দেখে প্রদীপ হতবাক হয়ে যায় । মা ছেলের হাতে পায়ে ধরে ঘড়ে ফিরিয়ে আনে । স্বামী প্রদীপকে প্রমীলা বলে আমাদের সবকিছু যদি ওর হয়ে থাকে তাহলে ওর জন্য তোমার জমির কাগজ দিতে আপত্তি কোথায় । প্রদীপের কিছু করার ছিল না , লেখাপড়া

না জানলে ও প্রদীপ এতটুকু বুঝতে পারে সরকারী ভাবে তার জমি বন্ধক হয়ে যাচ্ছে, টাকা সঠিক সময়ে পরিশোধ করতে না পারলে জমি তার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। অনন্যোপায় প্রদীপ স্ত্রীর পরামর্শে রাজী হয়ে যায় । দু - দিন পর ছেলের সাথে গিয়ে কোর্টে এভিডেভিটে সই করে । তারপর ব্যাঙ্কে জমির কাগজ জমা দেয়, সই সাবুদ করে , ১৫ দিন বাদে দেখতে পাই ছেলে প্রশান্ত নতুন অটোগাড়ী নিয়ে বাড়ীতে এসেছে । মা বাবাকে প্রণাম করে রাত্রিতে প্রশান্ত এবার মায়ের মারফৎ না গিয়ে সোজাসুজি বাবারকাছে গিয়ে অবনতমস্তকে বাবকে বলে, বাবা এবার শেষ আর কিছু চাইব না , প্রদীপ বলে ,বাবা আমার আর আছে টা কি বল্ । প্রশান্ত বলে বাবা গাড়ী তো কিনে দিলে কিন্তু ট্রান্সপোর্ট অফিস থেকে কাগজ না দিলে এ গাড়ী তো রাস্তায় চালানো যাবে না । প্রদীপ বলে উঠে তবে আমাকে কি করতে হবে বল্ । প্রশান্ত বলে বাবা ঘড়ের বাছুরটা যদি বিক্রি করে দাও তবে তো কিছু টাকা পাওয়া যাবে। আমাকে ৮০০ টাকা দিলেই হবে । বাকী আমার লাগবে না । প্রদীপের বুকটা যেন ঠফাস্ করে উসঠ কারণ এই বাছুরটা সে যতন করে পালন করছিল আগামীতে জমির হালের জন্য কিন্তু কি করা যাবে, এখানে ও প্রদীপকে মুখ বুঝে ছেলের আবদার মেনে নিতে হল ।

কিছুদিন বাদেই প্রশান্তের অটোগাড়ী রাস্তায় নামল । প্রথম দিকে রাত নটা/দশটায় ছেলে প্রশান্ত বাড়ী ফিরে আসত । সংসারের খরচাপাতির দায়িত্ব ও নিজ কাধেঁ নিয়ে নেয় । দু তিন মাস ভালভাবে চলতে থাকে । প্রমীলা, প্রদীপকে বলে দ্যাখো আমার ছেলে যা করেছে ভালই করেছে । কিছুদিন বাদেই তোমাকে আর সংসারের চিন্তা করতে হবে না । প্রদীপ ক্ষীন স্বরে বলে উঠে " শেষ ভাল যার সব ভাল তার " প্রদীপ ছেলেকে এ ভাবে তৈরী করতে চাই নি ।

দিনের পর দিন কেটে যায় প্রশান্ত ও যেন দ্রুত গতিতে পাল্টিয়ে যাচ্ছে । মা প্রমীলা বুঝতে না পারলে ও প্রদীপের বাবা হিসেবে বুঝতে বিলম্ব হয়নি। প্রশান্তের চলাফেরা হাবভাব, প্রদীপের চোখে ভালো লাগে না । প্রদীপ দেখতে পায় এখন প্রশান্ত অনেক রাতে ফেরে , সংসারের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নেই । তার উপর প্রদীপের মনে হয় ছেলেটা দিনে দিনে নেশাগ্রস্থ হয়ে যাচ্ছে । প্রদীপ একদিন স্ত্রী প্রমীলাকে বলে দেখতে পাচ্ছো তোমার ছেলের হাবভাব ।প্রমীলা বলে উঠে আমি তো দেখছি আর ভাবছি যদি তাকে বিয়ে করিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় তবে মনটা তার সংসারে বসবে । প্রদীপ বলে উঠে দ্যাখো তুমি আর তোমার ছেলের ব্যাপার । আর একটা মায়ের কপাল যেন পোড়া না যায় । প্রদীপ ছেলের প্রতি এখন উদাসীন, জীবনের প্রতি ও উদাসীন , মানষিক অবসাদ গ্রস্থ পিতা।

মা প্রমীলার ব্যস্ততায় বাধ্য হয়ে প্রদীপ ছেলেকে বিয়ে করাতে রাজী হই, নির্দিষ্ট দিনে, সময় তারিখ দেখে প্রশান্তের বিয়ে ও ঠিক হয় । মায়ের নাম পূরবী রায় , বাবা মৃত ননীগোপাল রায়

সাকিন - উত্তর ত্রিপুরার জয়শ্রী । পূরবী দেখতে বেশ সুন্দর , লেখাপড়ায় পশান্তের মতো মাধ্যমিক পাশ। শান্ত মেয়ে মোটামুটি আরম্ভরতার সাথেই প্রদীপ ছেলে প্রশান্তের বিয়ে দেয় পূরবীর সাথে । আত্মীয় স্বজন , গ্রামের লোক সবাইকেই নেমন্তন্ন করে খাওয়াই প্রদীপ , ভাবে হয়ত ছেলে প্রশান্ত সঠিক ভাবে চলবে ওর স্ত্রী পূরবীকে নিয়ে সংসার সাজাবে । প্রথম মাস খানেক সংসার হাসি খুশীতে ভালই ছিল কিন্তু বিধি বাম ।তারপরই শুরু হল সংসারে অশান্তি ।রাত ১২ টা / ১টাই প্রশান্ত টলতে টলতে ঘরে ধিরে আসে ।নবাগত বৌ পূরবী দীর্ঘমেয় চুপ করে থাকে , প্রদীপপ্রমীলা সবই বুঝত । প্রায়শই ছেলেকে ডেকে আনত,বুঝাত তার পরিবর্তনের জন্য কিন্তু কিছুতেই কোন পরিবর্ত্তন আসছিল না । এরই মাঝে পূরবী পাঁচ মাসের অন্তস্বত্বা হয় পূরবীর ডাক্তার দেখানো থেকে শুরু করে যাবতীয় সমস্ত কিছু শ্বশুড় শ্বাশুড়ীই দেখাশুনা করতো । পূরবী বুঝে বোবা প্রণীর মতো থাকতেনা পেরে কখনো ও কখনো শ্বাশুড়ী প্রমীলাকে , প্রশান্তের আচার , ব্যাহার সম্পর্কে বলত । গ্রামের মানুষ বলতো প্রশান্ত দেবতার ঘরে অসুর জন্মেছে ।হঠাৎ একদিন দুপুরে প্রশান্ত বাড়ীতে নেই , ডাকযোগে চিঠি এল প্রদীপের বাড়ীতে প্রদীপেব নামে , প্রদীপতো চিঠি পড়তে পারে না, লজ্জায় ছেলের বৌ পূরবীকে ও বলতে পারে নি চিঠিটা পরে দিতে । তাই ছুটে যায় পাশের বাড়ীতে সেখানে গিয়ে ও নিত্যগোপাল বাবুর বড়ছেলেকে না পেয়ে নিত্যগোপালবাবুকে সাথে নিয়ে ব্যাংঙ্কে যান যেহোতু পিত্তুন বলেছিল চিঠিটা ব্যাঙ্ক থেকে এসেছে । ব্যাঙ্কে গিয়ে পরিচিত সতীশবাবুকে চিঠিটা দেখায় এবং জানতে চান চিঠি টুকুর বিষয়বস্তু কি ? সতীশবাবু মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়ে প্রদীপকে বলে আপনার ছেলে প্রশান্ত ব্যাংঙ্ক থেকে লোন নিয়ে

অটোগাড়ীটি কেনার পর মাত্র দুইটি ইনষ্টলমেন্ট দিয়েছে অর্থাৎ দুই কিস্তি টাকা দিয়েছে এরপর আর টাকা দেইনি এখন সুদে আসলে যে টাকা হয়েছে তা জমির মূল্যের দ্বিগুন এবং যেহেতু প্রশান্তের এই লোনের গ্যারান্টার প্রদীপ সেহেতু এক সপ্তাহের মধ্যে প্রদীপকে টাকাটা জমা দিতে হবে নহেতু প্রদীপের জমি ক্রোক হয়ে যাবে। শুনেই প্রদীপের চোখ বড় হয়ে যায় ।কোথা থেকে দেবে সে এত টাকা , হঠাৎ নিত্যগোপালবাবু দেখতে পান প্রদীপ ঢলে যাচ্ছে। নিত্যগোপালবাবু ধরে রাখতে পারেনি প্রদীপ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ।দৌড়ে আসেন ব্যাংঙ্ক কর্মচারী সতীশবাবু সহ ব্যাংঙ্কের অন্যান্য কর্মচারীরা সাথে সাথে নিয়ে যাওয়া হয় উনাকে আগরতলা জিবি হাসপাতালের ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে ।কর্তব্যরত ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া জানিয়ে দেন প্রদীপ আর নেই ।খবর পৌছে প্রদী পের ছিনাইহানী বাড়ীতে ।এলাকাবাসী ছুটে ছুটে আসে হাসপাতালে, সাথে নিয়ে আসে প্রদীপের স্ত্রী প্রমিলাকে ও কিছুক্ষনের মধ্যে ছুটে আসে প্রদীপের একমাত্র পুত্র প্রশান্ত ।এলাকার মানুষ শোকে ভেঙ্গে পড়ে , কারণ প্রদীপ ছিল অজাত শত্রু ।জীবনে কাউকে কখনো ছেলে প্রশান্তের গায়ে একটি চড় ও দেইনি।

প্রদীপের ঘরে কালোছায়া নেমে আসে, প্রমীলা শোকস্তব্দ নির্বাক হয়ে গেছে, পুত্র বধূ পূরবীর শুধু চোখে জল কিন্তু প্রশান্তের চোখে মুখে তেম ন কোন অনুশোচনা নেই, শুধু করে যাচ্ছে লোকদেখানো কর্তব্য। গ্রামের লোকের চোখের জলে ছিনাইহানী শ্মশানে শেষকৃত্য হয় প্রদীপের, গ্রামের লোক ছিঃ ছিঃ করতে থাকে প্রশান্তকে কিন্তু পরিবর্তন হয়নি প্রশান্তের । এলাকাবাসী মিলে প্রদীপের অকাল পরলৌকিক কাজ সম্পাদন করে । প্রদীপের মৃত্যুার চার মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই এক রাতে প্রমীলার হঠাৎ শুরু হয় বমি, বুকে প্রচন্ড ব্যাথা , ডাক্তার ও দেখানো হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না ভোরেরাতে প্রমীলা প্রাণত্যাগ করে । পুনরায় এলাকাবাসী প্রমীলাকে যথাযোগ্য মর্যাদাদিয়ে ছিনাইহানী শ্মশানে শেষকৃত্য করান প্রশান্তকে দিয়ে । মনে হল যেন এক যুগের অবসান। কাকতালীয় ভাবে এইদিন সন্ধ্যায় প্রদীপের পুত্রবধূ পূরবীর প্রসব ব্যাথা শুরু হয় । প্রশান্ত ঘরে ছিল না । পাশের বাড়ীর নিত্যগোপালবাবু ও উনার স্ত্রী পূরবীকে নিয়ে যায় হাসপাতালে । রাতে পূরবী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় । খবর পেয়ে প্রশান্ত হাসপাতালে আসে কিন্তু পুত্রদর্শনের মতো অবস্থায় সে ছিল না, মাতাল প্রশান্তকে বন্ধুরা ঘরে পৌছে দেয়। এ দিকে নিত্যগোপালবাবু ও উনার স্ত্রী সারারাত জেগে পূরবীর সেবা যত্ন করে পরদিন ঘরে নিয়ে আসে, প্রশান্তের স্তম্ভিত ফিরে আসে কিন্তু সে কি করবে , পকেটে তার পয়সা নেই , যার কারণে অটোগাড়ীটির ও মেরামত হচ্ছে না, বাবার ভিটেমাটি ও ঘর ছাড়া একটুকরো জমি ও নেই । ক্ষনিকের ভাবনা ভেবে ঐ দিন বিকেলে মাত্র ১৫ হাজার টাকার বিনিময়ে প্রশান্ত অটোগাড়ীটি বিক্রি করে দেয় । স্ত্রী, সন্তানের জন্য ঔষধ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে ঘরে আনে । মাসাধিক কাল প্রশান্ত ভাল ভাবে চলে , সবাই ভাবে মা বাবার মৃত্যু প্রশান্তকে পরিবর্তন এনে দিয়েছে । কিন্তু না যেই কপাল সেই মাথা । প্রশান্ত স্বরুপ ধারন করে , পুনরায় মাতাল হয়ে গভীর রাতে ঘরে ফিরে পারিবারিক দৈন্যদশা দিনে দিনে বাড়তে থাকে । এ ভাবে মাস ছ মাস যাওয়ার পর প্রশান্ত গ্রামে বাবার রক্তজল করা তৈরী বাড়ী বিক্রির প্রস্তাব দেই । কিন্তু গ্রামের কোন মানুষ প্রদীপের তৈরী বাড়ী কিনতে রাজী হয়নি বরংচ প্রশান্তকে অনুরোধ করে সে যেন তার বাবার পুরানো স্মৃতি টুকু বির্সজন না দেই কিন্তু কারো কথায় কোন কাজ হয়নি , প্রশান্ত ভিন গ্রামের এক ক্ষুদ্রব্যবসায়ীর কাছে একলাখ টাকায় বাবার শেষ স্মৃতিটুকু বিক্রি করে দেয় । চলে যায় ভাড়াবড়ীতে স্ত্রী সন্তান নিয়ে , প্রায় বৎসর কাল এই টাকাই চলার পর প্রশান্ত ভাবে কি করা যায় , সে স্ত্রী পূরবীকে বলে সে আপলাইনে অর্থাৎ আগরতলা গৌহাটী রাস্তায় সহকারী চালকের কাজ করবে। পূরবী বলে তুমি দূরে যেও না প্রয়োজনে আমি মানুষের বাড়ীতে ঝি এর কাজ করব। প্রশান্ত বলে না এ ভাবে তো চলবে না , ঘর ভাড়া, একমাত্র পুত্র প্রসেণজিৎ তার বয়স ও তো দুই বৎসর হয়ে গেলো , তার কথা ভেবে হলে ও কিছু কাজ করতে হবে। এখানে আমি কি কাজ করব, আমাকে বাধা দিও না ।

প্রশান্ত চলে যাই জাতীয় সড়কের পথে ট্রাকগাড়ীর সহ- চালক হয়ে । কোন মাসে একবার কোন মাসে দু -বার প্রশান্ত স্ত্রী সন্তানের কাছে আসে। এ দিকে পূরবী ও ঘরের বসে নেই , সে খুবভোরে উঠে গৃহক্রিয়া সম্পন্ন করে চলে যাই বাবুদের বাড়ীতে ঝি এর কাজ করতে । প্রশান্তের দেওয়া যৎসামান্য টাকা আর পূরবী রোজগারের পয়সায় কোনক্রমে ঘরভাড়া দিয়ে কোনক্রমে সংসার বাচাঁয় পূরবী । বাবার মতো প্রসেণজিৎ ও বালোয়ারী শেষ করে স্কুলজীবনে ডুকে পড়েছে । তার ও একটা খরচ আছে । শুরু হয় পূরবীর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম । বিয়ের পর থেকেই পূরবী কখনো সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখতে পায়নি। ভাবে ছেলে প্রসেনজিৎ বড় হলে হয়ত তার দুঃখ ঘুচবে। প্রসেনজিৎ যখন ক্লাস টু - তে পড়ে একদিন সন্ধ্যায় মোটরশ্রমিক অফিস মারফত মারফত খবর আসে গৌহাটির রাস্তায় এক যান দুঘটনায় প্রশান্ত মারা গেছে । চোখের জল ছাড়া পূরবীর করার কিছু ছিল না , স্বামীর দেহ এতদূর থেকে আনার আর্থিক ক্ষমতা ও ছিল না , যাই হোক গাড়ীর মালিক ও মোটর শ্রমিক অফিসের বদান্যতায ৫ দিন বাদে প্রশান্তের মৃতদেহ ছিনাইহানী আসে , চোখের জল , সিথিঁর সিদূরঁ, হাতের শাঁখা ভেঙ্গে পূরবী প্রশান্তকে শেষ বিদায় জানাই সেই ছিনাইহানী শ্মশানে । অবুঝ প্রসেনজিৎ বাবার মূখাগ্নি করে । গ্রামের লোকের সাহায্যে যৎসামান্যভাবে প্রশান্তের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় । যাই হোক, তবু ও তো ছিল স্বামী, পূরবীর মাথার উপর থেকে শেষ সম্বলটুকু ও শেষ হয়ে গেল। যৌবনে বিধবা পূরবী , অস্থি চর্ম সার পূরবীকে দেখলে মনে হয় মাঝবয়সী মহিলা । ছেলে প্রসেনজিৎ ছোট , কাচ করার বয়স হয়নি । এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরে বাবুদের বাড়ীতে ঝি ষর কাজ করে পূরবী অতি দৈন্যদশায় পূরবী পুত্র প্রসেনজিৎকে নিয়ে বেচেঁ আছে । ঘরভাড়া ঠিকভাবে দিতে না পারায় বাড়ীর মালিক গোপালবাবু পুবরীকে বলে এ ভাবে কতদিন বৌমা আমিও তো সচল মানুষ নয় , ভাড়া দিলে ঘরটা দু - টো পয়সা পাব । পূরবী কেদেঁ উঠে বলে, কাকা আমি ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাব। স্বামী হয়ে ও প্রশান্ত আমাদের জলে ভাসিয়ে চলে গেল । ভদ্র গোপালবাবু বলে ঠিক আছে আমার গোয়ালঘরের পাশের রুমটাতে তুমি থাকে , পয়সা দিতে হবে না । পূরবীর কাছে এটাই তখন স্বর্গভূমি । অন্তত ছেলেকে নিয়ে মাথা গুজা তো যাবে। প্রসেনজিৎকে স্কুলের স্যার , দিদিমনিরা বই,খাতা, কিনে দেয় । পূরবীর পক্ষে ছেলের মূখে ভাত যোগার করাই কষ্ট , ছেলেকে লেখাপড়া শিখাবে কি করে । এ ভাবে তিনটি বৎসর চলে যায় । প্রসেনজিৎ ও একটু বড় হয়ে ওঠে স্কুলে ক্লাস ফোরে উর্ত্তীন হয়েছে । অস্বাভাবিক পরিশ্রমে আর অর্ধাহারে অনাহারে পূরবী ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয় কিন্তু শরীরের যন্ত্রণা নিয়ে ও ঝি এর কাজ করে যায় একমাত্র পুত্র সন্তানের মূখের দিকে তাকিয়ে । হয়তো মুখ ফুটে বললে গ্রামের লোকের সাহায্য ও পেতো । কারণ এই গ্রামের বয়স্করা একটু অন্যরকম , গ্রামের মানুষের একের সাথে অপরের বোঝাপড়া ও ভাল । উপরন্তু পূরবী এই গ্রামেরই সৎ ব্যাক্তি

সবার প্রিয় প্রদীপের পুত্রবধূ সুতরাং যে জায়গায় পূরবী সাহায্য পেত এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই ।এই গ্রামের গরীব অংশের মানুষের বাস হলেও ওদের মন আছে, কিছু করার ইচ্ছা আছে । পূরবী কিন্তু কাউকে কিছু না বলে মুখ বুজেঁ ছেলেকে নিয়ে দিন যাপন করত ।হঠাৎ একদিন পূরবী রক্তবমি শুরু করে ঘটনাটুকু প্রথমে গোপালবাবুর স্ত্রী উমাদেবীর চোখে পড়ে । উমাদেবী গোপালবাবুকে ডেকে পাঠান , তখন শিশু প্রসেনজিৎ পাশের বাড়ীতে বসে টি, ভি দেখছিল, শিশু প্রসেনজিৎ টের ও পায়নি, তার মা অসুস্থ হয়ে গেছে, প্রয় সংঞ্জাহীন অবস্থায় গোপালবাবু ও গ্রামের লোক পূরবীকে হাসপাতালে নিয়ে আসে, প্রসেনজিৎ

ঘরে ঢুকে দেখে ঘরের মধ্যে, বিছানা ছোপ ছোপ রক্ত, মা নেই ঘরে । প্রসেনজিৎ "মা""মা" করে কেদেঁ উঠে। কারণ আজ সে মার সাথে কথা বলার সুযোগ ও পায়নি , মা যখন কাজ থেকে এসেছে তখন সে পাশের বাড়ীতে টি, ভি, দেখছে । উমাদেবী এসে প্রসেনজিৎকে জড়িয়ে ধরে বলে তুই কার্দিস্ না রে মার শরীর খারাপ করেছে দাদুভাই তারা তোর মাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। প্রসেনজিৎ বায়না ধরে সে মার কাছে যাবে, হায় অভাগা প্রসেনজিৎ কে নিয়ে যাবে তাকে হাসপাতালে। এদিকে পূরবীকে হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করে দেখে গোপালবাবুকে বলেন দেখুন আমাদের কিছু করার নেই ।একদম শেষ সময় ।সেলাইন পযর্ন্ত গ্রহন করছে না । গ্রামের অধিকাংশ লোক রাতে আর বাড়ী ফেরেনি, সবার একটাই কথা আরে অভাগী আমাদের তো বলতে পারতি , কেন এত অল্প বয়সে নিজেকে শেষ করে দিলি । কে দেখবে এখন তোর ছেলেকে। ভোরের আলো ফোঁটার আগেই পূরবী মারা যায় । গ্রামের লোক হতভাগী পূরবীকে নিয়ে আসে গোপালবাবুর বাড়ীতে কারণ ছেলে ছাড়া পূরবীর তো আর কেউ নেই । হতভাগা প্রসেনজিৎ মায়ের সাথে শেষ কথাটুকু ও বলতে পারে নি । একপলকে প্রাণহীন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে । কি - ই বা করার আছে । স্বামী শশুর , শ্বাশুড়ী র সেই একই ঠিকানায় ছিনাইহানী শ্মশানেই পূরবীর দেহ সৎকার হয় । অবুঝ প্রসেনজিৎ মায়ের মুখাগ্নি করে। অঘুম রাত আর সারাদিন ক্লান্তিতে গ্রামের লোক পূরবীর দেহ সংকারের পর ঘরে ফিরে যায় । রাজপথে ধারে শ্মশানের কালিমন্দিরে মাথানীচু করে ঠাই বসে থাকে প্রসেনজিৎ , বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে যায় , প্রসেনজিৎ মাথা গুজে শ্মশানে কালী মন্দিরে বসে থাকে । শ্মশানের বৃদ্ধ ডোম দশরথ দশরথ দেখতে পায় একটি বাচ্চা ছেলে " মায়েব মন্দিরে বসে আছে । সেই দুপুর থেকে দশরথ এক পা দু -পা করে এগিয়ে যায় , জিজ্ঞেস করে এই ছেলে কখন তোর মাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লোক ঘরে চলে গেছে , তুই এখানে কি করছিস্ । ঘরে যা, প্রসেনজিৎ ক্ষোভে দুঃখে বলে উঠে কোথায় যাব বাবা ! আমার বাবা নেই মা নেই , কোন ঘর বাড়ী নেই , কোথায় যাব বলতো । প্রসেনজিৎ এর মুখ তেকে সমস্ত ঘটনা শুনে দশরথ ডোম বলে তবে কি

তোর কোন আত্মীয় পরিজন ও নেই । প্রসেনজিৎ বলে না , আমি কখন ও দেখিনি । দশরথ বলে তাহলে কি করবি বল প্রসেনজিৎ বলে উঠে বাবা আমাকে তোমার কাছে থাকতে দেবে । দশরথের মন গলে যায় বলে তুই পারবি আমার সাথে থাকতে । খুশী হয়ে প্রসেনজিৎ বলে থাকব বাবা । ঠিক আছে তাহলে ামার সাথে থাক্ , আমি তো রোগগ্রস্থ মানুষ বিয়ে থা ও করিনি । তুই ই তাহলে আজ থেকে আমার সম্বল , আর দশরথ বলে উঠে দ্যাখ ব্যাটা অত বড় নাম প্রসেনজিৎ আমার মনেও থাকবে না । আমি দশরথ তুই আমার ছেলে রাম, আর কোন পরিচয় আমি জানতে চাই না । ঐ দিন থেকে প্রসেনজিৎ বদলে রাম ওরফে রামু ডোম হিসাবে। শ্মশানের কালী মন্দিরের উপর শ্মশান কমিটির তৈরী ইটের দেওয়ালে টিনের ছানি দিয়ে তৈরী ঘর রামুর ঠিকানা , সাথে আশ্রয়দাতা বাবা দশরথ । প্রতিদিন শ্মশানে যে পয়সা পাওয়া যায় তাতে রামু ও দশরথের দি ন কোনক্রমে চলে যায় । রামু বড় হয়ে উঠলে শ্মশানের ডোমের কাজটুকু দশরথ রামুর কাছেই সপেঁ দেয় মগ সারাদিন মদ্ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে দশরথ , আবার সন্ধ্যায় বন্ধুদের নিয়ে মন্দিরের পাশের বটগাছের নীচে গাঁজার আসর জমায় । রামুর কাছে দশরথের এই কাজকর্ম পছন্দ হত না কারণ রামু তার মায়ের মুখ থেকে শুনেছে তার বাবা প্রশান্তের কারণে তাদের পুরো পরিবার শেষ হয়ে গেছে   । রামু প্রায়ই দশরথকে বারণ করত নেশা না খাওয়ার জন্য । দশরথ হাসত আদর করে বলত ব্যাটা রামু আমার জন্য তুই চিন্তা করিস না আমার কিছু হবে না । এ ভাবেই চলতে থাকে দশরথ / রামুর সংসার । রাজপথ ধরে ছেলে মেয়েরা স্কুলে কলেজে যায় , দেখে রামুর খুব দুঃখ হয় । যদি মা বাবা থাকত তাহলে আমি ও পড়তাম । রামুর ভাগ্যে তা হল না । দশরথ কখনো ও কখনো দুষ্টুমি করে বলে, রাম তোকে আমি বিয়ে দিয়ে দেব। রামু মনে মনে হাসে, ভাবে আমি রামু ডোম কে দেবে আমার কাছে মেয়ে । রামুর চোখে সবসময় মায়েরপ্রতিছবি ভাসে, রামু দেখতে পায় তার মায়ের মতো এক মহিলা প্রায়ই শ্মশানের সামনে দিয়ে যায় । একদিন সাহসে বুক ভর করে রামু জিজ্ঞেস করে মাসী তোমার বাড়ী কোথায় ? তোমার নাম কি ? মহিলা সহাস্যে বলে আমার নাম পুষ্প , রামু বলে মাসী তোমাকে দেখলে আমার মায়ের কথা মনে হয়। প্রায় প্রতিদিনই রামু পুষ্প মাসীর সাথে কথা বলে । রামু জানতে পারে মাসী পুষ্প কোন ধনী বাড়ীতে ঝি এর কাজ করে । রামু লক্ষ্য করে মাসী যেন দিনে দিনে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে । একদিন রামু জিজ্ঞেস করে মাসী তোমার শরীরটা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে । পুষ্প বলে রামু বড় হলে বুঝবি, ওসব মালিকদের আসল চেহারা কি ? রাত্রিতে কোন লাশ এলে সাধারনত দশরথই দাহ করে । ঐ দিন ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে রাত ১০ টা হবে একটা জীপ গাড়ী নিয়ে এক ভদ্রলোক একদল যুবক সহ শ্মশানে আসে বলে দশরথ কোথায় , রামু বলে বাবার শরীর ভাল না , জ্বর এসেছে , তবে লাশ জ্বালাবে কে রামু বলে আমি আছি । তবে কখন আসবেন।

ভদ্রলোক বললেন একটু রাত হবে । রামু জানে গভীর রাতের লাশ একটু সমস্যা থাকে রামু বলে ভদ্রলোককে কত দেবেন । ভদ্রলোক বলে ৫০০ (পাচঁশত) টাকা । রামু খুশী হয়ে রাজী হয়ে যায় । রাত প্রায় দু - টো ঐ জীপ গাড়ীটা সাথে ভদ্রলোক এবং ৮/১০ টা শন্ডা চেহারার ছেলে শ্মশানে আসে এবং দ্রুত গতিতে লাশ নামিয়ে আনে । রামুকে বলে দ্রুত শ্মশান জ্বালা , ভদ্রলোক রামুকে পাচঁশত টাকা হাতে গুজে দেয় বলে প্রয়োজনে আরো টাকা পাবি তাড়াতাড়ি কর । রামু শ্মশান সাজাতেই শন্ডা ছেলেগুলো লাশ শ্মশানে তোলে। রামু সামনে এসেই লাশ দেখে বলে আমি এ লাশ জ্বালাতে পারবো না । রামু দেখতে পায় কোমরের নীচে.শাড়ীতে ছোপ ছোপ তাজা তাজা রক্ত । রামু চিৎকার দিয়ে চেচিঁয়ে বলে আমি এ লাশ জ্বালাব না । সবাইকে বলে দেব । ভদ্রলোক রামুকে ধমক দিয়ে বলে তোর কতটাকা চাই । রামু বলে এই নিয়ে যাও তোমার টাকা চাই । রামু বলে এই নিয়ে যাও তোমার টাকা । রামু দেখে তার মায়ের মুখের সেই মাসী পুষ্প নিস্প্রান দেহ নিয়ে শ্মশানে শুয়ে আছে । ভদ্রলোক আদেশ করে লাশ তোরা জ্বালিয়ে নে । গভীর রাতে রামুর কথা শোনার লোক কেউ নেই। শান্ডা ছেলেগুলে তাড়াতাড়ি করে কেরোসিন ঢেলে লাশ জ্বালিয়ে দেয় তারপর কখন চলে যায় , রামুর আওয়াজ ও আর নেই । সকালে বৃদ্ধ দশরথ , রাম রাম করে খুঁজতে খুঁজতে দেখে রামুর নিস্প্রান দেহ লাশ হয়ে ছিনাইহানীর খালে ভাসছে। জীবনের যবনিকা।

মৃত্যু রহস্য

রাজধানী আগরতলা থেকে বাসে চেপে সাতকিলোমিটার দক্ষিণে সূর্য্যমনি নগর গ্রাম। শহরতলী এলাকা । বাসস্টপেজ থেকে পায়ে হেটে চার কিলোমিটার দূরত্বে সুকান্ত কলোনী । এই কলোনীতে কোন লোক কখনও খবরের কাগজ ও কেনেনি । সীমান্ত গ্রাম, কাঁটাতারের বেড়া পেরোলেই বাংলাদেশ, ওপারের গ্রামের নাম কসবা । এই সুকান্ত কলোনীর লোকদের অভিভাবক হলেন হারাধন রায়। তিনি শিক্ষক ছিলেন বর্তমানে রিটায়ার্ড । এলাকার কৃষিজীবি মানুষের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান । হারাধনবাবুর দুইমেয়ে এক ছেলে । মেয়ে দুটো বড় । বড়মেয়ের নাম মাধবী, ছোট মেয়ের নাম পূরবী। দুই মেয়ের পর ছেলে । হারাধন মাষ্টার ছেলের নাম রাখেন পুলকেশ। পুলকেশ ছোটবেলা থেকেই গুরু গম্ভীর স্বভাবের ছেলে ছিল। হারাধন বাবু মাধবী , পূরবীকে লেখাপড়া শিখিয়ে পাত্রস্থ করেছেন । পূরবীর বিয়ের দুইমাস পর হারাধনবাবু কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নেন। রিটায়ার্ড জীবনের পয়সা দিয়ে কোনক্রমে মেয়ে বিয়ের ঋন পরিশোধ করেন । পুলকেশ তখন অষ্টমশ্রেণীর ছাত্র । হারাধন বাবুর স্ত্রী সুনীতাদেবী একমাত্র পুত্র পুলকেশের লেখাপড়া করানোর কথা ভাবতে ভাবতে

যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েন। অবশ হয়ে যাওয়া পা দুটোকে কোনক্রমে টেনে নিয়ে প্রতিদিন চলে রান্নাঘরের কাজ ।সুনীতাদেবী ভাবে পুলকেশকে তো মাথা গোঁজার মতো মাথার উপর ছাদ বানিয়ে দিতে হবে । এ যে আমাদের কর্তব্য । সুনীতাদেবীর চোখে ঘুম আসে না । জানালা দিয়ে বাইরে তখন বাঁশ গাছের মাথার কাছে উঠে এসেছে চাঁদটা । নিশুতি রাতে একটানা ডেকে চলেছে ঝিঁ ঝিঁ পোকারা । হঠাৎ করে যেন সুনীতাদেবীর বুকের উপর দিয়ে আর্ত চিৎকারে ফালা ফালা করে দিয়ে গেল এক পাখী , অন্ধকার রাতের নিঝুমতা । ছেলে পুলকেশ গভীর নিদ্রায় । সুনীতাদেবী অস্বস্তি বোধ করল । তারপর ও চাপাউত্তেজনার মধ্যে ভোররাতের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সুনীতাদেবী । ঘুম ভেঙেছে একটু বেলা করে , ঘুম থেকে উঠে সুনীতাদেবী কিছুটা স্বস্তি বোধ করল । গতরাতের ভাবনা আর আতঙ্কের কোন ও চিহ্ন নেই । প্রখর সূর্যের আলো, ঘরের আশে পাশে ঝোপ ঝাড়ে আনাচে কানাচে পরম নির্ভরতার আশ্বাস । কোথাও কোন সন্দেহ নেই আতঙ্ক নেই । চোখ গেল সামনে সীমান্তের দিকে , দেখতে পেল নিষ্কলঙ্ক

মাটির উপর খুঁটি দিয়ে তার জড়িয়ে বেড়া দেওয়া হচ্ছে । কাটা পরে গেছে নীল , লাল সাদা ফুলের গাছগুলো , বাতাবি লেবু গাছ গুলো কাটা পড়ে গেছে কিন্তু লেবুর মনভোলানো সু- গন্ধ সুনীতাদেবীর নাকে লেগেছে । জির জির করে কাঁপছে হালকা

হাওয়ায় বেড়াঝোপের হলুদ সবুজ পাতাগুলো । এতসবকিছু সুকান্ত কলোনীর লোক

কিছুই জানে না । ভর দুপুরে পুলিশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর লোকজন সহ কতিপয় অফিসার সুকান্ত কলোনীতে আসে , গ্রামের অন্যান্য বাড়ীর পাশাপাশি হারাধন মাষ্টারে বাড়ীতে ও যাই , সরকারী লোক বলে গেল সীমান্তের বেশ কিছু বাড়ী সীমান্তের তার কাঁটার বাইরে চলে যাবে । পিতৃপুরুষের ভিটে হারাধন মাষ্টারের, রিটায়ার্ড লাইকে স্ত্রী পুত্র নিয়ে কোথায় যাবে ভাবতে ভাবতে হারাধন বাবুর চোখে মুখে আদিম হিংস্রেতা ফুটিয়ে বন্য জন্তুর মতো মনের ভেতরে চাপা গর্জুন উঠতে লাগল । মুখে শব্দবিহীন হারাধন চোখে এক পৈশাচিক ক্রুরতা ফুটে উঠেছে । না নেয়ে, না খেয়ে হারাধন বাবু ছুটলেন একাকী সরকারী দপ্তরে ,বলে গেলেন কিছু একটা না করে আসবো না । একাকী সুনীতাদেবী আর ছেলে পুলকেশ । সুনীতাদেবী ভাবে জীবনের ঝড় - ঝাপটা থেকে বাঁচতে যার ছায়ায় তাদের আশ্রয় সেই হারাধন বাবু গুমরে গুমরে ঝড়ের চেহারা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল , জানি না কখন ফিরে আসে । দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা , ঘরে ফেরা পাখিরা শেষ পর্বের আলাপচারিতায় ব্যস্ত রাতের আহ্বানে বাঁশবন জুড়ে ঝিঁঝিঁ পোকার নিরলস ডাক । এমন সময় আততায়ীর মতো নিস্তব্দ ভাবে ঘরের দরজায় টুং টুং শব্দ । সুনীতাদেবী দরজা ঘুলেই দেখতে পেল হারাধন বাবুর শান্ত অবাক চোখ, যাতে নেই কোন ক্রুরতা , হিংস্রেতা , কিন্তু প্রচন্ড ক্লান্ত আর হতাশার চিহ্ন স্পষ্ট । সীমান্ত গ্রামের গ্রাম্য

প্রকৃতির কলতান যেমন দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় তেমনি হারু বাবুর কণ্ঠস্বর যেন আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে গেছে । শুধু বলে উঠে বাড়ীটা আমাদের ছাড়তে হবে। মনে হয় আমার জীবনে গভীরতর অসুখ এখন যাই হোক টানাপোড়া তো থাকবেই হারাধনবাবু সুকান্ত কলোনীর সীমান্ত পার থেকে দু কিলোমিটার সরে টিলাভূমিতে নতুন বসত ঘর করে নতুন ঠিকানা গড়লেন, যদি ও তাতে সরকারী অনুদান ও কিছু পেয়েছিলেন । দু বৎসর পর হারাধন ও সুনীতাদেবীর একমাত্র পুত্র পুলকেশ মাধ্যমিক খুব ভাল রেজাল্ট করে । বিজ্ঞান নিয়ে রাজধানীতে ভর্ত্তি হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে কিন্তু হারাধন বাবুর তখন অস্তমিত সূর্য্য , আবার একমাত্র ছেলের শিক্ষার আবদার । মাধবী , পূরবী দু বোন বাপের বাড়ীতে আসে বা বাবাকে দেখতে , উপরন্তু ছোট ভাই পুলকেশ ভাল রেজাল্ট করেছে তাকে ও তো কিছু উপহার দিতে হয় । পুলকেশ দুই দিদিকে বলে উঠে দিদি তোদের তো বাবা পড়িয়েছে , বিয়ে দিয়েছে এখন তো বাবার কাছে আর কিছু নেই । উপরন্তু সীমান্তের বসত বাটি ও তো তার কাঁটার বেড়ার মধ্যে পড়ে গেছে , তাহলে আমার পড়ার কি হবে । আমার ইচ্ছে আগরতলায় কোন ভালস্কুলে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করার কিন্তু কে চালাবে আমার পড়াশুনা ? তোমরা যদি কিছু সাহায্য করো তবে আমি বড় হয়ে রোজগার করে তোমাদের অর্থ পুনরায় ফেরৎ দিয়ে দেবো । বড়দিদি মাধবী বলে উঠে ভাই তোকে অতো কথা বলতে হবে না , আমি তোর পড়ার খরচ চালাবো। পূরবী বলে উঠে ভাই তুই উচ্চমাধ্যমিকে ভাল রেজাল্টকর তবে তোর কলেজে কড়তে আমি তোকে সাহায্য করবো । দুই মেয়ের কথায় হারাধনবাবু ও সুনীতাদেবী প্রচন্ড খুশী হলেন এবং নিজেদের গর্বিত বোধ করেন । পুলকেশ বড়দির সাহায্যে আগরতলায় বিজ্ঞান নিয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয় এবংএকাগ্রচিত্তে পারিবারিক টানাপোড়নের কথা মাথায় রেখে ভালকরে পড়াশুনা করে । এইচ, এস পরীক্ষা দেওয়ার পর পুলকেশ নানাহ কম্পিটেটিভ পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করে সাথে ২/১ টি টিউশনি ও করত পুলকেশ। মে মাসে পুলকেশের এইচ , এসের রেজাল্ট বের হয় , পুলকেশ খুব ভাল রেজাল্টকরে পাশাপাশি পুলকেশ কলকাতাতে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ও ভর্ত্তির সুযোক পায় কিন্তু প্রশ্নটা হল এই ব্যায়বহুল পড়াশুনাটা করাবে কে ? বাবা হারাধন রায় বুঝত ছেলে পুলকেশ উচ্চশিক্ষিত হতে চায় এবং তার উচ্চাকাঙ্খা আছে । রাতজাগা তার অভ্যাস , রাতজেগে পড়াশুনা করে , সে প্রচন্ড ডিটারমাইন্ড। ছেলের সাফল্য বাবা হারাধনবাবুকে মনে আনন্দ দিলে ও দেখলে মনে হয় জীবনের প্রতি পদে ব্যর্থ হওয়া মানুষের মতো । হারাধন বাবুর ছোট মেয়ে কমিটমেন্ট অনুযায়ী বাড়ীতে এসে হারাধন বাবুকে বলে " বাবা" আমি পুলকেশের ভর্ত্তির জন্য কিছু টাকা জোগার করেছি কিন্তু এখন তোমার জামাই এর ব্যাবসা খুব খরাপ চলছে তাই সম্পূর্ন ব্যাবস্থা করতে পারছি না । নির্বাক দৃষ্টিতে বাবা হারাধন বাবু ছেলে পুলকেশের দিকে তাকিয়ে থাকে। হারাধন বাবু

প্রেসারের রুগি । কষ্ট করে ছোটমেয়ের সাহায্যে, সুনীতাদেবীর যৎসামান্য সোনাদানা বিক্রি করে, কিছুটা ঋ ন করে হারাধনবাবু ছেলে পুলকেশকে কলকাতাতে ইঞ্জিনীয়ররীং এ ভর্ত্তি করান । পুলকেশ যে করেই হোক ফ্রি স্টুডেন্টশিপ, ফ্রি হোষ্টেল অ্যাকোমোডেশন পেয়েছিল এ ছাড়া টিউশনি ও কিছু কিছু করত । এ ভাবেই পুলকেশ পড়াশুনা চালিয়ে যেতে শুরু করে । সংসারের টানাপোড়ন , ছেলের পড়াশুনা আর জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে নিস্তব্দ হারাধন বাবু অসুস্থ হয়ে পড়ে । বড়মেয়ে মাধবী , ছোটমেয়ে পূরবী নিজের সংসার, সন্তান সামলে এখন আর আগের মতো বাপের বাড়ীতে ও াাসতে পারে না । আর্থিক সাহায্য ও করতে পারে না ফলত হারাধনবাবু নিজেকে বড্ড নিঃসঙ্গ ভাবে এবং হতাশা গ্রস্থ হয়ে
পড়েন। উপরন্তু ছেলের টেনশন তো আছেই। সুনীতাদেবী ঘরে একা অসহায় নারী একদিন দুপুরে সুনীতাদেবী পারিবারিক কাজে পাশের বাড়ীতে যাই । যাওয়ার সময় দেখতে পাই হারাধনবাবু ঘুমোচ্ছে। সুনীতাদেবী ভাবে দরজা হাট করে খুলে রাখলে কুকুর বেড়াল ঘরে ডুকতে পারে এই ভেবে শোবার ঘরে শেকল লাগিয়ে পাশের বাড়ীতে যাই , কিছুক্ষন বাদে সুনীতাদেবী বাড়ী ফিরে আসেন, শোবার ঘরের দরজায় কান পেতে কোন শব্দ পেল না সুনীতাদেবী , হারাধনবাবু ঘুমালে নাক ডাকেন কিন্তু "না" নাক ডাকার শব্দ ও হচ্ছে না । সুনীতাদেবী শেকল খুলে নিঃশব্দে সামান্য ফাঁক করল দরজাটা। দেখতে পেলেন হারাধন বাবু একইভাবে শুয়ে আছেন । বুকটা খুব ধীরে ধীরে ওঠা নামা করছে । হারাধনবাবু অচৈতন্য। সুনীতাদেবী অচেতন হারুবাবুকে
দেখে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। আস্তে করে মাথার নীচে বালিশ দিয়ে উঁচু করে দিলেন এবং পাতলা চাদর টেনে শরীরের অর্ধেকটা ঢেকে দিলেন , ভাবলেন ক্লান্ত বলে হয়ত ঘুমিয়ে আছেন, ডাকলে বিরক্ত হবেন । কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে হারুবাবুর সাড়াশব্দ
নেই । সুনীতাদেবীর কাছে বাইরের নিঝুম অন্ধকারটা মনে হল যেন খানিক হকচকিয়ে থমকে গেছে।

সুনীতাদেবী ফিরে এল হারাধনবাবুর কাছে । হারাধন বাবুর শিয়রের কাছে বসে পলকহীন চোখে চেয়ে রইল হারাধন বাবুর নিস্পাপ মুখের দিকে তারপর হঠাৎ হারাধনবাবুর স্পন্দনহীন বুকে হঠাৎ মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল । সহায় সম্বলহীন অসহায় সুনীতাদেবীর চিৎকারে ঘরের বাইরে মাঠের পারে দূর দিগন্তে ফিকে রং ধরেছে । হারাধনবাবুর বাড়ীর সামনে জটলা, এলাকার স্বজ্জন লোকহিসেবে সবাই শোকে বিহ্বল । খাটের উপর হারাধন বাবুর নিস্প্রাণ দেহ । হারাধন বাবুর অসাড় পায়ে মাথা দিয়ে উ পুড় হয়ে পড়ে আছে সুনীতাদেবী । কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে তার শরীর। সুনীতাদেবী মর্মভেদী কান্নার অনুরণনে সিরসিরিয়ে উঠছে গোটা গ্রাম । এভাবেই রাত্রটা কাটিল, পরের দিন খবর পৌছে গেল হারাধনবাবুর মেয়ে মাধবী, পূরবীর কাছে । মাধবী, পূরবী স্বামীদের

নিয়ে ছুটে আসে , সবাই অপ্রস্তুত কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করে ফাঁকি দেওয়ার ছলে হারাধনবাবু চলে গেলেন , অনেক পুরানো শিক্ষক সহকর্মী ও এলেন এরই মধ্যে একজন সহকর্মী শিক্ষক অরুপবাবু বলে ফেললেন, হারাধনবাবু ওয়াজ আ পারফেক্ট জেন্টলম্যান । হি সাফারড মেন্টালি। একমাত্র ছেলে পুলকেশের জন্য হারাধনবাবুর দেহ পরদিন দুপুর গড়িয়ে গেল । বিকেলের বিমানে পুলকেশ এসে পৌছায় । বাবাকে শেষশ্রদ্ধা জানায় । গুরুগম্ভীর অথচ অশ্রুসজল নয়নে বাবার সৎকার করে গ্রামীন শ্মশানঘাটে বুড়ীমা নদীর ধারে । শ্মশানে হাজারো মানুষের ভীড় । বাবার সৎকারের পর পুলকেশ মাকে বলে মা আমি আর ফিরে যাবো না হারাধনবাবুর সহকর্মীরা, অরুপবাবু সবাই বলে উঠে , পুলকেশ তুই পাগল হয়েছিস্ নাকি? আর একটা বৎসরের জন্য জীবনটাকে হেলায় ফেলে দিবি । প্রয়োজনে আমরা চাঁদা করে তোকে সাহায্য করবো । সবাই বুঝানো সুজানোর পর পুলকেশ রাজী হয়। বাবার শ্রাদ্ধ শান্তির পর মাকে বড়বোন মাধবীর মাড়ীতে রেখে পুলকেশ কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। মনোযোগ দিয়ে শুরু করে পড়াশুনা আর মায়ের একটি কথা সবসময় মনে পড়ে “ মা বলেছিলো পুলকেশ দেখিস বাবা্ তুই কিন্তু তোর বাবার মতো ফাঁকি যাস্ নে। তোর অভাগী মায়ের কথা মনে রাখিস্। পুলকেশ মানুষের কাছ থেকে নিজেকে সবসময় গুটিয়ে রাখত কারণ হালফ্যাশানের ছেলে মেয়েদের কাছে সে নিজেকে অবাঞ্চিত অনুভব করত । ইঞ্জিনীয়ারীং ফাইন্যাল ইয়ারে পুলকেশ একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরী পেয়ে যায় । শেষ ফাইন্যাল পরীক্ষার পরের দিন সে চাকরীতে জয়েন করে । তারপর থেকে পুলকেশ আরো একাকী হয়ে যায়। কলেজ জীবনে এক আধজন বন্ধু হয়েছিল এখন সেই কোন বন্ধু ও পুলকেশের নেই। অফিসে ও নতুন করে কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়নি । নতুন চাকুরীর পর পাঁচদিনের ছুটি পেয়ে পুলকেশ.বাড়ীতে মা ও বড়বোনদের সাথে দেখা করে যাই ষবং তার নতুন চাকুরীর সুসংবাদটুকু শোনাই এ ও বলে যায় দিদি আস্তে আস্তে দেখি কি করা যায় । একা ফ্ল্যাটে নিঃসঙ্গতায় পুলকেশ হাঁপিয়ে উঠে । ফ্ল্যাটখানি ও ভাড়া । ফ্ল্যাটের মালিক পাশেই এক সু-সজিতফ্ল্যাটে থাকেন । উনি একজন প্রমোটর, ওই এলাকার বেশ প্রভাবশালী মানুষ , উনার স্ত্রী ব্যাঙ্কে চাকুরী করেন । পুলকেশ নির্বান্ধব যুবক, অফিস আর ফ্ল্যাট ছাড়া কোথাও তার যাওয়া আসা নেই । এই ব্যাপারটা ফ্ল্যাটের মালিক সুবীর ভদ্র এবং উনার স্ত্রী শর্মিষ্ঠা ভাল করেই লক্ষ্য করেন। বেশ ভালো ছেলে , তাই মাঝে মধ্যে সুবীরবাবু প্রাতঃরাশে পুলকেশকে ডাকতেন । শর্মিষ্ঠা দেবী ও পুলকেশকে ভদ্রছেলে বলে যথেষ্ঠ সমীহ করতেন, বাড়ী ঘরের খোঁজ খবর ও নিতেন । সুবীর বাবু ও উনার স্ত্রী শর্মিষ্ঠা ছাড়া তাদের ফ্ল্যাটে আর কেউ ছিল না । নিয়ম মাফিক কাজের লোক কাজ করে যেত । আদর পেয়ে পুলকেশ ও মাঝে মধ্যে সুবীরবাবুর ফ্ল্যাটে আসত। একদিন প্রাতরাশের টেবিলে পুলকেশ সুবীরবাবুকে জিজ্ঞেস করেন , স্যার মনে কিছু নেবেন না, আপনার ছেলে মেয়ে ক জন , সাহাস্যে

সুবীরবাবু বললেন আমার একমাত্র মেয়ে নাম তার "ইস্পিতা " সে গতবছর ইংরেজী অনার্স নিয়ে বি, এ পাশ করেছে । এখন ব্যাঙ্গালোরে আছে , সেখানেই তার পড়াশুনার জীবন কেটেছে। । এখন সে আর পড়াশুনা করতে ও চাই না ২/৪ দিনের মধ্যে এখানে আসবে , তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। সপ্তাহখানেক বাদে একদিন সকালে পুলকেশ অফিসে যাওয়ার সময় ঘর থেকে বের হয়েই সুবীরবাবুর দরজায় দেখতে পায় এক আধুনিকা মেয়ে যেন মুর্তিমতি ভেনাস , পরনে টাইট জিন্‌সের প্যান্ট আর হালফ্যাশানের একটি ছোট্র আধুনিক টপ। ঐ দিনই সন্ধ্যায় যখন পুলকেশ ফ্ল্যাটে ফিরছে তখন দেখতে পায় সকালের দেকা ওই মেয়েটি একটি বখাটে ধরনের ছেলের সাথে রাজকন্যার বেশে কাউকে পাত্তা না দিয়ে অনর্গল ইংরেজী বলতে বলতে ওই ছেলেটির সাথে একটি গাড়ীতে উঠে পড়ল । যাকগে অত সব ভাবে কে ? পরদিন সুবীরবাবু পুলকেশকে ডেকে পাঠান প্রাতঃরাশের জন্য প্রাতঃরাশের টেবিলে সুবীরবাবু এবং শর্মিষ্ঠাদেবী পুলকেশকে হাতে চেপে বলে পুলকেশ তোমাকে আমাদের খুব পছন্দ , আমাদের ইচ্ছা যদি তুমি রাজী হও তবে আমাদের একমাত্র মেয়ে ইস্পিতাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে শান্তি পাবো । পুলকেশ মনে মনে ভাবে সারাক্ষন নিঃসঙ্গতায় হাঁপিয়ে উঠি, বিয়ে করা দরকার । বাড়ীতে একজন সঙ্গী তো জুটবে। সুবীরবাবু মেয়ে ইস্পিতাকে ডাকেন পুলকেশ দেখে ভাবে এই মেয়েকে তো গতদিন আমি দেখেছি, যাকগে ভালস্কুলে পড়েছে, ভাল পরিবেশে তাই আধুনিক , ইংরেজীটা ভালই , বলতে কইতে পারে , বিয়ের পর ম্যানেজ হয়ে যাবে । ভদ্র, শান্ত পুলকেশ , সুবীরবাবু ও উনার স্ত্রী শর্মিষ্ঠাদেবীর কথায় রাজী হয়ে যায়। ধুম ধাম করে শহর মাতিয়ে সুবীরবাবু - দ্রুততার সরাথে পুলকেশ ও ইস্পিতার বিয়ে দিয়ে দেয় । পুলকেশ ২৪ বৎসরের যুবক, ইস্পিতা ২১ বৎসরের যুবতী । বিয়ে রাত থেকেই কি ঘটে যায় তা তো পুলকেশ কাউকে কখনো বলতে পারে নি । শুধু ডায়েরীর পাতায় নিঃস্তব্দ ভাবে লিখে রেখেছে তার প্রতিটি মূহুর্তের কথা । বিয়ের রাতেই ইস্পিতা পুলকেশকে বলে দিয়েছিল আপনি কাউকে কিছু বলতে পারবেন না , আমি মা বাবার মনের দিকে তাকিয়ে আপনাকে বিয়ে করেছি । আসলে আপনি আমার স্বামী নন্। স্বামী হবার যোগ্যও নন । মা বাার জোর জুরিতে বিয়েতে মত দিতে বাধ্য হয়েছি , বাট আই উইল নট বি ইওর ওয়াইক । পুলকেশ প্রথমটায় ইস্পিতার কথাগুলো সিরিয়াসলি নেই নি, ভাবে বড়লোকের একমাত্র সন্তান , প্রথমটাই ম্যানেজ করতে কষ্ঠ হচ্ছে আস্তে আস্তে সব টিক হয়ে যাবে । যদি ও পুলকেশ জিজ্ঞেসকরে আমার কম কীসে ? ইস্পিতা বলেছিল , আপনার সারাটা জীবন কাটবে ভিখিরির মতো বন্দী জীবনে । এতবড়ো স্বপ্ন আপনি দেখলেন কি ভাবে । কি ভাবে আপনার সাহস হলো বামুন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরার । ইস্পিতা বলে আমি ছোট বেলা থেকে স্বপ্ন সে দেখেছি আমার স্বামী হবে

একজন ইনষ্টিয়ানিষ্ট । আমি দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াব নিজের মনের মতো ইচ্ছা মতো । বন্দী জীবন তো মোটেই নয় । আপনার কাছে আমাকে দেওয়ার কি আছে কিছুই নেই । ইস্পিতা হুশিয়ারী দিয়ে আরো বলে আমার এসব কথা যেন মা বাবা না জানে , এমনকী কেউ যেন না জানতে পারে । যদি কেউ জানে তবে আপনার অসুবিধে হবে জীবনটা গারদে কাটবে । আপনার বিরুদ্ধে আমি পুলিশে দাউরী টর্চারের অভিযোগ আনব। পুলকেশ ইস্পিতাকে বলেছিল তবে সংসার করার কোন মানে হয় না , টেক ডির্ভোস ফ্রম মি। জবাবে ইস্পিতা পুলকেশকে বলেছিল , ডিভোর্স নিতে গেলে কারণদেখাতে হবে আর আসল কারণ হলো মা , বাবা কখনো তা মেনে নেবে না । বাড়ীতে বাবার কোন অঘটন হয়ে যেতে পারে সুতরাং আপনাকে অনুরোধ করছি আমার মুখ চেয়ে একটু কষ্ট করুন, সময় মতো আমি মিউচুয়াল ডিভোর্স নিয়ে নেবো। পুলকেশ ইস্পিতার তথাকথিত সংসারের স্থায়িত্ব হয়েছিল কেবল এক বৎসর । পুলকেশ মানষিক যন্ত্রনায় কাতর হয়ে যেতো কিন্তু কিছু বলার উপায় ছিল না । চাঁপা , শান্ত, ভদ্রস্বভাবের পুলকেশের না ছিল কোন বন্ধু বা কোন আত্মীয় পরিজন ।মহানগরীতে পুলকেশ ছিল একা । ইস্পিতা মনমজি মতো চলতো উদ্‌ভ্রান্তের মতো । সুযোগটা আরো হয়েছিল ইস্পিতার বিয়ের পর তার মা বাবা, ব্যাঙ্গালোরে চলে যায় । রাতে বিরেতে আকন্ট মদ পান করে ইস্পিতা ঘরে ডুকত , একটা বখাটে ছেলে তাকে ঘরে পৌছে দিয়ে যেতো । এক দুবার ওই ছেলেটির সাথে পুলকেশের বাকবিতন্ডা ও হয় আশে পাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা ও তা শুনতে পায় । কিন্তু কেই বা কার পরিবারে নাক গলাই । এক দুইবার পুলকেশ টেলিফোনে ইস্পিতার চালচলন সর্ম্পকে সুবীরবাবুকে বলতে ও চেয়েছিল কিন্তু পাছে উনারা বিশ্বাস না করেন তাই আর পুলকেশের বলা হয়নি। দিনে দিনে ইস্পিতার উশৃঙ্খলতা বাড়তে থাকে ; প্রয়ই হোটেলে রাত কাটায় , কখনো পুলকেশের অনুপস্থিতিতে ফ্ল্যাটে মদের আসর জমায় । এ যেন এক অসহনীয় ঘটনা । একবার বাধা দিয়ে ইস্পিতা ও বহিরাগত

বখাটে ছেলেটার হাতে পুলকেশের নির্যাতিত ও হতে হয়েছিল । ইস্পিতা বলে উঠে এই ভিখিরি ফ্ল্যাট- টা কি তোর বাবার । আমার ইচ্ছে আমার ফ্ল্যাটে আমি যা ইচ্ছে তা করব । ১০ ই সেপ্টেম্বর শনিবার ইস্পিতা, ব্যাঙ্গালোরে বাবাকে টেলিফোনে বলে বাবা পুলকেশের কি যেন হয়েছে, সে টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, অচৈতন্য , কিছু বলছে না তুমি তাড়াতাড়ি আস্। সুবীরবাবু বললেন আমি এক্ষুনি তোর মাকে নিয়ে এয়ারপোর্ট আসছি। তুই একটু ওর অফিসে টেলিফোন কর? আমি থানা পুলিশকে জানাচ্ছি। পুলকেশের অফিসের লোকজন ছুটে আসে, পুলিশ ও আসে , সবাই দেখতে পায় অভিমানী পুলকেশ টেবিলে মাথা রেখে চিরনিদ্রায় শুয়ে হয়ে আছে । পুলকেশের মুখ থেকে গোঁজলা বের হয়ে আছে , সামনেই একটি সাদা গ্লাস । পুলিশ এসে ঘরটা দেখে ইস্পিতাকে কিছু জিজ্ঞেস করে

পুলকেশের দেহটুকু নিয়ে যায় পোষ্টমর্টেমের জন্য। বিকেলের দিকে সুবীরবাবু উনার স্ত্রীকে নিয়ে মেয়ের ফ্ল্যাটে আসেন কিন্তু মেয়ের চেহারা স্বামীহীনা স্ত্রীর মত ঠেকায় না মা, বাবার কাছে । ইপ্সিতা থেকে কোন সদুত্তর না পেয়ে সুবীরবাবু পুলকেশের শোবার ঘরে যান এবং সে ল্ফে দেখতে পান একটি ডায়েরী , যাতে প্রতিদিনের ঘটনা নির্ভূল ভাবে লিখে রেখে গেছে পুলকেশ সুবীরবাবুদের জন্য সুবীরবাবু বলে উঠেন , পুলকেশ ওয়াজ আ পারফেক্ট জেন্টলম্যান। আই অ্যাম সো সরি দ্যাট হি সেক্রিফাইজড্ হিজ লাইফ ফর মি । আই অ্যাম গিলটি । কি উত্তর দেবো পুলকেশের হতভাগা মাকে । মৃত্যুর কারণ হিসাবে ডাক্তারি রিপোর্ট - " অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ "- পুলকেশের মৃত্যু কি" আত্মহত্যা "না "হত্যা " তা রহস্যময় থেকে গেলো ?

আমি সাংবাদিক

" শান্তনুর স্বগোতোক্তি - জীবনের শুরু থেকেই হেরে যাওয়ার শুরু , আজ ও যেন এই পথের শেষ নেই ।পরাজিত মানুষের কাছে আত্মরক্ষা আর আত্মপ্রতিষ্ঠা শব্দ দুটো মূল্যহীন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত প্রতি পদক্ষেপেই যখন বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন সে যুবক শিক্ষা আর আদর্শের অজুহাত নিজের পরাজয় আর অক্ষমতাকে মনের ভেতর গোপনে লুকিয়ে রাখে - এটাই সহজ পন্থা "
শান্তনুর মাথা থেকে কেউ যেন শান্তনুকে নির্দেশ দেয় । তোমাকে উপরে উঠতে হবে, আরো উঁচুতে উঠতে হবে । মানষিক উত্তেজনার মধ্যেই কোথা ও যেন একচিলতে মানষিক অবসাদ শান্তনুকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে । ছোটবেলা থেকেই উপরে উঠার স্বাধ মনে হয় পূর্ণ হলো না । ধনী বাবার খেয়ালী ছেলে সৌমিত্রকে দেখে শান্তনু ভাবে , তারা ইচ্ছে করলেই বাইরের জগৎটাকে গৃহবন্দী করতে পারে , আর ঘরের জীবনটাকে যে কোন ষ্টেডিয়ামের খোলা মাঠে নিয়ে যেতে পারে । তাই

বন্ধু সৌমিত্রের মুখে সাফল্য আর জয়ের আনন্দ, জীবনের তৃপ্তি।

ছোটবেলাই শান্তনুর বাবা মারা গেছেন, মা পুষ্পদেবী গ্রামের বালোয়ারী কেন্দ্রে চাকুরী করেন। এই স্বল্প পয়সার রোজগারে পাঁচ পেটের অন্নসংস্থান করাই দায় । শান্তনুর ছোট দু - বোন , নন্দিতা এবং পুস্পিতা এ ছাড়া আছেন বুড়ো ঠাকুরমা। পুস্পদেবী প্রানান্ত হয়ে যায় । ছোটবেলা থেকেই শান্তনুর লেখাপড়ার প্রবল ইচ্ছে, পাশে পারিবারিক দারিদ্রতা তবু ও পুস্পদেবীর ইচ্ছা ছেলেটা লেখাপড়া করুক , খুব ভোরে আধো ঘুমের মধ্যেই শান্তনু শুনতে পায়। প্রতিদিনকার মতো মায়ের বাসন মাজা , রান্না করার শব্দ , কারণ গৃহ কাজ সেরেই মাকে পাড়ি দিতে হবে অন্নের সন্ধানে। যাওয়ার আগে শান্তনুকে ডেকে বলে উঠ্ তো বাবা পড়তে বস্ । নন্দিতা , পুস্পিতাকে ও বলে মা উঠে পড়তে বস্ । পরিশ্রমের মাঝে ও পুস্পদেবী ভাবে শান্তনু একদিন লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, এর চাইতে বড় পুরষ্কার, আমার আর কি হতে পারে ? মা, ছেলের মানষিক দৃঢ়তা , হাড়ভাঙ্গা শ্রম আর শান্তনুর অদম্য লেখাপড়ার নেশা শান্ত একের পর এক ক্লাশ পেরিয়ে মোটামুটি ভালফল করে মাধ্যমিকের গন্ডি পেরিয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয় । সুদীর্ঘ পথ প্রায় ১০/১২ কিমি পথ পায়ে হেটে গোলাঘাটি গ্রাম থেকে শান্ত জাঙ্গালিয়া হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে যায় । পথে অতিক্রম হয় একের পর এক গ্রাম যেমন সিপাহীজলা , বাইদ্যার দিঘী , চন্দনজগর , রাউৎখলা, নারাউড়া ইত্যাদি। আসা যাওয়ার পথে প্রবাল চক্রবর্ত্তী নামের একজন নজরে পড়ে শান্তনুকে , একদিন প্রবালবাবু শান্ত, ভদ্র, সিরিয়াস ছেলে শান্তনুকে স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে জিজ্ঞেস করে তোমার নাম কি ? শান্তনু শান্ত গলায় উত্তর দেয় শান্তনু দেব । বাবার নাম কি ? বাবা মৃত অবিনাশ দেব কোথায় থাকো - শান্তনু বলে আমাদের বাড়ী গোলাঘাটিতে । শান্তনুকে প্রবালবাবুর খুব ভাল লাগে । শান্তনু প্রবালবাবুকে জিজ্ঞেস করে কাকু আপনি কে ? উত্তরে প্রবালবাবু বলেন আমি এখানকার লোক আমি সাংবাদিক করি । শান্তনু আর কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে গৃহভিমুখে প্রস্থান করে । দুইদিন বাদে শান্তনু স্কুলে যাওয়ার পথে প্রবালবাবুকে রাস্তায় পেয়ে কাকু বলে ডাক দেয়, প্রবালবাবু শান্তনুকে বলে তুমি আমাই ডেকেছো , শান্তনু তার বইয়ের ভেতর থেকে কিছু কাগজ বের করে প্রবালবাবুর হাতে তুলে দেয় এবং বলে কাকা আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছি আপনি পড়ে দেখবেন বলেই শান্তনু স্কুলের পথে পাড়ি দেয় । কৌতুহলী সাংবাদিক প্রবালবাবু পকেট থেকে চশমা বের করে শান্তনুর দেওয়া কাগজটুকু পড়তে শুরু করে । ছাপার অক্ষরের মতো সাজানো লেখা , যার শিরোনাম '' আমাদের গ্রাম্য জীবনের সমস্যা '' - প্রবালবাবু মনোযোগ দিয়ে শান্তনুর লেখাটুকু পড়ে - মনে মনে ভাবেন সত্যিই মেধার জন্ম হয় না মেধা তৈরী হয়। সন্ধ্যায় প্রবালবাবু শান্তনুর লেখাটুকু নিয়ে সংবাদ ভবনে যান , সম্পাদককে শান্তনুর লেখাটুকু দেখান , উপস্থিত সবাই শান্তনুর লেখার ভুয়সী প্রশংসা করে । সম্পাদক

একধাপ এগিয়ে বলেন প্রবালবাবু যদি ছেলেটি কাজ করতে চাই পড়াশুনা ফাঁকে ফাঁকে তবে তাকে আমরা ঐ অঞ্চলের ফিল্ড রিপোর্টার নিয়োগ করতে পারি । প্রবালবাবু ও এই কথা শুনে খুব খুশী হন । পরদিন ভোরের কাগজে শান্তনুর প্রবন্ধটি ছাপা হয় । প্রবালবাবু কাগজটুকু হাতে নিয়ে বিকেল শান্তনুর প্রতিক্ষা করেন । স্কুল থেকে ফেরার পথে প্রবালবাবু শান্তনুকে হাতে খবরের কাগজটুকু দেন এবং বলেন দ্যাখ কাল তুমি যে প্রবন্ধটুকু আমাকে দিয়েছিলে আজ খবরের কাগজে বের হয়েছে । শান্তনু বড্ড খুশী হয়ে বলে , কাকা আমি আরো লিখব, প্রবালবাবু জিজ্ঞেস করে শান্তনু তুমি পড়াশুনার ফাঁকে মাঠে সাংবাদিকতার কাজ করতে পারবে কি ? শান্তনুর এক কথায় উত্তর , আমি পারবো । প্রবালবাবু বলে তোমাকে সংবাদ ভবন থেকে পরিচয় পত্র ও দেওয়া হবে সাথে অল্প কিছু টাকা ও দেওয়া হবে । আর আমি তোমাকে কাজ শিখিয়ে নেবো । শান্তনুর যেন হাতে স্বর্গ প্রাপ্তি , প্রবালবাবু বলে চলো মহামায়া স্টুডিও তে তোমার দু -টো ফটোগ্রাফ নিতে হবে । শান্তনু বলে কাকু আমার কাছে টাকা নেই , প্রবালবাবু বলে উঠেন তোমাকে টাকার কথা তো আমি বলিনি ,তুমি আস্ । মহামায়া স্টুডিওতে ফটো তোলার পর শান্তনু বাড়ীতে চলে যাই , মাকে তার লেখা প্রবন্ধ যে ভোরে কাগজে বের হয়েছে তা দেখাই এবং মাকে আরো বলে মা আমি একটা কাজ পেয়েছি । এখন থেকে আমার পড়ার খরচ তোমাকে চালাতে হবে না । খবর শুনে যদি ও মা খুশী হয়েছেন কিন্তু পরক্ষনেই ভাবেন ছেলেটার পড়ার না কোন ক্ষতি হয়। শান্তনু মাকে কথা দেয় , মা আমি কাজের ফাঁকে পড়াশুনা চালিয়ে যাবো, তুমি আমার জন্য ভাববে না। দুইদিন বাদে প্রবালবাবু শান্তনুকে তার হাতে ফিল্ড রিপোর্টার হিসেবে তার পরিচয় পত্র এবং নিযুক্তির কাগজটুকু দিয়ে দেন। পড়াশুনার সাথে চলতে থাকে শান্তনুর সাংবাদিকতার কাজ, প্রবালবাবুর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে, গ্রামের সমস্যা নানাহ সংবাদ লিখে শান্তনু প্রবালবাবুকে স্কুলে যাওয়ার পথে উনার হাতে পৌছে দেন। এবং বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে প্রবালবাবুর কাছ থেকে সব জেনে বাড়ী চলে যায়। এলাকায় বয়স্করা শান্তনুকে - " সাংবাদিক শঅন্তনু " বলে ডাকে । সাংবাদিকতার পয়সায় শান্তনু লেখাপড়া করে উপরন্তু কখনো কখনো বোনদের খাতা কলম ও কিনে দেয় । এই ভাবেই শান্তনুর স্কুলের পাঠ শেষ হয়ে যায় । উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর দু- মাস , মাঠে ময়দানে , গ্রামে - শহরে ঘুরে শান্তনু অনেক রিপোর্ট সংগ্রহ করে । কাজের নমুনা কি ভাবে করতে হয় সব কিছু তো তাকে প্রবালবাবুই শিখিয়ে দিয়েছে। সংবাদপত্র অফিস থেকে শান্তনুকে বেশ কিছু বাড়তি পয়সা ও গাড়ী ভাড়া ও দেওয়া হয়। উচ্চমাধ্যামিকের ফল পর শান্তনু প্রথম সু- সংবাদটুকু মাকে দেওয়ার পর সোজা বাসে চেপে পত্রিকা অফিসে, পত্রিকার সম্পাদককে তার পাশের সুসংবাদটুকু দিলে সম্পাদক অভীক ব্যানার্জী তাকে প্রথমে মিষ্টি খাওয়ান , তার পরে বলে উঠেন শান্ত তুমি তো পাশ করে কলেজে আসবে

সুতরাং আমরা যদি তোমাকে প্রমোশান দিয়ে ষ্টাফ রিপোর্টার বানিয়ে দেই কেমন হবে। লাজুক শান্তনু খুশীতে মাথা নাড়ে সম্পাদক মহাশয় বলেন কলেজের পর তুমি অফিসে এসে পড়ো , এখানে কাজ করবে আর বন্ধের দিনগুলোতে তোমাকে ডাব্‌ল লোড্‌ নিতে হবে । শান্তনু রাজী হয়ে যাই , সংবাদ অফিস ও শান্তনুর আনুগত্যকে সম্মান জানিয়ে তার ভাতা দ্বিগুন বাড়াইয়া দেয় । পড়াশুনা করতে শান্তনুর আর সমস্যা রইলো না । প্রতিদিন বাসে চেপে গোলাঘাটি থেকে বিশালগড় হয়ে আগরতলা মহারাজ বীর বিক্রম কলেজে আগমন তারপর কলেজ শেষে সংবাদভবন, রাত ৯টায় গৃহাভিমুখে প্রস্থান। প্রতিদিনকার এই রুটিনে তার কলেজের এক বান্ধবী শর্মিষ্ঠ যাওয়ার পথে প্রতিদিন বিশালগড় বাসটপেজ থেকে একসাথে যায় , কলেজ শেষে হাঁটিতে হাঁটিতে শহরের দিকে আসে ওরা । শঅন্তনু অঅর শর্মিষ্ঠা । শান্তনু রোগা , শ্যামলা, মিশকালো চুল আর শর্মিষ্ঠা পাতলা, ফরসা, মাঝারি গঠনের। তবে উভয়ের চেহারায় কোন টেক নেই, তবে চেহারায় বোঝা যায় মনের মধ্যে হয়ত কোন কথা লুকানো আছে ।শান্তনুর কাঁধে একটি কাপড়ের ঝোলা, যার ভেতরে বই পত্র যতসব আছে আর শর্মিষ্ঠার কাঁধে আধুনিক ব্যাগ ।ক্লাস শেষে এভাবেই ওরা রোজ বিকেলে হাঁটিতে হাঁটিতে এই পথ ধরে শহরের কামান চৌমুহনী পর্যন্ত আসে । তারপর শর্মিষ্ঠা সোজা বটতলার দিকে চলে যায় আর শান্তনু বা - দিক হয়ে চলে যায় তার সংবাদ অফিসের দিকে।

কলেজ থেকে কামানচৌমুহনী , এই লম্বা পথের অনেকেই এই জুটিকে চেনে । দোকানদার, রিকশাওয়ালা, ফেরীওয়ালা। কারণ দুটো তরুণ তরুণী প্রায় প্রতিদিন নিয়ম করে একই রাস্তা ধরে নির্দিষ্ট একটা সময় ধরে হেঁটে গেলে অনেকেই তাদের চিনবে, এটাই স্বাভাবিক। প্রথম প্রথম শর্মিষ্ঠার বেশ খারাপ লাগত । প্রথমদিকে এক দু বার শর্মিষ্ঠা শান্তনুকে বলেছিল রোজ রোজ এভাবে আমরা যদি রাস্তা দিয়ে যাই হয়ত মানুষ খরাপ ভাবতে পারে । লাজুক মুখে শান্তনু বলে কি অন্যায় করেছি আমরা? শর্মিষ্ঠা- শান্তনুর কথা শুনে একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। হঠাৎ যেন দু - জনের বুকে একটু কাঁপুনি এসেছিল - ব্যস্‌ এ পর্যন্তই । আর কখনো একসাথে আসা নিয়ে কোন কথা হয়নি । দু - জনের অনেক গল্প হয়েছে কিন্তু কেউ কাউকে কখনো মুখ ফুটে কিছু বলেনি । এ ভাবে কেটে গেল সাংবাদিক শান্তনুর কলেজ জীবন । কলেজে ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ. সংবাদ অফিস থেকে শান্তনুকে বলা হল কলেজের একটি প্রোগ্রাম আছে । অর্থাৎ উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কলেজের অডিটোরিয়াম উদ্বোধন করবেন। শান্তনুর সাথে সমস্ত কলেজ ছাত্রছাত্রী ও এসেছে , শর্মিষ্ঠা ও এসেছে । শান্তনু সমস্ত প্রোগ্রামটুকু কভার করে । অফিসের ক্যামেরা দিয়ে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বেশ কিছু ছবি ও তুলেছে শান্তনু এর মধ্যে একটি ছবিতে শর্মিষ্ঠার ছবি ও এসে গেছে । শান্তনু পোগ্রাম কভার করে ফটোসহ পত্রিকা অফিসে জমা দিয়ে দেয় । পরদিন সন্ধ্যায় শান্তনু সংবাদ অফিসে এসে পত্রিকা হাতে নিয়ে দেখে

পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তার নিউজটুকু ছেপেছে এবং মন্ত্রীর পিছনে অন্যছাত্রীদের সাথে শর্মিষ্ঠার ফটোটুকু ও সাঁফ ফোকাসে এসেছে । পত্রিকাটি হাত থেকে রেখেই শান্তনু যেন কেমন আলো - ছায়ার জগৎ এ চলে গেছে । এক স্বর্গীয় অনুভুতি মনে মনে তার শিহরণ লেগেছে । এমন সময় ক্রীং ক্রীং শব্দে টেলিফোন বেজে উঠে , শান্তনু টেলিফোন উঠাতেই প্রশ্ন এখানে শান্তনু আছে । স্বকীয়ভঙ্গীতে শান্তনুর উত্তর আজ্ঞে বলছি , অপরদিক থেকে উত্তর আসে শান্তনু আমি শর্মিষ্ঠা, সত্যিই আজ খবরের কাগজ দেখে বুঝতে পেরেছি তুমি সত্যিই আমাকে ভালবাস, শান্তনু বিশ্বাস কর আমি ও তোমাই ভালবাসি । অবিশ্বাস্য ঘটনা , শান্তনুর শরীরের ভেতর যেন রং তাপ, উত্তাপ ফুটিয়ে তুলেছে। শঅন্তনু চারদিক তাকিয়ে বলে উঠে আমার যে কিছু নেই । সাথে সাথে শর্মিষ্ঠার উত্তর তোমার যা আছে তা এ দুনিয়ায় আর কারো নেই , তোমার এক বিশাল মন আছে । আমার আর কিছুর প্রযোজন নেই । একদিন দুপুরে সংবাদভবনে খবর আসে কলেজে রেজাল্ট বের হয়েছে শুনে শান্তনু ছুটে যায় কলেজে, রেজাল্ট দেখে সগর্ভে শান্তনু বলে আজ আমি গ্র্যাজুয়েট, শর্মিষ্ঠা ও পাশ করেছে , কথা বলতে বলতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে । হাতধরে কলেজ জীবনের মতো চলতে শুরু করা গায়ে গা লেগে পথ চলা , পারফিউমের মিষ্টি গন্ধ যেন নবজীবনের সুখানিভুতি,

"ভোরের আলোর " ষ্টাফ রিপোর্টার বলে একটা গর্ব তো এমনিতেই আছে শান্তনুর কারণ তার লেখার উপরে থাকে ষ্টাফ রিপোর্টার শান্তনু দেব। যার আনন্দ শান্তনুর মনকে আনন্দে বরে রাখে । এক আলাদা শক্তি যোগায় । কিছুদিন পর শান্তনু ও শর্মিষ্ঠা সূর্য্যমনি নগর ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হয় । ভালবাসা তুঙ্গে ব্যাপারটুকু অনেক বন্ধু বান্ধবী জেনে গেছে । এমনকী শান্তনুর মা পর্যন্ত জানে । মা পুস্পদেবী শান্তনুকে শুধু একদিন বলেছিল বাবা আমরা গরীব, ধনী ঘরের মেয়ে কি তোর কাছে আসবে ? আগুনে , জলে কি বন্ধুত্ব ঘটে রে ! শান্তনু সেদিন মায়ের কথায় কোন উত্তর দেয়নি। ছ মাস্ , এক বছর পর শান্তনুর মনে যেন কেমন হতাশার সৃষ্টি হয় । কারণ সে দেখতে পায় শহরের বনেদী রেস্তোরা থেকে শর্মিষ্ঠা বেশ স্মার্ট এক যুবকের সাথে প্রায়শই আসা যাওয়া করে । শান্তনু ভাবে আমি কোন সাহসে তাকে জিজ্ঞেস করব । তবু ও কিছুদিন যাওয়ার পর শান্তনু একদিন শর্মিষ্ঠাকে বলে তুমি এখন প্রায়ই ইউনিভার্সিটিতে আসনা কেন ? একটু ভাল করে পড়াশুনা করো। শান্তনুর কথায় শর্মিষ্ঠা প্রচন্ড ক্ষেপে যায় বলে উঠে অতলোকের সাথে না তোমার পরিচয় , একটা চাকুরী তো ব্যাবস্থা করতে পারলে না । ? আর এখন ও তো আমাদের বিয়ে হয়নি , সেটা তুমি কবে করবে তা তো তুমি কেন স্বয়ং ইশ্বর ও জানে না । তাহলে ,এখন থেকেই কেন তুমি আমাকে তোমার বাপের সম্পত্তির মতো ব্যাবহার করতে চাইছো । আমিই বা কেন তোমার কথা শুনব । শর্মিষ্ঠার এই রুদ্ররুপ শান্তনু ভাবতেই পারেনি, শান্তনুর মনে হয় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে । শান্তনু বলে উঠে

আমি খারাপ কি বললাম , শর্মিষ্ঠা বলে তোমাকে বলার অধিকারই বা কে দিল ?ঐ দিন সংবাদ ভবনে না গিয়ে শান্তনু সোজা বাড়ী ফিরে গেলো । দেখতে পেলো মা গ্রামের মাতব্বরদের সাথে বোন নন্দিতার বিয়ের আলাপ করছে , ছেলের গ্রামেই ছোট মুদীর দোকান , বড় ভাই হিসেবে শান্তনুর ও কর্তব্য, দায়িত্ব আছে । ভাবে পড়াশুনার ফাঁকে যে দু - চারটে পয়সা জমা করেছি তা দিয়ে তো মাকে সাহায্য করা যায় তবে তো বোনের বিয়ের কাজে আসবে । সবাই বলেছে ছেলেটি ভাল , নন্দিতা সুখে থাকবে । শান্তনু মাকে বোনের বিয়ের দিন ঠিক করার পরামর্শ দিয়ে সংবাদ ভবনে যায় , সম্পাদকের সাথে বোনের বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতেই সংবাদ সম্পাদক বলেন তোমার বোনাস্ , টি, এ মিলে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা জমেছে, তুমি অফিস থেকে নিয়ে নিও । আর বাকী আমরা দেখি !

শান্তনু মনমরা হয়ে গেছে , ইউনিভার্সিটিতে ও যায়,সংবাদ ভবনে ও যায় এ দিকে বোনের বিয়ে ঠিক । একদিন সন্ধ্যায় শান্তনু দেখতে পাই একটি সুন্দর মার্সিডিজ গাড়ী সংবাদ ভবনের সামনে এসে দাড়াই । গাড়ী থেকে শর্মিষ্ঠা আর সেই ছেলেটি যাকে সে রেস্তোরায় শর্মিষ্ঠার সাথে যেতে দেখেছে উভয়ে গাড়ী থেকে নেমে সংবাদ ভবনের দিকে আসছে । শর্মিষ্ঠাকে দেখে শান্তনুর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়ার টের পাচ্ছিল । শর্মিষ্ঠা, ছেলেটিকে নিয়ে শান্তনুর সামনে এসে দাড়ায়, শান্তনু বসতে বললে শর্মিষ্ঠা তার ব্যাগ থেকে একটি চিঠি শান্তনুর দিকে বাড়িয়ে দেয় বলে আমার বিয়েতে যেও , ছেলেটিকে দেখিয়ে বলে, এই তো আমার ভাবী বর । শান্তনু চিঠি খুলে দেখতে পাই ঔ দিনই বোনের(নন্দিতার) বিয়ে । শর্মিষ্ঠা আর কিছু না বলে সংবাদ ভবন থেকে বেরিয়ে পড়ে । শান্তনু ভাবে সেই জন্ম থেকেই পিছিয়ে পড়া , হেরে যাওয়ার শুরু এই রাস্তার শেষ নেই । পরিশ্রম আর মেধা দিয়ে শান্তনু যতই এ গো তে চাই ভাগ্য তাকে টেনে হিঁচড়ে নীচে নামিয়ে দেয় , প্রতি পদে হেরে যায় শান্তনু । শান্তনুর অসামান্যতার কোন মূল্যায়ন হয় না , - শর্মিষ্ঠাও তাকে নিষ্ঠুর ভাবে পরাস্ত করে । সেদিন আর শান্তনুর পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব হয়নি । শর্মিষ্ঠার বিয়ের চিঠি হাতে নিয়ে বটতলা বাসষ্ট্যান্ডের দিকে নিঃশব্দে এগোলো শান্তনু , বাড়ীতে মায়ের কাছে যেতে । সেখানেই পাবে সমস্ত যন্ত্রনার উপশম।
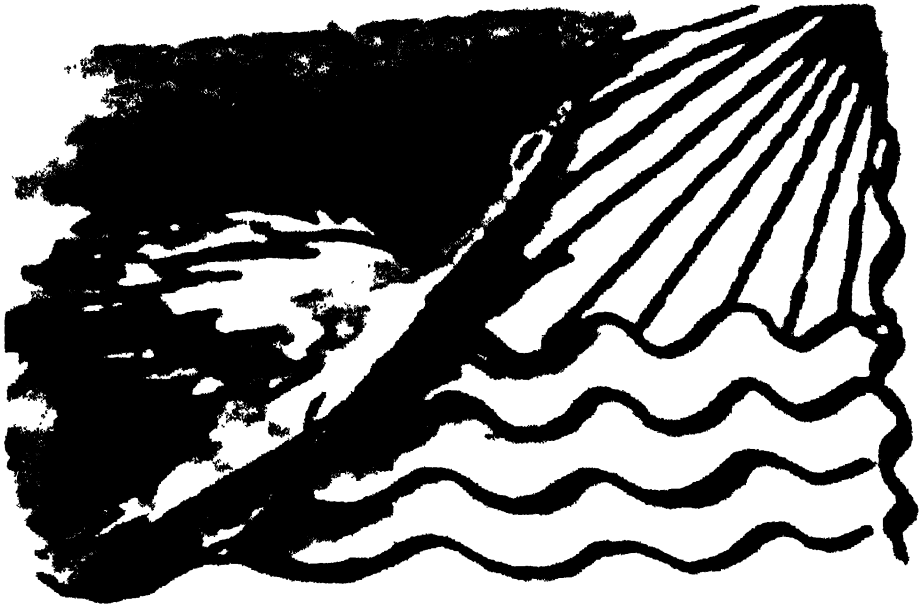
ঠিকানাবিহীন

সুরজিৎ এর মেজাজটা আজকাল খুব খিটখিটে হয়ে গেছে বয়সটা পয়তাল্লিসের দোড়গোড়াই। পরিস্থিতির সাথে প্রায়শই মানিয়ে নিতে পারছে না । সামান্য চাপে বিরক্ত হয়, উত্তেজিত হয়ে পড়ে, রেগে যায় । সুরজিৎ চাকুরিজীবী পেশায় পুলিশের সাব- ইন্সপেক্টর । চাকুরী জীবনের প্রথম কুড়ি বছরের মতো এখন আর পরিশ্রম করতে পারছে না সুরজিতের বড্ড কষ্ট হচ্ছে শরীরে, হয়তো সুগার সমস্যা ও একটি কারণ মাঝে মাঝে রক্ত চাপ ও বেড়ে যায় । সকাল দুপুর , সন্ধ্যা রা, সবসময় যেন একটা অজানা উত্তেজনা । সুরজিৎ একাকী থাকলে ভাবে জীবন যৌবনের শুরুতেই যেন পরাধীনতার শৃঙ্খল তাকে আষ্টেপিষ্টে বেধেঁ রেখেছে এক খোলা কারাগারে ।কিন্তু স্বাধীন চেতা তার এই পরিণতি ইচ্ছাকৃত কারণ তার এই চাকরিটা তার এবং তার স্ত্রী কন্যার জীবন জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। সু- শিক্ষিত সুরজিৎ জানে জীবনের এই সময়টুকু সে ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজেকে

চুক্তিবদ্ধ ভাবে সঁপে দিয়েছে । সুতরাং পরিস্থিতি যাই হোক না কেন তা তাকে মেনে নিতেই হবে। আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হলে নিশ্চিত সুরজিং না দেখা দাসত্ব থেকে মুক্তি নিতে পারে । যেহেতু কোন অবলম্বন নেই সেহেতু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে সুরজিৎকে যে কোন ভাবেই হোক পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে হবে। সেখানে ইচ্ছা, অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই । সুরজিৎ এর মনের সাথে অবিরাম যুদ্ধ চলে, কিন্তু করবেটা কি? বলবেই বা কাকে ? তার উপর পুলিশের চাকুরীর চলতে থাকা নিরন্তর ভিন্নমুখী সমস্যা সঙ্কুল প্রবাহ । দু টো একসাথে চালানো ও অসম্ভব। দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার হলেই কি দায়িত্ব প্রাপ্ত, পিতা বা স্বামী হওয়া যায় ? নানাহ্ টানাপোড়ন ও গোপন উত্তেজনা সমস্যা নিয়েই সুরজিৎ এর দিন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে । বিভাগের ভিন্নমুখী সমস্যা তো আছেই , কখনো উধস্তন কখনো অধস্তন , কখনো খোসামোদ, কখনো অপরাধ সমস্যা , কখনো সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক , দিনের পর দিন বছরের পর বছর তা ক্রমানুয়ে চলছে তা যেদ কখনো ও থামবে না । দক্ষতা বাড়াতে হবে , আরো অ্যাফেকটিভ হতে হবে, চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় কিন্তু সুরজিৎ জানে পাশাপাশি তার বয়সটা ও বাড়ছে , দৈহিক কর্মক্ষমতা তো আর ২০ / ২৫ বছরের ছেলের ও তা চুলোয় যাক্‌গে। ওসব সমস্যায় নয়তো সাংসারিক অশান্তি হবে কিন্তু আসল জায়গাটা তো ঠিক রাখতে হবে। কারণ এখানেই তো সুরজিৎ এর রুটি রুজির ব্যাপার । দিনে দিনে কাজের টার্গেট বাড়ছে । তা যদি সম্পূর্ন করতে না পার তাহলে ঝাড় খাও শাস্তি পাও , নয়তো ঘরে চলে যাও। দিবানিশি ২৪ ঘন্টা খোলা কর্মক্ষেত্রে দক্ষযজ্ঞের কোন শেষ নেই । দিবারাত ভিতর বাইরের সমস্যায় সুরজিৎ এর মাথা খাঁ খাঁ করে উঠে । কখনো দু হাত কপালে চেপে ধরে মাথা নুয়ে টেবিলে বসে পড়ে সুরজিৎ একটানা একুশ বছর ধরে সাব- ইন্সপেক্টর হিসেবে পুলিশের মতো চ্যালেঞ্জিং চাকুরী করে চলেছে উত্তেজনা ও চাপকে সঙ্গী করে । ভাবতে ভাবতে সুরজিৎ অবাক হয়ে যায় রোজকার মতো দেখা চা - বাগানের শ্রমিকদের দেখে সুরজিৎ ভাবে এই শ্রমিকরা ও তার চাইতে অনেক খুশী অনেকসুখী পারিবারিক জীবনে ।এই চাকুরীর রোজের মতো সময় অসময়ের নিয়মকানুন, আদেশ , উপদেশ এর চুক্তি যেন এখন তার কাছে গাত্রদাহ । মনথেকে মেনে নিতে না পারলে তাকে তা মেনেনিতেই হবে ।খোসামোদ, সেবা ধর্মটী স্তমকী সব করতেই হবে , মানতেই হবে। সবার শান্তি নিশ্চিত করতে গিয়ে নিজে না উজোর হয়ে যাও , ভাবে সুরজিৎ । ভাবতে ভাবতে ক্লান্তি তাকে গ্রাস করে নেয় । অদ্ভুতভাবে মনের ভেতরে যেন তার কখনো তৈরী হয়ে থাকে রেজিগনেশন লেটার । কিন্তু আবারো ভাবে সুরজিৎ জীবন - জীবিকার স্বার্থে একথা মুক ফুটে বলো না যেন । সে ভাবে সুরজিৎ তুমি এখন অচল ঘোড়া, কেউ তোমাই নেবে না । আগের মতো মুঠ বইবার ক্ষমতা এখন তোমার নেই । কখনো সুরজিৎ স্ত্রী সূনী তাকে বলে এই চাকুরীটা এখন আর আমি পারছি না গো ।

সুনীতা বলে অমন কথা বলো না , এখন তোমার এসব কথা বলার সময় নই, মেয়েটা সবে বার ক্লাশ পাস করল তার কলেজ , তার জীবন সবই বাকী তার উপর মেয়ে সন্তান , এসব বাজে কথা মনে ও আনবে না , মুখে ও বলবে না । কেন এমন বলছো বলতো , তুমি তো রাজ্যের পাহাড় জঙ্গল, চরাই, উৎরাই কথপথ চলেছো কত সমস্যা বিভাষিকা সামলেছো তবে কেন এখন এত অনীহা বলতো । কি করতে পারবে এখন যদি বের হয়ে যাও , সুতরাং এসব চিন্তা ছাড় । সুরজিৎ বলে উঠে সব মানুষ কি পুলিশের চাকুরী করেই বেঁসচ আছে বলতো ।

সুরজিৎ এর কথায় সুনীতার দু চোখ বেয়ে জল নামতে থাকে । সুনীতা বলে তুমি একবার কেন ভাবছো না , আমাদের একমাত্র মেয়ে সাগরিকার কি হবে ? যদি তুমি এ রকম পাগলামো কর সুনীতার কথা সুরজিৎ ভাবে সত্যিই তো এই বয়সে নতুন প্রফেসনে গিয়ে নিজের জায়গা তৈরী করা সত্যিই তো মুখের কথা নয় ।মেয়ে সাগরিকার কথা তো ভাবতেই হবে। তা ছাড়া ও এ যাবৎ তো সুরজিৎ রাজ্য পুলিশে সুনামের সাথেই কাজ করে আসছে । পুরষ্কার ,সন্মান , সম্বর্ধনা , সবই তো পেয়েছে , তবে অনীহা কেন ?

সুরজিৎ কোন কংক্রিট সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে না একবার বাবে যা হোক , যতকষ্টই হোক চাকুরীটা করে যাবো । আরেকবার ভাবে আমার জীবনে তো কোন বড় চাহিদা নেই । অট্টালিকা সম চাহিদা না থাকলে সুখী হতে সমস্যা কোথায় , সাহেব আসবেন, সাহেবের টেলিফোন আদেশ, ইত্যাদি চো চুরীর অঙ্গচাপ, বকুনি, উত্তেজনা ও সব তো থাকবেই, তার মাঝে ও যদি অন্যরা পারে আমি পারব না কেন, এমনটা ও ভাবে সুরজিৎ।

তবে সুরজিৎ এর মুশকিলটা হলো যখন তার দায়িত্ব প্রাপ্ত এলাকায় কোন অপরাধের ঘটনা ঘটে তখন সে বেসামাল হয়ে যায় , ঘটনা সামাল দিতে অপরাধীকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে আর যদি ঘটনা নিরসনে বিলম্বিত হয় তখন সে নিজেকে অপরাধী ভাবে । এখানে যে তার বিরাট সমস্যা , অপরাধের ঘটনা সুরাহা না হলে নিজেকেই যেন সুরজিৎ এর অপরাধী মনে হয় । আরে ব্যাটা সুরজিৎ অপরাধ তো তুমি করোনি । অত ভাবছ কেন সমস্ত ঘটনা তো আর মূহুর্তে সুরাহা হয় না , সময় কখনো লেগে যায় । তাই বলে হতাশ হওয়ার কি আছে । কিন্তু এ ভাবনাতো সুরজিৎ এর দীর্ঘস্থায়ী হয় না । অচিরেই সুরজিৎ মানষিক ভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ে । কারণ তাকে যে সবার কাছে জবাবদিহি করতে হয় ।অনেক সময় কারণে অকারণে গালমন্দ ও শুনতে হয় । সুরজিৎ ভুলে যায় এটা যে চাকুরীরই একটা অঙ্গ, আবার ভাবে কতজনকে সন্তুষ্ট করা যায় । সমস্যায় যন্ত্রণাকাতর সুরজিৎ তাব. পরে ও বিভাগের কাজে মন দিয়ে লেগেই থাকে । নানাহ বার্তা আদেশের উত্তর ভেতরে বাইরে সামলানো এ তো রুটিন ওয়ার্ক । উল্টোপাল্টা ভাবনা আসলে মনে স্ত্রী সুনিতার মুখটা

যেন চোখের সামনে ভেসে উঠে, কন্যা সাগরিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে নানাহ্ চিন্তা হয় । তবু ও যেন সুরজিৎ ভাবে যদি মুক্তিপেতাম, কারণ দু- মুঠো ভাতের জন্য তো নিজের প্রকৃত সত্বা বিসর্জিত। এতকিছুর মাঝে ও মনকে দৃঢ় করে সুরজিৎ কাজ শেষ করতেই চাই । কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ভেতরের টেনশন অনেক সময় সুরজিৎ এর কাজে গোল পাঁকিয়ে দেয় । সে কখনো মানষিক শান্তি হারিয়ে ফেলে । ভেতরে ভেতরে যেন তার কান্না পায়, সে ভাগ্যকে দোষারোপ করে । দীর্ঘ বছর ধরে ঘরে বাইরে হুকুম তামিল থেকে সে মুক্তি চায় । এই মুক্তি যেন তার জন্য ব্যাক্তির স্বাধীনতা । সে নিজেকে নিজের মতো করে বাঁচতে চায় ।

একবার সুরজিৎকে মেয়ে সাগরিকা বলেছিল, বাবা লাক লেবার টেলেন্সি একসাথে মিললে জীবন সাক্সেসফুল হয় । সুরজিৎ ভাবে লাক কি তাতো চোখে দেখা যায় না , বা আমি দেখিনি। লেবার সে তো জীবনে বহুত পরিশ্রম করেছি , রাত জাগা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের হিসেব ও কষিনি , আর যদি টেলিন্সি বলা হয় তবে তো ছাত্রজীবনে ও খারাপ ছিলাম না বা বিভাগীয় কাজে ও অনেক নিপুন তাই দেখিয়েছি, সে কোন অপরাধীর বিরুদ্ধেই হোক বা কোন জঙ্গী সংগঠনের বিরুদ্ধেই হোক । বহু অপরাধীকেই আইনের এবং বিচারের মানদন্ডে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি । তবে বাকীটা রইল কী? এ যাবৎ তো ব্লাডি, ক্যালাস্, ননসেন্স, এই সব শব্দগুলো শুনতে হয়নি । সুরজিৎ এর মন একটাই প্রশ্ন নিজেকে করে তবে কেন মুক্তি চাও । যেহেতু দৈহিক শান্তি তাকে এখন আর আগের মতো সহায়তা করছে না । সুরজিৎ ভাবে এখন ট্রিকস্ আর বাটারটুকু লেবার ও টেলেন্সী থেকে অনেকবেশী যুগোপোযোগী । সুরজিৎ এর মনের ভেতর কেমন যেন ভাষাহীন বোবা কান্না, আর অমানবোচিত মানুষের প্রয়োগ করা শব্দগুলো মাথায় ঘুড়পাক খাচ্ছে , আর সুরজিৎ অদ্ভুত ভাবে নিজেকে নিসঙ্গ ভাবে নিজেকে আলাদা করে নেয় । একাকীত্ব যেন তাকে ভাবনার সুযোগ করে দেয় ভাবে এ সুযোগ পেলে সমাজকে বলে দেব কত ঘটনা যা এ যাবৎ মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি । যদি তোমার পার পরিবর্তন কর । আমার মানষিকতা আড়ালে আবডালে থেকে বাতাস হয়ে তোমাদের সাহায্য করব। মন খুলে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে ও সুরজিৎ নিজেকে আটোসাটো বলে মনে করে, সে ভাবে আমি পরাধীন ক্রীতদাস আর এই ভাবনাই তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে । সুরজিৎ ভাবে স্ত্রী সুনীতা কন্যা সাগরিকা কেউ বুঝবে না তার মানষিক সমস্যা । সুরজিৎ ভাবে বোবা নির্বাক গাধার মতো বোঝা বয়ে বেড়ানোই তার কাজ । তিনজনের একটি ছোট্ট সংসার । সুরজিৎ মনে মনে ভাবে সংসারটাকে আরো সুখের করে তুলবে কিন্তু পারে না । মেয়ে সাগরিকা ২০০৭ এ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে প্রথম বিভাগে , মেয়ের ভর্ত্তির ব্যাপারটা ও বাবা হিসাবে কর্তব্যের প্রথম দিকে পড়ে । চিন্তায় চিন্তায় সুরজিৎ অফিসের টেবিলে বসে ঝিমোচ্ছে এমন সময় সুরজিৎ এর ঘনিষ্ট বন্ধু কিষান সুরজিৎ এর অফিসে আসে । কিষান - লক্ষ্য করে বলে ওঠে ওমা , সুরজিৎ তুই ঝিমোচ্ছিস কেন ?

সুরজিৎ নড়ে বসে বলে কিষান মনটা ভাল লাগছে না রে । কি হয়েছে বল্ - কিষান বলে অত ভাববার কি আছে আমার দুই গাঙ্গুলীদা ও মুজুলবাবু কোলকাতায় আছে । তাদের সাথে যোগাযোগ করব । তুই ভাববি্ না প্রয়োজনে আমি তোর সাথে তোর মেয়েকে নিয়ে যাব্। খানিকটা রাত বেড়ে গেছে কিষান চলে যায় কিন্তু সুরজিৎ এর দু ঃশ্চিন্তার যেন শেষ নেই । সুনীতা ও মেয়ে সাগরিকা বাবাকে বলে বাপু ঘুমিয়ে পড় । সুরজিৎ ঘুমিয়ে ভাবে এই দুনিয়ার সবাই তো আর পুলিশের চাকুরী করে বেঁচে নেই আবার সুরজিৎ ভাবে সুনীতাকে কিভাবে কেস করব । মেয়ের পড়াশুনাই বা কিভাবে চালাব । নতুন কাজে যোগ দিলে তো আবার নতুন হাজারো সমস্যা । সব জায়গায় তো আর শিক্ষা দিয়ে সব কাজ হয় না । ওয়ার্ক কালচার , ওয়ার্ক এবিলিটি চাই , যেখানে সুরজিৎ এর ঘাঠতি । সুরজিৎ ভাবে আমি তো লইয়ার ও ছিলাম , বিভাগে এফ্সি সিয়েন্ট হিসাবে খ্যাতি ও ছিল তমু ও কেন ------------ । উধ্বতন অনেক আধিকারিকরা অধস্তন কর্মচারীদের সাথে অনেক রকম অন্যায় করে থাকে এবং তা যুগ যুগ ধরেই চলেছে । কেউ বা ক্ষমতা দেখায় , কেউ বা ভাবে এটাই তাদের মুনাফা এত সমস্যা তবু ও সুরজিৎ এর মন চাই মুক্তি । ভাবতে ভাবতে বিছানায় সুরজিৎ দেখে তার স্ত্রী , কন্যা, ক্লান্ত শরীরে গভীর নিদ্রায় । নিদ্রাহীন সুরজিৎ এর চোখ খোলা জানালা দিয়ে সুরসুর বাতাস তার শরীরকে স্নিগ্ধ শীতল করে দিচ্ছে কিন্তু তবু ও ঘুম আসে না । ভোরের পাখীর কলরবে অস্থির সুরজিৎ বিছানা থেকে চুপিসারে উঠে বাইরে আসে, সে দেখতে পায় দলছুট এক সাদা বক ঠোটে একটি চিঠি নিয়ে ঠড়ে যাচ্ছে অজানা ঠিকানায় ।
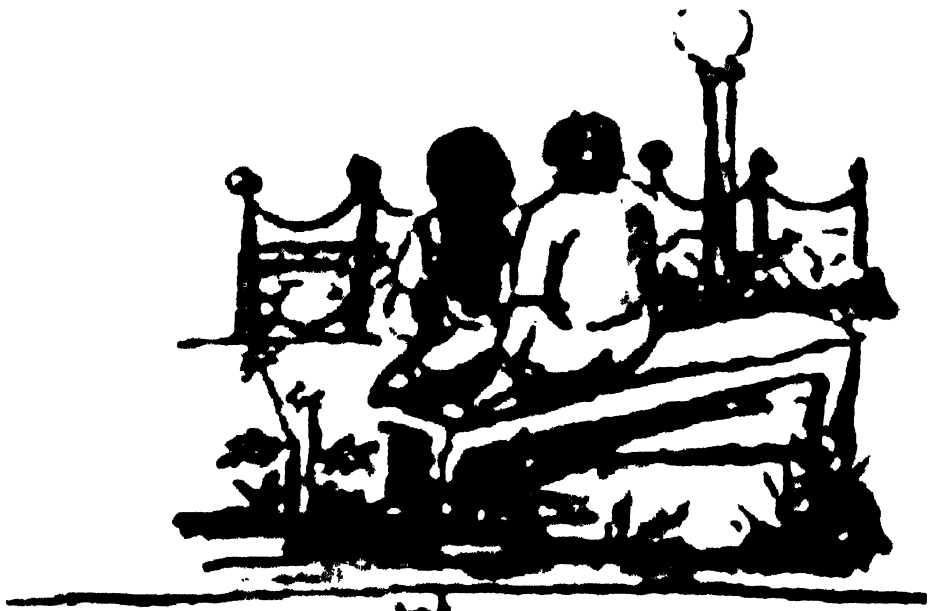
আত্মহত্যার চিঠি

কাজ করবার জন্যই হয়তবা মানুষের জন্ম। যদিও কাজের সঙ্গে পৃথিবীতে অস্তিত্ব টিকে থাকার কোনওসর্ম্পক নেই। একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা সবসময় কুর্নিশ করতে ভালবাসে কেউ বা দরিদ্রতা থেকে মুক্তি পেতে, কেউ বা সামাজিক অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে, কেউ বা অধিকারিককে সন্তুষ্ট রেখে নিজের কাজ হাসিল করতে আর কারো কারো ক্ষেত্রে কুর্নিশ হয় মজ্জাগত।

বেচেঁ থাকাটা ও প্রচন্ড যন্ত্রণা, সময়ে সময়ে সমস্যা গুলি তাই ভেবে তোলে। কারণ সমস্ত প্রকার যন্ত্রণার শেষ পরিণতি মৃত্যু। আর একাধিক এগোলে অপমৃত্যু। মনে হচ্ছিল আজ থেকে ১৮ বৎসর আগের সেই দিনটি, স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ পযর্ন্ত এক সাথে হাত ধরে গিয়েছিলো মৃনাল। ডিসেম্বরের কন কনে শীতের সকাল, খুব ভোরে সাইকেল নিয়ে যাওয়ার পথে খুনী লরী তাকে পিষে দিয়ে গেল, মুখমন্ডল ছাড়া সাইকেল সহ সমস্ত শরীরটুকুই থেৎলানো। কি অসহ্য মৃত্যু

যন্ত্রণা ।আমার যেন বারবার মনে হচ্ছিল ডাক্তাররা একটু চেষ্টা করলেই সে ভালো হয়ে যাবে। স্কুলে যাওয়ার পথে সে সবসময় বলত গৌতম পা চালিয়ে হাঁট , নইলে গিয়ে দেখব ক্লাশ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের ক্লাশ মিস্ হয়ে যাবে । মৃনাল লেখাপড়ায় মধ্যম ছিল তবে আগ্রহ ছিল খুবই বেশী । রোজকার মতো সে দিনটিও সে আমার থেকে হয়ত কয়েক পা এগিয়ে ছিল। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তা। মালভরা লরী তেড়ে আসছিল হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার, তারপর সামনে দিয়ে গুম গুম, শব্দে বেরিয়ে গেলো খুনী লরীটা। কয়েক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্দতা । আমি যেন কিছুই বুঝতে পারছিলামনা। যখন বুঝলাম তখন হাসপাতালে কুয়াশাচিরে দিনের রোদ ঝলমলে আলো এসে পড়েছে মৃনালের নিথর দেহের উপর । আমার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না, মৃনাল তো আমার সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই এক সাথে প্রাণচঞ্চল ছিল। তা কি হতে পারে আজ আমি আছি ও নেই? সুদীর্ঘ পথ ১৮ বছর চলার পথে স্বপ্নের মতো ভেসে আসে মৃনালের অতীত স্মৃতি মনে হয় কেন তুই চলে গেলি মৃনাল।

কবির সেই উক্তি স্মৃতিপটে উঁকি দিয়ে বলে গৌতম ''জন্মিলে মরিতে হবে কে কোথা হবে'' বড্ড মানুষের ভীড় । জীবন আর মৃত্যুর যে ব্যবধান তার মাঝখান টুকুতে সমস্যা সুখ, দূঃখ , হাসি, কান্না মনের সব ফালতু । কিন্তু জন্মের আগে মৃত্যুর পরে কি তা জানি না এখন তুইই বলতে পারিস মৃনাল।

যত দিন ছিলি শুধু দারিদ্রতার সাথে কঠোর পাঞ্জা লড়ে গেলি তবে তুই হারিসনি মৃত্যু তোকে জয়ী বলে ঘোষনা দিয়েছে ।আমরা যারা বেচেঁ আছি শুধু লোভ , আকাঙ্খা নিয়ে । যদিও জানি লোভ মানেই মনুষ্যত্বের পতন তবুও পিছু ধাওয়া.। বিকট বিকট শব্দে যেন ক্ষেত্র পতন । ভূ - কম্পন? সৃষ্টির সত্যতা উজার করে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ কেড়েঁ নিয়ে গুজরাটের ভূজ শহরের মত যেন সব গ্রাম শহর তলিয়ে যাচ্ছে গভীর অন্ধকারের খাদে?

এ যেন এক পূণ্য লগ্ন ২৬ শে জানুয়ারী ২০০১ গনপ্রজাতন্ত্র দিবস অন্য দিকে প্রকৃতির ধ্বংস লীলা , নাকি কোন মানুষের সৃষ্ট কেড়ে অস্ত্রে খান খান হয়ে যাচ্ছে সভ্যতার ভূমি? মৃত্যু কেড়ে নিয়ে গেলো জীবনের সৃষ্টি গুলো। তাহলে মৃণাল তুই বলতো কেন অপমৃত্যু একটি মৃত্যু হয় না । মৃত্যুর পর তো কোন হতাশা ও থাকে না । উচ্চাঙ্খাও থাকে না । শুধু কৃত্রিম যন্ত্রটুকু বন্ধ হয়ে গেলেই তো মৃত্যু পড়ে থাকে নিথর দেহ । মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির ইতিহাস মৃতের কাছে মূল্যহীন হয়ত কীর্তিগুলো সভ্যতার বুকে ছাপ রেখে যায়।

দু মেয়ের পর এক ছেলে । তাই বাবা আদর করে নাম রেখে ছিলেন গৌতম। মা ডাকতেন বুদ্ধ, মা বাবার আদরে আপ্লুত হয়ে পড়তাম। অভাব কখনো ও বুঝিনি । বাবা ছিলেন নামীদামি

উকিল যদিও মোক্তার থেকে উকিল । সে সময় বাবকে খ্যাতনামা উকিল হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছে কিন্তুআমি বাবার চাইতে অনেক বেশী লেখাপড়া শিখে ও বাবার মতো হওয়া তো দূরের কথা নিজে বাঁচার মতো আর্থিক ক্ষমতা ও অর্জন করতে পারিনি। বাবা ছিলেন ব্যস্ত মানুষ আর আমি সময় কাটাতেই অসুবিধেয় পড়তে হয়। দু বোন , আমি ও মা আমাদের সবার ভার ছিল বাবার উপর তার পরে ও ছিল ছেলে মেয়েদের উপর তীক্ষ্ন নজর । তাই বলেই আমি মৌসুমীকে বিয়ে করব এই ব্যাপারে বাবার ছিল ঘোর আপত্তি। কিন্তু প্রেমের গভীরতা শরীর পর্য্যন্ত ছেয়ে গিয়েছিলো । যা থেকে ফিরে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বাবার পরিষ্কার বারণ অসবর্ণ মেয়ে কখনো ব্যনার্জী বাড়ীর বউ হতে পারে না । মৌসুমী এসব জেনেও কখনো এসব সেকালে কথার পাত্তা দেয় নি । মৌসুমী আমাই বলত সেকালে সমাজ ব্যবস্থা আমাদের বেধেঁ রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু বন্দী জীবন কখনো ও কোন বড় কাজ করতেই পারে না ।

সেকালে লোক নিজেদের কথাই বেশী গুরুত্ব আরোপ করে আমি ও সব নীতিকথায় বিশ্বাসী নই ।

মৌসুমীর দৃঢ় মন্তব্য আমাকে আরো দুর্বল করে দিত সুতরাং ও কে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

কিন্তু বাবার উক্তি ছিল ছেলেদের জীবনে অনেক মেয়ে মানুষই আসে তাই বলে কাউকে বিয়ে করতেই হবে তা কি ? বউ মরলে আবার বিয়ে করবে এটাই ছেলেদের কাছে স্বাভাবিক। বাবার কথায় কত মেয়ে অ্যাবরসন করছে তাই বলে কি ছেলেই সব মেয়েকে বিয়ে করছে নাকি ?

সুতরাং তুমিও মৌসুমী মেয়েটাকে জীবন থেকে ছুটি দিয়ে দাও । কিন্তু বাবার মুখের উপর অসম্ভব বলার সাধ্যি আমার ছিল না । যদিও এম এ পাশ কিন্তু ঠাঁই বেকার । বাবার হোটেলেই একমাত্র আশ্রয় । ভাবতে লাগলাম মৃণাল তুই কত সহজেই না চলে গেলি । এসব কথাগুলো শোনার ও কোন লোক আজ আর নেই যদি তুই থাকতি তোর কাছে মন খুলে সব বলতাম হয়ত তুই বিচক্ষণের মতোকোন না কোন পথ খুজে দিতি ।সব কথা কি মৌসুমীকে বলা যায় । কিছু বললেই সে উড়িয়ে দিয়ে বলত তোমার আছে শুধু চিন্তা রোগ, রাখো তো ও সব অসার কথাবার্তা । আমি যখন মৌসুমীকে বলতাম মুক্তির উপায় নেই তখন সে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করত কিসের মুক্তি । মনের ভেতর উত্তরটা থেকে যেত বাবা স্বচ্ছল কিন্তু দু বোন বিয়ের বাকী তারপরে আর কিছুই নেই । আমার অক্ষমতা আমাকে দারিদ্র আর হতাশ করে দিয়েছে । মৌসুমী বলত তোমার তো কোন কিছুটাই নেই সুতরাং তোমার আবার কি মুক্তির দরকার । সারা দিন ভবঘুরের মতো দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ালে চিন্তা রোগ আসাটা স্বাভাবিক । কিছু কাজ করো , ট্যুইশান করো সব দেখবে

ঠিক হয়ে যাবে। ভাবলাম পৃথিবীটাই কাজের জন্য কাজ না থাকলে না করতে পারলে বেচেঁ থেকে ও কোন লাভ নেই। আীম বুঝতাম মৌসুমী আমার হতাশা টুকু উপলব্দি করে , কারণ সে তো ব্যাঙ্কে চাকুরী করে কিন্তু আমি তো বেকার । এক দিন ছুটির দিনে আমায় নিয়ে চললো সিপাহীজলা ওর নিপছু যায়া ছাড়া আমার তখন আর কিছুই করার ছিল না। লেইকের ধারে বসে দু জনে গল্পে মত্ত । এমন সময় ভদ্র পোষাকে এক জাঁক ছেলে মেয়ে এসে হাজির । মৌসুমীকে দেখে সবাই বলে উঠে এই মৌসুমী, মৌসুমী ঘুরে দাঁড়ায় বলে গৌতম এরা সবাই আমার কলেজের বন্ধু । এর মাঝে মৌসুমীর এক বন্ধু বলে উঠে মৌসুমী এই জনই নাকি । কি করে --------- বেকার অপর প্রান্তথেকে অপর বান্ধবীর উক্তি আরে আজকাল এরকম বখাটে আকাট বেকারের সঙ্গে কেউ প্রেম করে নাকি ?

মৌসুমীর চটপট উত্তর তাতে তোর কি ? সব রকমের সঙ্গেই প্রেম করে দেখতে হয়। তা রপর বলল গৌতম চল, সামনেই বন্দী পাখির খাচাঁ সেখানে দাড়িয়ে ঠাঁই দেখলাম , প্রকৃতির কি অমোঘ মিলন। আমার অস্ফুষ্ট শব্দ বের হয়ে গেল কী সুন্দর।

মৌসুমী বলে উঠল চল ফিরি ।আমার যেন শরীরের ভেতরে বাইরে যন্ত্রণা হচ্ছিল সবখানেই শুধু তুচ্ছ তাচ্ছিল্য । কিন্তু আমি যে তোমাই ভালবাসি আর সেই জন্যই আমার পরিবার আমাকে সহ্য করতে পারে না । মৌসুমী বলে উঠে তোমার মন কেন খারাপ কর আমি তো আছি। বাঁচব তো এক সাথে মরব তো এক সাথে । এতো ভাববে না তো।

লাঞ্ছনা , গঞ্জনা যাই হোক বৌসুমী কিন্তু আমায় ভালবাসে এ ভেবে রাতে ঘরে ফিরে আসি। কিন্তু য যন্ত্রণা যে অসহ্য , আমি তো বেকার , রোজগারহীন এক দামার যুবক । মার আদরের বুদ্ধ এজে যেন অশুচি । সদর দরজায় পা রাখতেই মার উক্তি যে পথে এসেছো সে পথেই যাও। এখানে কনে? বাবা বলে উঠলেন ভাতের সাথে ছাঁই দিয়ে দাও। বোনের উক্তি সে তো চাকুরী করে তা হলে তোকে রেখে দেয় না কেন । থাকা খাওয়ার জনৱ এ বাড়ীতে পা না বাড়ালেই হয়। এ যেন অভিমন্যুর উপর কৌরব সেনাদের চতুর্মুখী আক্রমণ। তবে কি মৃত্যুই শ্রেয়। দাড়াঁবার শেষ পথটুকু ও যেন বন্ধ হয়ে গেছে। কুকুরের মতো রীতিমতো তাড়া খেয়ে শোবার ঘরে ডুকে পড়লাম । ভাবলাম সাদা কাগজে লিখলাম আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমার বেকারত্ব হতাশা, ব্যক্তিগত দারিদ্রতা । কত কথাই মাথাই আসছে কিন্তু কি লিখব । বনে পড়ল ডিসেম্বরের সাত সকালে অ্যাক্সিডেন্টের এ মৃণাল এর মৃত্যু হয়েছিল । যেহেতু তা ছিল দুর্ঘটনা সেহেতু সে কোন সুইসাইড নোট লিখে যায় নি। আজ ডিসেম্বর পেরিয়ে জানুয়ারীর মাঝরাত্রি । আমি বসে বসে লিখছি অঅর ভাবছি মৃণাল সত্যিই তুই সবচেয়ে বেশী সুখী। তা রপর লিখি আমার এই লেখাটুকু হয়ত অনেক ছেলের প্রাণ বাঁচবে পরিবারের সকলে কনজাভেটিভ মানসিকতা পাল্টাবে। প্রেমিকারা হতে চেষ্টা করবে ঠিকম আমার মৌসুমীর

মত । বুদ্ধদেবের সাথে লড়াই করে ভালবালার মর্যাদা দেবে প্রয়োজনে ভালবাসার জনব মরতে ও চাইবে । যদি ও মৃণালের মৃত্যুতে কলেজ ছুটির হয়েছিল । ফুলে ফুলে সাজিয়ে মৃণালকে চিতায় উঠিয়েছিল কিন্তু হয়ত বা আমার জন্য কারো ততো আপসোস থাকবে না। শুধু মৌসুমী ছাড়া আর হয়ত স্মৃতি থাকবে মৃণালের মৃত্যু একটি নিছক দুর্ঘটনা আর আমার ঝুলন্ত শরীরটাকে লেখা হবে। অপমৃত্যু নিশিত রাত্রি জীবনের শেষ কথাটুকু বলে গেলো।

যাযাবর

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেলো কাঠালতলীর " **রায় আয়রণ কোম্পানী** " এই কোম্পানীর কাজ দিয়ে জীবন জীবিকা চলতো মধুবন কলোনীর মোটামুটি পঞ্চাশ পরিবারের। বছর তিনেক হলো কোম্পানী বন্ধ শ্রমিকেরা বেকার । এই কোম্পানী থেকে মাইল দু - এক দূরে আগরতলা - বিশালগড় রাস্তার পাশে হাপানিয়াতে আছে রাজ্যের একমাত্র জুটমিল , সেখানে ও শ্রমিকের প্রয়োজন নেই । তাছাড়া আয়রণ কোম্পানীর শ্রমিক জুট মিলের জন্য দক্ষ ও নয় ।

বন্ধ কারখানার শ্রমিক রমেন্দ্রের ছেলে নারায়ণ বয়স ষোল ছুঁই , ছুঁই কর্মঠ, এখানে ওখানে কাজ করে একটি ঠেলা রিক্সা যোগাড় করে । ভোররাতে মায়ের সঙ্গে ঘরে বসে ঘুগনি তৈরী করে,

পরটা বানায় , সকাল হতেই ঠেলা রিক্সা করে ঘুগনি , পরটা, আর কয়লার চুলো, কেটলী কাপ নিয়ে ছুটতে থাকে। আগরতলা - বিশালগড় রাস্তার পাশে , জুটমিলের সদর দরজায় যেখানটাই বাসস্টপেজ। জুটমিলের শ্রমিকরা রাত্রির ডিউটি সেরে নারুর কাছে পরটা , ঘুগনি আর গরম চা খেয়ে বাসে উঠে। তা- ছাড়া ও যাত্রীরা নারুর অস্থায়ী দোকানে সকালে টিফিন করে । জুটমিল গেইটে নারু এখন পপুলার । বেলা দশটা / এগারটার মধ্যেই নারু বিক্রি সেরে ঘরে ফিরে যায়। হিসেব নিকেষ , লাভ লোকসান নারু খুব ভালই বোঝে , কারণ সে সেভেন পযর্ন্ত পড়াশুনা করেছিল ।

নারুদের মতো আর ও পঞ্চাশ পরিবার ওই আয়রণ কোম্পানীর দেওয়া একচালা ঘরে থাকে , নয় নয় করে ও এই জায়গায় বারো বছর হতে চলল । তবে জমিগুলো তাদের নয় কোম্পানীর মালিকের বছর তিনেক হয়ে গেলো কারখানা তালা বন্ধ মালিক ও এখানে থাকেন না । আর শ্রমিকের খবর কে রাখে ? কারখানার ভেতরের শেড থেকে টিন খুলে নিয়ে গেছে চোরেরা কেবল ভেতরে ভারী যন্ত্রপাতিগুলো আছে , অনেক কলকব্জা ও লোপাট হয়ে গেছে কারখানার পাঁচিলের কোথা ও কোথা ও ধসে পড়েছে। ইট গুলোতে শ্যাওলা জমেছে । তারকাঁটায় জং ধরেছে । অফিসের দরজা , জানলা অবশিষ্ট নেই ।

শুধু মেনগেটের সামনে লিখা আছে " রায় আয়রণ কোম্পানী" তাতে ও মরচা ধরেছে । শক্ত মজবুত লোহার গেইটটা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় তাতে ও মরচে ধরেছে ।

নারু বাবা রমেন্দ্রের কাছে গল্প শোনে তাদের পুরানো বসতবাড়ী ছিলো বাগানবাড়ী। সেখানে তাদের জায়গা, জমি, গবাদি পশু , ফলের বাগান সবই ছিল। জমজমাট এলাকার বাজার ছিল গাবর্দী রাজ্যের বিখ্যাত ছানার পায়েস , রসমালাই , রসগোল্লা ইত্যাদি মিষ্টি সেখানে বিক্রি হতো সকাল সন্ধ্যা জম জমাট হাট বসত । এলাকার মানুষজন ছিলো সচ্ছল । এখন ওই জায়গাটা যেন " মৃত্যের ভুমি" কৌতুহলী নারুর চোখের জিজ্ঞাসা বাবা তবে কেন আমাদের এতো কষ্ট । আমার ও দিদি পারুলের পড়াশুনা ও বন্ধ করে দিলে। চল্ আমরা আবার পুরানো বাড়ীতে ফিরে যাই। রমেন্দ্র ছেলে নারুকে বলে , বাবা কখনো ও আর সে বাড়ীতে ফিরে যাওয়া হবে না । ওইখানে এখন আর কেউ নেই , আমাদের বাড়ীগুলো এখন বিশাল বিশাল , রবার , সেগুন বাগান হয়ে গেছে । আর ওখানে গিয়ে থাকা যাবে না । নারু জিজ্ঞেস করে তাহলে তোমরা কেন ওই জায়গাটা ছেড়ে আসলে ? কৌতুহলী ছেলের প্রশ্নের উত্তরে রমেন্দ্র ছেলে নারুকে সেই কালো রাতটির ঘটনা বলতে শুরু করে । রাতটি ছিল ১৯৯৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী । পরেরদিন সরস্বতী পূজো , বাগানবাড়ি গ্রামের বেশীর ভাগ ছেলে পুলেরা সজাগ ছিল। কেউ বা গ্রামের পূজোতে ডেকোরেশান করছে , কেউ বা মূর্তি সাজাছে , কেউ বা গপ্পো করছে । স্কুল ছাত্ররা স্কুলের বারান্দায় প্যান্ডেল সাজাছে । বয়োঃজ্যেষ্ঠরা হয়ত মাত্র

শুয়েছে । রাত তখন ১১ টা , হঠাৎ গ্রামের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত ছড়াছে , একে একে গ্রামের বাড়ীগুলো , পুড়ে যাচ্ছে , বিকট চিৎকার , বুকফাটা কান্না , শিশুর আর্তনাদ , বৃদ্ধ , বৃদ্ধা , যুবক - যুবতী কিশোর কিশোরীর উর্দ্ধশ্বাস পলায়ণ যে যেদিকে পথ পায় সেদিকেই পালাতে শুরু করে । আমি তোর মা , দিদি ও তোকে নিয়ে গহন অরণ্যে লুকিয়ে পড়ি । আগুনের লেলিহান শিখা জঙ্গলকে ও আলোকিত করে ফেলে। পুরো গ্রামটি পুড়ে ছাই হয়ে যায় । আগুনের লেলিহান শিখায় দেখতে পাই ৩০ /৩৫ জনের নরখাদক জঙ্গী দলটি নির্বিচারে গ্রামটি জ্বালিয়ে দিচ্ছে এলোপাথারী গুলি চালাচ্ছে তাদের হাতে থাকা কালশনিকভ্ রাইফেল থেকে । নির্বিচারে নরমেধ যজ্ঞে মেতেছে ওরা । ওরা হৃদয় বিহীন, সারারাত ওরা অগ্নির বহ্নিৎসব আর নিরপরাধ মানুষের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে ।

ভোরের আলো ফোটার আগে নরপশুরা - মানুষের রক্ত খেয়ে পিপাসা মিটিয়ে পুরো গ্রামটাকে ছাই করে দিয়ে চলে গেছে । দুই বছরের শিশু প্রসেনজিৎ এবং বিটু ও তাদের হাত থেকে মুক্তি পায়নি । মানুষরূপী হায়নাদের গুলিবৃষ্টিতে ঝাঝড়া হয়ে যায় নিরপরাধ ফুলের মতো কোমল শিশুরা । দানবদের আক্রমনে আমাদের গ্রামের পনেরো (১৫) জন ঘটনাস্থলেই মারা যায় , তা ছাড়া ও অনেকে গুলিবিদ্ধ হন । পূজোর আনন্দ বিলীন হয়ে গেছে পুরো গ্রামে শ্মশানের নিস্তব্দতা " মৃতের ভুমি"

বাগানবাড়ী গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । তা আজ কেবল স্মৃতি । হয়ত আরো কিছুদিন বাদে প্রবীনেরা বাগানবাড়ী নিয়ে চমৎকার , চমৎকার ঘটনা বলবেন, কারণ বাগানবাড়ী গ্রাম ছিল শান্তির অফুরান ভান্ডার যদি ও আজ শ্মশান ,আর মৃতের ভুমি।প্রগাঢ় শান্তির অনেক গুঢ় তত্ব মানুষের জীবন দর্শনের সাথে একাকার হয়েছিলো বাগানবাড়ী গ্রামে । পরম্পরাগত শান্তির গ্রাম বাগানবাড়ী আজ হারিয়ে গেছে তবু ও বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে মনে আসা ঘটনাগুলো তোকে বললাম্ । বাবা আর কিছু জিজ্ঞেস করিস্ নে । রমেন্দ্র ছেলে নারুকে এ কথা বলে , আরো বলে প্রচন্ড কষ্ট হয় রে বাবা । বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত লোকেরা এসে ঘর বাধে আয়রণ কোম্পানীর জায়গায় সম্পূর্ন ভাবে বিধ্বস্ত , নিঃস্ব , সাথে স্বজন হারানোর যন্ত্রণা , নিয়ে শ্রমিকের বেশে , জীবন জীবিকার সন্ধানে 'রায় আয়রণ কোম্পানীর ' শ্রমিক হিসাবে কাজে যোগ দেন এবং কোম্পানীর বাদান্যতায় যোগার হয় অস্থায়ী ঠিকানা । যার নামকরণ হয় মধুবন কেলানী হিসাবে । আয়রণ কোম্পানীতে সকাল -বিকেল- রাত তিন শিফটে পুরোদমে কাজ চলত। সবসময় মানুষের ভীড় । ট্রাক , লরি ডুকত - বেরোত মাল বোঝাই হয়ে ট্রাকের পর ট্রাক বেরোত । অন্ততঃ মধুবন কলোনীর শ্রমিকেরা দু -বেলা সন্তান সন্ততি

নিয়ে পেট ভরে ভাত খেতে পারত । কিন্তু এখন তা ইতিহাস । বলতে বলতে রমেন্দ্রের গলা ধরে আসে । বাস্তুভিটা হীন কারখানায় চাকরী খোয়ানো লোকগুলোর যেন জীবন সিঁড়ি ভেঙ্গে যাচ্ছে । জীবনের রাস্তা বড্ড চড়াই । বেঁচে থাকার জন্য একটার পর একটা কাজ কিন্তু সবই যেন খড়কুটোর আয়ু । অখাদ্য - অপুষ্টিতে মধুবন কলোনীর লোকেরা,শিশুরা রুগ্ন হয়ে গেছে । কর্মসংস্থানহীন , খাদ্যাভাব । এর মধ্যেই অন্ত্রিকের প্রকোপ শিশুবৃদ্ধ সহ - ন - জন মারা গেছে , আর্থিক সংকট , চিকিৎসার অভাব। এরই মধ্যে মারা গেছে পরেশের জোওয়ান ছেলে শ্যামলাল । কাল হয়তো আবার কেউ মরবে সবই যেন ভগবানের খেলা - বলে উঠে রমেন্দ্র। সন্ধ্যায় রমেন্দ্রের ছেলে নারু কলোনীতে এসে এমন কথা বলল , পুরো কলোনীতে শ্মশানের নিস্তব্দতা নেমে এলো । নারু বলল সে শহর থেকে শুনে এসেছে মধুবন কলোনীর দিন এবারে শেষ হতে চলল । সে শুনেছে রায় আয়রন কোম্পানীর মালিক , কারখানা সহ সমস্ত জায়গাটা বাইরের এক কোম্পানীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে । তারা নাকি এখানে গ্লাস ফ্যাক্টরী করবে । কাগজে নাকি খবর ছেপেছে । কলোনীর লোকজনদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে । কারণ ওই কোম্পানীর নিজস্ব দক্ষ শ্রমিক আছে । সঙ্গে সঙ্গে কলোনীর সবার মুখে চোখে অন্ধকার নেমে আসে । সবাই ঘিরে ধরল নারুকে । তবে এখন যাবো কোথাই ? পরেশ পুত্রহারা পিতা কিন্তু পরিবার তো বাঁচাতে হবে , ভাঙা গলায় শুধোল। আমরা তো পুরানো কর্মচারী আমাদের কাজে নেবে তো ? রমেন্দ্র প্রশ্ন করল " আরে ধুত , তা কি হয় ! এই কারখানার জমিতে এবারে গ্লাস তৈরী হবে , নামই তো গ্লাস ফ্যাক্টরী । সবার মুখ ভার যদি সত্যিই এখান থেকে উঠে যেতে হয় তবে পরবর্তী গন্তব্য কোথায় হতে পারে , সেই দুশ্চিন্তাই মুখ চোখে খেলে বেড়াতে লাগল । নারু হাত পা নাচিয়ে চলে গেল স্বপ্নাদের ঘরের দিকে । নারুর নাকে মাংস রান্নার গন্ধ এলো , নারু বলে উঠল কার ঘর থেকে মাংসের গন্ধ আসে রে .... খেয়ে নে , দ্রুত চলে যেতে যে হবে , এখানকার পাট উঠল বলে - এখান থেকে উঠিয়ে দিলে কোথায় থাকো দেখব । স্বপ্না জবাব দিল না , একটু পরেই বিড়বিড় করল, আমরা হতভাগা গৃহহীন , বাবার ভিটেয় যখন স্থান হলো না , আমাদের নিয়ে যা ইচ্ছে করা যায় ইচ্ছে করলে মালিকরা ওজনদরে ও বিক্রি করতে পারে । পরের দিন রাত্রিতে হঠাৎ ট্রাকের শব্দ শুনে পরেশ রমেন্দ্ররা ঘড় থেকে বের হয়ে দেখতে পায় কারখানাতে ট্রাক ঢুকছে অনেক মেশিন , যন্ত্রপাতি নিয়ে সাথে জনা - বিশেক উর্দি পরিহিত পাবলিক সিকিউরিটি গার্ড। তাদের ক্লিষ্ট জীবনের ছেড়া খাতায় অন্ধকারের চোরা হাতছানি । দুঃখ , কষ্ট , ক্লেষ , গ্লানি ক্লেদ, ক্ষুধা নিয়ে এ একটা আলাদা সমাজ । শেষরাতে কলোনীর কোনে স্বপ্নার ঘর থেকে গোঙালী কান্নার শব্দ শুনে পরেশ এসে রমেন্দ্রকে ডাকে , কি -রে অভাবী তো আমরা সাবই । তাই বলে কি নিতাই স্বপ্নার ঘরে কোন ঝামেলা বাধল নাকি । প্রচন্ড গোঙানীর শব্দ

পাচ্ছি । চল গিয়ে দেখি আবার কি ঝামেলা ? চোখ কচলে অন্ধকার সইয়ে নিল পরেশ। তারপর কান খাড়া করে বলল , হ্যাঁ মেয়ের গলা বলে মনে হচ্ছে । যন্ত্রণার কান্না আর গোঙানি , পরেশ , রমেন্দ্র এগিয়ে যেতেই ঘর থেকে ঘোমটা দিয়ে স্বপ্না আর নিতাই বেরিয়ে এলো সাথে শিমূলী দাই । কালো মুখে সাদা দাঁতে ফেটকে হাসল শিমূলী দাই , বল্লো ,স্বপ্নার মেয়ে বীনার ঘরে ছেলে হয়েছে , ছেলে - একাশো টাকা লাগবে কিন্তু - যাও এবার গরম কাঁথা চেপে দাও , ঘুঁটের আগুনের সেঁক দাও , পারলে বীনাকে একটু গরম দুধ খাওয়াও। অমিয় অর্থাৎ বীনার স্বামী অন্ধকারে একা উবু হয়ে বসেছিল । এবার সে উঠে দাঁড়াল । দেখল তার চারপাশে কলোনীর সব মানুষ । এই কলোনীতে প্রথম ছেলের জন্ম । হ্যারিকেন নিয়ে সবাই দেখল ফুলের মতো একটা বাচ্চা খুদু খুদু চোখ , মুঠি করা দুটো হাত , কোলাহলে ওয়াঁ ওয়াঁ শব্দে কেঁদে উঠেছে । নিতাই বলে উঠে কাজকর্ম নেই , কী করে বাচ্চাটাকে ভরনপোষণ দেবে বীনা , অমিয় আশ্চর্য্য লাগছে । আসলে রোজগারের সাথে বাচ্চা হওয়ার যে কোন সম্পর্ক নেই । বাচ্চা হওয়ানো যায় না । রমেন্দ্র বলল এ যে ঈশ্বরের দান নিতাই । এমনটা বলবি না। মাঝরাতে কলোনীর মহিলাদের উলুধ্বনি , কাসর ছড়িয়ে গেল কলোনী থেকে কারখানার আনাচে কানাচে মনে হল প্রভু জন্মনিয়েছে সাথে দিয়েছে বেরোজগেরে মানুষদের কর্ম। পরেশ বলল যত ঝড়ই আসুক জীবন কিন্তু ঠিক চলবে। অমাবস্যা , পূর্নিমা , ঝড় বৃষ্টিতে টালমাটাল হলে ও মুখ থুবড়ে পরবে না । একটা না একটা পথ নতুন করে আবার তৈরী হবে । যেভাবে আমরা বাগানবাড়ীর স্বচ্ছল গৃহস্থের জীবন ছেড়ে এখানে মধুবন কলোনী গড়েছি হয়ত একদিন পুনরায় সুন্দর জীবন তৈরী হবে। শিশুর আগমন তার পূর্ব ইঙ্গিত। বিধি বাম, পরদিন সকাল দশটায় কারখানা কতৃপক্ষ নোটিশ ধরাল উচ্ছেদের জন্য । নোটিশ পেয়ে কেউ কেউ কেঁদে ফেলল । কেবল কাদঁল না নারু অর্থাৎ নারায়ণ । সে বলে উঠে আমরা যাযাবর , উচ্ছেদ হবো তাও ছিল আমাদের সবার জানা আমাদের ঠিকানা হোক সেই পুরানো “ মৃত্যের ভুমি”

মাফিয়া

মৃনালবাবু প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, সাধারণ জীবনযাত্রা, ভদ্র নির্ভেজাল মানুষ হিসাবে যোগেন্দ্রনগর এলাকাতে সুপরিচিত। দীর্ঘ ১৮/১৯ বৎসর যাবৎ যোগেন্দ্রনগর এলাকাতে শিক্ষক শিশিরবাবুর বাড়ীতে ভাড়া থাকেন। এমনিতে মৃনালবাবুর বাড়ী ছিল অধুনা ধলাই জেলার মনু এলাকাতে। চাকুরী প্রায় ২১ বৎসর হয়ে গেছে। চাকুরী সুত্রে আগরতলায় আসা, যাতায়াতের সুবিধার্থে যোগেন্দ্রনগর অপর শিক্ষক মহাশয়ের বাড়ীতে ভাড়া থাকেন। বিয়ে করেছেন ২০ বৎসর আগে এবং নববধু নিয়ে প্রথমে শিশিরবাবুর বাড়ীতেই উঠেন। এবং ক্রমে ক্রমে এই বাড়ীতেই মৃনালবাবুর দু - মেয়ের জন্ম, বড়মেয়ে রুমি, ছোট মেয়ে ঝুমি। বড় মেয়ে রুমি, একাদশ শ্রেণী থেকে উর্ত্তীন হয়ে দ্বাদশ শ্রেণীতে উঠেছে। ছোট মেয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। মৃনালবাবু উনার স্ত্রী রুপালীদেবীর অনুরোধে মেয়েদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে পড়াশুনার কথা ভেবে মৃনালবাবু মনু এলাকাতে উনার পিতৃভুমি বিক্রি করে যোগেন্দ্রনগরের পাশে শ্যাম নগরে তিন গন্ডা ভু -খন্ড দেখেন, যখন জায়গা কেনার কথাবার্তা প্রায় পাকা তখন একদিন একটি মোটর বাইকে করে দুই

যুবক উনার সামনে হাজির, উনি তখন স্কুল থেকে বাড়ী ফিরছিলেন । পিচরাস্তার উপর দাড়িয়ে হাট্রাকাট্রা দুই যুবক উনাকে একগাল হাসি হেসে , বলে উঠে নমস্কার মৃনালদা। আপনি তো শিশিরবাবুর বাড়ীতে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া থাকেন । শুনেছি আপনি আমাদের পাড়ায় জমি নিচ্ছেন , ভালই হবে আমাদের এলাকাটা ভাল। আপনি ও তো বড্ড ভালমানুষ । ঠিক আছে প্রয়োজন হলে ডাকবেন । আমরা এ পাড়াবই ছেলে। আমাদের ক্লাবের নাম " সমাজসেবক সংঘ " আমার নাম বিষ্ণুপদ সরকার। আর এ কিশোর দাস । মৃনালবাবু বলে উঠে ভালই হয়েছে অন্ততঃ আপনাদের থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে । বিষ্ণু বলে উঠে মোলায়েম সুরে । আপনাকে এ পাড়াতে কোন চিন্তা করতে হবে না । বাড়ী তাহলে এবার শুরু করছেন ? মৃনালবাবু বলেন ভাবছি ভগবানের নাম নিয়ে জমিটা কিনে কাজটা শুরু করব । কিশোর বলে , খুব ভাল , আপনাদের মতো লোকেরা এখানে ঘরবাড়ী তৈরী করলে জায়গাটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠবে । তা - ছাড়া দেখুন না লোকেশনটা খুব চমৎকার কাছাকাছি ট্রেনলাইন , সামনেই বাসষ্টান্ড, স্কুল সবই কাছাকাছি । বিষ্ণু ঝকঝকে হাসি হেসে বলে " দাদা" তো শিক্ষক , তাই না ? মৃনাল বিস্মত হয়ে জিজ্ঞেস করে , আপনারা জানলেন কী করে ? না পাড়াতে নতুন লোক আসছে খবর তো নিতে হয় , তার উপর সমাজ সেবক সংঘ মানুষের জন্য কাজ করে , তাই খোঁজ খবর তো রাখতে হয় । এটাকে আমরা সামাজিক কর্তব্য মনে করি । তা- ছাড়া জমির মালিক ও তো এ - পাড়ার, একমাত্র ছেলে বাইরে চাকুরী করে তার জন্য চলে যাচ্ছেন । নয়তো দাদা ও কি যেতেন ?

উনিই বুঝি আপনাদের বলেছে ? বিষ্ণু ও কিশোর কোন জবাব দিল না । বিষ্ণু আর একটু চওড়া হাসি হেসে বলে দাদা , আপনি এখানে জমি কিনবেন , বাড়ী বানাবেন আমরা প্রচন্ড খুশী । আরো সু -খবর হলো আপনি নিশ্চয় শুনেছেন এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হবে পাশের মাঠটিতে কচিকাঁচাদের জন্য তৈরী হবে একটি 'চিলড্রেন্স পার্ক' । যার জন্য আমাদের সবার প্রচেষ্ঠায় একটি উন্নয়ন সমিতি ও তৈরী হয়েছে কারণ তা এলাকার মানুষ ও চান । এখন থেকে মৃনালদা আপনি ও সমিতির একজন হয়ে গেলেন ।

মৃনালবাবু মৃদু হেসে বললেন , অবশ্যই কিশোর বলে দাদা ছোট একটা নিয়ম আছে । কাজ শুরু করার আগে আপনাকে এলাকাভিত্তিক ভাবে মেম্বারশিপটা নিতে হবে , চাঁদা বেশি নয় । এলাকার উন্নতিতে তা ব্যায়িত হবে ।

মৃনালবাবু বলেন এক্ষুনি তো টাকাটা ,নেই না ,এ কি বলছেন , এখন কাজটা আপনি শুরু করেন টাকা পয়সার ব্যাপারটা পরে হবে । সন্মান দেখিয়ে কথা বলে বিষ্ণু ও কিশোর বাইক ষ্টার্ট দিয়ে চলে যায়। মৃনালবাবুর অস্বস্তি বাড়তে থাকে । ইত্যবসরে মৃনালবাবুর জমির লেনদেন করেন , এক শুক্রবার

জমির রেজিষ্ট্রি হয়। সেই দিন পুনরায় সন্ধ্যায় বাইক নিয়ে কিশোর ও বিষ্ণু মৃনালবাবুর ভাড়া বাড়ীতে উপস্থিত। ঝুমা ডাকতে শুরু করে বাবা দু -জন কাকু এসেছে তোমার সাথে দেখা করতে। অমনি মৃনালবাবু ঘর থেকে
বেরিয়ে আসেন দেখেন সেই দুই ছোকরা কিশোর ও বিষ্ণু। মৃনালবাবুর ভুরুতে হালকা ভাঁজ পড়ে। মৃনালবাবু বলে ঘরে আসুন না, ওরা বলে দাদা সময়টা কম, চাঁদাটা দিয়ে দিলে ভাল হয়। মৃনালবাবু জিজ্ঞেস করে অংকটা কত। ওরা বলে আপনি নতুনবাড়ী করছেন অনেক খরচপাতি হবে তাই আপনার থেকে কি বেশী নেওয়া যাবে। অন্যেরা মেম্বারশীপ প্রতি ১০ হাজার টাকা দেন, আপনি আট হাজার দিলে হবে। তা -ছাড়া এলাকাতে আপনি নিশ্চিত কেউ কোন প্রকার হুজ্জতি করতে পারবে না। মৃনালবাবু ভেতর ঘর থেকে গিয়ে টাকাটা এনে গুনে ওদের হাতে তুলে দেয়, ঘরে তখন ছিল মৃনালবাবুর বন্ধু অপরেশ রায়, অপরেশ বলে উঠে কেন এত টাকা দিলে? ও সব সমাজ সেবার নামে স্রেফ চাপ। সব নিজেদের পেটপূর্ত্তি আর অগ্রিম ট্যাক্স দিলে, মৃনালবাবু বলে উঠলেন কি করা যাবে বল্। এলাকায় থাকতে গেলে ---- এ ছাড়া অন্তত ছেলেগুলো তো হাতে রইলো। দ্যাখ বন্ধু আজকাল বাড়ীঘর, জমি কিনতে কত হ্যাপা, এই টাকাটা দিয়ে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় তবে মন্দ কি? চলে ভিতপুজার প্রস্তুতি ভিত পুজোরদিন পুরুতমশাইয়ের পাশে মৃনালবাবু আর স্ত্রী রুপালী বসেছে হাত জোরে। ভীত পুজো সর্ম্পূন হল। নিয়ম কানুন করে স্বর্ণ, রৌপ্য আর কতকিছু দিয়ে, সবার মিষ্টিমুখ করানো হল। হঠাৎ মোটরবাইকে করে একাই এলে কিষ্ণু। বললো দাদা আমি কি মিষ্টিমুখ থেকে বঞ্চিত। মৃনালবাবু বলে উঠে, আরে না, না ভাই আসুন। বিষ্ণু মিষ্টিমুখ করে নানাহ্ গপ্পো জুড়ে দিল। আচমকাই জিজ্ঞেস করে উঠে দাদা কবে নাগাদ ঘরের কাজ শুরু করছেন। মৃনালবাবু বলে উঠে, অফিস হাউস্‌লোনের দরখাস্ত করেছি, সংশোধন হয়ে গেলেই কাজ শুরু করে দেবো। বিষ্ণু বলে উঠে দাদা, অফিস, সংসার সামলিয়ে ঘর তৈরীর কাজটা দেখভাল করতে পারবেন কি? মৃনালবাবু বলেন না ভাই তা তো সম্ভব নয়। মৃনালবাবু বলেন এ ছাড়া আমার এসব ব্যাপারে কোন ধারনা ও নেই। আমার বন্ধু অপরেশের পরিচিত একজন কন্ট্রাক্টর আছে নাম দেবাংশু, সেই যা করার করবে। বিষ্ণু বলে দাদা আমার একটা ছোট্ট আবদার ছিলো আপনার কাছে, ছোট ভাই হিসাবে। মৃনালবাবু বলে উঠে বলুন না। আমি, কিশোর আরো ও কয়েকজন এলাকার ছেলে মিলে একটা গ্রুপ করেছি। আমরা সবাই বেকার। এখানে যত কাজ সব কাছের বিলন্ডিং মেটেরিয়াল এ যাবৎ আমরাই সাপ্লাই করছি। ইট, বালি, সিমেন্ট লোহা ইত্যাদি। অনুরোধ থাকবে এগুলো আমাদের কাছ থেকেই কিনবেন।

মৃনালবাবু যেন ভেতরে কুঁকরে যান মৃদুস্বরে বলেন , তা কি সম্ভব ? বিষ্ণু বলে কেন সম্ভব নয় দাদা ? মৃনালবাবু বলেন , দেবাংশুর সাথে কথা হয়ে গেছে । তা ছাড়া আমার কাজ তো আর ক্যাশ করা সম্ভব নয় । কাজ ক্রেডিটে চলবে ।

বিষ্ণু বলে উঠে দাদা ভুল করছেন , ক্রেডিটে আমাদের সাথে ও কাজ চলতে পারে । খোঁজ নিয়ে দেখুন এখানে অনেক বাড়ী তৈরীর মেটোরিয়াল আমরাই সাপ্লাই করেছি ক্রেডিটে । পরে উনারা দিয়েছেন তার জন্য আমরা কখনো কোন পার্টির সাথে চাপাচাপি করিনি । বিষ্ণুকে এড়ানোর জন্য মৃনালবাবু অনেক চেষ্টা করেন পরে বলেন ঠিক আছে আমি দেবাংশুর সঙ্গে কথা বলে দেখি ।

বিষ্ণু বলে ঠিক আছে আপনি উনার সাথে কথা বলুন , তা ভাল হবে । তারপরেই বিষ্ণু একগাল হাসি হেসে বলে উঠে দাদা একটা কথা কি জানেন , নতুন রেললাইন হয়েছে । রেলের কু -ঝিক - ঝিক শব্দ শান্ত পাড়া যদি ও নতুন । তবে দেখছি ইদানীং ছিচকে চোরের উপদ্রুপ বেড়ে গেছে । বাড়ী তৈরীর মেটোরিয়াল রাখলে কখনো ইট কখনো সিমেন্ট উধা ও হয়ে যায় । তবে দাদা একটু গ্যারান্টি দিতে পারি যদি আমরা মাল সাপ্লাই করি , তা যেমন হবে এক নম্বর , তেমনি কোন ব্যাটার সাধ্যি নেই মালে হাত ছোঁয়ানোর । এই গ্যারান্টি আপনাকে এক্ষুনি দিয়ে দিতে পারি । মাল চুরির ব্যাপার থানা পুলিশ করে ও কি লাভ হবে , বরংচ তিক্ততা বাড়বে । সুতরাং দাদা আপনি দেবাংশু বাবুর সাথে কথা বলার সময় এ ব্যাপারেগুলো মাথায় রাখবেন । মানুষ তো আর বারংবার বাড়ীঘর করেন না , শান্তিতে থাকার জন্যই তো ঘরবাড়ী তৈরী করা । না - কি বলুন দাদা , মৃনালবাবু বললো আপনার কথা তো সত্যিই , রুপালীদেবী ছেলেটা যাওয়ার পর বলে উঠে এই ছেলেটা তো তোমাকে রীতিমতো ঠান্ডামাথায় মিষ্টিমুখে হুমকী দিয়ে গেলো । মৃনালবাবু সবকিছুই বুঝতে পেরেছিল কিন্তু কি করা যাবে , স্ত্রী রুপালীকে বুঝাতে চেষ্টা করলো । ছেলেটা কিন্তু অন্যায্য কথা বলেনি । মালতো কিনতেই হবে , হয়ত এক - দু টাকা বেশী আর কম , তবে তো জিনিষপত্রগুলো প্রোটেকৌড । এ ছাড়া এলাকার যুবকদের চটিয়ে কি এখানে বসবাস করা যাবে ? ফালতু অশান্তি কেন ডেকে আনব বলো ! বাড়ীটা তো তৈরী করতেই হবে । এ ভাবে মৃনালবাবু বোঝালেন স্ত্রী রুপালীকে । দেবাংশুর ইচ্ছে ছিল না তবু ও মৃনালবাবুর অনুরোধে দেবাংশু ঘরটুকু তৈরী করে দিতে এবং দেখভাল করতে রাজী হয় । বিষ্ণুরা প্রথম প্রথম ভাল মাল দেয় তারপর বাজারের যতসব নিংড়ে মাল , তাই সাপ্লাই করে । মৃনালবাবুর অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে দেবাংশু কাজ শুরু করে , তাতে ও কত ঝক্কি । লেবার আমরা দেবো, মিস্ত্রী

আমরা দেবো , নানাহ কুটক্তি , খিস্তি । দেবাংশু সব সহ্য করে এক প্রকার বিষ্ণুদের কথামতো দালান তৈরী করে । মৃনালবাবু প্রায়শই অফিস সেরে বিকেলে স্ত্রী রুপালী , আর দুই ময়ে রুমি , ঝুমিকে নিয়ে স্বপ্নের বাড়ী দেখতে আসেন । মেয়েরা ছুটাছুটি করে , ঘরতৈরী হচ্ছে রুপালীর মনে ও আনন্দ। এক সন্ধ্যায় দেবাংশু মৃনালের ভাড়া বাড়ীতে এসে মৃনালকে বলে দাদা , এখানে আপনার ঘর তৈরী করতে গিয়ে আমাকে অনেক ঝক্কি সামাল দিতে হয়েছে । বহুবার অপমানিত ও হয়েছি , মনের মতো মালপত্র পায়নি । দু নম্বরী তিন নম্বরী মাল সাপ্লাই করেছে ছোকরা গুলো । বাড়ীর রং ও ওরাই করেছে । বছর দুয়েক গেলে হয়তো রং গুলো ফিকে পড়ে যাবে । দেবাংশু বলে দাদা তাই আপনাকে সব আগে ভাগে জানিয়ে যাচ্ছি । মৃনাল বলে উঠে দেবাংশু দাম কি তাহলে অনেক বেশী পড়েছে না কি ? দেবাংশু বলে একটু বেশী তো পড়েছেই তা নিয়ে তো আর আমার কিছু বলার নেই, ওরা তো আপনার সাথে কথা বলেই মাল সাপ্লাই করেছে । দাদা আপনার টাকা আছে , আপনি দেবেন তাতে আমার আপত্তি থাকবে কেন ? ফিউচারে যাতে আমার সাথে আপনার দীর্ঘদিনের সর্ম্পক খারাপ না হয় তার জন্যই তো সব বলে রাখা । মৃনালবাবু বলে উঠে না - রে ভাই , ধারে দেনায় ডুবে গেছি , প্রভিডেন্ট ফান্ড খালি , তা ছাড়া লোন , অনেক বন্ধুদের কাছ থেকে ধার , করে শোধ করব কে জানে ? এখন মনে হচ্ছে এই তল্লাটে বাড়ী করার পরিকল্পনাটাই আমার ভুল হয়েছে। হঠাৎ মৃনালবাবু উত্তেজিত হয়ে বলে বিচার কোথায় পাবো । ভদ্রভাবে বাঁচতে চাওয়া যে দুস্কর । শুধু ঝামেলা চাই না বলেই তো ওরা যা ইচ্ছে তা দাদাগিরি করছে । দাদা ঘর তো তৈরী প্রায় শেষ । দাদা আমার মনে হয় দ্রুত গৃহ প্রবেশ করে নেওয়াটা ভাল হবে । কারণ আমি জানতে পেরেছি এখান থেকে দু একটা ভাল পরিবার বাড়ীঘর বিক্রি করতে চেষ্টা করছে । ওই শাস্তা ছেলেদের জন্য পারছে না , ওদের দাদাগিরি তাই ।

মৃনালবাবুরর শরীর যেন কাঁপছে , গলা শুকিয়ে আসছে । ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে ফেলল মৃনালবাবু । উনি যেন বুকে কোন বল ভরসা পাচ্ছেনা । দেবাংশুর অভিযোগটা যে গুরুত্বপূর্ণ , বুঝতে দেরী হয়নি মৃনালবাবুর ইদানীং বিষ্ণু , কিশোর ওদের আপ্যায়নের ধরনটা বদলে গেছে । ওদের সাথে যেন দেখা করাই দায় । ওরা এলাকার ভি,ভি আই , পি দাদা । মুখে বড়বড় বুলি আওড়াই । দু দিন দেখা করতে গিয়ে দেখা করা গেল না । ওদের চ্যালারা বলে দাদা এখন ব্যস্ত । আপনি পরে আসবেন ।

মৃনালবাবুর মনে শান্তি নেই , জীবনের সবকিছু উজোর করে ঘর বানিয়েছেন , তাতে কিভাবে থাকা যায় । স্ত্রী রুপালীকে ও সব বলা যাবে না । এমনিতেই রুপালী বার কয়েক বলেছে , চাঁদা দিয়েছো , ওরা যা বলেছে তাই করেছে । আমরা কি মানুষ না ,আমাদের কি নিজস্ব ভাবে কিছু বলার করার অধিকার নেই । মৃনালবাবু অফিসের অনেকের সাথে কথা ও বলেছে । সবাই বলে একটু ম্যানেজ করে নিতে হবে । ওই ছোকরাদের চটিয়ে থাকতে পারবেন না । যুগ পাল্টেছে , রুপালীকে তো আর সব বোঝানো যাবে না । রুপালী বলে এলাকার সিনিয়রদের বলো , কিন্তু মৃনালবাবু জানে বলাবলিতে শত্রুতা বাড়বে কোন লাভ হবে না । মৃনালবাবুর রাতের ঘুম উঠে গেছে । মেয়ে রুমি , ঝুমি খুব খুশী ঘর সাজাবে , পড়ার টেবিল সাজাবে । শুধু বলে বাবা দেরী করো না , আমরা নিজেদের বাড়ীতে যাব। মৃনালবাবু ভাবে ঘরের ছাদটাই নাকি ভেঙ্গে পড়ে ? গৃহপ্রবেশ ও যেন বিষ্ণুদের পারমিশান ছাড়া মানা । ওদের যা ডোন্টকেয়ার ভাব যে কোন সময় বেশী কথা বললে অপমানিত ও হতে হবে। স্ত্রী রুপালী আর মেয়েদের সাথে নিয়ে পুরোহিতের সাথে গৃহপ্রবেশের দিন প্রায় পাকা করে ফেলে মৃনালবাবু। পারিবারিক বন্ধু অপরেশবাবু ও বলেন শুভস্য শ্রীঘ্রম । একসাপ্তাহ পর একদিন বিকেলে মৃনালবাবু বন্ধু অপরেশ রায়কে নিয়ে নিজের জমিতে যান , কারণ কয়েকদিন বাদেই যে গৃহপ্রবেশ। উনারা জমিতে গিয়ে হতবাক হয়ে পড়েন । উনার নতুন তৈরী বাড়ীর সামনে বিশাল সাইনবোর্ড তাতে লেখা আছে " সমাজসেবক সংঘ " ভেতরে ১৫/১৬ জন শান্ডা চেহারার ছেলে অপকর্মের আসর জমিয়েছে। মৃনালবাবুদের দেখে শন্ডা শন্ডা চেহারার ছেলেগুলো উত্তেজিত ভাবে বলে উঠে আপনারা এখানে কার পারমিশানে এসেছেন । আপনারা কে? মৃনালবাবু থতমত খেয়ে বলে উঠে আমি মৃনাল , এ বাড়ীর মালিক ছেলেগুলো বলে উঠে আমরা মালিক টালিক চিনি না , এখন চলে যান না হলে ভাল হবে না । মৃনালের যেন মৃত্যু ভয় উঠে গেছে । মৃনালবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন না এটা আমার বাড়ী । এখানে আর একমূহুর্ত ও আপনারা থাকতে পারবেন না । এক্ষুনি আপনাদের বেরিয়ে যেতে হবে। প্রচন্ড উত্তেজনার মূহুর্তে হঠাৎ মোটর বাইক নিয়ে বিষ্ণু ও কিশোর এসে হাজির । ষন্ডা চেহারার ছেলেগুলো তক্ষণাৎ চুপ হয়ে গেল । মনে হল বস্‌কে কুনির্শ জানাতে বিষ্ণু বলে উঠে দাদা আপনি এখানে এসেছেন খবর পেয়েই ছুটে এসেছি । আমি নিজেই আপনার কাছে যাবো ভেবেছিলাম কিন্তু নানা সামাজিক কাজে জড়িয়ে আছি তো তাই সময়ের অভাবে যেতে পারি নি । মৃনালবাবু বলে উঠেন, আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না । বাড়ী তৈরী করলাম আমি আপনাদের হাজারো ঝামেলা সামলে , এখন বাড়ী হওয়ার সাথে সাথেই জবর দখল , এ সব কী হচ্ছে ?

বিষ্ণু বলে উঠে দুঃখিত দাদা , সত্যিই প্রচন্ড দুঃখিত । প্রচন্ড ব্যস্ততাই আপনাকে খবর দিতে পারিনি, খবর দেওয়াটা আমার উচিত ছিল । মৃনালবাবু বলে আমি গৃহপ্রবেশের দিন ঠিক করে ফেলেছি ।

বিষ্ণুরা বলে উঠে দাদা ডেট টা আপনাকে চেইঞ্জ করতেই হবে। প্লীজ , এতদিন যখন কষ্ট করেছেন , কষ্ট করে মাস খানেক সময় আপনাকে দিতেই হবে। উপরের ডিসিশ্ন , এখানে আর তো খালি ঘর নেই , যে ওদের রিপ্লেজ করবো । সমানে আমাদের একটা বিশাল সামাজিক কর্মযজ্ঞ আছে সেটা শেষ করে পরের দিনই আমি আপনাকে খবর দিয়ে দেবো । চোখছোট করে কিশোর বলে দাদা যে কোন ভাল কাজেই তো নানাহ প্রবলেম আসে । যাতে কোন সমস্যা না হয় তার জন্যই শক্তসামর্থ ছেলেদের প্রয়োজন । মৃনালবাবু জিজ্ঞেস করেন তাহলে এই ছেলেরা কারা ? বিষ্ণু বলে উঠে সব উপরের ডিশিস্ন , এতসব জানিনা দাদা , মৃনালবাবু বলেন, যদি কোন সমস্যা হয় কিশোর বলে উঠে ধুত আপনি অযথা ভাববেন না তো দাদা , আমরা কিসের জন্য । মৃনালবাবু অনুনয় বিনয়ের সুরে বলে ভাই আমার যে গৃহপ্রবেশ । বিষ্ণু বলে উঠে বললাম তো একটু সবুর করুন । সমাজের সামাজিকতা বলতে ও তো একটা কিছু আছে। মিছিমিছি টেনশ্ন নিচ্ছেন কেন ? বললাম তো কিছুদিন বাদে ঘর ফাঁকা হয়ে যাবে । তখন ঘরে এন্টি নিয়ে নিন , ফাংশন করুন , কেউ আপনাকে কিছু বলবেও না । নিশ্চিন্তে বাড়ী চলে যান , আমি আপনাকে খবর পৌছে দেবো । মৃনালবাবু অসহ্য হয়ে গেছেন , বন্ধু অপরেশ বাবু হতবাক । মৃনালবাবু বলেন বন্ধু দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। অপরেশবাবু বলেন প্রাণের চাইতে বড়ো তো আর বাড়ী নয় । কিছু একটা ভাবতে হবে। একমাস যায় - দু -মাস যায় , ঘর তো ভেকেন্ট হয় না । মৃনালবাবু অপরেশবাবু বহু দরজায় গেছেন , লাভ হয়নি । সাইনবোর্ডটা যেন বাড়ীর সামনে আরো উজ্বল । প্রাণচঞ্চল মৃনালবাবুর দু - মেয়ে রুমি , ঝুমি যেন নিশ্চুপ বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে । মৃনালবাবুর স্ত্রী ভেঙ্গে গেছেন । অনুতাপ কেনই বা এখানে বাড়ী করার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম । দাদাগিরি সামনে অনুনয় , বিনয় , কিছুই কাজ হলো না । উল্টে মৃনালবাবুর কানে যেন কেউ খবর পৌছে দেয় যান প্রয়োজনে মামলা করুন । অবশেষে চেষ্টায় দাদাদের মোটা অংঙ্কের বিনিময়ে মৃনালবাবু স্বাদের তৈরী বাড়ী অন্যত্র বিক্রি করে দেন , প্রভুত মাসুল দিয়ে , খেন্নায়, অপমানে মৃনালবাবু এই এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যান মেয়েদের ভবিষ্যৎ এর কথা মাথায় রেখে । মনে মনে প্রশ্ন করেন ওদের " দাদাগিরি " চলবে কতদিন ?

ভবঘুরে

চন্দননগর গ্রামে বাপ্পাকে এই তল্লাটের সবাই চেনে । সকাল থেকে রাত অব্দি গ্রামের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়ায় । কেবল আক্ষরিক নামটা বাপ্পা অর্থাৎ বাপ্পাদিত্য নয়তো ভবঘুরে বললে ও ভুল হবে না । যদি কোথা ও না পাওয়া যায় নির্ঘাত পাওয়া যাবে সমর সাধুর শিবমন্দিরে। অনেক জায়গার সাধু , সন্তরা এখানে প্রতিনিয়ত আসেন , দুপুরের পর মাঝে মাঝে " বাবা ভোলা " "বাবা ভোলা" শব্দ শুনতে পাওয়া যায় মন্দিরের বৃহাদাকার বটগাছের নীচ থেকে, জমজমাট গাঁজার আসর , সবাই নেশাই চুর , ব্যাত্তিক্রম থাকে না বাপ্পা ও । কখনো সকালে বাপ্পাকে দেখা যায় গ্রামের চৌমুহনীতে সত্যেনবাবুর চায়ের দোকানের সামনে ঠাঁই দাড়িয়ে আছে । শীতের সকাল পরনে থাকা তেলচিটে পুরানো একটি জ্যাকেট , কালো প্যান্ট আর পায়ে হাওয়াই চপ্পল। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি এর মধ্যে দু -চারটে সাদা , চুলগুলো উস্‌খো খুস্‌খো । সুপারী গাছের মতো লম্বা লম্বা পা , সাপের

মতো লিকলিকে চেহারার লোকটাই বাপ্পা ।

ঝড় - জল- বৃষ্টি - যাই হোক না কেন , ভরদুপুরে সমর সাধুর শিবমন্দিরে পাওয়া যাবেই। মুখের চোয়াল যেন হাজার দিনের অভুক্তের মতো ভেঙ্গে আছে । চোখ দুটো যেন মনিকোটরের ভেতর লুকানো । চন্দননগর স্কুলের উত্তরে একটা পুরনো ঢেউটিনের ঘরেই ওর ঠিকানা । পুরানো ভাঙ্গা টিনের গেইট পার হয়ে বাম দিকে পলেস্তরা খসা দুটো একতলা বাড়ি , ও দুটো ঘরে ২৫/৩০ বৎসর ধরে দুটি পরিবার ভাড়া থাকে। ঐ ভাড়ার যৎসামান্য পয়সাই আপাতত বাপ্পার রোজগার । মাস ফুরোলে দুই ভাড়াটিয়া বাপ্পাকে পেমেন্ট দিয়ে আসে । তা দিয়েই চলে বাপ্পার । এক সময় বাপ্পার বাবা শিলাদিত্য গোস্বামী ছিলেন চন্দননগর স্কুলের প্রধান শিক্ষক , মা রেনুদেবী ছিলেন গৃহিনী , আজ তারা কেউ বেঁচে নেই । তাদের একমাত্র সন্তান বাপ্পা , আদর করে নাম রেখেছিলেন বাপ্পাদিত্য । শিলাদিত্য আর রেনুদেবী বাপ্পাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন , হয়ত স্বপ্ন অধরা রয়ে গেলো । ছোটবেলা থেকেই বাপ্পা মেধাবী ছাত্র ছিল বলে তল্লাটের সবাই জানে । উচ্চমাধ্যমিকে ভাল ফলাফল করার পর শিলাদিত্যবাবু ছেলেকে ইঞ্জিনীয়ারীং পড়তে ব্যাঙ্গালোরে পাঠান , কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই পঠনপাঠন চুকিয়ে বাপ্পাকে বাড়ী ফিরতে হয় , এই এক বৎসরে ৩/৪ বার শিলাদিত্য বাবু ব্যাঙ্গালোরে যান ছেলের কাছে , তারপর একদিন শিলাদিত্যবাবু ছেলেকে বাড়ী নিয়ে আসেন । বেশ কিছুদিন বাপ্পা অসুস্থ ও ছিল , অনেক ডাক্তার দেখিয়েছেন কিন্তু কনজারভেটিভ ফেমিলি কোন কথায় কেউ জানতে পারেনি । কেনই বা বাপ্পা লেখাপড়া ছেড়ে বাড়ীতে এসেছে তারপর কেনই বা আর লেখাপড়া করল না , বাপ্পার ছন্নছাড়া ভাব । একদিন শোনা গেল শিলাদিত্যবাবু বাথরুমে পড়ে মূর্ছা হয়ে গেছেন , দৌড়াদৌড়ি করে গ্রামের লোকজন উনাকে নিয়ে যান জি,বি হাসপাতালে , কিন্তু জ্ঞান আর উনার ফেরেনি , পাঁচদিন বাদে শিলাদিত্য বাবু হাসপাতালের বেডে প্রাণত্যাগ করেন ।

তারপর রেনুদেবী বড় জোর এক বৎসর বেঁচেছিলেন । ছেলের পড়াশুনা , চিকিৎসা , এ সব মিলিয়ে শিলাদিত্যবাবুর পেনশনের যা টাকা পেয়েছিলেন সবটাই কপর্দকশুন্য হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং বাপ্পার জন্য ভিটে বাড়ীটাই সম্বল --- ভাড়াটিয়ারা ও বাবার আমলেরই , এত ঘটনা ঘটে গেছে কিন্তু বাপ্পা যেন নির্বিকার । ভবঘুরে জীবন, কখনো রাতে এসে ঘরে ঘুমিয়ে থাকে । কারণটা সবার কাছেই অজানা । ঘরে আছে তক্তপোশ , একটি ভাঙাচোরা টেবিল আর একটি চেয়ার । একটি বহু ব্যবহৃত তেলচিটে ময়লা তোষক , তেলচিটে বালিশ আর কয়েকটি বাসনকোসন । এই নিয়েই

বাপ্পার সংসার বত্রিশ এর কাছাকাছি এই যুবকটার আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই । আশা আকাঙ্খা, লোভ কিছুই নেই । কোন ও দিন ঘরের মধ্যে আলো জ্বলতে দেখা যায় না । এতকিছুর মাঝে ও বাপ্পা কিন্তু ছোটবেলার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু শৈবালকে ভুলে নি । ভবঘুরে এই মানুষটা প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর একবার এসে বন্ধু শৈবালের সাথে দেখা করে যায় । বন্ধুত্বের প্রগাঢ় সম্পর্ক বন্ধু শৈবাল ও প্রায়শই বাপ্পাকে ঘরে আসলে খাওয়া দাওয়া না করে যেতে দিত না । মাসে প্রায় কুড়িদিন বাপ্পা বন্ধু শৈবালের বাড়ীতে রাত্রের খাওয়া দাওয়া করে যেত।

শৈবাল কৃষক পরিবারের ছেলে , প্রাথমিক স্কুলে একসাথেই পড়াশুনা করতো। ছোটবেলা থেকে বাপ্পা ও শৈবালের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । এই সম্পর্ক আজো ও অটুট, শৈবালের পড়াশুনা বেশী হয়নি । এখন সে মোটামুটি স্বচ্ছল গৃহস্থ । কৃষিকাজ শৈবালের পেশা, বছর দু-য়েক হলো শৈবাল বিয়ে করেছে । শৈবালের স্ত্রী রত্না অন্তঃসত্বা, সুখের সংসার । শৈবালের পাশের বাড়ী বড়ভাই প্রবালের । তবে শৈবালের বাবার মৃত্যুর পর থেকেই দুই ভায়ের বনিবনা নেই , এমনকি কথাবার্তা ও নেই । জমির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দু-ভাইয়ের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক , যেমন অহিনকুল । ইদানীং প্রবালবাবু মাঝে মাঝে শৈবালকে ডাক দেন বাবার আমলের বিশালাকার পুকুরের পাশে একটি জমি নিয়ে সমস্যার হাল করতে । জমির দাবীদার দু-ভাই । মাঝে মধ্যে দু-ভাই আলাপচারিতা করে বাজার থেকে ফেরে দুপুর থেকে বাপ্পা সমরসাধুর মন্দিরে বসে গাঁজা খেয়ে বিভোর হয়ে থাকে । আর যেন বিড়বিড় করে কি বলে , দু -দিন ঘরে ও ফেরেনি । তারপর একদিন বাড়ী ফেরার পথে বন্ধু শৈবালের বাড়ীতে আসে । বাড়ীতে ডুকে দেখতে পায় টিনের ছাউনী দেওয়া মাটির ঘরটি শৈবালের বন্ধ । পুরানো শালগাছের পাল্লা দেওয়া জানলা গুলো ও বন্ধ । বাপ্পার মনটা যেন কেমন অস্থির লাগছে । বাপ্পা দরজায় বার কয়েক টুকটুক শব্দ করে হাঁক দেয় শৈবাল , শৈবাল বলে । শৈবালের স্ত্রী দরজা ঘুলে হাঁ করে বাপ্পার দিকে তাকিয়ে থাকে । বাপ্পা বলে শৈবাল কোথায় ? রত্না ফুপিয়ে কেঁদে উঠে , বলে বাপ্পাদা উনি তো কাল থেকে বাড়ী ফেরেনি । বাপ্পা বলে তুমি কাউকে জানাওনি । রত্না বলে কাকে জানাব ? এখানে তো আমার কেউ নেই । আমার বুকটা যেন কেমন ধুক্‌ধুক্ করছে । রত্নাকে বড় উচাটন অস্থির লাগছে । প্রবল ভয় কোথা থেকে এসে যেন রত্নাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। হাতের তালু , পায়ের পাতা ঠান্ডা হয়ে উঠেছে । চোখদুটো ছলছল করছে । মুখে আওয়াজ উ-উ উ চন্দননগর গ্রামের নিস্তব্দ রাতের আকাশকে চিরে খানখান করে ফেলল রত্নার বুকফাটা

কান্না । গ্রামের দু - চার জন লোক ও আসল, বলল , রাতে কোথায় যাওয়া যাবে সকালে থানায় যাব। বাপ্পা জিজ্ঞেস করে কোথায় গিয়েছিল শৈবাল । রত্না বলে বাজারে গিয়েছি দুপুরে , বলেছে এসে পড়বে কিন্তু আসেনি। ভবঘুরে বাপ্পার যেন সম্বিত ফিরে এলো । বললো রত্না তুমি ভাববে না , সকালে আমি আসব ।

পরের দিন সকালে বাপ্পা এসে হাজির গ্রামের আরো দু -জনকে ডেকে বাপ্পা রত্নাকে নিয়ে সোজা চলে যায় লোকাল থানায় । থানাতে শৈবালের মিসিং ডায়েরী করা হয় হঠাৎ যেন বাপ্পার জীবনের পরিবর্তন । বাপ্পা রত্নাকে বলে যায় বোন তুই ভাববি না। আমি জীবনের সবকিছু মেনে নিয়েছি , কিন্তু শৈবালের কোন বিপদ আমি মানবো না । যে ভাবেই হোক আমি কিছু একটা করব । নয়তো আর আসব না । রাতে বাপ্পার যেন ঘুম ধরে না , মনে হয় শৈবাল তাকে ডাকছে , বলছে বন্ধু অপরাধীর সাজার ব্যবস্থা করে দে! কয়েক মুহুর্তের জন্য বাপ্পার বুকটা কেঁপে উঠে , তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ভাঙ্গা মোমের টুকরা জ্বালতেই সব চুপচাপ । বাপ্পা ভাবে শ্যালা গাঁজার নেশাটা আমাকে পাগল করেছে। এভাবে কেটে যায় আরো বেশ কয়েকদিন । বাপ্পা যেন চঞ্চল হয়ে উঠে । বন্ধুর কোন খোঁজ পাচ্ছি না । অশান্ত বাপ্পা পাগলের মতো , এদিক ওদিক ছুটে তার ভেতরে আর্তনাদ, সে যেন শুনতে পায় অমঙ্গলের আহ্বানধ্বনি । সে বাজারে ঘুরে বেড়ায় , বন্ধুর খোঁজে । বাজারে বাস স্টপেজের পাশেই ঝিলমিল রেষ্টুরেন্ট , মোগলাই পরটা , বিরিয়ানি , মাংসের গন্ধ , ম, ম করছে । বাপ্পা নাক বন্ধ করে এগিয়ে যায় । যাত্রী বিশ্রামাগার সেডে একা বসে থাকে । রেষ্টুরেন্টের একটি ছেলে তার নাম নান্টু ঘোষ , তার বাড়ী ও চন্দননগর গ্রামে , সে বাপ্পাকে দেখে বলে দাদা তুমি একা বসে আছ কেন ? নান্টুর যেন বাপ্পার প্রতি দয়া হয় , রেষ্টুরেন্টের কাজ তার শেষ হয়েছে , সে ও বাড়ী ফিরবে । সে বাপ্পাকে অনুরোধ করে দাদা একটু বস্ একসাথে যাব। এখন একা যেতে আমার ভয় করে । বলে সে রেষ্টুরেন্টের দিকে যাই মালিককে বলতে । হাতে করে নিয়ে আসে একটি মোগলাই ।বাপ্পার হাতে নান্টু মোগলাইটা দিয়ে বলে বাপ্পাদা তুমি খাও । বাপ্পা খুশী হয়ে গো গ্রামে মোগলাইটা খেয়ে ফেলে। তারপর নান্টুকে সাথে নিয়ে গ্রামের দিকে রওয়ানা হয় বাপ্পা , নান্টুর হাতে একটি বড় টর্চ । বাপ্পা ক্ষীণস্বরে নান্টুকে জিজ্ঞেস করে ভয় পাস্ কেন ? নান্টু বলে জানো না তোমার বন্ধু শৈবাল সমন্ধে যেদিন থেঁকে শৈবালদা নিখোঁজ হয়েছে সে দিন ও শৈবালদা উনার বড় ভাই প্রবাল সহ আমাদের ঝিলমিল রেষ্টুরেন্টে চা, সিঙ্গারা খায় । তারপর দু -ভাই , একসাথে চলে যায়,

আমি ও তাদের পিছু পিছু যাই কারণ আমার সারাদিন ডিউটি সন্ধ্যা ৭ টায় ছুটি , তখন অন্য কর্মচারীরা কাজ করে । আমি যখন শৈবালদা তাদের পিছু আসি তখন তারা আমাকে অন্ধকারে দেখেননি , বাঁশ বাগানের কাছে রাস্তায় আমাকে দেখেন শৈবালদার বড় ভাই , উনি আমাকে ধমক দিয়ে বলেন , বাড়ী যা , আমাদের পিছু কোথায় যাচ্ছিস্ । আমি ঘাবড়ে চলে যায় । কারণ আপনি ও তো জানেন প্রবালদা ক্ষমতাশালী লোক , গ্রামের সবাই ভয় করে , তাই আমি ও চলে যাই । পরদিন দুপুরে থেকে শুনি শৈবালদা নিখোঁজ । কাউকে কিছু বলিনি তাদের ভাইদের ব্যাপার , কাউকে কিছু বলে নিজেকে এক্সপোর্ট করার ইচ্ছে আমার নেই । বাপ্পাদা তোমার ছোটবেলার বন্ধু শৈবালদা তাই তোমাকে বলল্যাম , প্লীজ তুমি কাউকে কিছু বলো না । আমি যেন কোন সমস্যায় না পড়ি । বাপ্পা নান্টুকে বলে দিব্যি করে বলছি কাউকে কিছু বলব না । নান্টু তোকে একটু কাজ করতে হবে কোন দিকে প্রবালদা শৈবালকে নিয়ে গেছে রাস্তাটা আমাকে একটু দেখা , নান্টু প্রথমে বারণ করে কিন্তু বাপ্পার বারংবার সকাতর অনুরোধে নান্টু রাজী হয় । পুনরায় বলে প্রবালদা যদি টের পায় তবে কিন্তু আমার চিতার আগুন ও কেউ দেখবে না । ঠিক আছে অত করে যখন বলছেন তাহলে চলুন তবে খুব সাবধানে যেতে হবে , বাপ্পা, নান্টুকে নিয়ে বাঁশ বনে ডুকে পড়ে । চলতে চলতে খানিকটা দূর গিয়ে বাপ্পাকে নাকে অগুরুর গন্ধের বদলে পচা গন্ধ লাগতে থাকে, বাপ্পা আস্তে নান্টুকে বলে তুই গন্ধ পাচ্ছিস্ কি না ? নান্টু বলে ঝোপঝাড়ে হয়ত কোন বন্য প্রাণী মরে আছে । এক পা - দু পা করে এগোতেই বাপ্পার চোখে পড়ে একটি গামছা, বাপ্পা নান্টুকে বলে দেখতে পেয়েছিস্ এই গভীর বনে কে আবার কেন গামছা ফেলে গেল ? নান্টু গামছাটা দেখে বলে উঠে বাপ্পাদা এই গামছাটা আমি প্রবালদার কাঁধে দেখেছিলাম , বাপ্পার মনের সন্দেহ যেন আরো গাড় হয়ে গেছে , সামনে আরো প্রচন্ড দুগন্ধ , মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে। নান্টু আর কোনমতে এগোতে রাজী না । বাপ্পা এক রকম জোর করে নান্টুর টর্চটা নিয়ে সামনে একটা গভীর কুয়োতে টর্চলাইটটুকু মারে , দুর্গন্ধে বাপ্পার নাড়িভুরি যেন বের হয়ে আসছিল । বাপ্পা দেখতে পেল অর্ধগলিত একটি দেহ কুয়োর নীচে । প্যান্ট শার্ট দেখে বাপ্পা নিশ্চিত এই গলিত দেহটি তার বন্ধু শৈবালের। এবার বাপ্পা , নান্টুকে নিয়ে বাশঁবন থেকে বেরিয়ে আসে , ভাবে যা করার সকালেই করব। পরদিন খুব সকালে বাপ্পা ঘুম থেকে উঠে নান্টুর বাড়ীতে যায় । নান্টুকে সাথে নিয়ে কথা বলতে বলতে বাশঁবনের নীচের জমির আল ধরে হাটতে থাকে । হঠাৎ বাঁশবনের ভেতর থেকে একটি ভয়ানক চিৎকার শোনা গেল , আরে এই শালা নান্টু কার সঙ্গে দাঁড়িয়ে

কথা বলছিস্ । আরে এ দেখছি গাঁজল বাপ্পা , এখানে কি করছিস্ । ভয়ে নান্টুর পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল । সঙ্গে সঙ্গে বাপ্পার পা নান্টুর তালে তালে কাঁপতে থাকে । কী করবে বুঝে উঠতে পারে না ।

ইত্যবসরে সামনে এসে দাঁড়ায় মূর্তিমান যমদূত প্রবাল । চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল, মুখে বাংলা মালের গন্ধ । এখানে কি করছিস্ বলতেই বাপ্পা বলে নান্টুর সঙ্গে গপ্পো করছিলাম । শালা এখানে গাঁজা খেতে এসেছিস্ । আর একবার এখানে যদি দেখি তবে কবর দিয়ে দেবো । বাপ্পার মনে হচ্ছিল এক্ষুনি বোধহয় হার্টফেল করবে । বাপ্পার এমন ভাব যেন প্যান্টে হিসু হয়ে যাবে । বাপ্পা যেন মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এল, নান্টুর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে উভয়ে ঘরভিমুখে চলতে থাকে । মেইন রাস্তায় এসে বাপ্পা ভাবে আমার সামনে পিছনে কেউ নেই , তাহলে এত ভয় কিসের । যদি কেউ এক্সপোর্ট করে দেয় । দেবে , আমি থানায় যাব , বন্ধু খুনের বিচার চাইতে ।

দুপুর বারোটা । বাপ্পা সুইংডোর ঠেলে বড়বাবুর সামনে এসে দাঁড়াল , স্যার বড়বাবু বলে উঠে বলুন ।

বাপ্পাকে উত্তেজিত দেখায় , বাপ্পা বলে স্যার আমি একটা রহস্যের কিনারা করতে এসেছি

বড়বাবু বলেন , বসুন , বলুন কি রহস্য !

বাপ্পা সমস্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত বড়বাবুকে শোনায় । প্রথমটাই বাপ্পার বুঁদ হওয়া গাঁজার গন্ধে বড়বাবু প্রচন্ড বিরক্তি হন । বাপ্পা বলে তাহলে আমি উঠে পড়ছি , তবে শেষবারের মতো আপনাকে অনুরোধ করছি শৈবাল রায় আমার বাল্যকালের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু , ওর মিসিং কেসটা একটু ভাল করে দেখুন । যত প্রয়োজ ন সাহায্যের তত করবো , প্রয়োজনে প্রাণ ও দেবো ।

যদি আপনি কাজটা করতে পারেন , হয়ত আপনার অন্য লাভ হবে না তবে গ্রামবাসীর সম্মানের আসনে আজীবন থাকবেন ।

বড়বাবু এক মুহুর্ত ভাবেন , তারপর বলেন আপনি সাহায্য করতে পারবেন ? বাপ্পা বলে উঠে যেভাবে চান , বেলা আড়াইটে বড়বাবু , ছুটলেন লোক লস্কর নিয়ে সাথে ডোম নিয়ে বাপার দেখানো পথে । বাশঁবনের কুয়ো থেকে পচাগলা মৃতদেহ বের করা হলো । বাপ্পা সনাক্ত করলেন শৈবাল বলে । শৈবালের স্ত্রী রত্না ও সনাক্ত করল শৈবালকে । কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে গোটা গ্রাম । রত্না জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে । বড়বাবু সেই রহস্য গামছাটা ও সনাক্ত করে , রাজ সাক্ষী হয় নান্টু ঘোষ । বাপ্পা

ভাই এর মতো রত্নাকে পৌছে দেয় তার বাপের বাড়ীতে । বাপ্পার যেন নিজেকে খুব হাল্কা লাগছে মাথা থেকে যেন পাহাড়টা নেমে গেছে । রত্নাকে বাপের বাড়ী পৌছে দিয়ে বাপ্পা যখন বাস থেকে নেমে চলতে থাকে গ্রামের উদ্দেশ্যে আর ভাবে অসহায় বাপ্পা আজ সাধুর আশ্রমে যাবে, মনপুরে বাবা ভোলার প্রসাদ নেবো , এমন সময় পুলিশের একটি ভ্যান বাপ্পার সামনে দাঁড়াল । বড়বাবু গাড়ী থেকে নেমে বললো বাপ্পাদিত্যবাবু সত্যিই আপনার মতো বন্ধু পাওয়া যেমন দুস্কর তেমনি নিঃস্বার্থ আর্দর্শ নাগরিক ও বটে । ভ্যানের ভেতর থেকে প্রবাল বলে উঠে শালা গাঁজল তাহলে তুমিই আসল নাটের গুরু । আমাকে মনে রেখো। বেরিয়ে আমি তোমার ছাল দিয়ে ঝিলমিল রেষ্টুরেন্টে রোষ্ট বানিয়ে খাব । আরো কিছু বলতে ছিল , বড়বাবু ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিল । বাপ্পা গেল সমর সাধুর আশ্রমে , মনের আনন্দে কল্কিতে ধোঁওয়া ঔড়াল , পরদিন সকালে চায়ের দোকানে এক ভদ্রলোকের হাতে ধরা খবরের কাগজে চোখ পড়ল । বড় বড় হরফে লেখা চন্দননগরে পিতৃসম্পত্তির লোভে বড়ভাইয়ের হাতে খুন ছোটভাই , কুয়ো থেকে পচাগলা মৃত দেহ উদ্ধার ও ,সি সমাদ্দারের তৎপরতায় খুনী গ্রেপ্তার । এলাকার লোকজন খুব খুশী । গ্রামবাসী সন্মান জানালো বড়বাবু পরেশ সমাদ্দারকে । স্বজনবিহীন ভবঘুরে বাপ্পার কাছে তো সবাই এক, হঠাৎ একদিন শোনা গেল ভবঘুরে বাপ্পা অসহায়ত্বেকে সাথী করে সমরসাধুর শিবমন্দিরের বটতলায় চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে ।

****

গোয়েন্দাগিরি

আগরতলা থেকে উত্তরত্রিপুরা যাওয়ার একমাত্র পথ আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা । ত্রিপুরা রাজ্যের পর্যটক স্থানের অন্যতম হচ্ছে উত্তর ত্রিপুরার জেলা শহরের অদূরে উনকোটি তীর্থস্থান । পাহাড়ের উপর পাথর খেদাই করা অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি , ঝর্ণার জল , এক অপরুপ মনোরম দৃশ্য। বিশালাকার পাথরের উপর শিবের নিঁখুত কষ্ঠিক পাথরের মূর্ত্তি ঝর্নার জল গড়িয়ে গহ্বরে যেখানে জল জমেছে সেখানে তীর্থযাত্রীরা স্নান করে পূণ্য লাভ করে । উনকোটি পাহাড় এককথায় মানুষের কাছে যেমন পবিত্র তীর্থস্থান তেমনি প্রচন্ড আকর্ষনীয় । পাহাড় পার হয়ে ভারত বাংলাদেশ

সীমান্ত । মনে হয় বহু পুরানো আমলের রাজ , রাজাদের ভাস্কর্যের কীর্তি , যা আজো স্মৃতি ও অপরুপ সৌন্দর্য্য বহন করে চলেছে । রাজ্যের শিল্প , সংস্কৃতিতে উনকোটি এক সমধিক পরিচিত নাম । প্রলয় দেবরায় , শ্রীকান্ত সান্যাল , পল্লব চক্রবর্ত্তী , স্কুলজীবনের বন্ধু । প্রলয় এবং শ্রীকান্ত ব্যবসা করে । পল্লব বিদ্যুৎ নিগমে এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার । তবে তিন বন্ধুর কেহই এখনো বিয়ে করেনি এবং তাদের বন্ধুত্ব এখনো অটুট । প্রতি বছর তারা কোথা ও না- কোথা ও বেড়াতে যাই । এ -বছর কৈলাশহর এসেছে , সেখান থেকে উনকোটি পাহাড় এবং জম্পুইহিলের কমলাবাগান ও ত্রিপুরার সর্বোচ্চ পাহাড় বেথলাংশীপ দেখার পরিকল্পনা । জম্পুই হিল ত্রিপুরার টাইগার হিল , ঝকঝকে আকাশের নীচে পাহাড়ী ঝর্নার জল , চারদিকে কমলা বাগান , উঁচু উঁচু পাহাড়ে সুদৃশ্য কাঠের সু-সজ্জিত বাংলা টাইপের ঘর। ত্রিপুরার শেষ সীমানা কনপুই , সেখানে স্থানীয় উপজাতি মানুষের বাস , কনপুই এর মিজোরাম সীমান্ত মিজোরামের মামিদ্ জেলা । ভাষাভাষি দিক দিয়ে জম্পুইহিলের মানুষের সাথে মিজোরামের মানুষের মিল আছে , ধর্ম সংস্কৃতি প্রায় একই ধরনের । কনপুয়ের দক্ষিনে গেলে পাহাড়, উৎরাই পার হয়ে খানব্লাং পাহাড় সেখানে আছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প , তারপরই আন্তর্জার্তিক সীমানা , ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত , গবীর উপজাতি মানুষের বাস । এমনকি অনেকে জানে ও না তারা কোন দেশের বাসিন্দা । প্রকৃতির খেয়ালে তুমুল বৃষ্টি নামল । প্রলয় , শ্রীকান্ত পল্লবরা কৈলাশহরে হোটেলবন্দী । পরের দিন কৈলাশহর বাসষ্টান্ডে এসে উনকোটি যাবে বলে বাসে উঠতে গেলে ড্রাইভার ও অন্যান্য যাত্রীরা বললো কৈলাশহর ধর্মনগর যাওয়ার পথে বেশ কয়েক জায়গায় ধস্ পড়েছে । সবে মাত্র রাস্তা পরিস্কার করছে । সারা দিন লেগে যাবে । আপাতত সব গাড়ী বন্ধ । মনমরা হয়ে তিনবন্ধু ফিরে এল হোটেলে । কৈলাশহর থেকে উনকোটি যাওয়া হলো না তাহলে জম্পুই হিল যাওয়া তো আরো দুস্কর। জম্পুই পাহাড়ী রাস্তা আরো অনেকবেশী ভয়ানক হবে । প্রচন্ড রিস্ক্ । তিনবন্ধু ভাবল এভাবে যদি আরো তিনচারদিন আটকে যায় তবে প্রোগ্রাম কাটছাঁট করে নতুনভাবে প্ল্যান কষতে হবে।

বাসষ্টান্ডেই তিনবন্ধুর সাথে এক স্মার্ট মেয়ের দেখা হয়েছিল । জিজ্ঞাসায় জানতে পারে মেয়েটির নাম অন্বেষা মিত্র । ওদের এক হোটেলেই থাকে , গতকাল দুপরে তিনবন্ধু মেয়েটিকে খাবারের টেবিলে দেখেছে নজরকাড়া সুন্দরী । আজ বাসষ্টান্ডে পরিচয় হয়ে গেলো । প্রচন্ড স্মার্ট । সে নিজেকে কোলকাতার মেয়ে বলে পরিচয় দেই । সমস্ত ত্রিপুরা একাই চষে বেড়াচ্ছে । সে বলে বন পাহাড় ঘুরে প্রাকৃতির তথ্য সংগ্রহ করা তার হবি । কাঁধে ঝুলানো আছে দামী বিদেশী কোম্পানীর ডিজিটাল ক্যামেরা । সে বলে দক্ষিনের ধর্মস্থান ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির থেকে পিলাক পাহাড় , সাব্রুম শহরের সীমান্ত থেকে চট্রগ্রাম ছিল ট্রাক্ট , বিলোনিয়ার চর অঞ্চল , পশ্চিম ত্রিপুরার মেলাঘরের রুদ্রসাগর সংরক্ষিত প্রাণীদের জন্য সিপাহীজলা , ভারত বাংলা সীমান্তের কসবা্ মায়ের মন্দির থেকে

মতিনগর, ফুলতলী , এমনকি ভারত বাংলা সীমান্তের ভাগলপুর গ্রামের গাজী বাবার দরগা সব জায়গা সে দেখে ফেলেছে । বলেছে কখনো , কোথা ও তার অসুবিধে হইনি কোথা ও সীমান্তের লোকজনদের সাহায্য পেয়েছে , কোথাও বা নিরাপত্তা রক্ষীদের।

প্রলয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মৃদু হেসে এগিয়ে এল অন্বেষা । প্রলয় বলল , ব্যাড লাক, কৈলাশহরে বসে আর সময় নষ্ট করা যায় না , ফিরে যেতে হবে সময় কম। অন্বেষা বলে কেন ? এখান থেকে অনেক জায়গা দেখার আছে । আমি ও তো জম্পুইহিলের প্রোগ্রামটা আপাতত ক্যানসেল করে দিয়েছি । একটা অটোভ্যান জোগাড় করেছি । ঊনকোটি যাচ্ছি । দুর্দান্ত জায়গা , একেবারে স্বর্গ উদ্যান । যেমনি প্রাকৃতিক দৃশ্য , পাথরে খোদাই মূর্তি , বিশাল উঁচু থেকে ঝর্নার জল গড়িয়ে নামছে, নানাহ্ পাহাড়ী ফুল পাহাড়ের চূড়ায় , যেখানে আছে শিবমন্দির । তাছাড়া ও থাকার জন্য আছে ডাকবাংলো, স্থানীয় " হালাম " উপজাতীয় লোকরা খুব ভাল সরল প্রকৃতির । যে কোন কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় । সুতরাং আপনারা ইন্টারষ্টেড থাকলে চলুন । যাতায়াতের খরচটা শেয়ারড হয়ে যাবে । ঊনকোটির শিবের সঙ্গে সুন্দরী মেয়ের আকর্ষন । তাই আমরা তিনবন্ধু সিদ্ধান্ত নিতে মূহূর্ত ও গড়াল না । তড়িঘড়ি হোটেলে কি প্রয়োজনীয় জিনিষ ও ব্যাগ নিয়ে আমি শ্রীকান্ত , পল্লব , আর কোলকাতার সুন্দরী অন্বেষা , অটোভ্যানের ড্রাইভার রবি , সে লোকাল ছেলে , আমরা পাচঁজন ছুটলাম । বৃষ্টিতে কাদা প্যাচপ্যাচে রাস্তা ধরে ভগবান নগর হয়ে নির্জুন রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ী ছুটল । বেলা বারোটার আগেই গাড়ী পৌঁছে গেল ঊনকোটিকে পাহাড়ের নীচে অবাক করে দেওয়া ছবির মতো সুন্দর গ্রাম , কিন্তু হালাম পরিবারের অস্থায়ী বাস , শীতকালে ওরা এখানে পাহাড়ে আগুন দিয়ে বন পরিষ্কার করে জুম চাষ করে , ঊনকোটির দৃশ্য দেখতে প্রলয় , শ্রীকান্ত পল্লব সাথে কোলকাতার সুন্দরী ---- অন্বেষা বেলকুম পাহাড় বেয়ে ঊনকোটিতে সিঁড়ি বেড়ে উপরে ওঠে । না দেখলে পাহাড়ের সৌন্দয্য বর্ণনা করা সত্যিই মুশকিল । ঊনকোটি পাহাড়ের স্থানে স্থানে সরকারী আদেশ নামার অনেক বোর্ড দেখা গেল , যাতে বাংলা ও ইংরেজী দু - হরফের লিখা আছে । পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আঁস্তে তিনবন্ধু উপরে উঠছিল এবং দেখছিল পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা মুর্ত্তিগুলো । তিনবন্ধুর মধ্যে নানাহ্ কথা হচ্ছিল , কে এই অপরুপ মূর্ত্তিগুলো পাহাড়ের গায়ে বানিয়েছিল ? কখন বানিয়েছিল ? ত্রিপুরার কোন রাজার আমলে বানিয়েছিল? কি সন্দর ভাস্কর্য্য । আধঘন্টা বাদে ওদের তিনবন্ধুর খেয়াল হল অন্বেষাকে দেখতে পাচ্ছে না , হারিয়ে গেছে । তিনবন্ধু হাঁফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের উপর জলকুন্ড পযর্ন্ত উপরে উঠে । প্রায় একঘন্টা বাদে

অন্বেষা ফিরে এল । কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল জিজ্ঞাসার উত্তরে কোন ও পাত্তা দিল না। বন্ধুরা একে অপরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল । পল্লব বলে উঠে অন্বেষা , দেখছি এ অঞ্চলটা তোমার একদম মুখস্থ । তুমি সাজেষ্ট কর কিভাবে সমস্ত ব্যাপারটা ঘুরে দেখা যায় । দ্যাখো লজ্জার ব্যাপার , আমরা রাজ্যের ছেলে হয়ে ও অতকিছুই জানি না । কিন্তু তোমার দিখছি ক্লিয়ার কনসেপস্ন আছে । খোঁজ নিয়েছি বেলকুম পাহাড়ে ধস নেমেছে। অন্বেষা বলে উঠে বস্তির পাশ দিয়ে পাহাড়ের রাস্তা বেয়ে উপরে শিব মন্দির যাবো চলো শ্রীকান্ত জিজ্ঞেস করে ওখানে কি আছে । অন্বেষা বলে বিশালাকার বটগাছ , যা তুমি হয়ত এ জীবনে কখনো দেখোনি । ,এই বটগাছের তলায় কষ্টিপাথরে তৈরী শিবের সম্পূর্ণ অবয়ব । এ ছাড়া রাজ আমলের নানাহকীর্তি পাহাড়ের গায়ে , মাটিতে পাথরের মাঝে খোদিত আছে । বিদেশে এগুলি মহামূল্যবান । তা- ছাড়া উপরে আছে অপরুপ নানা ফুলের দৃশ্য । উপর থেকে প্রাকৃতিক ভাবে জলগড়িয়ে নীচে, বহু নীচে কুন্ডতে কিভাবে অনবরত জল পড়ছে তা দেখতে পাবে । এই জায়গাটা রাজ্যের হিন্দুধর্মাবলম্বীদের এবং স্থানীয় উপজাতিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। প্রতিবছর ঊনকোটি মেলার ওপার থেকে বহু মানুষ আসে । প্রলয় জিজ্ঞেস করে ওপার মানে ! অন্বেষা বলে আরে বোকা, ওপার মানে সীমান্তের ওপার থেকে । প্রলয় জিজ্ঞেস করে তুমি অতকিছু জান কি ভাবে? অন্বেষা বলে জানার ইচ্ছে থাকলেই জানা যায় । এত চড়াই মাত্র তিনকিলোমিটার রাস্তা বয়ে .... প্রলয় বলল কাজেই বুঝতেই পারছ কি ভাবে , ... কি রকম খাড়াই রাস্তাটা ! তবে গেলে ঠকবো না । প্রলয় বললো আমার তো আপত্তি নেই । তোরা কি বলিস ? প্রলয় বাকী দু - বন্ধুর দিকে তাকাল । একে একে সবাই রাজী হয়ে গেল । অন্বেষা বলে আমার একটা শর্ত আছে তোমরা আমার সঙ্গে যাচ্ছ বলেই ডোন্ট ফলো অন মি । আমার একান্ত দরকার , তবে তোমাদের কোন ইনফরমেশন দরকার হলে বলবে । অন্যথায় তোমরা তোমাদের মতো ঘুরবে , আনন্দ করবে তাতে আমার কোন প্রবলেম নেই । বেলকুম ও ঊনকোটি পাহাড়ের চড়াই , উৎরাই যে আগরতলার রাস্তাই হাঁটা নয়, সেটা ভালভাবে টের পেল ওরা তিনবন্ধু । অন্বেষা অভ্যস্থ , পায়ে অনেক আরোই পাহাড়ে পৌঁছে গিয়েছিল । উপরে উঠে শিবমন্দিরের পাশে একটি বাঁশের তৈরী মাঁচার উপর শ্রীকান্ত হাত পা ছড়িয়ে বলল , যাই বল বন্ধু , দস্তুর মতো থ্রিলিং এক্সপেরিয়েন্স । অন্বেষা মেয়েটি সত্যিই অসাধারণ। প্রলয় গম্ভীরস্বরে বলল , আমি আর নেই ভাই । পল্লব তুমি যাও , অন্বেষার সঙ্গে প্রেম কর। পায়ে ক্র্যাম ধরে গেছে , কোনরকমে হোটেলে পৌছলে দু -দিন আর নড়ছি না । শালা , বেড়াতে এসেছি না কষ্ট করতে এসেছি। এ যেন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি । শ্রীকান্ত ও হাত তুলল । বললো প্রলয়, আমি ও তোর সাথে আছি ।

প্রলয় , শ্রীকান্ত , বাশেঁর তৈরী মচাং এর উপর পড়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। পল্লব এক পা দু-পা করে এগোতে থাকে , মনে মনে ভাবে অন্বেষা তুমি আমায় পাগল করে দিয়েছ। অন্বেষা ও ব্যাপারটা আচ করতে পেরে কোথায় যেন একটু খুশী হল । অন্বেষা ভাবে ও আসুক না , প্রয়োজনে আমি ওর সাহায্য নেবো ও ভালবাসায় হাবুডুবু খাক আর আমি আমার কাজটা শেষ করি । হঠাৎ পল্লব দেখতে পেলো মন্দির থেকে খানিকটা দূরে অন্বেষা মন্দিরের সাধুর সাথে বসে একান্তে কি যেন বলছে । পল্লব ভাবে কি আশ্চর্য্য ! একটু আগে দেখলাম লালবস্ত্র পরিহিত সাধু মাটির উপর ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে কিন্তু এখন লাঠি বিহীন অন্বেষার সাথে ঝোঁপের আড়ালে পাহাড়ের ছাদে দিব্যি হেটে বেড়াচ্ছে । পল্লবের মনে সন্দেহ হয় , সে ও নিজেকে লুকিয়ে রাখে , পল্লবের ভালবাসা , অন্বেষার প্রতি দুর্ব্বলতা যেন উঠে গেছে । পল্লব দেখতে পেলো খানিকটা পাহাড়ী পথ হেঁটে সাধু এবং অন্বেষা একটা উঁচু টিলায় বৃহদাকার গাছের নীচে দাঁড়ায় এবং উপর থেকে সীমান্ত ও নিরাপত্তারক্ষীদের চোকিগুলো ভাল করে লক্ষ্য করছে , তারপর পাহাড়ের উপর থেকে সেলফোনে উর্দ্দু ও হিন্দি মেশানো ভাষায় কি যেন বলছে মেয়েটির কথা শেষ হওয়ার পর সাধু ও সেল ফোনে খানিকক্ষন কথা বলে । তারপর দেখা গেল সাধু ও অন্বেষা মাটিতে বসে পড়ে অন্বেষা তার ব্যাগ থেকে একটি ম্যাপের মতো বের করে সেখানে নিবৃতে মনোযোগ দিয়ে উভয়ে গ্রাউন্ডি ম্যাপিং করছে । পল্লবের বুঝতে দেরী হলো না অন্বেষা আসলে কোন বিদেশী এজেন্সীর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছে আর ট্যুরিষ্ট সেজে একটি মেয়ের পক্ষে এ কাজটা ভাল করা যায় । পল্লব বুঝতে পারে অন্বেষা নামে মেয়েটি টুরিষ্ট সেজে নিবৃত্তে গুপ্তচরবৃত্তির কাজটাই করছিল । পল্লবের মনে স্বদেশপ্রেম জেগে উঠে , পল্লব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে । সোজা চলে যায় ছদ্মবেশী সাধু আর অন্বেষার কাছে , বলে উঠে আমি সব দেখেছি তোমার ব্যাগে কি , তোমার সেলফোনটা দেখি তুমি কার সাথে কথা বলেছ । পল্লব প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে শুনশান পাহাড়ে বন্ধুরা অস্থির হয়ে উঠেছে পল্লবের খোঁজে । হঠাৎ দুই বন্ধু প্রলয় ও শ্রীকান্ত পল্লবের আর্তচিৎকার শুনে এদিক ওদিক ছুটতে শুরু করে । এক অসতর্ক মূহুর্তে ভন্ডসাধু আর অন্বেষা ধাক্কা দিয়ে পল্লবকে পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দেয় । অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে , দুই বন্ধু ছুটাছুটি করে দেখতে পায় অন্বেষা আস্তে আস্তে পাহাড় থেকে নীচে নামছে । পাহাড়ে চড়তে যত কষ্ট নীচে আসতে ততটা কষ্ট নয়। অন্বেষা শ্রীকান্ত , প্রলয়কে দেখতে পাই , বলে উঠে একটা চিৎকার শুনলাম , তোমরা শুনেছ কি ? প্রলয় বলে পল্লব তো তোমার সাথে গিয়েছিল , তাহলে সে কোথায় ? অন্বেষা বলে না তো সে তো তোমাদের সাথে ছিল , আমার সাথে তো কেউ ছিল না ! আমি একাকী ঘুরে ঘুরে দেখেছি আনন্দ নিয়েছি , আমার ভাবনা এ রাজ্যের বন - পাহাড় নিয়ে

একটি তথ্যভিত্তিক বই বের করবো । রাত হয়ে গেছে, কোথায় খুঁজব পল্লবকে ? অন্বেষা বলে হয়ত ও রাস্তা হারিয়ে অন্যদিকে চলে গেছে, ঠিক আছে সকালে খোঁজা যাবে । শ্রীকান্ত বলে তিনজন একসাথে এসেছি বাড়ীতে গিয়ে আমরা কি বলব । অন্বেষা বলে অতো চিন্তার কিছু নেই, কাল সকালে দ্যাখো ঠিক পেয়ে যাবে । প্রলয় বলে আমি সিওর যে চিৎকারটা আমরা শুনেছি সেটা পল্লবের। কোন বন্যজন্তু আক্রমন করলো না তো । অন্বেষা বলে অযথা মিছিমিছি ভাবছ । প্রলয় বলে রাত হয়ে গেছে কিভাবে যাবো ? অন্বেষা বলে চলো অসুবিধে নেই, এ রাস্তাটা আমার জানা আছে । শ্রীকান্ত বলে লোকাল থানাতে একটা ফোন করলে কেমন হয় । অন্বেষা বলে অযথা সমস্যা তৈরী করছ । পল্লব এতো বোকা ছেলে নয় । সে ঠিক বের হয়ে আসবে । চলো এতো চিন্তার কিছু নেই ।শ্রীকান্ত, প্রলয়ের প্রচন্ড টেনশান হচ্ছে । যাই হোক রাতে ঊনকোটি পাহাড়ে তো বসে থাকা যায় না ? অন্বেষার দেখানো পথে পাহাড় থেকে নেমে রাস্তায় আসে শ্রীকান্ত, প্রলয়, আর অন্বেষা, ডাকবাংলোর বারান্দায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে অটো ড্রাইভার রবি ঘুমিয়ে পড়েছিল । প্রলয়রা ডাকতেই হুড়মুড়ি খেয়ে রবি উঠে পড়ে, বলে দাদা রাত ৭টা বেজে গেছে । চলুন তাড়াতাড়ি এলাকাটা বেশী ভাল নয় । এর মাঝেই শ্রীকান্ত লক্ষ্য করে অন্বেষার মোবাইলে তিন চারবার মিস্‌কল আসে কিন্তু অন্বেষা ফোন রেস্‌পনস্ করছে না বরং চ সে খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছে । খুব সর্তকভাবে শ্রীকান্ত আর প্রলয়ের দিকে তাকাচ্ছে । গাড়ী চলতে থাকে পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে কৈলাশহর পথে, এরই মাঝে রবি হঠাৎ বেঁফাস বলে উঠে ম্যাডামকে নিয়ে এ পর্যন্ত আমি তিনবার আসলাম এখানে । কথাটা প্রলয়ের কানে বাজে প্রলয়ের যেন একটা অজানা সন্দেহ তাড়া করে । যাঁই হোক হোটেলে এসে প্রলয় হঠাৎ করে বাইরে যায়, ড্রাইভার রবিকে বলে ভাই তুমি একটু অপেক্ষা করো । অন্বেষা তার রুমে ডুকে যাই । প্রলয় শ্রীকান্তকে বলে দেখ্ বন্ধু ব্যাপারটা আমার কাছে ভা ল ঠেকাছে না, পল্লবের কিছু হলে দায় —— আমার আর তোর উপর । ওদের পরিবার আমাদের ছাড়বে না, এ ছাড়া আমার কাছে এই সুন্দরীর কথাবার্তা ভাল ঠেকছে না, যদি কাল সকালে কেটে পড়ে ওর টিকির নাগাল ও পাওয়া যাবে না । বরংচ তুই লক্ষ্য কর যাতে সুন্দরী পালাতে না পারে আমি একটু থানাতে যাই, ঘটনার বিহ্বলতা কাটিয়ে শ্রীকান্ত বলে ঠিক আছে, তাই হোক, তুই থানায় যা আমি এ দিক সামলে নেব । প্রলয় বের হয়ে ড্রাইভার রবিকে থানায় ঠিকানা জিজ্ঞেস করে এবং রবিকে সাথে নিয়ে থানায় যায় । থানার সামনে প্রলয় রবিকে সমস্ত ঘটনা বলে । তারপর রবিকে সাথে নিয়ে প্রলয় সোজা চলে যায় ও, সির রুমে প্রলয় ও .সি সুভাষ মুখার্জীকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে ওরা ছোটবেলার তিনবন্ধু আগরতলা

থেকে কৈলাশহরে আসে উনকোটি পাহাড় দেখতে , তারপর তাদের জম্পুইহিলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। বৃষ্টির দাপটে তাদের জম্পুইহিল যাওয়া হয়নি , হোটেল আর বাসস্ট্যান্ডে পরিচয় হয় কোলকাতার তরুনী অন্বেষা মিত্রের সাথে , সেই জানিয়েছে এই এলাকা উনার চেনা । উনার কথাতেই শেয়ারড্ করে অটোরিক্সা ভাড়া করে তারা উনকোটি পাহাড়ে যায় প্রলয় ও শ্রীকান্ত ওরা দু-জন টায়ার্ড্ হয়ে মন্দিরের মাচাং এ শুয়ে পড়ে । বন্ধু পল্লব অন্বেষার সাথে উপরে ওঠে, সন্ধ্যার আগমুহূর্তে পল্লবের কন্ঠের ন্যায় আর্তচিৎকার শুনে , ওরা খোঁজাখুজি করে দেখে অন্বেষা পাহাড় থেকে নামছে , জিজ্ঞাসা করলে অন্বেষা বলে সে ও চিৎকার শুনেছে, কিন্তু পল্লব ওর সাথে যাইনি । ও.সি সুভাষবাবু ড্রাইভার রবিকে ডেকে ঘটনা জানতে চাই , রবি বলে স্যার আমি তো ডাকবাংলার বারান্দায় শুয়ে ছিলাম , আমি উনাদের সাথে যাইনি , তবে এটুকু বলতে পারি , এই ম্যাডামকে নিয়ে এখানে আমি তিনবার এসেছি । প্রলয় করজোরে ও .সি কে বলে ওঠে স্যার আমাদের একটু সাহায্য করুন যাতে আমরা পল্লবকে খুঁজে পাই । ও . সি সুভাষবাবু সমস্ত ঘটনা শুনে , এক অফিসারকে ডাকেন , সবার নাম , ধাম , ঘটনার সম্বন্ধে লিখে প্রলয়কে নিয়ে সোজা জিপ গাড়ী করে হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন, রাত তখন প্রায় এগারটা । প্রলয়কে দূঁরে সরিয়ে খানিকক্ষণ হোটেলের মালিকের সাথে কথা বললেন। হোটেল মালিক বললেন সুন্দরী তরুনী অন্বেষা মিত্র এ পযর্ন্ত তিনবার উনার হোটেলে এসেছেন । হোটেলের রেজিষ্টারে পারপাস অব ভিজেটে লিখা আছে । ষ্টাডি হোটেলের রেজিষ্টার চেক করে ও, সি সাহেব থানায় কি যেন টেলিফোন করে বললেন , কিছুক্ষনের মধ্যেই তিনজন মহিলা পুলিশ সাথে তিনজন সশস্ত্র পুলিশ হোটেলে হাজির। হোটেল মালিককে সাথে নিয়ে প্রথমে আমাদের ঘরে ডুকেন, কি যেন তল্লাসী ও করেন । শ্রীকান্ত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল , তার দু চোখ গড়িয়ে জল বের হচ্ছে । আমাদেরকে বলেন আপনাদের আমার সাথে থানায় যেতে হবে । তারপরেই আচমকা আমাদের সাথে নিয়ে হোটেল মালিকসহ তিন মহিলাপুলিশ সহ অন্বেষার ঘড়ে ডুকেন । ডুকেই প্রশ্ন করেন ম্যাডাম এতরাত আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? উত্তরে অন্বেষা বলে না তো কোথায় যাবো ? তবে আপনি একদম ডেস্ আপ হয়ে কেন ? জিনিষ পত্র দেখছি সব গুছিয়ে নিয়েছেন । না এমনিতেই বিছানার উপর ব্যাগটা ধরতে গেলে অন্বেষা বলে উঠে , এটা আমার পার্সোনাল ও , সি সুভাষবাবু বলে উঠে , পার্সোনাল জিনিষ তখনই দেখা হয় যখন তাতে কোন অভিযোগ বা সঙ্গত কারন থাকে । ঠিক আছে আপনি চলুন , আপনাকে থানাতে যেতে হবে । অন্বেষা বলে উঠে রাতে কেন সকালে যাবো ? ও , সি বলে উঠেন সকালে যেতে হলে তো আমরা এখন আসতাম না , ঠিক আছে আপনি পার্সোনাল ব্যাগ

নিয়ে নিন ।আমাদের মেয়েরা আপনার সাথে আছে ।ও , সি সুভাষবাবু মেয়েদের চোখের ভাষায় কি যেন বুঝিয়ে দেন। হোটেল মালিককে বলেন এ দুটো রুম আর খুলবেন না ,যতক্ষন পুলিশ না বলে , এই বলে দু- টোগাড়ী করে আমাদের দু-জন আর কোলকাতার অন্বেষা মিত্রকে নিয়ে থানায় আসেন , থানায় ঢুকেই ও, সি সুভাষবাবু অন্বেষাকে বলে আপনার নামটা ঠিক আছে তো ? স্মার্ট মেয়ে নিখুঁত ইংরেজী অ্যাকসেন্টে বলে আপনার কি সন্দেহ আছে নাকি ? ও , সি সুভাষবাবু বলে ওঠেন সন্দেহ আছে বলেই তো জিজ্ঞিস করলাম , সন্দেহ আছে বলেই তো থানাই নিয়ে এলাম । সোজা কিছু না বললে অনেক রাত্রি পর্যন্ত হয়তো ইন্টাররোগেশন করতে হবে । প্রলয় হতাশ ভাবে বলল , সব উল্টো পাল্টা হয়ে গেল , তারপর মনে হচ্ছে দোষ না করে সবার কাছেই দোষী হলাম , পুলিস কেসে ফেঁসেছি ।লাইফটা ডুম ফোঁস করে তেড়ে উঠে শ্রীকান্ত ।লাইফ ডুম মানে , দেশে কি আইনকানুন নেই ? আমাদের তো অ্যারেষ্ট করেনি , ডিটেন করেছে ইন্টারগোশনের জন্য । প্রলয় বলে মাথাটা ঠান্ডা রাখ । সত্যি বলতে কি , এই বজ্জাত মেয়েটাকে আমার খুব সন্দেহ ! কেন জানি না ? থানার ভেতরে একটা পুরানো টেবিল ।ইলেকট্রিক তারে ঝুলানো একটা হাইপাওয়ার বাল্ব । টেবিলটার দুই পাশে দুটো লম্বা কাঠের বেঞ্চ , অন্যদিকে হাতল দেওয়া একটি চেয়ার , হাতলছাড়া আর একটি চেয়ার । এটাই কৈলাশহর থানার ইন্টারোগেশন চেম্বার ।ও , সি সুভাষ মুখার্জী এখানেই আমাকে , শ্রীকান্তকে অপরদিকে অন্বেষাকে বসতে বলেছেন ।এখানেই.দফাওয়ারী অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, আশ্চার্য্য ! মেয়েটি স্বীকার ই করলো না পল্লব ওর সাথে গিয়েছিল । মেয়েটি একটু ও নার্ভাস হয়নি হয়ত ও সিওর পল্লব আর পৃথিবীতে নেই । আমি আর শ্রীকান্ত খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম । থানার ভেতরে যেন একটা অজানা আতংঙ্ক বুকটা হা হাকরতে থাকে । ও, সি সাহেব প্রায় দু - টো পযর্ন্ত নানাহ ইন্টারোগেশন করেছেন , কি যেন খাতায় লিখেছেন, উনার দুটো চোখ আগুনের হল্কার মতো জ্বলজ্বল করছিল ।রাত দু -টোর পর উনি চলে যান , আর একজন অফিসার আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন এমন সময় অন্বেষার মোবাইল বেজে উঠে ।এবার যেন অন্বেষা একটু নার্ভাস, বাজপাখীর মতো ছো মেরে অফিসার অন্বেষার মোবাইলটি হাতে নিয়ে নেন , অফিসার হ্যালো করতেই মোবাইল লাইন কেটে দেয় । তরুন অফিসার এবার তীক্ষ্ণ ভাবে জেরা শুরু করেন অন্বেষাকে । আপনার মোবাইলে দেখছি অনেক বিদেশী নাম্বার ।এগুলো কোথা থেকে এলো । দেখছি আপনি কলগুলো রিসিভ্ করেছেন এবং বেশ সময় কথা ও বলেছেন, ব্যাপারটা কি বলুনতো ।অন্বেষার স্মার্ট কথাবার্তায় যেন ভাটা পড়ে গেছে ।সে অসম্ভব চুপ । কিছুক্ষনবাদেই ও , সি সুভাষবাবু আবার এলেন তখন রাত

প্রায় শেষের পথে হয়ত উনি ডিনার সেরে ঘন্টাখানেক আরাম করে পুনরায় এসেছেন । তরুন অফিসার মোবাইল ফোনের ঘটনাটুকু ও,সিকে বলে । ও,সি সাহেব মহিলা কনষ্টেবল দিয়ে অন্বেষার ব্যাগ তল্লাসী করান , ব্যাগে পান একটি অত্যাধুনিক বিদেশী ডিজিটেল ক্যামেরা যাতে রাজ্যের অনেক ফটোগ্রাফ, বেশ কয়েকটি ম্যাপ ফোল্ডিং করা , ৬ খানা সিম কার্ড , কেবল একটি সিমকার্ড এদেশের বাকী সব বিদেশের । সিমগুলো মোবাইলে ডুকিয়ে ও,সি সাহেব চেক করে দেখেন সবগুলো সিম্ এ্যাক্টিভ । রিং বাজে কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে কোন রিস্‌পনস্ আসছে না । হঠাৎ করে অন্বেষা শান্ত হয়ে যায় । ও, সি সুভাষবাবু হয়তো ততক্ষণে যা বুঝার বুঝে গেছেন । উনি তরুন অফিসারকে বলেন ষ্টাফ তৈরী করো , সাথে দু -জন মহিলা ষ্টাফ ও নিয়ে নাও । দু-টো জীপ গাড়ী তৈরী । তখন ভোরের আলো ফুটে গেছে ও,সি সুভাষমুখার্জী হঠাৎ বলে উঠেন । " ম্যাডাম খুনের চেয়ে ও দেশদ্রোহীতা ও গুপ্তচরবৃত্তির সাজা অনেক সাংঘাতিক । নামীদামি আইনজীবিরা হয়তো খুনটাকে দুঃর্ঘটনা বলে আমাকে খানিকটা সেইফ করতে পারে , কিন্তু দেশদ্রোহীতা , গুপ্তচরবৃত্তি তা থেকে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না । সুতরাং আমাদের কষ্ঠ না দিয়ে সবকিছু খুলে বলেন। অন্বেষা মাথানীচু করে চুপ করে রইলো ।

সকাল প্রায় সাতটা বেজে গেছে । এমন সময় এক উপজাতি ছেলে হাঁকিয়ে বাই -সাইকেল থেকে নেমে জানতে চাই বড় স্যার কোথায় ? ও,সি সুভাষ মুখার্জী ছেলেটাকে বলে ঠিক আছে তুমি শান্ত হও । ছেলেটা বিড়বিড়িয়ে বলছে লোকটা গুরুতর আহত , তাড়াতাড়ি চলুন । সুভাষবাবু জিজ্ঞেস করে তুমি আস্তে বলো কি হয়েছে ? সুধাম দেহের উপাজাতি ছেলেটা বলে তার ঘড় পাহাড়ের ঢালে বস্তিতে , মাঝ রাত থেকেই তারা বস্তির লোক কান্না ও গোঙানী শুনতে পাচ্ছে । রাতে তারা কেহ বের হয়নি , ভোরে তারা দলবেধে বের হয়ে পড়ে দেখতে পায় একজন বাবুলোক পাহাড়ের নীচে গহ্বরে পড়ে আছে । তারা সবাইমিলে উনাকে উঠিয়েছেন এবং বস্তিতে নিয়ে এসেছেন । লোকটা কথা বলতে পারে কিন্তু হা-পা ভেঙ্গে গেছে বসতে ও পারে না , দাঁড়াতে ও পারে না । উপজাতি যুবকটি বলে আমারা যত্ন করে ঘরে রেখেছি উনাকে । ও,সি সুভাষবাবু ততক্ষনে যা বুঝার বুঝে গেছেন । হঠাৎ অন্বেষা থানা থেকে দৌড়ে রাজপথের দিকে গাড়ীর নীচে ঝাঁপ দিতে চেষ্টা করে , ভাগ্যিস দুই পথচারী ঝাপটে ধরে ফেলে , লরীটি ও ব্রেককষে হয়ত বা অন্বেষার মনে হয় মৃত্যু ও বিশ্বাসঘাতকতা করে । দুই জীপে করে ও,সি সুভাষবাবু , অপর তরুন অফিসার , আমাদেরকে সাথে নিয়ে উপজাতি যুবকটিকে নিয়ে ছুটেন সেই পাহাড়ের ছাঁদে রাস্তায় জিপ থেকে নেমে পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়ালেন ও,সি সুভাষ মুখার্জী । ড্রাইভার নির্ম্মল আর পল্টুকে বললেন তোমরা গাড়ীর কাছে থেকো। উপজাতীয় যুবকটার দেখানো পথে উনকোটি পাহাড়ের কোল পার হয়ে উপজাতি মহল্লায় গিয়ে উঠে পুলিশের দলটি সাথে আমরা । বস্তির লোক অন্বেষা মেয়েটিকে দেখা মাত্রই তেঁড়ে আসে , যাই হোক পুলিশী

তৎপরতায় কোন অঘটন ঘটেনি । পল্লব শুয়ে শুয়ে সমস্ত ঘটনাটুকু বস্তির লোকদের বলেছিল । আমরা যাওয়ার পর পল্লব সমস্ত ঘটনা ও,সি সাহেবকে পুংখ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলল । অন্বেষা মেয়েটির কথা এবং অপর সাধুর কথা। সব কথা শুনে ও,সি সুভাষবাবু পল্লবকে বলে আমি আপনার দেশপ্রেম ও সাহসকে ধন্যবাদ জানাই, তবে আপনার কৌশল ভুল ছিল । বস্তির লোক জানল কি ভাবে ? পল্লব বলে আমি ভেবেছি যদি আমি মরে যায় তাহলে ঘটনাটুকু কখনো আবিস্কার হবে না , গুপ্তচররা আমাদের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানতে পারে । তাই উপজাতি বস্তির লোকদের সমস্ত ঘটনা বলেছিলাম এবং এ ও বলেছিলাম আমি না থাকলে ও আপনারা ঘটনাটুকু প্রশাসনকে জানাবেন , এই মোতাবেক বস্তির লোক ছেলেটাকে আপনার থানায় পাঠায়। ও,সি সুভাষবাবু নেতৃত্বে আমরা ও পুলিশের দল সমস্ত ঘটনাস্থল ঘুরে দেখি । এলাকার লোক আরো জানাই এইরকম কোন সাধু তাদের শিবমন্দিরে ছিল না, শিবমন্দিরের পুজারী বয়স্ক এক উপজাতি । ও,সি উনার সাথে ও কথা বলেন । অন্বেষা সম্পূর্ন ভেঙ্গে পড়ে , জিজ্ঞাসায় সে বলে এই সাধুর পরিচয় সে সম্পূর্ন জানে না । শুধু কোড নাম , রুহেল ভাই বলেই জানে । ও,সি সাহেব ওয়ারলেস্ বার্তারি সমস্ত সীমান্ত চৌকি ও থানাগুলোকে খবর পৌছায় , সেই ছদ্মবেশী সাধু রুহেল ভাইকে গ্রেপ্তার করার জন্য । পড়ন্ত বিকেলে পল্লবকে সাথে নিয়ে পুরো দলটা কৈলাশহর ফিরে আসে । সম্পূর্ন সরকারী খরচে পল্লবের চিকিৎসা চলতে থাকে কৈলাশহর জেলা হাসপাতাল, পরবর্তীতে আগরতলা জি,বি হাসপাতালে । অন্বেষা জিজ্ঞিসাবাদে খোলসা্ করে তার নাম অন্বেষা মিত্র নয় , সে বৈদিশিক একটা গুপ্তচর সংস্থার হয়ে কাজ করে , তার অর্থ তারাই যোগান দেয় , সীমকার্ড থেকে সবকিছুই তাদের দেওয়া । অন্বেষা সবকিছু খোলসা্ করে দেয় রাষ্ট্রদ্রোহিতা আর গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে অন্বেষা গ্রেপ্তার হয় , শুরু হয় টানা তদন্ত জিজ্ঞাসাবাদ তল্লাসী , তদন্তের স্বার্থে , রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব কাধেঁ নিয়ে ও,সি সুভাষ মুখার্জী বলেন , আমরা আর কিছু বলবো না , আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দিন । প্রলয় শ্রীকান্ত - বন্ধু পল্লবকে নিয়ে পুলিশী সহায়তায় আগরতলায় ফিরে আসে । ছ- মাস বাদে দেশপ্রেম ও সাহসিকতার জন্য পল্লব রাষ্ট্রীয় সন্মানে সম্মানিত হয় । প্রলয় , শ্রীকান্তরা ফিরে আসার সময় ও,সি সুভাষ মুখার্জী চোখ বন্ধ করে একটা বড় শ্বাস নিলেন তারপর চোখ খুলে বললেন একটা বড় কাজ করতে অনেকের সাহায্যের দরকার । বিশাল ভারতবর্ষে আঘাত হানার জন্য গুপ্তচরেরা সক্রিয় দেশের দেশপ্রেমী মানুষ ওদের যোগ্য জবাব দেবে । নোংরা বিভেদ হয়ত অচিরেই চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে । গুপ্তচরবৃত্তির কথা লিখা থাকবে পুরনো কেস ডায়েরীতে ওরা সৃষ্টি করতে পারে না , শুধু ধ্বংস করে ইতিহাস ওদেরকে বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর হিসাবেই চিহ্নিত করবে ।

শেষের দিনগুলো

পচাত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে মনিমালা দেবীর মোটা আতস কাঁচের চশমা চোখে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, মনে হয় চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। বাড়ীর পেছনের মাঠটার দিকে তাকালে দেখেন তপ্ত রোদ্দুর ঝলসে যেন কুন্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। তপ্ত গরমে ঘর্মাক্ত দেহে চোখ গুলো যেন ঝলসে যাচ্ছে, চোখের চশমার আতসকাচগুলো গরম হয়ে গেছে, মোটা ভারী চশমাটা ঘামে ভারী হয়ে নাকের সামনে এসে ঠেকে। বিরক্ত হয়ে চশমাটা খুলে বারবার কাপড়ের আঁচল দিয়ে পরিস্কার করেন। চশমার পাওয়ারটা চেঞ্জ করতে হবে কিন্তু কে নিয়ে যাবে ডাক্তারের কাছে। উপরন্তু ভালো ডাক্তারের কাছে গেলে দু - শো টাকা সাথে ঔষধ পত্রের খরচ। এই পচাত্তর বছর বয়সে রোজগার,

টাকাপয়সা আসবে কোথা থেকে? উপরন্তু স্বামীহীনা বৃদ্ধা মহিলার খবর কে রাখে । সবাই বাড়তি বোঝা মনে করে । স্বামী ও নেই উজার করে খরচ করতে গেলে টাকাটা দেবে কে ?

মনিমালাদেবীর দুই মেয়ে সোনালী , রুপালীর বিয়ে হয়েছে অনেক দিন, সবার ছোট রুপক। মেয়েরা স্বামী সন্তান নিয়ে সুখেই আছে । আর কেই বা চায় মেয়ের সংসারে বোঝা হতে । প্রায় চৌদ্দ বছর হয়ে গেছে মনিমালাদেবীর স্বামী সচিদানন্দবাবু মারা গেছেন । সচিদানন্দবাবু পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। মনিমালাদেবীর ভরসাটা শুধু পেনশনের টাকা । বড়মেয়ে সোনালী অনেকবার মাকে বলেছে চলো আমার কাছে তোমার অসুবিধে হবে না । কিন্তু না , মনিমালাদেবীর এই কথা তোর বাবার তৈরী বাড়ীটাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবো । এখান ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না , সোনালী মা কে দেখতে এসে কয়েকবার বলেছে মা চল্ আমার সাথে ডাক্তারের কাছে , টাকাকড়ি যা লাগে আমি দেব। চশমাটা পালটে নাও , ঔষধ যা লাগবে আমি এনে দেবো। সোনালীর দুই ছেলে শান্তনু ও সুভাষ স্কুলে পড়ে । স্বামী স্বরুপ হাইস্কুলের শিক্ষক । তার উপর সকাল বিকাল টিউশনি করে । সোনালীর অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল।

বড়মেয়ের কথায় মনিমালাদেবীর গর্বের সঙ্গে সজল নয়নে মেয়ে সোনালীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন , মনে মনে ভাবেন আমার শরীরের রক্ত এখনো আমার প্রতি খেয়াল রাখে । দ্যাখ মেয়েটা সবার বড় , কত সরল, মনে কোন ছলচাতুরী নেই। আমার থেকে তার এখন পাওয়ারকিছু নেই তবু ও মাতৃভক্তি তার অটুট আছে । সোনালী তার বাবার কার্বন কপি । তার বাবা থাকলে মেয়ের এই কথা শুনে কতো খুশী হতো । ছোটবেলা থেকে এ মেয়ে মা -বাবার মন বুঝতো । সংসারের জ্বালা - যন্ত্রনা সব সমস্যা মা বাবার সাথেই ভাগ করে নিতো । এখন ওর নিজের সংসার হয়েছে কিন্তু একটুকু ও পাল্টায়নি । মা হওয়া যে সহজ নয় , এই কথাটুকু যেন সোনালী মর্মে মর্মে বুঝে , সচিদানন্দবাবু প্রচন্ড সংস্কৃতি পরায়ণ আদর্শবান মানুষ ছিলেন । ব্যাক্তি জীবনে, কর্মজীবনে আদর্শ বিসর্জন দিয়ে কখনোও কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে রাজী ছিলেন না তিনি । স্বামীর কথা মনে আসতেই দাতবিহীন শিশুর সরলতা নিয়ে একমুখ হাসি দিয়ে মনিমালাদেবী সোনালীকে বলে উঠে আমাকে নিয়ে তোমার বেশী ভাবতে হবে না । নিজের স্বামী সন্তানের জন্য কর্তব্যপালন করো । তোমার বাবা আমায় ফেলে চলে গেছেন অনেক বছর হলো , আমি শুধু প্রার্থনা করি উনি যেন আমাকে উনার কাছে ডেকে নেন । তোমার বাবার সাথে ঘরবেধেঁ জীবনে সবকিছুই পেয়েছি । এখন

যেতে পারলে বাঁচি। মায়ের কথা শুনে সোনালীর বুকটা যেন হাহাকার করে উঠে । বলে মা তুমি কি অশুভ বকছ্ , তুমি চলে গেলে "মা" বলে ডাকবো কাকে । বাবা ও নেই যাবো কোথায় । হঠাৎ সোনালীর চোখ পড়ে পর্দ্দার পাশে দাড়িয়ে থাকা ছোটভাই রুপকের স্ত্রী তানিয়ার দিকে । সোনালীর মনে হয় তানিয়ার কোন প্রতিক্রিয়া নেই বরংচ মনে হয় তানিয়া তিতিবিরক্ত । সোনালীর মায়ের কথাবার্তা তানিয়ার কাছে মনে হয় তেতো পানিয়। মুখ মন্ডলে তা যেন পরিস্কার ঘরে বয়স্কা বিধবা শ্বাশুড়ী তার কাছে যেন এক বাড়তি বোঝা । কারণ মনিমালাদেবী বেশ কয়েকদিন শুনেছে পুত্রবধু তানিয়া রুপককে তার বিরক্তির কথা বলতে । রুপক কখনো ও কোন শব্দ করেনি । বোনরা এলে রুপক দিদিদের সাথে বসে মার সুবিধে অসুবিধে নিয়ে কথা বলে । মাকে স্নান খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করে শরীরের খোঁজ খবর নেয় । তানিয়ার কথায় রুপকের কোন হেলদোল নেই যার ফলে তানিয়া সংসারে কিছুটা কোনঠাসা । তানিয়ার হাসিতে কথাবার্তায় টিপ্পনিতে যে অসন্তোষের ছাপ আছে তা স্পষ্ঠ । দিদিরা আসলে মা বোনদের সাথে কথায় কথায় রাত্রি বেড়ে গেলে পরদা সরিয়ে তানিয়া রুপককে ডেকে নেয় , বলে আদিখ্যেতা করো না তো, অনেক হয়েছে । তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি আমার অসহ্য লাগছে । এ রকম ভাবে আমার পক্ষে তোমাদের বাড়ীতে থাকা অসম্ভব। রুপক খানিকটা চুপ করে থাকে ।

তোমাদের বাড়ি মানে ! তাহলে তুমি কি বুঝাতে চাও । এটা তাহলে কার বাড়ি? রুপকের কথায় পাত্তা না দিয়ে তানিয়া হম্বিতম্বি করে । তারপর বলে এখানে আমার কোন স্বাধীনতা আছে নাকি ? যতদিন তোমার মা বেঁচে থাকবেন ততদিন এ বাড়িটাকে আমি নিজের ভাবতে পারবো না । ঔদ্বত্যের ঢেউ উত্থাল করে তোলে তানিয়াকে, আমাকে কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত পুর পাঠিয়ে দাও । মা বাবার কাছে যাব।

রুপক বলে তা ঠিক আছে তুমি যেও । আমি মাইনে পেলে যেও তানিয়া বলে না আমি কালই যাবো ।

হতবাক হয়ে রুপক তানিয়ার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কিছু বলবে এমন সময় মনিমালাদেবী সামনে এসে হাজির বলে উঠেন রুপক তানিয়াকে বাপের বাড়ীতে যেতে দাও , বাড়ীর জন্য যখন মন টানছে তোমার ওকে বাধা দেওয়াটা ঠিক নয় ।

রুপক বলে ক-দিন আগেই তো ঘুরে আসলাম , দার্জিলিং হয়ে ছোট শঙ্খদ্বীপ কি এতটা

জার্নি সহ্য করতে পারবে । এমনিতেই ওর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না । মনিমালাদেবী বললেন তুমি শঙ্খকে নিয়ে বউমাকে শান্তিরবাজার বাপের বাড়ীতে নিয়ে যাও । শঙ্খকে নিয়ে বউমা এতদূর যাবে কি করে ? বাসে প্রচন্ড ভিড় হয় ।

তানিয়া বেপরোয়া ভঙ্গিতে পাশ কেটে চলে যায় । মনিমালাদেবী ভাল করেই বুঝেন তানিয়ার বিরক্তির কারণ শুধু বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী । পচাত্তর বছর বয়স তো আর একদিনে হইনি , সংসারে ছেলে মেয়ে মানুষ করতে করতেই চুলগুলো সাদা হয়েছে । রুপক তানিয়া ঘরমুখো হতেই মনিমালাদেবী ঠাকুরঘরে ডুকে পড়ে । এই অশান্তির মধ্যে কি খাওয়া দাওয়া হয় । তাছাড়া এই বৃদ্ধাকে খাওয়ার কথা বলবেই বা কে ? স্বামী সচিদানন্দের কথা মনে পড়ে মনিমালাদেবীর । দু - চোখ গড়িয়ে জল বের হতে থাকে চোখ যেন আরো ঝাপসে হয়ে গেছে । বুকফাঁটা কান্না ডুকরে আসে কিন্তু কে শুনবে তার কান্না । ঠাকুরের পায়ে তিল তুলসী দিয়ে মনিমালাদেবী বলে হে ঈশ্বর আমাকে ওর কাছে পাঠিয়ে দাও । সচিদানন্দবাবু যদি জীবিত থাকত তাহলে হয়ত এই পরিস্থিতি দেখতে হতো না । মধ্যাহ্নবেলায় দু জনে বসে কথা বলত । কারণ সচিদানন্দ কখনো দিবানিদ্রা যেতেন না কারণ দুপুরটা অফিসে কাটত । তাই এই অভ্যাসটা রিটায়ার্ডের পরেও হয়নি । মনিমালাদেবী ভাবে সচিদানন্দ দাড়িঁয়ে অপলক দেখছে এই নির্ভেজাল সংসারের আমন্ত্রিত ভেজাল , অশান্তি ।

শঙ্খের কান্না শোনে মনিমালাদেবী তানিয়ার ঘরে যান , রুপক ঘরে নেই , সে ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্কে চাকুরী করে । সে অফিসে চলে গেছে । দুপুরে খাঁ খাঁ রোদ্দুর শঙ্খের কান্নায় তানিয়া কর্ণপাত ও করছে না দেখে মনিমালাদেবী নাতীকে আনতে যান । এমনিতেই তানিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠে যত সব আদিখ্যেতা , অমন আহ্লাদ করতে হবে না । আপনি এখান থেকে সরে যান । মনিমালাদেবী বুঝতে পারেন, তানিয়া মনিমালাদেবীকে মেনে নিতে পারছে না । মনিমালাদেবী ভাবে সবসময় কি এত অশান্তির মধ্যে থাকা যায় । ভাবেন কোথা ও চলে যাবেন , বড় মেয়ে সোনালী মেঝ মেয়ে রুপালী তো মাকে নিতে চান কিন্তু মনিমালাদেবী মেয়েদের বোঝা হতে নারাজ । যাওয়া বললেই তো যাওয়া হয় না । মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে ঘর ছাড়া যে বৃদ্ধ বয়সে অনেক কঠিন । ছেলে , নাতি , বউ কেউ যে তার পর নয় । কোথায় যাবেন তিনি ? কুড়েঁ কুড়েঁ বাকী ক-টা দিন কাটাতে হবে স্বামীর তৈরী চারদেওয়ালের ভেতর । পেনশন তুলে প্রতিমাসে তানিয়ার হাতে টাকাটা ধরিয়ে দেন । এক সপ্তাহ মোটামুটি ভাল যায় তার পর যেই কপাল সেই মাথা । মনিমালা ভাবেন সচিদানন্দবাবু একার চাকুরীতে দুই মেয়েকে

লেখাপড়া করিয়েছেন ভালো বিয়ে ও দিয়েছেন । ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন বাড়ী ঘর বানিয়েছেন সবার সুখের জন্য কিন্তু জীবনে সুখ , আরাম উনার ভাগ্যে জোটেনি ।

মনিমালার মনে পড়ে ছেলেকে বিয়ে করানোর প্রায় এক বছর বাদে সচিদানন্দবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়েছিলেন। বিছানায় একাকী মনিমালাদেবীকে বলেছিলেন চেহারা সুন্দর হলেই সবার মন সুন্দর হয় না । এই অসুস্থতার মাঝেই একদিন সজ্ঞানে দেহ রাখল। সচিদানন্দবাবু সুখের মুখ দেখার আগেই সচিদানন্দবাবুর মৃত্যু , স্ত্রী হিসাবে মনিমালাকে যেমন আঘাত দিয়েছিল তেমনি একমাত্র পুত্র রুপক যেন ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছিল , রুপকের ভগ্ন মানষিকতার মধ্যেই মনিমালাদেবী একদিন শুনতে পেল তানিয়া বলছে , তুমি দেখছি পিতৃভক্ত পরশুরাম । মা বাবা তো চিরকাল বেঁচে থাকে না , একদিন সবাইকে যেতে হয়। রুপক বলে বাবাকে ভুলতে পারছি না , ছেলে হিসাবে বাবার জন্য কিছু করতে ও পারলাম না । সবই তো বাবার হাতে গড়া ।

তানিয়া বলে তাহলে বাবাকে নিয়ে কাহিনী লিখো । তানিয়ার উস্কানীমুলক কথাবার্তা রুপকের মনে যেন শিং মাছের কাটার ক্ষত বলে মনে হয় । রুপকের দুঃখের কথা বলার /শোনার কেউ নেই , মা তো শোকগ্রস্থ , সব কথাই মনিমালাদেবী শুনেছেন কিন্তু কিছু বলার জো নেই । ভাবেন সচিদানন্দবাবুর সেই কথাটুকু "চেহারা সুন্দর হলেই সবার মন সুন্দর হয় না "

নানাহ্ ভাবতে ভাবতে মনিমালাদেবীর দিন কেটে যায়। পড়ন্ত বিকেল আকাশ লাল । সর্ন্তপনে উনুন জ্বালিয়ে মনিমালাদেবী চা - করে ফেলেন । তারপর বারান্দায় দাড়িঁয়ে গ্রামের রাস্তায় দিকে শুন্যতাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন । বড্ড একাকিত্ব বোধ হচ্ছে মনিমালাদেবীর । উনি থাকলে এই সমস্যাটা হতো না । কারণ সচিদানন্দবাবুর বাইরে প্রয়োজন ব্যতীত ঘোরাঘুরির অভ্যাস ছিল না । সবসময় বাড়ীতে কোন না কোন কাজ করতেন । মাঝে মাঝে রুপুর মা বলে হাঁক দিতেন । আজ আর কেউ রুপুর মা বলে অমনভাবে ডাকে না । ছেলে বৌ যার যার জীবন নিয়ে ব্যস্ত । স্বাভাবিক , এখন তো তাদের সময় । মুখোশপড়া পুত্রবধু তানিয়া কখনো মনিমালাদেবীকে সৌজন্যবোধ দেখিয়ে একটি কথা ও বলে না ।

মনিমালাদেবী একাকীত্ব জীবন শরীর ও বয়সের সাথে ভার হয়ে আসছে । একটু হাঁটা চলা না করলে পাছে বাতে আক্রান্ত হবে এই বয়স্ক দেহ । পাশের বাড়ীর বৃদ্ধ মহিলা আরো কয়েকজন মিলে বিকেলে হরিমন্দিরে যান , আলাপ চারিতা করেন । কারণ বয়স্কা মহিলারা পরস্পরকে চেনে ,

বোঝেন নিজেদের মধ্যে দুঃখ ভাগ করে নেন। নাটমন্দিরে বিকেলে পৌছতে পারলে মনিমালাদেবীর মনে এক ঝলক তাজা বাতাস আর ক্ষনিকের একটু ভাল লাগা , আর ভাবেন জানি না এ ভাবে আর কটা দিন বেঁচে থাকতে হবে । সুন্দর ভুবন কেউ যেতে চায় না কিন্তু জড়াক্রান্ত হওয়ার আগে যেতে পারলেই তবে সু-ভাগ্য।

তানিয়া সাজগোছ , বন্ধুদের নিয়ে এত ব্যস্ত শঙ্খকে ঠিক ভাবে নজর ও দেয় না। মনিমালা তিনটে সন্তান মানুষ করেছে । দায়িত্ববোধ থেকে শঙ্খকে স্নান থেকে খাওয়ানো সবটাই করান । তানিয়া দিব্যি মজায় আছে । কাজের লোক হিসাবে তাছিল্যের শ্বাশুড়ী তো আছেই । মনিমালাদেবীর যে শঙ্খের সাথে রক্তের সম্পর্ক। নিশ্চুপ হয়ে মনিমালাদেবী বিকেলে মন্দিরে বসে আছেন । অপরবৃদ্ধা অজয়ের মা শুধোলেন কি দিদি শরীর ভাল তো ? মনিমালা দেবী বলেন আজ ঘরে কেউ নেই , আমি একা ।

অজয়ের মা বলেন কেন ওরা কোথায় ? মনিমালা দেবী বলেন রুপক , ওদের নিয়ে বউয়ের বাপের বাড়ী গেছে ।

ফিরবে কখন ?

কিছু বলে যায়নি !

অজয়ের মা বলে উঠে দিদি আজ কাল আমাদের বয়সী কেউ ভাল নেই । এই বয়সটা ভুগান্তির বয়স ।

মনিমালা দেবী বলেন সোনালীর বাবা ভাগ্যবান । স্বপ্ন ছিল বাড়ী বানাবে তা ও করে গেল। মেয়েদের পাত্রস্থ করা, তা ও সুন্দর ভাবে সামলে গিয়েছেন । রেখে গেছেন আমাকে একাকী।

বৌ - মা তেতো গলায় কথা বললে ও হিসাবটা কষে সুন্দর ভাবে. আমার থেকে জেনে নিয়েছে পেনশান কত পাই , তাছাড়া ওর শ্বশুড় কত টাকা রেখে গেছে ইত্যাদি । তাছাড়া রুপককে প্রতিনিয়ত বিচুটি কাটলে ও সে নিরুত্তাপ থাকে । এখন বউয়ের বায়না মার থেকে বাড়ীর কাগজপত্র তোমার নামে বা আমার নামে করে নাও । রুপক না বুঝার ভান করে বলে । মায়ের সম্পত্তি যাকে খুশি দিক । প্রয়োজনে দিদিদের দিক , তাতে আমার কি ?

এইগুলো তো আমার রোজগারের পয়সা ছিল না । বাবা গায়ের রক্ত জল করে একটু একটু করে এগুলো করেছে । তাতে আমি মনে করি মায়ের অধিকার । মা যা ভালবুঝে তা -ই

করবে।

তানিয়া - রুপককে বলে উঠে গ্যাসের গরমে দু - বেলা যে আমি তোমাদের রান্না করে খাওয়াই , তার বিনিময়ে কি ? লাল টুকটুকে মুখটা যেন বিষের কণা তুলে ফুফিয়ে উঠল , বলল আমি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা করাব না । তুমি বাধ্য ছেলে হয়ে থাক , আমার ও ছেলে আছে , তার ভবিষ্যৎ এর কথা আমাকেই ভাবতে হবে । তুমি ছেলের জন্য কি করবে বুঝেছি । আমার ছাই , আমি -ই - মাকে বলব ।

ছেলে শঙ্খদ্বীপ নার্সারী স্কুলে যায় । এখন থেকে না ভাবলে ওর ভবিষ্যৎ কি হবে । তুমি কি তা বুঝ? আমি মনে করি তুমি বাবা হওয়ার উপযুক্ত হওনি । মুখ ঝাঁঝিয়ে তানিয়া বলে উঠে দিনমজুরেরা ও তোমার থেকে অনেক বেশী সন্তান সচেতন। পাশের ঘর থেকে মনিমালা দেবী সব কথা শুনে বুকে চাঁপা ব্যাথা হয় কিন্তু বলার যে কিছু নেই। ছেলে রুপকের দিকে দেখলে মনিমালা দেবীর মনে হয় ছেলে যেন আঘাতপ্রাপ্ত কোন পশু তবে বোবা ।

মনিমালা দেবী ভাবে তানিয়া কেন এ রকম নিষ্ঠুর । ওর বাবা তো শিক্ষক ছিলেন। পারিবারিক অবস্থা ও তো তত সচ্ছল ছিল না । কোনক্রমে সে বি .এ পাশ করেছে । মনিমালা তানিয়াকে সম্পূর্ণ দোষ দিতে নারাজ । ভাবে হয়ত মনের অসম্পূর্ণ স্বপ্ন ছেলেকে দিয়ে সে পুরণ করতে চায় তা ও তো হতে পারে। সেই কারনেই হয়ত আগাম আর্থিক নিরাপত্তা তৈরী করতে চাইছে। সন্তানের ভবিষ্যৎ শিক্ষার জন্য যদি তার এই চাওয়া পাওয়া হয়ে থাকে তবে অন্যায়টা কিসের ?

মনিমালা দেবী ভাবে জীবনের শেষবেলা আমার টাকা জমির কি প্রয়োজন। দু বেলা , দু-মুঠো ভাত আর ঔষধ পথ্য জুটে গেলেই তো আমার হয়ে গেলো শেষ বয়সে এর বেশী আমার কি প্রয়োজন , আমি তো জীবনের সব কাজ সেরে ফেলেছি । এই যুগে রুপকের মতো ছেলে পাওয়া তো ভাগ্য।

মনিমালা দেবীর চোখে ভেসে উঠে পুত্রবধু তানিয়ার ঝাঁঝালো চেহারাটা। রুপকের ঘরে ঢুকলে রুপককে চা দিয়ে তানিয়া বলে তোমার মা যেমন দিনে দিনে যুবতী হচ্ছে । বসে বসে খায়তো রুপক শুধু বলে কি উল্টো - পাল্টা বলছ তুমি । তানিয়া বলে না - তা ও হতে পারে প্রদীপ নেভার আগে আলো করে জ্বলে উঠেছে।

পুত্রবধু তানিয়ার তাচ্ছিল্য আর মনিমালা দেবীর মৃত্যু কামনার কথা নিজ কানে শুনেছেন ।

মনিমালাদেবী উনি ভাবেন ইচ্ছাকরলেই তো মরা যায় না , মৃত্যু যদি না আসে । মনের মধ্যে হাহাকার, হতাশা , গোপন কান্নায় ভেঙে পরেন মনিমালা দেবী । ভাবেন এ ভাবে তানিয়াকে কত ক্ষমা করা যায়, এ যে দিন দিন বেড়েই চলেছে । নির্বোধ হয়ে কতকাল তানিয়ার কথায় সব সময় অপমান দায়ক মনিমালাদেবীকে মনে হয় আঘাতপ্রাপ্ত , মানষিক ভারাক্রান্ত যেন ঝড় বৃষ্টির আঘাতে বিধ্বস্ত বনভূমি। ডাল - ভাত খাইয়ে তিন সন্তানকে মানুষ করেছেন মনিবালাদেবী । পাশে স্বামীকেও অফিস থেকে শুরু করে সব কিছু ঠিক রেখেছেন। কিন্তু নাতিকে ও মনে হয় উনি ছাড়া যত্ন রাখার কেউ নেই । বউ তানিয়া নিজের রুপচর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকে । ছেলের যত্ন করার সময় নেই ঘরে বুড়ো কাজের মাসী মনিমালা তো আছে । উনিই মাতৃত্বের ধ্বজা ওড়াক । তানিয়ার কাজ বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীকে অপমান করা আর স্বামী রুপককে সুযোগ পেলেই খোঁচা মারা । বয়সের ভারে অতীত অনেক কথাই মনে উকিঝুঁকি দেয় মনিমালাদেবীর কিন্তু জীবন তো এখন দৃষ্টির মতো ঝাপসা । সব ভুলে যেতে পারেন কিন্তু একমাত্র ছেলের বৌ এর অপমান যেন দিনে দিনে উনাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তানিয়া সন্ধ্যায় হাসতে হাসতে বলে তোমার কৃপন মা থেকে বাগিয়ে আজ তোমার কথা বলে কিছু টাকা নিয়ে নিলাম । তোমার কথা না বললে একটা পয়সা ও দিত না , রুপক তানিয়াকে বলে তুমি কাজটা ভাল করোনি । তানিয়া ভারী গলায় বলে উঠে ভালো মন্দ তুমি আমাকে শেখাতে হবে না । মায়ের হাতে কি -ই বা আছে । অল্প ক- টা টাকা ছাড়া । উনার এখন আর টাকার কি প্রয়োজন , আমি এভাবে উনার থেকে টাকা নেবো । তুমি কিছু বলতে যাবে না , এই ভাবে কতৃত্বের স্বরে তানিয়া রুপককে বলে উঠে । রুপক বলে তাহলে তুমি কি মাকে শেষ বয়সে চিট করছ ।

তানিয়া রাগে ফুঁসে ওঠে । মার থেকে তো আমি জোর করে নিচ্ছি না মা স্বেচ্ছায় দিচ্ছে তা - ই-তো নিচ্ছি । তাতে আপত্তি কোথায় ?

একাকী ঘরে বসে মনিমালাদেবী ভাবেন , জীবনের বেশীর ভাগ পথ ফুরিয়ে শেষ পথে কি পরাজয় নিরাপত্তাহীনতার কাছে ।

মনিমালা ভাবে সে হেরে গেছে বউমার আব্দার মেটাতে গিয়ে সে নিঃস্ব । অর্থাৎ এখন যদি ছেলে আর বৌ দেখাশুনা না করে তবে কিছু করার নেই । কেউ জানে না ভুল হয়ে গেছে নিরাপত্তা ও আদরের আশায় শেষ ভুলটা ও হয়ে গেছে এখন যদি তানিয়া বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় তাহলে পথে গিয়ে মরতে হবে । কেন না ছল চাতুরী করে বউমা বাড়ীর জায়গাটা ও তানিয়ার (নিজের) নামে করে নিয়েছে , ছেলে রুপক তা জানে না। সে যখন বাইরে ট্রেনিং এ যায় তখন বউয়ের চাতুরীর ফাঁদ

মনিমালাদেবী বুঝতেই পারেনি , হয়ত ছেলে রুপক তা আজো ও জানেনি, বললে যদি সংসারে অশান্তি হয় এই ভয়ে মনিমালাদেবী ছেলে রুপককে আজো বলেনি । উনি নিঃস্ব, অর্থ , জায়গা, সব তার চাতুরীর কাছে হেরে চলে গেছে । তারপরই লাঞ্চনা , গঞ্জনা ক্রমশ বাড়ছে সাথে মৃত্যুকামনা মনিমালাদেবী সবই টের পাছেন হাড়ে হাড়ে ।

মনিমালাদেবীর স্বামীর কথা মনে পড়ে । উনি অর্থাৎ সচিদানন্দবাবু বিছানায় অসুস্থ অবস্থায় বলেছিলেন শোনো রুপকের "মা" আমার এই কথাটুকু মনে রেখো তোমার খ্যাতির যত্ন সব ব্যাঙ্কে সঞ্চিতটাকার উপর নির্ভর , যতদিন টাকাকড়ি আছে , ততদিন তুমি আছো, টাকাকড়ি না থাকলে তুমি হবে ঠিকানাবিহীন । আমার কথাগুলো ভুলবে না। ভুললে তোমাকে কষ্ট পেতে হবে । মনিমালাদেবী সারাজীবন দক্ষতার সাথে সংসার সামলে শেষ সময়ে ভুল করে নৌকো ডুবিয়ে দেবেন ভাবেন নি নিজে ও। কিন্তু কিভাবে অমনটা হলো উত্তর নেই । পুত্রবধুর ছলনার কাছে পরাস্ত মনিমালাদেবী। পুত্রবধুর কৌশলের কাছে এভাবে হেরে যাবেন ঘূর্নাক্ষিরে ও ভাবেননি মনিমালাদেবী। এখন ভাবলে কি হবে। যা হওয়ার তো হয়ে গেছে । এখন ভরসা ছেলে রুপক । ভাবেন সে তো মাকে খাদে ফেলে দেবে না সে যে আমার সন্তান । ছেলে বউয়ের মন পাওয়ার জন্য মনিমালাদেবী ঘরের কাজ থেকে শুরু করে নাতিকে স্নান করানো , খাওয়ানো , স্কুলের জন্য তৈরী করে দেওয়া সবই করেন । বয়স উনাকে প্রশ্রয় দেয় না কিন্তু কিছু করার নেই করতেই হবে । মনিমালা দেবীকে কুড়ে , কুড়ে খায় একা থাকার যন্ত্রণায় । কারণ ছেলে অফিসে যাওয়ার পরই বৌমা বান্ধবীদের সাথে বেড়িয়ে পড়ে । ছেলে ও আসে বৌ ও আসে । তারপর খেতে হয় বৌ এর চাপা শাসানি । রান্নাঘর পরিষ্কার নেই কেন বেডরুমে ধুলো কেন । মানে হাইজিন ফাষ্ট । মনিমালাদেবী বৃদ্ধ বয়সে সব কথা কি পালন করা সম্ভব । প্রায়ই বউমার বান্ধবীরা আসে তাদের চা করে দেওয়া ফাই ফরমাশ যতটুকু সম্ভব মনিমালাদেবী করেন তবু ও যাতে বউয়ের মন রক্ষা করা যায় । বউ ঘরে ডুকেই সময়ে অসময়ে শরীরটা ধপাস করে বিছানায় ফেলে দেয় বলে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন পদাটা ফেলে দিতে পারেন না । অর্থাৎ সুযোগ পেলেই অপমান । অপমানে প্রায়শই মনিমালাদেবীর গা - হাত - পা থরথর করে কাঁপে । কিন্তু মনিমালাদেবী এখন অভ্যস্ত।

মনিমালাদেবী ভাবেন রুপকের বাবা সত্যিই তানিয়াকে চিনতে পেরেছিল । বউমা আমার বড্ড সুন্দর কিন্তু মনটা সুন্দর নয় । তাই মৃত্যুর আগে সর্তক করেছিলেন টাকা পয়সা হাতছাড়া করো না, শরীর ভেঙ্গে যাবে , দৃষ্টি ঝাপসা হবে । টাকাই তোমার পথ চালিয়ে নেবে , এ যুগে সেবা হয়

অর্থের বিনিময়ে, সংসারে ছেলে কি করবে । তোমার বউ তানিয়ার শেষ কথা। আশঙ্কা যে আজ সত্যি প্রমাণিত । এই জমা দুঃখ মনিমালাদেবীর বুকের পাঁজরে গাঁথা আছে । দিন রাত গঞ্জনা অপমান কত সহ্য করা যায় এই বয়সে ভাবেন মনিমালাদেবী , উপরন্তু বলে বউমা সবসময় বলে আর কতদিন বাঁচবেন সব বুড়োমানুষগুলো তো চলে গেছে আপনি তো দেখছি বটগাছ ।

এক দিন ভর দুপুরে ছেলে রুপক ঘরে নেই , হঠাৎ নাতী শঙ্খদ্বীপের কান্না শুনে মনিমালাদেবী রুপকের ঘরে যেতেই তানিয়া গর্জ্জে উঠে। কেন এসেছেন এক্ষুনি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান । মনিমালাদেবীর তোষামোদের জল গড়িয়ে নামছে শুধু বাকী পুত্রবধুর পা স্পর্শ করার কিন্তু না বৌমা আরো উত্তেজিত একসময় ঘাড়ে ধাককা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেন । বলে উঠে এক্ষুনি পোড়ামুখ নিয়ে বের হয়ে যান নদীতে ঝাঁপ দিন। ছেলে জানল না মা তার কোথায় গেছে । কাঠিন্য চোখজোড়ায় জল নিয়ে লজ্জা অপমান , ঘৃনায় বেরিয়ে পড়লেন মনিমালাদেবী বার্ধ্যক্যের অভিমান নিয়ে।

****

চিরবিদায়

দীপু , দীপু! ক্ষীণ গলার আওয়াজ , রাত তখন প্রায় বারোটা গেছে গেছে । ঠিক এরকম কনকনে শীতের রাত আর শীতের কামড়ে অসাড় হয়ে যায় গ্রামের জীবনযাত্রা । আর ঘরের ভেতরে যেন হিমপাথরের মতো নিরেট অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকার । অন্ধকারময় ঘরের পরিস্থিতি যেন নিজেকেই নিজের কাছে বিশ্বাস হয় না। অবিশ্বাস্য ও ভৌতিক কিছু বলে মনে হয় । সুতরাং দরজার ওপার থেকে ভেসে আসা ডাক চেনা হলেও অচেনা ঠেকে । এক রাত ঘরের মধ্যে অন্ধকার নেমে আসাটাই স্বাভাবিক । আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে দীপু ও গোপা । দু'জনের ঘরে , সুতরাং খাওয়া

দাওয়ার পাট চুকিয়ে এঁটো থালা বাসন ধুয়ে গুছিয়ে রেখে একটু গল্প করে মোটামুটি দশটায় শোবার ঘরে ফিরে গোপা । ফলে এতো রাত্রে জেগে থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না । যদিও তখন গোটা গ্রামটাই শব্দহীন হয়ে যায় । - দীপু , দীপু ' পুনরায় ডাক শোন গেল , তবে খুব ক্ষীণ স্বরে। পুরনো বেড়ার ঘর। পুরনো দরজা । সারা বছরের রোদ , বৃষ্টি যাবতীয় অত্যাচার এই দরজাটাকে সহ্য করতে হয় যেহেতু বারান্দাও নেই । শীতের শুখা দিন বলে ঘরের বেড়াঘুলোও ফাঁক হয়ে আছে , কিন্তু অমাবস্যা রাতের কাছে ঘরের - বাইরের জগৎ , দৃষ্টিহীনের মতো ঘরের মাঝখানে একটিই খাট বিছানো । যেখানে দীপু ও গোপার শয্যা । এছাড়া একটি ছোট টেবিল ও একটি চেয়ার , মাঝখানে একটুখানি খোলা জায়গা , ওটাই দীপুদের ডাইনিং স্পেস । পাশেই রান্নাঘর , সামনে ছোট উঠোন । উঠোনের এক প্রান্তে বাথরুম, পায়খানা । শীতের রাতে পুরানো টিনের চালের উপর হিম পড়ে ঠান্ডা হয়ে এলে চালের টিনে ভূতুড়ে শব্দ হয় । ঠুং ঠাং । কুয়াশাচ্ছন্ন শীতরাতের ঘুম হলেও 'দীপু' ডাকগুলো দরজা ভেদ করে গোপার কানে ভেসে আসে । সাথে গুম গুম শব্দও । এই গ্রামে রাতের আঁধারে চোরাগোপ্তা অনেক ঘটনা আগেও অনেক ঘটেছে । সুতরাং কোন শব্দ ও ডাকাডাকিতে কেউ দরজাও খোলে না বা কেউ তেমন মাথাও ঘামায় না । যেহেতু এবার ভৌতিক ডাক নিজেরই দরজায়, তাই গোপাকে একুট ভাবিয়ে তুলল। অন্য কোথাও হলে হয়তো গোপার কোনও ভাবান্তর হত না। গোপা সন্তর্পনে দীপু আস্তে বলে উঠলো শুনছো নাকি ? দীপু চটজলদি বলে উঠল - এত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে । চাপা গলায় গোপাকে বলল হয়ত পেটো টেষ্ট - ফেষ্ট করছে - এটা তো এখানকার পুরানো রেওয়াজ , তবে যেহেতু আওয়াজটাও কাছে থেকে শোনা যাচ্ছে , তাই দীপুর ও গলা কাঁপল, মনে হচ্ছে যেন ঘরটাই ভেঙ্গে পড়বে । গোপা বলে উঠল - আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না । আমাদের বাড়ীর কাছেই শব্দটা হল ---- কথা শেষ না হতেই ঘরের পাশ দিয়ে হুড়মুড় করে দৌড়ে যাওয়ার শব্দ খুব দুরন্ত গতিতে । এর মধ্যেই আবার শব্দ সাবধানে কেটে পড়ে । আর অপেক্ষা করল না দীপু ও গোপা , হুড়মুড়িয়ে দুজনেই উঠে বিছানায় বলে পড়ল । এবার দরজায় মৃদু টোকা ও ক্ষীণ ডাক । গোপা ভয়ে কাঠ , শ্বাস ছাড়ছে খুব সন্তর্পনে । হাড়কাঁপানো শীত যেন দীপুকে কোন বিপদ সঙ্কেত জানিয়ে দিচ্ছে। যতই ভয় হোক না কেন , দরজায় ওপারের মৃদু ডাক গোপা ও দীপু উভয়েরই খুব পরিচিতি । এটুকু অন্তত পরিস্কার - অভিজিৎ । শব্দটা একবার উচ্চরণ করে যেন দীপু নিজের মনের সংশয় দূর করতে চাইল । গোপাকে জিজ্ঞেস করলো দীপু , অভিজিৎ এর গলাই তো মনে হচ্ছে তাই না ?

গোপাকে দীপুর প্রশ্ন যেন গোপাকেই এক অবিশ্বাস্য সংশয়ের মধ্যে রেখে দিল । দীপুর স্বল্প

ভাষায় মনে হল সমস্ত দায় যেন গোপারই । তবুও যেন ঘরটা সাড়া শব্দহীন । গোপার নীরবতা যেন দীপুকে একটু উস্‌কে দিল । পুনরায় গোপাকে দীপু বলে উঠল - অভিজিৎ ডাকছে , দরজা খুলব ? মনে হচ্ছে মৃত্যুদূত দরজায় দাঁড়িয়ে তবুও কেন দীপঙ্কর নিষ্ঠুরভাবে সব দায় গোপার দিকে ঠেলে দিচ্ছে ? তাহলে রহস্যটা কি ? অমাবস্যার হিম রাতে কেন দাঁড়িয়েছে অভিজিৎ । হঠাৎ গোপা বলে উঠল - এত রাতে অভিজিৎদা কেন এলেন । গোপার এ কথায় দীপু ভেবে নিলো হয়তো অভিজিৎ আসার কথা পুর্ব নির্ধারিত, কারণ আজ আমার বাড়ীতে থাকার কথা ছিল না , হয়ত বা তাই তারতম্য ঘটেছে । অন্য সময় অন্য কেউ এসে এভাবে ডাকলে গোপা হয়ত ধুন্দুমার কান্ড বাধিয়ে বসত । কিন্তু কেনই বা এখন সে নীরবতা পালন করছে । দীপু ভাবছিল আজই বোধ হয় এ বছরের সব চেয়ে শীতলতম রাত্রি । বাইরে কি ভীষণ কুয়াশা , বাতাসও আছে নিশ্চয় !

পুনরায় - কিরে দীপঙ্কর ঘুমিয়ে পড়লি নাকি ? সমস্ত পরিস্থিতিটাই যেন পূর্ব রচিত বলে ঠেকল দীপুর কাছে । একটু আগে পেঠোর শব্দ , তারপরে কেন যেন দ্রুতবেগে ছুটি যেতে বলল , সাবধানে কেটে পড় । দীপুর মনে হচ্ছিল কোথাও যেন ভয়ঙ্কর হল্লা হচ্ছে । হৈ চৈ টা যেন কাছাকাছি।

দরজার দিকে এগুলো দীপু । মাথাটা যেন ঝিমঝিম করছিল , কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে দীপুকে দূরে সরে যাওয়া বন্ধু অভিজিৎ ডাকছে । দীপুর মনে যেন ভেসে আসছে দীপুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে গোপাকেই শিকারী ব্যাঘ্র থাবায় শিকার করবে । দরজার দিকে হাত বাড়ায় দীপু কিন্তু গোপা আশ্চর্যভাবে নীরব । গোপা কেনই বল বলছে না - ওগো এখন তুমি দরজা খুলবে না - দরজাটা বন্ধই থাক । কিন্তু তার বদলে গোপা পুনরাবৃত্তি করে উঠল - এত রাত্রে অভিজিৎদা এল কেন ? এটাতো দীপুর উদ্দেশ্যে গোপার ঘুরিয়ে ফিরেয়ে নির্দেশ , দরজাটা খোলা । ক্ষণে অভিজিৎ যে কারণে এসেছে তা মুখ বুজে চোখ বুঝে মেনে নাও । দীপু যেন মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিল ।

দীপুর মনের মধ্যে ভেসে এলো পাঁচটি বছর আগের কথা , দীপু , তুই যতই চেষ্টা করিস না কেন গোপা আমারই থাকবে । তোর কখনো হতে পারে না । দীপু ভাবছিল , গোপাতো জীবনে প্রথম আমাকেই ভালবেসেছিল । কিন্তু অভিজিৎ এর কাছে যখন অর্থের প্রাচুর্য্য এলো তখন কেনই বা সে আমার কাছ থেকে সরে যেতে চেয়েছিল ।

বারংবরী মনে আসছিল - একদিন সন্ধ্যায় গ্রামের খেলার মাঠে দীপু , অভিজিৎ

ও গোপা বসে গল্প করছিল আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে । দীপু এম.এ পাশ করে তখন সবেমাত্র শিক্ষকতার চাকুরী পেয়েছিল , বসে বসে তিনজনে কখনো হাস্যরোল , তর্কাতর্কি , অবশেষে অভিজিৎ এর .... দেওয়া চ্যালেঞ্জ ।

তুই দেখবি গোপা আমার হবেই । প্রয়োজনে বুলেটের বিনিময়ে । দীপু একটু হেসেছিল , বলছিল - যদি গোপা রাজী থাকে তো তুই নিয়ে নে । গোপা কিন্তু হঠাৎ করেই সিরিয়াস হয়ে গিয়েছিল , বলে উঠেছিল আমি বাজারের পণ্য সামগ্রী নয় যে তোমরা আমাকে নিয়ে দর কষাকষি করবে । আমি চললাম , বলেই গোপা চলে গেল । গোপা চলে যাওয়ার পর দীপু ও অভিজিৎ একে অপরের দিকে ক্ষিপ্ত সিংহের মত তাকিয়ে রইল , যেন প্রতিহিংসার আগুন ।

দীপু একবার ভাবল অভিজিৎ ভেতরে ডেকে আনবে কিনা । কারণ আপাততঃ মনে হয় সেটাই নিরাপদ । কারণ দরজার বাইরে গ্রামের গলিপথ , সামনে বীভৎস কাটাখাল যেখানে মৃত্যু যেন হিমহিম করে নিশ্বাস ফেলছে । তাছাড়া অভিজিৎকে ঘরে ডেকে আনা এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয় , কারণ দীর্ঘদিন ধরে প্রচন্ড মনোমালিন্য থাকলেও তো সে পুরানো বন্ধু তাছাড়া বর্ত্তমানের তরুণ প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ - এলাকার " দাদা" আগে বিয়ের ঠিক পরটাতেই অভিজিৎ প্রায়শই দীপুর অবর্তমানে গোপার কাছে আসত , সময়ে - অসময়ে গল্পগুজব করত , বেশ আনন্দ হুল্লোড়ে সময় কাটাত , কিন্তু যখনই দীপু ঘরে ফিরত তখন অভিজিৎ হুট করে দরজা পেরিয়ে দীপুকে কিছু না বলেই বেরিয়ে যেত । অভিজিৎ এর এমন হঠাৎ হঠাৎ আগমনে মনে মনে যতই রিক্ত হোক না কেন দীপু কিন্তু অভিজিৎ এর হিসেব করে বেহিসেবি আচরণ যে ইচ্ছাকৃত এটা জেনে কখনো অভিজিৎকে ফিরেয়ে দেয়নি । গোপার উচ্ছ্বাস ভরা মুখ যেন বাধা দিত দীপুকে একদিন গোপা বুকের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দীপু বলে উঠল - অভিজিৎ এর কোন কান্ডজ্ঞান নেই , কেউ কি এমন সময়ে - অসময়ে কারো ঘরে শুট করে ডুকে পড়ে নাকি ।

চট্ জলদি উত্তর গোপার । বলে উঠল । - অভিজিৎদা আমাদের খুব ভালভাসে , তাই আসে । তাতে অপরাধের কি আছে । দীপু এবার ঘরের দরজাটুকু খুলে দিয়ে অভিজিৎকে ঘরে ঢুকতে বলল না । বরংচ নিজের দেহটাকে বাইরে ঠেলে দিল । নিজের শরীরটাকে বাইরে বের করা মাত্র দীপু টের পেল অভিজিৎ বাড়ী থেকে গ্রামের গলির পথ ধরে এগোচ্ছে । তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে হ্যাচ্‌কা টানে তার বাড়ী থেকে গ্রামের গলির পথ ধরে এগোচ্ছে । তারপর উত্তেজিৎ কণ্ঠে অভিজিৎ বলে

উঠল এখানো নয় । সামনে কাটাখালের দিকে চল জায়গাটা যেমন অন্ধকার তেমনি সব দিক দিয়ে সেফ্ ।

অভিজিৎ যেন উত্তেজনায় রীতিমতো হাঁপাচ্ছে , দীপু । কিন্তু এতসব ঘটনার পরেও অভিজিৎ এর উপর সামান্য অনাস্থা প্রকাশ করল না । শুধু ভাবল অভিজিৎ কি আমাকে সত্যি ডাকতে এসেছিল, নাকি বাইরে টেনে .... । চাকুরী পাওয়ার পর থেকেই দীপু নিজেকে রাজনীতি থেকে গুটিয়ে নিয়েছিল, তবে এলাকায় জনপ্রীতি ছিল ভাল । শিক্ষক হিসাবে গরীব ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতো বলে সবার কাছেই দীপুর ছিল বেশ সুনাম । তবে এ গ্রামের চায়ের দোকান থেকে রাস্তা আর রাস্তা থেকে পার্টি অফিস , সর্বত্রই রাজনীতির গরম হাওয়া সদা বিদ্যমান । যে জায়গায় কাটা খালের পাশে দীপু অভিজিৎ এর মুখোমুখি সেখানটা বাড়ীঘরহীন । নিস্তব্দ পায়ের তলায় মাটি কাঁচা । আবর্জনার স্তূপ , ভ্যাট - ভ্যাটে গন্ধে মনে হচ্ছে এখানে কাঁচা পায়খানায় ভরা । এর মধ্যেই একটি অদৃশ্য বেড়াল বিশ্রী শব্দে কেঁদে উঠল । গভীর রাতে বেড়ালের কান্না তো অশুভের প্রতীক । দু'একটা শুকনো পাতা খসে পড়ল দীপুর মাথায় । টুপটাপ শব্দ হল ।

হঠাৎ অভিজিৎ বলে উঠল তিন চারটে পেটোর শব্দ শুনলি না এই তো একটু আগে এই খালের গায়ে । দীপু কিন্তু সবই শুনেছে , এ কারণে কেন অভিজিৎকে ছুটি আসতে হল আমার দরজায়। এ কারণটা কিন্তু ভালো করে শোনা হল না । দীপু ভাবছিল কোন এক অখ্যাত জায়গায় কুখ্যাত ঘটনার মুখোমুখি এখ ন সে , অভিজিৎ বলে উঠল - প্রশ্নটা সেই দিন বলে ছিলাম অধিকারের । অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয় । ভিক্ষে করে পাওয়া অধিকার , অধিকার নয় , তুই তো ভিখারী ।

দীপু মনে হলো কলেজের মধ্যে অন্যান্য বন্ধুদের সাথে অভিজিৎ ও আছে । আলোচনা হচ্ছিল । বক্তা ছিল অভিজিৎ । বক্তব্য ছিল অধিকার যখন অভিজিৎ কোন কথা বলে সেখানে কর্তৃত্বটুকু শুধুই তার । এক কথা বারংবার উচ্চারণ শুনতে শুনতে দীপু একবার বলে ফেলল - তাহলে তুই কি গোপার উপরও অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে চাস ? অভিজিৎ চুপ করে গেল । অপ্রত্যাশিত উক্তিতে কিছুটা বিভ্রান্ত । তখনই অন্য বন্ধুরা বলে উঠল , দীপু গোপা কে ? দীপুর উত্তর অভিজিৎকেই জিজ্ঞেস কর । অভিজিৎ বুঝতে পেরেছিল দীপু গোপাকে বিয়ে করবেই , আর দীপুও বুঝতে পেরেছিল অভিজিৎ প্রতিশোধ নেবেই । তবে কখন কিভাবে তা দীপু কখনো বুঝতে পারেনি ।

এ রকম একদিন ভরদুপুরে অভিজিৎ সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল গোপাকে নিয়ে ।

নিঝুম দুপুরে গ্রামের মাঠে কোন এক শিরীষ গাছের কোনে । দীপু দূর থেকে দেখতে পেল মাঠের কোনো অভিজিৎ আর গোপা গল্পে মত্ত । মাঝে মাঝে অভিজিৎ গোপার শাড়ী থেকে চোরকাঁটা ছাড়াতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে । কিন্তু একদিন এই গোপার প্রতিজ্ঞা ছিল ' আমার জীবনটা দীপুদা শুধু তোমার জন্য ' । ভাবনার মাঝে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল দীপু । হঠাৎ দেখতে পেল অভিজিৎ আর গোপাকে নজরে পড়ছে না কেবল গাছতলায় সাইকেলটা বিনা পাহারায় পড়ে আছে । দীপু ভাবল হয়ত বা কথা বলতে বলতে দীপু ও গোপা সামনে হয়ত বা গেছে এই ভেবে আর ও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল দীপু , কিন্তু না ওরা আসছে না দেখে কৌতুহলবশতঃ দীপু মাঠের শেষে ঝোপের দিকে এগিয়ে এল এবং সাথে সাথেই আবিস্কার করে ফেলল অভিজিৎ ও গোপাকে । দেখেছিল অভিজিৎ ও গোপা শরীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে । গোপা দুই হাত দিয়ে ঘিরে ধরেছে অভিজিৎ এর বুকপিঠ । অভিজিৎ মুখ তুলে গোপাকে চুমু খেল । সম্পূর্ণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে অদূরে দাঁড়িয়ে দীপু । অভিজিৎ মাথা তুলেই দেখে ফেলে দীপুকে , ফলে অভিজিৎ মাথা নীচু করে সাইকেল নিয়ে দ্রুত সরে গিয়েছিল । পরক্ষণেই গোপা দেখেছিল দীপুকে । কোন রাগ নয় । আক্ষেপও নয় , কোন প্রতিহিংসার ছাপও নেই । দীপুকে যেন হতাশা ঘিরে রেখেছিল । দীপুর এই নিঃ শব্দ প্রতিবাদ গোপা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিল না । যদিও অভিজিৎ সরে যেতে পেরেছিল যা গোপা পারে নি । কারণ দীপুর জীবনে গোপাই ছিল প্রথম আর গোপার জীবনেও দীপুরই ছিল প্রথম । অভিজিৎ এর আর্বিভাব বাঁধনহারা নদীর উপর সেতুর মত ।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গোপা কান্নাভেজা কলায় দীপুকে চেপে ধরে বলল , দীপুদা আমাকে বকো , মারো কিন্তু এভাবে প্রতিশোধ নিও না । আমাকে এবারের মতো ক্ষমা কর ।

যাই হোক , অভিজিৎ বলেছিল দীপঙ্করকে পার্টি ছাড়াব না , তাহলে ভুল হবে কিন্তু একগুঁয়ে দীপু নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত কখনো অন্যের হাতে সঁপে দেয় না , তাই এম. এ.পাশ করে আজ শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আর অভিজিৎ বর্ত্তমানে পার্টির একজন প্রভাবশালী তরুণ নেতা । যার ৩টি কমান্ডার জীপ , ২টি মারুতী ভ্যান , গোডাউন , একটি টুরিষ্ট বাস কত কি ? অভিজিৎ অনেক উন্নতি করে ফেলেছে ।দলের ভেতরে যেমন প্রভাব প্রতিপত্তি তেমনি বদলে গেছে আর্থিক অবস্থাও । এর মধ্যেই একদিন দীপু বিয়ে করে ফেলল । এ নিয়েও উভয় পরিবারে কত সংঘর্ষ , সম্পর্ক ত্যাগ , কত কিছু ।

দীপু এখন আর প্রকাশ্য রাজনীতিতেও নেই , কিন্তু মাঝে মাঝে একটু আধটু যাতায়ত ছিল কারণ যে শ্লোকগুলি আদর্শবাদী হিসেবে পরিচিত ছিল তা আজ কিভাবে পরিবর্ত্তন হয়েছে এই দৃশ্য দেখার টানে । একদিন হঠাৎ এক আড্ডায় দীপঙ্কর বলে অভিজিৎ ঝাঁঝালো ভাষায় দীপুকে আক্রমণ করে বসল । বলে উঠল দীপু তুই তোর আদর্শটুকু এখন উনুনে রেখে দে , কারণ তোর এই ভুয়োআদর্শের কারণে আর একজনের জীবন শুকনো বালুর চর হয়ে যাবে , জীবন অকালে শেষ হয়ে যাবে , তা হতে পারে না । দীপঙ্করের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এমন আক্রমণ দীপুর অপ্রত্যাশিত ছিল কিন্তু প্রতিবাদ করার জো নেই কারণ অভিজিৎ এর মত দুর্দান্ত প্রতাপ নেতার মুখের উপর । কিন্তু সহ্য করারও একটা সীমা আছে । এক সময় দীপু জিজ্ঞেস করে উঠলো - বল কার কথা বলছিস ' তুই ? যার নাকি আমার আদর্শের জন্য জীবনের মূল্য দিতে হচ্ছে । অভিজিৎ এর উত্তর অনায়াসেই তা বলতে পারি , কিন্তু তাতে তোর মান সম্মান এলাকাতে ঠুনকো হয়ে যাবে যে । দীপঙ্কর বলে উঠল - আমার মান সম্মান এক একদামী নয় যা নাকি তোর সামান্য কথাতেই ভেঙ্গে যাবে । তাছাড়া আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার তোকে কে দিয়েছে ? তোকে সাবধান করে দিচ্ছি , মুখ সামলে কথা বলবি । পরদিন রবিবার । ভরদুপুরে হঠাৎ মেরুণ কালারের মারুতি গাড়ী নিয়ে দীপুর বাড়ীর সামনে এসে হাজির অভিজিৎ । তখন দীপু খেয়েদেয়ে পত্রিকা পড়ছিল , এমন সময় অভিজিৎ ঘরে ঢুকে পড়ল , কিন্তু দীপঙ্কর নিরুত্তর খাঠে বসে একমনে পত্রিকাই পড়ছিল । হঠাৎ অভিজিৎ বলে উঠল দীপু তুই কেবল নিজের আদর্শের কথাই ভাবলি , এবার অন্তত একজনের মুখ চেয়ে নিজের এই গোঁয়ার্তুমিটা ছাড় । এবার পত্রিকা থেকে মুখ সরিয়ে দীপু একবার অভিজিৎ এর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সেই সঙ্গে গোপার মুখ ও । কারণ গোপা ঠিক অভিজিৎ এর পাশেই দাঁড়িয়েছিল । দীপু নিঃশব্দে উপেক্ষা অভিজিৎকে খুব অপমানিত বোধ করেছিল । অপমানে দ্রুত ঘর ছেড়ে সোজা গাড়ীতে গিয়ে উঠেছিল এবং খুব স্পীডে দ্রুত কেটে পড়ল । গোপা দরজার দাডিয়ে চোখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিল । আমি আর সহ্য করতে পারছি না । ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে একে একে বেরিয়ে আসছে ওরা , পাশেই কাটা খাল । ওরা হিংস্র , এত বধির দীপু যে ওদের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত চিনতে পারছে না । দীপু বুঝতে পারল এই লুম্পেনরা যাদের আশ্রয় দিয়েছে অভিজিৎরা । এদেরই কাজে লাগিয়েছে আজ অভিজিৎ । এবার ...... সব সুতরাং দীপুর প্রতিবাদ । এখন আর কাজ দেবে না । কোন যুক্তি কানে যাবে না এই লুম্পেনদের । হঠাৎ অভিজিৎ বলে উঠল - দীপু পালা , দ্রুত পালা , চমকে উঠল টর্চের আলোয় , পালাবার জো নেই । দীপঙ্কর বলতে চাইল , কিন্তু পারল না - অভিজিৎ , গোপার

সঙ্গে গত তিন বছর ধরে আমি আছি রে । স্বামী স্ত্রী হিসেবে সংসার করছি । তাই আমি জানি অভিজিৎ , গোপা ঠিক এতখানি মূল্যবান কেউ নয় , যার জন্য আমার প্রাণ নষ্টের প্রয়োজন হতে পারে । দীপু ঘেরাটোপের , কিন্তু অভিজিৎ দেখতে পাচ্ছে না । ক্রমে ক্রমে পুরানো স্মৃতি ভেসে উঠছে দীপুর চোখে । গোপার উক্তি - দীপুদা এভাবে প্রতিশোধ নিও না । কিছু বলারও নেই , করারও নেই যমদূত সম্মুখে অপেক্ষামান । শব্দহীন অবাস্তব এক শূন্যতা । তাকিয়ে দেখছে স্বপ্নের মতো অভিজিৎ ও গোপাকে । চোখের পাতাটুকু পর্যন্ত বন্ধ হচ্ছে না । হঠাৎ এর মাঝেই " মা" বলে একটী ক্ষীণ ডাক, রক্তাক্ত নিথর দেহ । কাটাখালের মাঝেই প্রতিবাদহীন ঝড় বয়ে গেলো ।

কবিতা
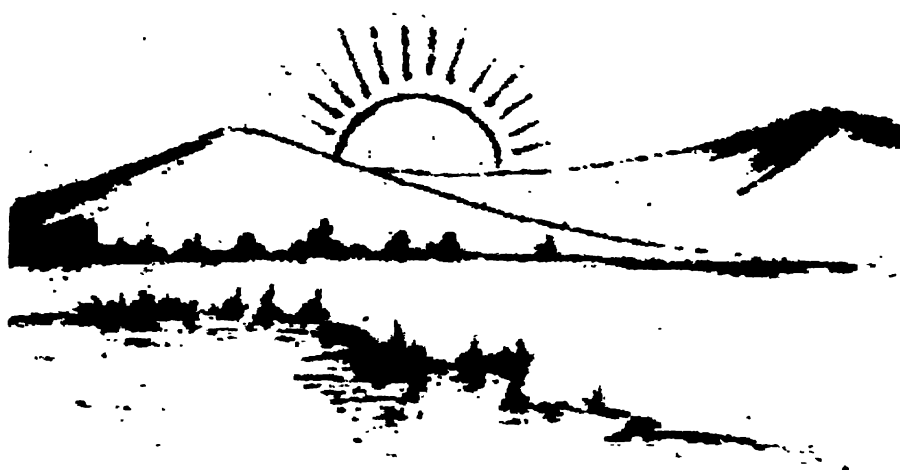
পথ আর কতদূর

পায়ের তলায় আল্‌গা মাটি , ঘটনাসঙ্কুল
বহুপথ বাকী আছে গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ী তলায়
বুকফাটা জমির আলপথে , বলদের ক্ষুর আর মাটির চাকায়
এবড়ো থেবড়ো পথ , অভিভাবক যে বিশাল বট
তার ছায়ায় পৌঁছে যে কোন পথিককে জিজ্ঞাসা কর
" পথ আর কত দূর"?
যেতে যেতে সে বলে গেল এ পাহাড়ের পরের পাহাড়!
হে পথিক তুমি কিছু ভাবলে না ! হয়তো 'বুকভরা কান্না' শুনেছো
কে জানে পায়ের নীচে আছে কতটুকু ভূমি
কিছুই বুঝলে না , একই পথে যে আছি আমি আর তুমি
বারুদ , বুলেটের শব্দ তোমায় স্তব্দ করেছে
কোনো কথাই পুরোপুরি বলতে পারছ না !
আত্মহননে জ্বলছে চিতা
তবুও মৃত্যুর অপেক্ষায় গ্রাম পাহাড় জাগে ,
বকবকে জোৎস্না রাত্রি কোন দিকে যায় সিপাহী?
ভেতরের আবেগ , যন্ত্রণা তাই আজো ও আমি প্রচন্ড বিদ্রোহী।
ভেঙ্গে যাওয়া বিকট শব্দ, শুধু আমি টের পাই
অতীত বিদায় , বেচেঁ আছি ভবিষ্য কল্পনায়,
চলে গেলো শতাব্দী - শুধু অভিমানে ।
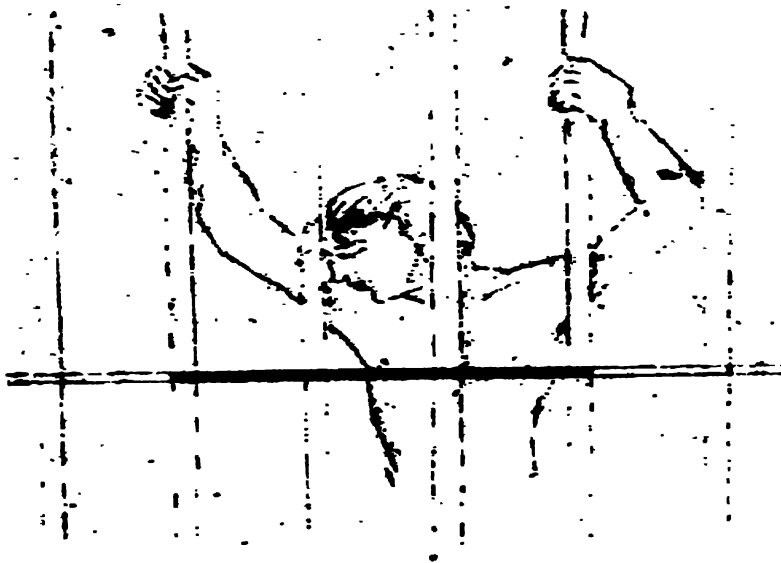
লকআপ

অমাবস্যার "না" ছিল কোন বিষাদ।
নিঃশব্দ যেন অঘোষিত হরতাল
কাল্চে লোহার দুর্গন্ধে ভরা গারদে
রড চেপে ধরে বাইরের দিকে মুখ রেখে আমি দেখি
মাঝ রাতের যন্ত্রণা ,
ইট,পাথরের ঠাসবুনোট যেন বিছানা ।
সকালে সূর্য্যের অহংকারে লালচে আভা-
রাত্রির জোনাকি শোকের শপথ।
নোংরা , মলমূত্র গন্ধের মতো আজ
চেনা লাগছে গারদটাকে
প্রহরীরা তো আছেই-
যে ভাবে দুগ্ধপোষ্য সন্তান ,মাকে ঘিরে থাকে সর্বক্ষন ।
দুর্গন্ধ , রুদ্ধ শ্বাস ।
আশ্চার্য্য ! কোথাও কোন বিষাদ নেই আজ ।
বুকের গভীরে যেন
ছটফট মৃত্যু যন্ত্রণা শুনছি।
শৈশব থেকে বার্ধ্যক্য কত কাহিনী ,
তবু ও মৃত্যু , তুমি সবেচেয়ে বড় ।
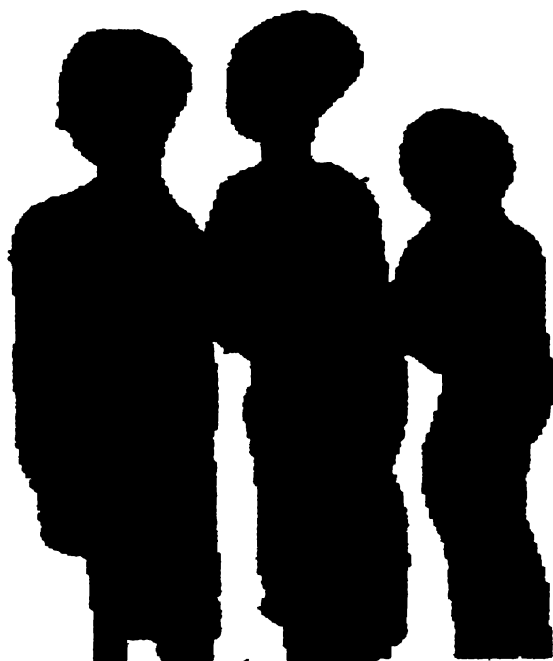
পথ শিশু

কাজের সন্ধানে হন্নে হয়ে ঘুড়ি
ক্ষুধার জ্বালায় ঘুমাতে হয়েছে
যাত্রী বিশ্রামাগারের বারান্দায়
ক্লান্ত চোখে ভেসে উঠেছে
পথ শিশুদের চুম্বনের প্রলয়
নোংরা ছেঁড়া জামা, বোতামবিহীন কুড়িয়ে পাওয়া প্যান্ট
বোনের গায়ে ছেঁড়া ফ্রক
শীত গ্রীষ্মের পরোয়া নেই ,
খোলা আকাশ ওদের ঘর ।
রাস্তার ধারে পড়ে থাকা দুটো ইট
ওদের উনুন
আগুন জ্বালানো তবু ও শূন্য হাঁড়ি।
এতসব তবু ও ভালবাসার আলিঙ্গনে
পথশিশু সেই ভাইবোন ,
নিস্কলঙ্ক , নিস্বার্থ ভালবাসা
শুধু - দু মুঠো ভাতের সন্ধানে ।
ভরা পেট তাদের কাছে চরম তৃপ্তি , আনন্দ
শাল জড়িয়ে আমি , তুমি , আমরা
পড়ছি মস্ত বড় বড় বই
লিখছি দিস্তে দিস্তে কাগজ
ওদের জন্য কাগজে লিখি
মুখে বড় বড় আওয়াজ তুলি
ওরা হাসে , ভাবে ওসব মনপ্রাণহীন ভাষা
পূজো , পার্বণ , অনুষ্ঠান- ওদের কাছে সবমিছে,
ওরা নিরন্ন - অন্নচিন্তায় শুধু ওদের আছে
নেমে দাঁড়াও ওদের কাছে
সবচেয়ে বেশী আনন্দ তাতে আছে ।

সারিবদ্ধ গনচিতা

সারিবদ্ধ গন চিতা , এলোমেলো কাঠ
ছোট বড় সবাই সমান
সারিবদ্ধ ছাগের মত
হয়েছে যূপকাষ্ঠে বলিদান
রক্ত ভাসছে , ওরা হাসছে
মৃতের উপর নেই কোন পদ্ম গোলাপ
জনমানবহীন শুধু পাহাড়ী ফুলের বাগান
খুনীরা পালিয়েছে এই পথে , রেখেছে রক্তে পায়ের ছাপ
কবর খোঁড়ে বেড় করল কঙ্কাল
রাত পাখী চলে গেছে
ভোরের পাখী বলে গেল হয়েছে সাত সকাল ।

মেয়ে

মায়ের জঠর
হয়ত বা জমকালো রাত্রি
ছিল আমার
আরামের বাসস্থান
এই ভাবেই জন্ম নিলাম
দেখতে পেলাম সূর্যের প্রখর আলো
হাত দুটি নরম মুঠো
রেখা দিয়ে দিল ভোরের প্রভাত
চুপি চুপি
কে , জানে কি কথা বলে গেল
আমি অবুঝ
কৌতুহল চোখ থেকে নেমে এল জল
অট্টহাসি
বলে গেলে মেয়ে হয়েছে,
দুর্বল শরীর
আমার মা অক্টোপাসের মত আমায় জড়িয়ে
চমকে উঠে আবার আরো একজন
ফিসফিসিয়ে
চোখ নেড়ে ওঃমেয়ে হয়েছে ,
বিষাক্ত অক্ষরে
জীবনের প্রথম এই শ্রুতি লিখা হল
হে বিধাতা
জন্মটাই যেন পরাজয়
অবহেলা , কটুক্তি
শুনেছিস , মেয়ে হয়েছে
সেই স্বর
আজ ও কানে লেগে আছে দারিদ্রতা
কি আসে যায় তাতে
কুসংস্কার , সমাজের পতন লেখে গেছে ।
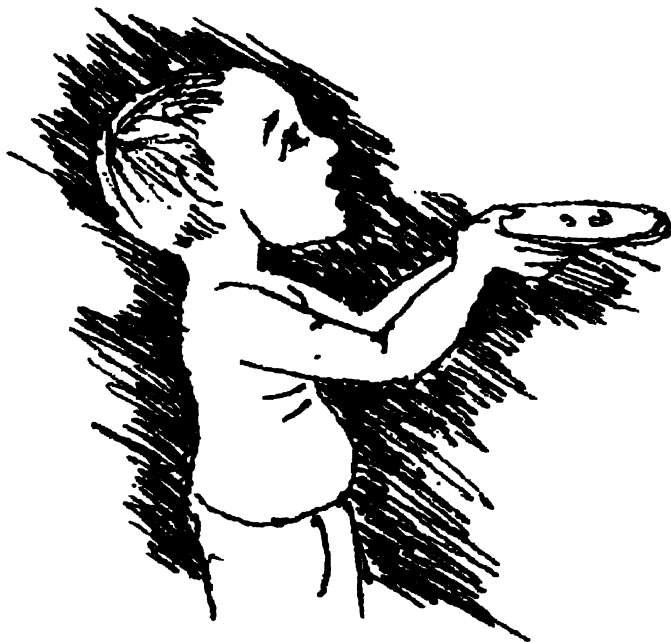
ঠিকানাবিহীন

নাম ,ঠিকানা বিহীন
তোমার আমার ভাই সে
আমাদেরই ভাই
ত্রিপুরা মায়ের সন্তান
তবুও নেই তার নাম, ঠিকানা
আলাদা সে আমার থেকে
আলাদা সে তোমার থেকে
আলাদা ছিল সে মায়ের গর্ভেও
ভাবার সময় কোথায়
যান্ত্রিক জীবনের যতসব ব্যস্ততা
বটতলা বাস ষ্ট্যান্ডে
দাঁড়িয়েছে দাবদাহ রোদের হলকায়
হাত বাড়ানো
একটি শব্দ , দুটো পয়সা দাও
জ্বলন্ত রোদ , ঠাঁই দাড়িয়ে
উনকোটির পাথরে খোদাই মুর্ত্তির মতো
স্পর্শ করে দেখো সেই হতভাগাকে
খুঁটিয়ে দেখো তার দেহের কালো চিহ্নকে
মন দিয়ে দেখো তার নোংরা ছেড়া কাপড়ের
ভিতর লুকানো হৃদয়টাকে ।
দেখলেই দেখা যাবে , ওর মাথা আছে,
মন আছে , বলার কিছু কথা আছে ।
যদি বলতেই হয় , জানতেই হয়
কথা বলো ওর সাথে
জানতে চাও তার কাছে
যার মুখ থেকে বেরোবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

রাতের রাজধানী

করুণ স্বরে বেজে উঠেছে
বিসমিল্লা খানের সানাই
রং বেরং এর আলোর চ্ছটায়
সেজে আছে হোটেল অভিষেক
ব্যস্ত রাজধানী আগরতলা
ব্যস্ত শ্মশানঘাট বটতলা ,
মুড়ি মুড়কির মতো বাজী পুড়ছে
নব যৌবণের প্রেমে মাতোয়ারা
যুবক , যুবতী স্তূপাকৃত কথা সেড়ে নিচ্ছে,
লাজুক নববধূ নতজানু হয়ে হাসছে
দায়িত্ব কাঁধে বর ব্যস্ত আথিতেয়তায় ,
জীবণ যৌবণের বন্ধন, সাতফেরী ,
হঠাৎ নীরবতা , ফিস্ ফিস্
একদল যুবক শব কাঁধে নিয়ে
উচ্চ স্বরে
হরিবোলা - বোল ।
আস্তে প্রশ্ন - কে গো !
উত্তর , আমাদের পাড়ার রামুদা
শবের হৃদয় নেই , বাসনাও নেই ,
শূন্য দেহ নিথর হয়ে পড়ে আছে ।
জীবন আলোহীন হয়ে গেছে ,
মৃত শব জাগে
স্বজনের উৎকীর্ণ চিন্তার ভেতরে,
হাড় , মাংস পুড়ে গেছে

চিতার আগুনে
পোঁড়া কাঠ, ছাইগুলো
হাওড়া নদীর জল
তরঙ্গ পেয়েছে,
বাতাস - জলের স্রোত , শব,
দিক দর্শক - শহর সভ্যতার।
যত সব নোংরা , ভেজাল
মিথ্যে ভাবণা
বিনা নোটিশে বৃষ্টি হাজির
ধুয়ে , মুছে দিলো বিনা পয়সায়।
কত রক্ত ঝড়ছে
হদিস ও নেই , হিসেব ও নেই ,
ক্ষনিকের স্মৃতি ,
পরক্ষণেই শুরু হয় জীবনের ব্যস্ততা ।

পাগলী

রাস্তার ধারে
যাত্রী বিশ্রামাগারে
রুগ্ন জীর্ণ শীর্ণ দেহে
মাথাভরা উস্‌কো খুসকো চুল
এক পাগলীর অস্থায়ী ঠিকানা ।
পথ চলতি রাস্তায়
মানুষ দেখলেই বাড়িয়ে দেয় রুগ্ন হাতখানা,
ক্ষুদার্থ পেট,দেহে শুধু অস্থি চর্মসার,
স্বামী , পুত্রহীনা , উন্মাদিনী
শোকে বাক শক্তিহীন
বাঁচতে হবে বেঁচে আছে
মূল্যহীন জীবন , কেবল অসাড়
স্বামী , পুত্র নিহত হয়েছে
কেউ ও কখন ও বলেনি তাকে
সারা গায়ে ছাই
জীবনের ধারা পাতালে বহমান।
সবাই নিশা নিদ্রা যায়
উন্মাদিনী রাত জাগে ।
যন্ত্রণাই বাকরুদ্ধ ভাষা
স্বামী , সন্তানের মৃত্যু
কেড়ে নিয়ে গেছে
জীবনের সমস্ত আশা
যারা চলে যাই
কভু তাকাই না ফিরে

উন্মাদিনী বেঁচে আছে
স্মৃতির অংশ ঘিরে
শ্মশানে শোওয়া
তার একান্ত আপনজন
রুদ্ধ দুয়ার খুলল না
তার জীবনের স্তব্ধতা ও কাটল না
ভোরে কাঠুরিয়া যায় কাঠ কাটতে
চোখে পড়ে যাত্রী শেঠে
পড়ে আছে উন্মাদিনীর নিথর দেহ
চেঁচিয়ে উঠে কাঠুরিয়া
আসুন শবের সংৎকার করি
না , কেউ এল না
শ্মশান বন্ধুহীন কাঠুরিয়া
পরিশ্রমের কুড়ানো কাঠ
নিয়ে চলে নদীর ঘাটে,
একবার ও ভাবে নি
স্ত্রী সন্তান উপোষ রবে ,
কাঠুরিয়া - ভেবে নেয়,
সৎকার করা , তার কর্ত্তব্য
কাঠুরিয়ার কোলে,
প্রাণহীন জীর্ণ শীর্ণ
উন্মাদিনী চলে ,
নদীর ঘাটে
সাজানো কাঠে
উন্মাদিনীর জীবনের যবনিকা।

অভাগিনি

শ্মশানে জমা হয় , ভদ্র মানুষের বেশে একদল মাতাল
ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ , মাঝে জ্বলছে যুবকের লাশ,
লুঙ্গিপরা হরি ডোম গর্জ্জন কাঠি দিয়ে খোঁচা মারে
দাহ্য দিয়ে ধুপ দিয়ে জ্বলে লাশ
আগুনের ঝলকানি চোখে জ্বালা করে
লাশ পোড়া গন্ধে নাসিকা উদ্যত
মাঝে মাঝে মাতালেরা নেচে উঠে,
হঠাৎ হাঁক মেরে ধ্বনি " হরি বোলা বোল'
শুনে , আগুনের তেজ বাড়ে
অর্ধপোড়া লাশ শ্মশানে উঠে বসে
হরিডোমের উন্মত্ত গর্জ্জন কাঠি , সোজা করে দেয় লাশ
হঠাৎ উন্মাদিনীর বেশে , চিৎকার বাতাসে ভাসে
কপালে লাল সিঁদুর মাখা , স্বামী হীনা শ্মশানে
স্বামীর প্রস্থান , জীবনের প্রত্যাখান
দু-দিনের প্রনয় তামাশা শেষ হয়ে যায় নিমিষে
জীবন কাহিনী মৃত , স্নান করে জলস্রোতে
মুছে যায় আহ্লাদ ভরা সিঁথির সিঁদুর
অন্ধকার বিভাবরী , কে সে একাকী অভাগীনি ,
বিস্বাদ ভরা , বিচ্ছেদ নিয়ে একা দাঁড়িয়ে
সদ্য বিধবা ।
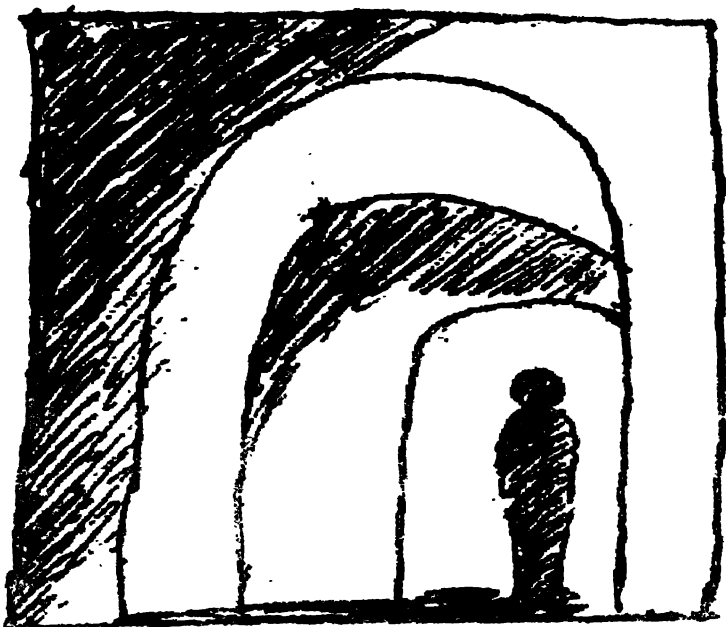
অগোছালো ঘর

অগোছালো ঘর
এখানে সেখানে পড়ে আছে কিছু লিখা কাগজ
নেড়ে চেড়ে দেখেছি লেখাগুলো
অবাস্তব ঘটনা ও নয় , কল্পনাপ্রসূত গল্প ও নয় ,
সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে
কুড়িয়েছি , সযত্নে রেখেছি লেখাগুলো
সাজিয়েছি অতীতের অভিমান দিয়ে
ফিরে তাকানোর ফুরসৎ ছিল না
সমস্যা ঘিরে ছিল বলে
একাকী অসহায়ত্ব জীবনে
লেখাগুলো এক ক্ষীন জলধারা
নয়তো আঁকা বাঁকা বিধস্ত জীবনকে
কোথায় রাখতাম জানি না
একদিন জীবন হারিয়ে যাবে
হয়ত গোরস্তানে পুঁতাথাকবে মাংস বিহীন কঙ্কাল
নয়তো চিতার লেলিহান শিখায় ছাই হয়ে উড়ে যাবে ।
অভিমানী মন কত কথা বলে
কিন্তু মনে রেখো স্বাথী থেকে যাবে , ঐ লেখাগুলো !

ছুটি

ঘড় , কাঠ পুড়িয়ে পেলাম ত্রিশ দিনের ছুটি
ভেবেছিলুম কর্তব্যে আর কখনও ফিরে যাব না ,
সবার সর্তকবার্তা , ভুল করিস নে
এ যুগে কাজ পাওয়া বড্ড মুশকিল,
কিন্তু আমি ভাল নেই
আমি বলেছি গল্প নয় বাস্তব কত কঠিন , জানো না,
ওদের ধমকানি , হুমকিতে ছোট হতে হতে আজ বিন্দু
ব্যাক্তি স্বাধীনতা সংবিধানে লিখা , কিভাবে লেখা ?
ওদের অভিধানে লিখা শুধু দাদাগিরি
আমি বুঝিনি কর্তব্যের গরমিল কোথায়
যতই খাটুনি খাটি - সব যেন মূল্যহীন
আমি তো মুক্তাবীজ বোনা ঝিনুক নয়
তোমাদেরকে মুক্তা ছড়াব !
দারিদ্র রয়েছে বলে তোদের কাছে পড়ে আছি ,
তোদের কাছে মূল্যায়ন নাই বা হলো
আমি জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ রয়েছি
তোমরা লড়াই দেখোনি,
প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের ময়দানে , শোধ করি রোজগারের ঋন।
ওরা আমাকে বিন্দু বানিয়েছি
আমি বিন্দু ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছি
কলমের অক্ষর দিয়েছি সাদা কাগজের পাতায়
মানব না তোদের সীমা রেখা
তোদের তৈরী করা গন্ডী।

মনের গভীরে মিশে আছে
তোদের দেয়া যন্ত্রণা.
ক্ষোভ - দ্বেষ আর অপমান
জেনে রাখিস্ যতই চেষ্টা হোক না কেন
কেড়ে নিতে পারবি না,
কলম, কাগজে তৈরী , অক্ষরের স্বাধীনতা।
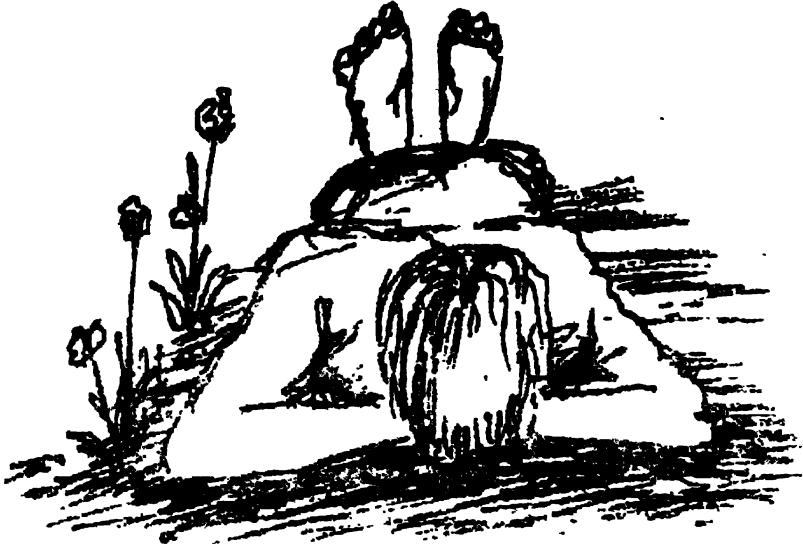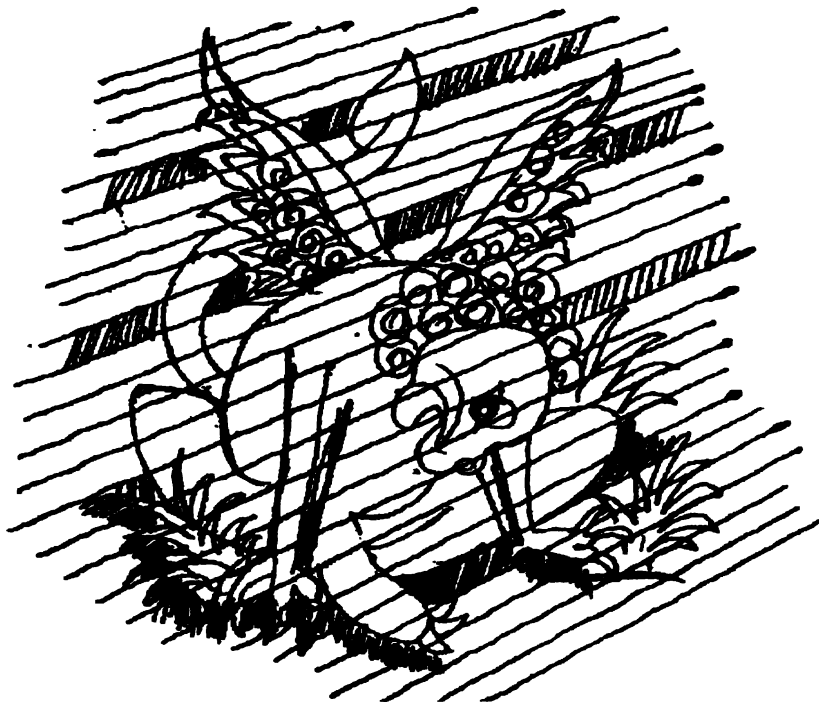
উন্মুক্ত বন্দীখানা

তোমার বন্দী গারদে, অপরাধের অভিযোগে
অন্নচিন্তায় তুমি নির্বাসিত খোলা কারাগারে
ভাষাহীন যন্ত্রণা নিয়ে আর কতদিন
বয়স তোমায় ক্লান্তি দিয়েছে
ক্ষুধা পেটে একা কতক্ষন লড়াই , প্রতিবাদ
সমস্ত পথ বন্ধ করে দেবে
তোমাকে বশ্যতা মানতেই হবে ,
তরুণ তাজা রক্ত
এ যে প্রবাহমান নদীর জল - ক্ষণস্থায়ী !
যৌবন ফুরিয়ে তুমি ক্লান্ত
খোলা কারাগারে , তোমার হিসেব নিকেষ
সবই লেখা হয় প্রতিদিন ডায়রীতে
যৌবনে তোমার পথ ভুল হয়েছে
তাই তোমাকে করতে হবে প্রায়শ্চিত্ত
দুঃস্বপ্ন দেখো না - বেদনায় ভরবে বাকী কটা দিন
দোহাই তোমার - জীবন ছেড়ে পালাবে না
সাথী তোমার একা বিছানাই
তোমার পথ চেয়ে
বিরম্বনা ভুলে যাও
দু'মুঠো অন্নের দরকার
বসে থাক বাকী ক-টা দিন
উন্মুক্ত খোলা কারাগারে ।

অসমাপ্ত জীবন কাহিনী

বারান্দায় বসে আছি গোধূলি বেলায়
স্বামী কাজ সেরে ঘরে ফিরবে বলে ,
ফুলের বাগান থেকে ভেসে আসছে সুগন্ধ
ঘরে ফেরার রাস্তা আলপথ , বর্ষার ঘাসে ঢাকা ।
খরব আসে দুর্ঘটনায় আমার স্বামী মারা গেছে
কিন্তু আমার পেটে লালিত ওর সন্তান।
বাড়ীর মালিক তাড়িয়ে দিয়েছে
চটের চাদর জড়িয়ে , বর্ষায় আমার সন্ধ্যা নামে ।
দিন কাটে হাটে বাজারে , রাত কাটে বন্ধস্কুলে বা যাত্রীশেডে
রাত কখন বিদায় নিয়েছে ভোর কখন শুরু হয়েছে তা জানি না ।
রাত এগারোটার পর রাস্তাঘাট ফাঁকা
আমি যেখানে ঠাঁই পাই মাথা গুঁজতে চলি ,
এভাবেই কাটে প্রতিদিন
একদিন আকাশের নকশিকাঁথায় , চাঁদের আলোতে
জন্ম নেয় আমার অভাগা ছেলে ,
দূর থেকে ভেসে আসে কাসরের আওয়াজ , উলুর ধ্বনি
নিঃঝুম সন্ধেবেলা , আকাশে বন পাখীর ঝাঁক উড়ে
খালি গায়ে আমার ছেলে খেলা করে আধোঁ অন্ধকারে
ঝলমল রোদে ছেলে মেয়েরা স্কুলে ছুটে
আমার ছেলে ছুটে ফুটপাতে খাবার কুড়াতে
ফুটপাতে জন্ম যাদের তারা ঠিকানাবিহীন
তাদের জন্য লিখা হয় অসমাপ্ত জীবনকাহিনী।

আমি বড্ড একা

আমি বড্ড একা
আমি জীবনের দুর্মূল্য ঘটনাগুলো কুড়িয়ে রাখি আর জমাই
জীবন আর সময়ের সঙ্গে খেলি
জীবন আবহমানের যত খেলা
মা ,বাবা আমাকে ধার দিয়েছে
এক সংঘর্ষিত প্রাণ
তিনদিকে আমার জীবন স্বপ্ন নাচে
আমিও মেতেছি জীবন উৎসবে
তিনদিকে জীবন
যেখানে লিখা আছে ভাঙ্গাগড়া জীবনের কথা,
একদিন আহত মনে চুপিচুপি দেখি
জীবনপ্রেমে মত্ত দুই পাখী
আর দেখি পাখীরা ব্যথার বদলে
তুলে আনে গানের স্বরলিপি
আমারও যে মন আছে
তা দেখে হৃদয়ের গভীরে গিয়ে,
জীবন শুধুই কি , মৃত্যু অবধি প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ,
আমি ভবঘুরে হয়ে বেড়াই
আর কে জানি ,আমার মৃত্যু লিখে আমাকে নাচায়
একদিকে জীবন স্বপ্ন
অন্যদিকে আমন্ত্রিত নিষ্ঠুর করাল মৃত্যু
ভগ্ন হৃদয়ে গান শোনাতে আসে প্রতিদিন
ইশারা সব আমার দিকে
আমার মনকে প্রতিদিন খুন করে।
নিরন্ন মানুষটি বলে উঠে,
আর্শীবাদ চাই না বাবু

এক মুঠো খাবার দাও ।
মানুষটি বিরক্ত স্বরে বলে উঠে,
শ্মশানে ও পুজো, মন্দিরেও পুজো,
তবে অত পুজো কার জন্য,
শব সংস্কারের পর পোড়া কাঠ আর ছাই
মরা নদীর জল বয়ে নিয়ে যায়,
তবে আমি কি?
জীবন, মৃত্যুর মাঝখানে কতকটা সময়
কখনো সুখ , কখনো দুঃখ
কখনো অলসতা , কখনো ব্যস্ততা
নীরব স্বাক্ষী তারারা
তাদের শীত নেই , যন্ত্রণা আছে
তাই একা , একা , জেগে থাকে সারা রাত
প্রচন্ড শীত , অচেনা কোন এক পাখী
নিঃঝুম রাতে তার কণ্ঠ গেয়ে যায় গান
নিয়ে আসে অদ্ভুত নীরবতা , নিস্তব্ধতা ,
গোপনে দাঁড়িয়ে থাকে মৃত্যুদূত
সবাই একদিন যেতে হবে এই বিপর্যস্ত রাস্তায়
তবে অসময়ে কেন ?
শব পোড়া চিহ্নটুকু শেষ অব্দি ছাই
সব হাহাকার মিশে যাবে , মৃত্যু শেষ কথা বলে
মৃত্যু , তবে কেন এক ভয় লাগে
জীবনের সব ক্ষত , মিশে যাবে সময়ের স্রোতে
তখন থাকবে সাময়িক অদ্ভুত নীবরতা
থাকবে না কোন চাওয়া , পাওয়া,
শুধু আমরা সবাই সময়ের কাছে ঋণী
কিন্তু আশ্চার্য কিছু লোক মরেও
অদ্ভুতভাবে আজীবন বেঁচে আছে ।

বাসা তৈরীর আশা

গভীর রাত , চলেছি একাকী
আপনমনে নিজের সাথে কথা বলে বলে ,
বাড়ীর রাস্তা , ফুরোয় না
হঠাৎ কিচিমিচি ডাকে গাছের দিকে দেখি
আমার মতো পাখীদেরও বাসা নেই
দলবদ্ধভাবে গাছের ডালে বসে আছে
ভুল করি , ওদের বাসা আছে ভেবে
ওরা , এ গাছ থেকে ও গাছে ঘুরে রাত কাটাই
আশায় থাকে , বাসা হবে বলে
খুঁটে খুঁটে খড় , কুটো আনে ,
সন্তানের জন্য ঘর বানাবে বলে
ঝড়ো বাতাস , সৃষ্টির জল
পাখীদের ঘর উড়িয়ে নিয়ে যায়
পাখীদের মনের গোপন থেকে
জলের ঢেউয়ের মতো আশা ভেসে আসে,
ঘর বাধবে বলে ,
মনের আশা , গভীর রাতে কিচিমিচি স্বরে গান গায়,
ওদের বাসা তৈরীর আশা , এখনো অনন্ত রাস্তায় ।
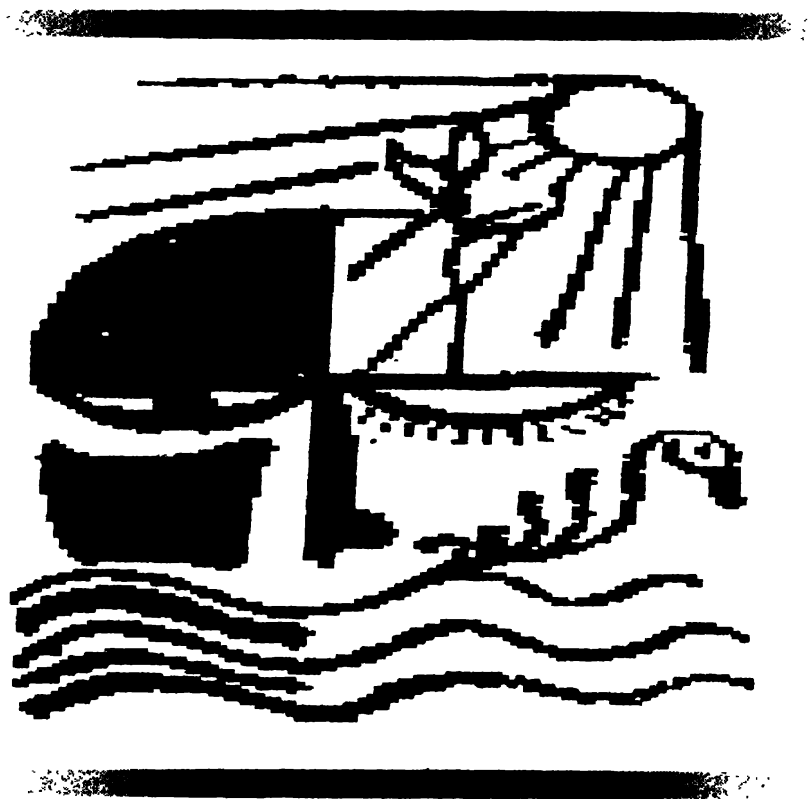
ছাড়পত্র

লড়াই, সংগ্রাম যতসব জীবন জীবিকার জন্য
আমার যতসব ইচ্ছা ওরা ছিনিয়ে নিতে চাই
আমি যুদ্ধের মুখোমুখি যাচ্ছি জীবন বাঁচানোর জন্য
নিজের শক্তির উপর ভর দিয়ে আমি চলেছি
মৃত্যুর কাছাকাছি থেকে ফিরে এসেছি
দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ঘোষনা দিয়েছি আমার জীবন
পথে বাধা হই ও না
দৃঢ়তার সাথে বলছি , পরিণাম হবে ভয়াবহ
অন্ধকারের সাথে লড়তে চাই বর্ম ও শিরস্ত্রাণ
আক্রমণ প্রতিহত করতে চাই লোহার জ্যাকেট
ঘুমের জন্য একটু আস্তানা
লড়াই করে জীবন বাঁচাতে চাই
বাঁচার জন্য চাই শুধু একাট ছাড়পত্র
জীবন গুটিয়ে মরার জন্য চাই
রিলিজ অর্ডার।

বাবার স্মৃতি

ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে
গোমতীর গো মুখের ধারে
হাতে তার পিতার চিতাভস্ম
চোখ মুখ ঘিরে রেখেছে অশান্ত আত্মা
সন্ত্রাসের বিষ ছোবলে তার পিতার মৃত্যু
পিতৃভূমিতে গ্রামবাসীর প্রতিবাদ সভা
ছেলেটি কুড়িয়েছে চিতাভস্ম
বাবার শ্মশানের আগুন নিভিয়ে,
গোমতীর পবিত্র জলে দাঁড়িয়ে
পিতার চিতাভস্ম হাতে একমনে বাবাকে ডাকছে
বাবা তোমার অশীরিরী আত্মা
হোক আমার জীবন রথের সারথি
গোমতীর শান্ত জলে ক্রোধ ছেলের চোখে মুখে
একমনে বলে বাবা তুমি আমর সামনে অবতীর্ণ হও।
ভেসে যাই পিতার চিতাভস্ম গোমতীর পবিত্র জলে ।
ছেলের জীবনের বাস্তব ভূমিতে
একটুকরো রুটি , একখন্ড কাপড়
যোগাড় করাই দায় ।
দিশাহীন ছেলে গুমরে কেঁদে উঠে
বলে বাবা আমি তোমাকে খুঁজছি
বাবা তুমি আমাকে অসহায় জীবন থেকে উদ্ধার করো
আদর করে ডাকো , তোমার কাছে স্থান দাও
বাবা আগুন তোমার জীবন নিতে পারে
কিন্তু আমার জীবন দিতে পারে নি।
আজ তোমার স্মৃতি শুধুই গোমতীর
জলে ভেসে যাওয়া চিতাভস্ম।

গোপন দহনে

এ কী জীবন দিলে প্রভু
ভাগ্যে যদি না সহ্য হয়
সাজানো গোছানো সংসার করি
এমন ভাগ্য কোথায় ?
ঘর বানিয়েছিলাম হয়ে কপোত কপোতী
আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়ে আমার কপোত হারিয়ে গেছে
আমি হয়ে গেছি চিরতরে একা
কিভাবে বাসা বানায় ।
ভিক্ষার থালা নিয়ে রোজ রাস্তার মোড়ে এসে থামি
আমার যন্ত্রণাসিক্ত দেহ , বিষন্ন মন
ঘুরে বেড়াই, এখান থেকে ওখানে ভেসে ভেসে
আমার কণ্ঠ থেকে বের হয় না কোন স্বর
মগজে আমার কখনো আসেনি বিন্দু , বিসর্গ , অক্ষর
হয়ত যন্ত্রণা মগ্ন দেহ হয়ে যাবে নীল বিষ
পথের প্রান্তে মৃত্যুদূত জানাবে আমাই কুর্নিশ।
আমি তো যেতে পারি না তোমার প্রসাদ ভুবনে
রক্ষীসাস্ত্রী বাধা দেয় , আমি মরি গোপন দহনে
অনাবৃত অবয়ব , হাঁড় কাপানো শীতের অন্ধকার
আমার পিঠের পুটলীতে ঝুলছে সারাদিনের সম্ভার
রাত দশটায় বটতলা থেকে চলে যায় শেষ বাস
রাতের আধারে ভদ্রবেশীরা ঢেলে দেয় আমার শরীরে তাদের অভিশাপ
আমার নেই খড়, নেই শীতবস্ত্র
ওরা চলে গেলে আমি ঘুমিয়ে পড়ি
মানুষের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে শূন্য যাত্রীশেডে।
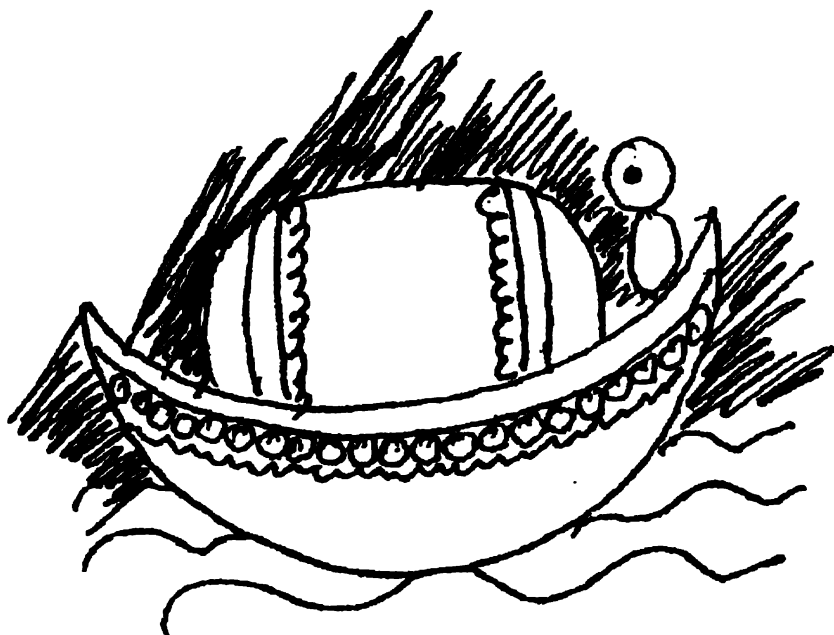
ভয়ানক কষ্ট

নাম না জানা এক ভয়ার্থ পাখী
লুকিয়ে আছে রাজ্যের জঙ্গলে,
আমাদের দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে
রাজ্যের ঘন গভীর জঙ্গলে
তার অবুঝ সন্তান কাতর ডাকে
স্বামী তার খুন হয়ে গেছে
ভয়ে অভিমানে সে পালিয়েছে,
একা ঘরে নিঃসঙ্গ সন্তান
মা ,বাবা তাকে ফেলে চলে গেছে ,
জঙ্গলে লুকিয়ে সে দেখছে
আধপোঁড়া কাঠগুলো নদীতে ভেসে গেছে ,
স্বামী তার মৃত্যুতে জল পাইনি
আধঁপোড়া মৃতদেহ কাঠ হয়ে জলে ভেসে গেছে,
রক্তে লাল নদীর জল
বারুদে ভরা জমির ফসল
নদীর তীর শ্মশান যেমন
দুঃশ্চিন্তার কোনো শেষ নেই
অন্ধকার ঘন জঙ্গলে
পাখী দেখে ঈষৎ সূর্যের আলো
আলো দেখেছি , কিন্তু তাপবিহীন
নিদ্রা বিহীন চোখ
বেঁচে আছে জঙ্গলের সাহারায়
দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা
কিছু তোয়াক্কা করে না উগ্র সভ্যতায়।

আগাম কোন খবর ছিল না

আগাম কোন খবর ছিলনা
আকস্মিক ভাবে ঘরের দরজা , জানালাগুলো
বন্ধ হয়ে গেল ,
পড়শীদের ঘরের দিক তাকিয়ে দেখি
বিজলী বাতিকুলোও সব নেভানো
অসম্ভব নিস্তব্দতা !
যেন পৃথিবী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন,
দরজায় তালা দিয়ে
আমি বেরিয়ে আসি রাস্তায়
সন্ধ্যা রাতের পরেই
রাতের দ্বিতীয় প্রহরে,
পুলিশের গাড়িতে
হাসপাতালের লাসঘরে শোনা গেল ,
নিস্প্রান নির্বাসিতদের সঙ্গে
আমাকেও শুইয়ে দেওয়া হবে
পরের দিন কাগজে বেরোবে
সে অভিযুক্ত
তার পড়ার ঘরে
সারি সারি লেখা
বিপজ্জনক অবস্থায় , আপত্তিকর ভাবে
পাওয়া গেছে ।

অতীতের রোমন্থন

ইতস্তত ছোটাছুটি
এক দঙ্গল মানুষের ভীড়ে
ছুটে পালায়
মারমুখো যুবকের তারা খেয়ে
বলা অসম্ভব
যদিও আকাট সত্য সামনে এসেছে ,
অতীতের রোমন্থন
ছোঁপ ছোঁপ রক্ত আর উদ্রভ্রান্ত অস্ত্র
মুহুর্তে নিস্তব্দতা
ওরা গতি বদলে অন্য দিকে গেছে
যা হবার তা হয়ে গেছে
নোংড়া ডাষ্টবিনের মাঝে পড়ে আছে রক্তাক্ত লাশ
ছেঁড়া নোংড়া ময়লার সাথে
ভেসে গেঝে নদীর প্রবাহমান স্রোতে
এখানে নেই আজ
নিন্দা ও প্রশ্ন , সবই অতীত
বস্ত্রহীন পাগলের মতো
নির্বোধ আমি তুমি সবাই
অস্ত্রহীন , লেখনীবিহীন
তাই বলি যা দেখোছো , যা হয়েছে
ভুলে যাও
সময় , তোমার আমার অপেক্ষায় থাকে না ।
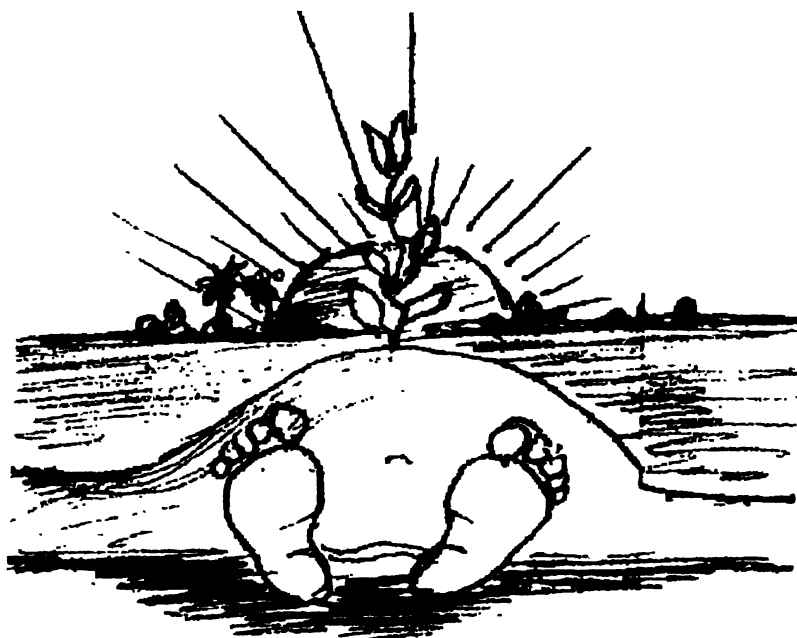
জীবনের রাস্তা

আজ আমি এসেছি , নিশুতি রাতে
খিস্তি খেউর খেয়ে জীবন দরজা খুলতে,
বুঝিনি জীবনের সব রাস্তা , ছিটকে গেছে
বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজ
হাঁটতে হাঁটতে প্রাণ আমায় হাঁপাচ্ছে
দুর্গন্ধময় পথ, বালির তৈরী পথের আবির
চোখে যেন ছানি পড়ে গেছে
নিংড়ে দেওয়া যৌবন আমার
জীবন বাজি রেখে প্রত্যাশার খোঁজে
যৌবন ধসে যাচ্ছে যেন পলেস্তরা খানা বাড়ি,
ঘুটঘুটে অন্ধকার দৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে
যেন নিজের অজান্তেই মৃত্যুর স্বাক্ষাৎ।

প্রতিবাদী ধ্রুবক

শৈশবের বিছানায় ভোরের রোদ
এক পা , দু -পা করে উন্মেচিত মুখ,
যৌবনের আগুনে স্বপ্ন জাগে
আমার সর্ব অধিকার নিয়ে,
কিন্তু জীবন কি পেলো
হিসেব নিকেশ মিলল না,
সর্বাঙ্গে ছিল জেদ আর অভিমান
তাই নতুন করে ভাবতে পারিনি।
তর্জনী তুলে দাঁড়িয়েছিলেন বস্
ক্ষনীক মূহুর্তে মনের ভেতর স্বপ্ন বিস্ফোরণ
যেন বৃহৎ থাবার হৃৎপিন্ড যন্ত্রণা
তীব্র গতিতে বিদ্যুৎ বেগে সময় চলে যাচ্ছে,
দেখেছি বাবুদের ঘরে ঝাড় লণ্ঠন , ফ্লুরোসেন্টের আলো
বাবুরা রঙিন তরল নেশায় মত্ত,
উদগ্র কামনার জ্বলজ্বলে চোখে
আমাকে ইসারায় ডাকে ,
আমার যৌবন ঘুমিয়ে গেছে
চোখের কালোছানি যেন নিশিন্দির কাজল ,
শুনেছি দুঃখিত বলেছেন
কিন্তু অনুতপ্ত হন নি ,
তবুও সবুজের খোলা পৃথিবীতে
জেগে উঠে নীরাহিকা
গুটিয়ে যাচ্ছে জীবন

কিন্তু লিখা হয়ে গেছে সৃষ্টির ইতিহাস,
মৃত্যু ওদের পরাস্ত করতে পারেনি,
ওরা সংগ্রাম জারী রেখেছে,
তৈরী করে গেছে এক প্রতিবাদী ধ্রুবক ।
অভিযোগহীন জীবন,
তবুও প্রতিবাদের শেষ নেই ।

খাবার চাই

রেস্তোরার পাশে আর্বজ্জনার বাক্স
বাবুদের খাবারের উচ্ছিষ্ট , হাড়গোড়
সাতসকালে ভীড় জমেছে একদল কাকের
খাবারে ভাগ বসাতে তৈরী নেড়ী কুকুরেরা
ঘেউ ঘেউ শব্দে প্রতিপক্ষকে তাড়া করে
ক্ষমা ঘেন্না শব্দগুলো তাদের অভিধানে নেই
দুই পথশিশু মাকে সাথে নিয়ে
সুতীক্ষ্ণ নজরে উচ্ছিষ্ট খাবারের দিকে ,
প্রতীক্ষা খাবার কুড়িয়ে খাবে
নোংরা গায়ে চিলতে রোদের প্রলেপ
ভুরিভোজ না-ই-বা হলো
মাংসবিহীন হাড় চাটতে আপত্তি কোথায়,
ওদের অভিমান নেই , ক্ষিদে আছে
সকাল থেকে রাত অবধি ওদের লড়াই
এ লড়াই কেবল উদরের ক্ষুধা নিবারনে
না দেখে ওদের কথা কখনো ও
পরে না মনে ।

ভাঙ্গা কাচেঁর টুকরো

রাত্রিতে কাঁচের ঘরের সামনে
ওর সঙ্গে দেখা,
সে সুপুরুষ , বলল অহমিকার কথা
যাকে সে প্রথম দ্যাখে তা এক কাঁচের ঘর,
যার থেকে হচ্ছে আলোর প্রতিফলন
আলোর বিচ্ছুরণ , ওর মাথাব্যাথা
কাঁচের ঘর দাঁড় করিয়ে রাখা - এ কি হতে পারে ?
পাথর হাতে কি করবে তাতে
রাত্রি পরিচিতা , মোহহীনা স্বাক্ষী দেবে না ।
কাঁচের ঘর দিচ্ছে পাহাড়া।
ওর কিছু তোষামোদ চাই , ওর বাক্যে ফোটে খই ।
কাঁচের ঘর তোষামোদ জানে না ।
এই অপরাধ ক্ষমতার দম্ভে সে সঙ্গপনে পাথর ছুড়ে মারে ।
এক পাথরের ঘায়ে চুরমার কাঁচের সাজানো ঘর ।
কাঁচের টুকরো পথে চালাচালি করে ,
অহমিকার রাত নীচে আসে দখল নিতে পরের জমি
রক্তের সাঁতালি কাঁচের টুকরো পায়ে ঢুকে পড়ে
সর্বদায় বর্তায় কাচের টুকরোর , কি দুঃসময় ?
রাতের গভীরে যে ভেঙ্গেছে কাচের ঘর তার দোষ নেই !
সে পরাক্রমী , কিন্তু অসতর্ক সময়ে কাচ ঢুকে গেছে পায়ে ।
অসম্ভব যন্ত্রণা , পরাক্রম ফুরিয়ে গেছে।
ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো , সে কি সংক্রামক ?
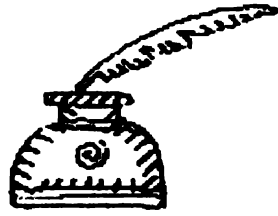
প্রবন্ধ

" চিত্র সাংবাদিকতা - কঠিন কঠোর প্রতিজ্ঞা "

চিত্র সাংবাদিকরা নির্ভীক , বোবা ক্যামেরা নিঃশব্দে সত্য কাহিনী বলে । আর এই সত্যের অনুসন্ধানে চিত্রসাংবাদিকদের অনেক সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটতে হয় । শোষণ , বঞ্চনা , নির্যাতিন , অবক্ষয় আনন্দ , খেলাধূলা , দুর্ঘটনা , দুর্নীতি , নানাহ্ বিষয় নিয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে চিত্র - সাংবাদিকরা সমাজের সামনে তুলে ধরে বাস্তব ঘটনাসমূহের জ্বলন্ত ছবি । সমাজকে সাহায্য করে ঘটনার বিচার - বিশ্লেষণ করতে । পরিস্থিতি যেমনই হোক সামাজিক দায়বদ্ধতায় এবং পেশাগত কর্তব্যের টানে ক্লান্তিহীনভাবে চিত্র সাংবাদিককে ছুটতে হয় - চিত্র সাংবাদিকের সাথী হয়ে থাকে কেবল বোবা ক্যামেরা - এ যেন এক আত্মবিশ্বাসী - অমোঘ অস্ত্র । হুমকী , মৃত্যুভয় কাজের গতিকে থামাতে পারে না । চিত্র - সাংবাদিকেরা যেন তৈরী ঘুমন্ত সমাজের ঘুম ভাঙ্গাতে । চিত্র সাংবাদিকেরা নিঃসন্দেহে সমাজ জাগানোর বলিষ্ঠ হাতিয়ার ।

চিত্র - সাংবাদিক ছুটেছে কখনো দুর্গম পাহাড়ে , কখনো খেলার মাঠে , কখনো শিক্ষা প্রাঙ্গণে , কখনো সংস্কৃতির ভূমিতে , সর্বত্রই যেন সংগৃহীত ছবির আলোড়ন তুলে সমাজকে কিছু দেবার প্রয়াস দিয়ে সৃষ্ট চিত্র - সাংবাদিকতা । ক্লান্তিহীন পবিত্র পেশায় কাজ করতে গিয়ে ভূ-বিশ্বে অনেক চিত্র সাংবাদিক খুন হয়েছেন , অপহৃত হয়েছেন , আক্রমনকারীর হাতে বন্দী হয়েছেন , অত্যাচারিত হয়েছেন , যুদ্ধবিধ্বস্ত ভূমিতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণের বলিদান দিয়েছেন অনেক চিত্র - সাংবাদিক। আভ্যন্তরীন গোলযোগের ঘটনা সংগ্রহে আহুতি দিয়েছেন প্রাণ । হুমকী পেয়েছেন , শারীরিক নিগৃহীত হয়েছেন এ সংখ্যা ও বহু , কিন্তু তাই বলে থেমে নেই মহান পবিত্র পেশা । চিত্রে মাধ্যমে ঘটনাসমূহ অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে চিত্র সাংবাদিক । উগ্রপন্থা, অভাব, কর্মহীনতা , অসম বন্টন , সাম্প্রদায়িকতা , দাঙ্গা, প্রাদেশিকতাবাদ , দুর্নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে চিত্র

সহকারে বর্ণনা আপসহীনতা নির্ভীক চিত্র সাংবাদিকদের কাজ । উন্নয়ন ও মূল্যায়নের পথ দেখাতে পারে সঠিক সাংবাদিকতা । নির্ভীকতা ও আপোষহীতা এই পেশার অঙ্গ সুতরাং মৃত্যুভয় সেখানে তুচ্ছ । নির্ভীক সাংবাদিকতা পারে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করতে । সমস্ত ভূ - বিশ্বে , পবিত্র পেশা রক্ষা করতে গিয়ে অনেক চিত্র সাংবাদিক খুন হয়েছেন , অপহৃত হয়েছেন , কারারুদ্ধ হয়েছেন , অত্যাচারিত হয়েছেন , তা এক বিশাল তালিকা । তবুও দু-একজন বিখ্যাত চিত্র - সাংবাদিকের কথা স্মরণ করে লিখছি, যেমন ইলিজ লাভজয় একদল উশৃঙ্খল জনতাকে আগুন লাগানো থেকে বিরত করতে গিয়ে খুন হন ।

ম্যাথিউ ব্রেডী , স্বনামধন্য চিত্র সাংবাদিক যিনি , যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ এবং ঝুঁকিপূর্ণ অন্ততঃ ৩,৫০০ ফটোগ্রাফ তুলেন (১৮২৩-১৮৯৬) এই সময়ের মধ্যে । জ্যাকব রিস্ বিখ্যাত চিত্র - সাংবাদিক বিশ্বের প্রথম বিখ্যাত মহিলা চিত্র - সাংবাদিক মার্গারেট - বোর্কে - ওয়াইট যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফটো তুলে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করেন এবং তিনি বিশ্ব নেতৃত্বের ফটোগুলো স্মরণের জন্য তুলে রাখেন যেমন গান্ধিজী , চার্চিল ,স্ট্যালিন ইত্যাদি।

বিখ্যাত চিত্র - সাংবাদিক রবার্ট কাপা ভিয়েতনামে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই মারা যান ।

এই পবিত্র পেশায় আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রেরও অনেক সাংবাদিক খুন হন যেমন হায়েতুল্লা খান , পাকিস্তান , শেখ বেলালুউদ্দিন , বাংলাদেশ তিনি খুন হন ১১ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ইং - তে । বাংলাদেশের "দৈনিক সমাকল " পত্রিকার গৌতম দাস , মৃত্যু ১৭ই নভেম্বর ২০০৫ ইং , নেপালের " রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান" পত্রিকার সাংবাদিক মহেশ্বর পাহাড়ী । পাকিস্তানের আল্লাহনুর ছিলেন পেশোয়ারস্থিত খাইবার টি.ভি-র সাংবাদিক ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ -এ খুন হন । সাথে অপর সাংবাদিক ছিলেন আমীর নোয়াব। শ্রীলঙ্কায় খুন হয় চিত্র - সাংবাদিক ধর্মেরত্নম শিবরাম ২৯ শে এপ্রিল ২০০৫ ইং , অপর সাংবাদিক রেলাঙ্গী সেলতারাজ ও তার স্বামী সেনাথুরাই খুন হন ১২ আগষ্ট , ২০০৫ ইং।

আমাদের দেশেও এই পবিত্র পেশায় কাজ করতে গিয়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে এমনকি অধুনাও সৎ সাহসী অনেক সাংবাদিককে বহু প্রকার বাধা , বিপত্তি , নির্যাতিত হতে হয়েছে । ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ভার্ণিকুলার প্রেস্ এ্যাক্ট প্রয়োগ করে সাংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ভারতীয় প্রেস আইন , ১৯৬০ সালের ২৬ জানুয়ারী স্বাধীন ভারতবর্ষে সংবিধানে , বলার এবং মত প্রকাশের অধিকার মৌলিক অধিকার বলা হয় । সকল পেপার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়ার রায় প্রদানকালে ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট অভিমত ব্যক্ত করেন সমস্ত ব্যাক্তির বলার মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা আছে এবং তাকে প্রচার করাও যেতে পারে । ১৯৬৫ সালে ভারতবর্ষের প্রেস কাউন্সিল বিল তৈরী হয়। ১৯৬৬ ইং জুলাই মাসে প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষা এবং ভারতীয় সংবাদপত্রের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া গঠিত হয় । প্রথম চেয়ারম্যান

ছিলেন জে.আর. মুদালেকার । উনি ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি । কাউন্সিলকে আইনের বিশেষ ক্ষমতাও দেওয়া হয় । কাউন্সিলের বিচারের ক্ষমতা আছে । ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত প্রেস কাউন্সিল অনেক সংবাদপত্রের সমস্যা সমাধান করে এবং সাংবাদিকের জন্য গাইড লাইন তৈরী করে । বিখ্যাত সাংবাদিক ডি. আর . মান সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন ।

আমাদের রাজ্য ত্রিপুরায় সাংবাদিকতার জগৎ সৃষ্টি হয় ১৯৪৫ থেকে । প্রথমভাগের কয়েকটি পত্রিকা হল নব - জাগরণ , চিনহা , ত্রিপুরা রাজ্য কথা, গণরাজ , অগ্রগতি , অভিযান , সেবক , সমাজ ইত্যাদি । ১৯৪৬ -৪৮ তিন বছর ত্রিপুরাকে সংবাদ জগতে নিয়ে আসেন হরিগঙ্গা বসাক । অপর ব্যাক্তিত্ব ছিলেন রাজ্যের সংবাদজগতের অমিয় দেবরায় । আজ ত্রিপুরায় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা সমাজে ও রাষ্ট্রে মর্যাদা লাভ করেছে । পত্রিকার প্রয়োজনীয়তাবোধ রাজ্যের ঘরে ঘরে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে । দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পথ গুটি গুটি পায়ে হেটে এসে আজ রাজ্যের সংবাদজগৎ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে । আমাদের রাজ্যের এ প্রজন্মের চিত্র - সাংবাদিকরা থেমে নেই । এ যেন প্রচন্ড কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান । রজ্যের ছোট বড় প্রায় চল্লিশটি কাগজ বের হয় । আমার বিশ্বাস এই পবিত্র ও মহান কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের চিত্র - সাংবাদিকরা আরো এগিয়ে যাবে ।

চিত্র - সাংবাদিকতার পথ মসৃন নয় , পর্বত সমান বাধা , তারপরেও দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে জনহিতকর কল্পে ঝুঁকি নিয়েও চিত্র সাংবাদিকরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ , প্রতিজ্ঞা বদ্ধ , সমাজকে জাগ্রত করার কর্মে মনে প্রাণে নিয়োজিত । দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন রাজ্যের চিত্র সাংবাদিকরা তথ্যভিত্তিক , সৃষ্টিশীল চিত্র - সংবাদের মাধ্যমে আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিতে বদ্ধ পরিকর যেখানে হবে কাজের সঠিক মূল্যায়ণ । গৌরবান্বিত ১লা মে ২০০৮ ইং হতে চলেছে রাজ্যের চিত্র - সাংবাদিকদের বার্ষিক সম্মেলন ।

চিত্র সাংবাদিকদের কাছে রাজ্যের মানুষের প্রত্যাশা অনেক । যদিও ইত্যবসরেই উনারা এগিয়ে নিজেদের দৃঢ় সংকল্পে । এই সম্মেলনে হোক এই সংকল্প আমাদের নেই পরাজয় , তথ্য , চিত্রের মাধ্যমে হোক সমাজের জয় ।

****

টাকারজলায়
" ফেলে আসা দুঃস্বপ্নের দিনগুলো"

প্রারম্ভিক পরিস্থিতি থমথমে ছিল , খুন বর্বরতা , অপহরণ , অগ্নিদাহ , গৃহদাহ , অমানুষিকতা , অমানবিকতা , পাশাপাশি স্বামীহারা , স্বজনহীন, পিতৃহীন ভিটেহীন , গৃহহীন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া টাকারজলা উপজাতি মহল্লার মানুষদের প্রতিরোধ , প্রতিবাদ , ভয়হীন দুর্বার গণআন্দোলন , কথাগুলো লিখতেই যেন কলমের কালি লাল হয়ে উঠেছে। টাকারজলা থানা এলাকার আয়তন ছিল ১৯২ স্কোয়ার কিলোমিটার । হায়না, মতলববাজদের হিংস্রতার পরিসংখ্যান লিখে বলে, তথ্যচিত্র দিয়ে শেষ করা যাবে না । চাক্ষুষ না করলে এ বর্বরতা যে কত নির্ম্মম তা ভাবাও যাবে না । পবিত্র খরস্রোতা ' বুড়ীমা'' নদী নির্বাক সাক্ষ্য বহন করে চলেছে অনাদী অনন্তের পথ ধরে । ১২ থেকে ১৪ হাজার মানুষ (জাতি /উপজাতি)

হায়নাদের হিংস্র নরমেধ যজ্ঞের হাত থেকে বাঁচতে ভিটেভূমি ছেড়ে ক্রমান্বয়ে এলাকা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে । সাজানো বাড়ীগুলো যেন আজ ভুতুরে বাড়ী , সেখানের শ্মশানের নিস্তব্দতা , কোথাও পোড়াবাড়ীগুলো স্মৃতির রোমন্থন করে, অর্ধপোড়া নারকেল গাছগুলো শূন্যবাড়ীতে পাহারাদারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে । সুদীর্ঘ পুরোনো সংস্কৃতির ঐতিহ্যে সুবিশাল ক্ষতচিহ্ন , সর্ব্বাঙ্গে রক্তাক্ত , মাটিতে শুকনো তাজা রক্তের কালশিটে দাগ । হাজার হাজার গৃহহীন , ঘরবাড়ী জ্বলে পুড়ে রাখ হয়ে গেছে , অগনিত গৃহপালিত পশুর প্রাণ , ওরা আমাদের মতো কথা বলতে পারেনি , তবুও বন্দী অবস্থায় অশ্রুসজল চোখে হয়ত বারংবার প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, বর্বর হিংস্র হায়নাদের মন গলেনি , আগুনে পুড়ে বোবা পশুদের আত্মহুতি হয়েছে । কত প্রাণ অকালে ঝড়েছে , অপহৃত হয়েছে , আহত

হয়েছে পঙ্গু হয়েছে, ধর্ষিত হয়েছে হিসেব মিলানো কঠিন, চলমান জীবন থেমে নেই তবুও আগামী — উত্তরের অপেক্ষায়। উত্থান, পতন ইতিহাসের ভাষা, সুতরাং ঘটনার জবাব আসবেই। ইতিহাসের পাতা সাক্ষ্য দেয় ফরাসী বিপ্লব সন্ত্রাসবাদের নিষ্ঠুরতা বিফল হয়েছিল। মারাঠা বিপ্লব উগ্রপন্থার কবলে পড়ে পতন হয়েছিল। উগ্রপন্থা এক ভ্রান্ত পথ তা কখনো সফল হতে পারে না। হিংসার থেকে হিংসার জন্ম হয়। সুতরাং সেখানে শান্তির পরিবেশ সুদূর পরাহত। ১৯৯৩ নং হইতে ২০০২ ইং পর্যন্ত টাকারজলা থানা এলাকায় জাতি, উপজাতি, নারী, পুরুষ, পুলিশ, হোমগার্ড, নিরাপত্তাবাহিনী, সরকারী কর্মচারী নিহত / অপহৃত হয়েছে মোট ২৯৮ জন। হয়ত অনেক হিসেব /ঘটনা কালস্রোতে লুকিয়ে গেছে। আগামীতে হয়তো প্রত্নতাত্ত্বিক যুগের মতো লুকিয়ে আছে মাটির তলায় উগ্রবাদী বর্বরদের দেওয়া চিহ্ন, মাঠ খুড়লেই হয়তো আগামী প্রজন্ম টাকারজলার বিভিন্ন এলাকায় পাবে পূর্বপুরুষের কঙ্কাল, মাথার খুলি, হাড় ইত্যাদি ইত্যাদি। এটাই বাস্তব, দস্যুদের সীমাহীন নগ্ন বর্বরতার ইতিহাস। জ্বলন্ত সাক্ষী, পোঁড়া বাড়ীঘরগুলো স্মৃতির বোঝা নিয়ে নিস্তব্দে দাঁড়িয়ে আছে। ভাষাহীন বর্বরতার শিকার স্থানীয় নিরীহ উপজাতিরা হিসেববিহীন ভাবে মুখ বুঝে অত্যাচার সহ্য করেছে। তরুনীরা ধর্ষিত হয়েছে। চাপা যন্ত্রণা বুকে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল। অসংখ্য অপহৃত হয়েছে। টাকারজলাতে শুধু এক সীতার হরণ হয়নি। শতশত রাম অপহৃত হয়েছে, অনেকে কখনো আর ফিরে আসবে না। দীর্ঘ যন্ত্রণা বঞ্চনার বিরুদ্ধে, রক্তলোলুপ, রক্তপিপাসু হায়নাদের বিরুদ্ধে ২০০৩ ইং থেকে শুরু হয় বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ, শান্তিপ্রিয় উপজাতিরা অন্তর্দহনে জ্বলতে থাকে, ঘৃণায় তাদের উদ্দেশ্যে মনে মনে থু থু ছুড়ে দেয়। ২০০৩ ইং ফেব্রুয়ারী মাাসের ৪ তারিখ উগ্রবাদীরা লক্ষণ র্সদার পাড়ায় ৭০ বছরের বৃদ্ধ কলচন্দ্র দেববর্মাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে প্রতিবাদের উত্তরে। দাদুর নিষ্ঠুর হত্যা পরখ করে ষষ্ঠবর্ষীয়া নাতনী ফাল্গুনী দেববর্মা গোঙিয়ে কেঁদে উঠতেই জঙ্গলদস্যুরা শিশুটির ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দেয়। ছোঁপ ছোঁপ রক্ত ও নরমাংসের টুকরো মাটিতে ইতঃস্তত ছড়ানো। শেয়াল, কুকুর, কোন বন্যপশুও এভাবে নৃশংসতা করতে পারে না। ১৭/০২/২০০৩ ইং রাত ৯ টা ৩০ মিনিটে শ্যামনগরের প্রতিবাদী যুবক সুবল দেববর্মাকে, বৃদ্ধা মা, শিশুসন্তান ও স্ত্রীর সম্মুখ থেকে টেনে হ্যাঁচড়ে নিয়ে যায়। গুমরে গুমরে কেঁদে উঠে সুবলের বৃদ্ধা মা, কন্যা, স্ত্রী পুত্রের প্রাণভিক্ষা চায়, কিন্তু না, ক্ষমা মানবতা এইসব শব্দগুলো উগ্রবাদীদের অভিধানে নেই। পরদিন সকালে হাত, পা বাধা অবস্থায় সর্বাঙ্গে কালশিটে দাগ, রক্তে লুটেপুটে, কালশনিকভ রাইফেলের গুলী মাথা এফোঁড় - ওফোঁড় করা অবস্থায় চিরনিদ্রায় ঘুমন্ত সুবলকে পাওয়া যায়। সুবলের বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, কন্যার হৃদয় বিদারক চিৎকার আকাশ, বাতাস গম্ভীর হয়ে যায়। একটুও মনে রেখাপাত করেনি — রক্তলোলুপ মানুষখেঁকো হায়নাদের। দু-দিন বাদেই বর্ব্বররা বীরচন্দ্র পাড়াতে বহ্নি উৎসবে মেতে ওঠে। সর্বশান্ত হয় ১২/১৪টি পরিবার। কিছুদিন বাদেই কালশনিকভ রাইফেল

রণজিৎ দেববর্মার দেহ ঝাঝরা করে দেয় । উগ্রবাদীদের খাবার জোগাড় না করার অপরাধে । বাকরুদ্ধ , শোকাবিহ্বল রণজিৎ - এর অন্তঃস্বত্তা স্ত্রী । এরকম বহু ঘটনা লিখে শেষ হবে না । বাস্তবী মুড়া নামক স্থানে প্রতিবাদী রাজা সুরণ জামাতিয়া, রত নপুরে রসিককুমার দেববর্মা বাহুচন্দ্র পাড়াতে সুরেশ দেববর্ম্মা , নন্দলাল পাড়াতে সুকুমার দেববর্মা রুখে দাঁড়ানোর ফলে নৃশংসভাবে খুন হন । ২৫/১২/২০০৩ ইং রাত আনুমানিক ৮ টায় সংস্কৃতিবান যুবক প্রদীপকে তার কোল থেকে ফুটফুটে শিশুকন্যা খুমতুইয়াকে ছুঁড়ে ফেলে , স্ত্রী আয়নাকে লাথি মেরে টেনে হ্যাঁচরে নিয়ে যায় । কাতর চোখে টগবগ করে তাকিয়ে থাকে খুমতুইয়া । প্রদীপের দুচোখ গড়িয়ে জল পড়তে থাকে । আয়নার বুকফাটা কান্না , পড়সীরা জেগে উঠে । প্রাণভয় ছেড়ে আবাল- বৃদ্ধবণিতা , সবাই ধিক্কারের ভাষা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে প্রদীপের গুলিবিদ্ধ প্রাণহীন নিথর দেহ খুঁজে পায় পবিত্র বুড়ীমা নদীর চরে । সমস্ত গ্রাম ক্রোধে , শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে । আয়না স্বামীহারা , খুমতাইয়া পিতৃহীনা । কে দেবে অবুঝ শিশুকে তার পিতৃস্নেহ ? কে ফিরিয়ে দেবে আয়নাকে তার স্বামী ? পরদিন উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে অগণিত মানুষের শুরু হয় ধিক্কার মিছিল । ভয়হীনভাবে মানুষ রুখে দাঁড়াতে শুরু করে ।

আতঙ্ক অশনী সংকেত দেয় । ভাষাহীন মুখগুলো বুঝিয়ে দেয় এভাবে চলতে দেওয়া যায় না । প্রকৃতির গড়া সুন্দরভূমিকে আর গণকবর বানাতে দেবো না । শুরু হয় ভাষাহীন নীরব প্রতিবাদ। পুলিশ , নিরাপত্তা বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এলাকার উপজাতি অংশের মানুষ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঘরে , বাইরে প্রতিরোধ শুরু করে । নিরীহ মানুষগুলোর মনে অসহ্য যন্ত্রণা , উত্তপ্ত জঙ্গল পথ , হাজারো ক্ষত । কনকনে শীতের রাতে পুলিশ , নিরাপত্তা বাহিনীকে সাহায্য করতে বসে আছে চুপটি মেরে নিরীহ উপজাতি যুবক , হয়ত জীবন যৌবনের সন্ধিক্ষণে তার নবযৌবনা বধূ পাহাড়ের ঢালে কোন অখ্যাত উপজাতি পল্লীতে রাত জেগে বসে আছে , কখন কি দুঃসংবাদ আসে । দুঃস্ব প্নে র রাত যেন শেষ হয় না । পাহাড় ঘেরা গহন অরণ্য , প্রকৃতির সৃষ্ট অন্ধকার , প্রাণের স্পন্দন উপলব্ধি করা যায় । কালো রাত নিঃশব্দে চলছে জোয়ানকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে যুবকরা , সে যে অঙ্গীকারবদ্ধ কখনো গোপনে নিস্তব্ধ জীবন্ত শবের মত শায়িত হয়ে আছে , জল্লাদদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে। টাকারজলাবাসী মৈত্রীর বাগিচা তছনছ করে দেওয়া নরপিশাচক উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ জেহাদ ঘোষণা করেছে , সাহায্যে করে চলেছে প্রশাসনকে । স্থানীয় প্রশাসনের স্তম্ভ টাকারজলা পুলিশ স্টেশন যার রোজনামচায় লিখা হচ্ছে জুমক্ষেতের আগুন থেকে প্রাকৃতিক দুযোর্গ , খুন ,ধর্ষণ , অপরাধের ঘটনা , দূরবীনের মতো চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিনিদ্র প্রহরী । অভিযানের মাঝেকখনো কখনো ভয়ার্ত , ক্ষুধার্ত পাখীর ছানার মতো আর্তনাদ শোনা যেত বেতারযন্ত্রগুলোর। টাকারজলা থানার পেছনে ফলের বদলে ঝুলে থাকত নারকেল গাছে অকাল মৃতের জামাকাপড় । উগ্রবাদীরা বহু প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে । সম্মান জানানোর প্রয়োজন । সভ্যতার সৃষ্টির কলমের বদলে এখানে চলত

স্বয়ংক্রিয় কালশনিকভ রাইফেল । কালির বদলে ব্যবহৃত হ'ত তাজা রক্ত ।

মানচিত্র নিয়ে দৌড়ঝাঁপ চলত পুলিশ নিরাপত্তা বাহিনীর জোনায়দের , সাহায্যে আসতো নির্ভীক উপজাতি যুবকরা । ওদের বিবেক আছে , ওরা গুনগুনিয়ে গেয়ে যায় মুক্তির গান । নগ্ন হিংস্রতার শেষ দেখতে চায় শান্তিপ্রিয় মানুষ । লুংফু পাহাড়ের উপজাতি বৃদ্ধরা ও প্রশ্ন করে - আর কতকাল । বৃদ্ধ পিতার সামনে প্রতিবাদী সক্ষম যুবককে টেনে হ্যাঁচরে ছাগল ভেড়ার মতো নিয়ে খুন করে উগ্রবাদীরা পৈশাচিক আনন্দ পায়। কতো ঘটনা । লিখে বলে - সমাপ্তি হবে না। চোরাগুপ্তা রণভুমি থেকে কোন যোদ্ধা ফিরে এসে সগর্বে বলে আমি ফিরে এসেছি সেই রণভূমি থেকে । এখন শান্তির বিজয় কেতন উড়ছে । উপজাতি মহল্লায় নিরাপত্তাবাহিনীর কিল্লায় কিল্লায় । হয়ত অনেক মানুষ অনেক সাথী অকালে প্রাণবলি দিয়েছে । এ লড়াই গৃহশত্রু , সংকীর্ণমনা স্বার্থবাজদের বিরুদ্ধে যারা বৈদেশিক শক্তির সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নিজ ভূমিকে ছাড়খার করে দিচ্ছে । আদৌ দেশ বা রাজ্যের স্বার্থে নয় , বরং দেশ / রাজ্যকে জলাঞ্জলী দেওয়ার নিমিত্তে । এ যুদ্ধ কোন সম্মুখ সমর নয় । চোরাগোপ্তা ছায়াযুদ্ধ লুকিয়ে লুকিয়ে কখনো নিরীহ মানুষকে ঢাল বানিয়ে , প্রচারের লিপ্সায় নিজেদের স্বার্থরক্ষায় খুন , রাহাজানি , লুঠ , জুলুমবাজী । গৃহদাহ, নিরীহ মানুষের প্রাণনাশ ও ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই নয় । এ ছায়াযুদ্ধ যে কত কঠিন তা বাস্তব ভূমিতে যারা , কাজ করছেন তারাই কেবল বলতে পারে । পাহাড়ী চড়াই , উৎরাই, দিবারাত্রে , ঘন জঙ্গলে কখনো কোন বস্তি গ্রামে , শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা না মেনে যেকোন সময় যে কোন জায়গায় শুরু হতে পারে। রক্তপিপাসু হায়না দৃষ্টির আততায়ীরা যে কোন সময় অঘটন ঘটাতে পারে , গণহত্যা , গণ গৃহদাহ , লুঠপাট ইত্যাদি ইত্যাদি। উপজাতি সমাজ , ওদের মেনে নেয় না , কোন সমাজব্যবস্থাতে কোন শুভবুদ্ধিসম্মন্ন মানুষ ওদের মেনে নেয় না । কিন্তু স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে নিরীহ মানুষের কিছু করার উপায় ছিল না , বাকরুদ্ধ হয় । বুকফাটা যন্ত্রণা , অকুণ্ঠ অত্যাচার তবুও মুখে ভাষা ফোটে না । দিশাহীন মানুষ খুঁজছিল , সময়ে ওরা পেয়েছে উৎকৃষ্ট উত্তর । এই এলাকার নিরীহ উপজাতি শ্রেণীর মানুষ এদের শোষণ অত্যাচারে তিতিবিরক্ত , অতিষ্ঠ । ২০০৩ সালে শান্তিপ্রিয় টাকারজলা থানাধীন এলাকার উপজাতি অংশের মানুষ ঘুরে দাঁড়ান । পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে । ফলশ্রুতিতে ২০০৩ সাল থেকে ২০০৪ এর আগষ্ট মাসের মধ্যে উগ্রবাদী ও তাদের সহযোগীসহ পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীর জালে ধরা পড়ে মোট ৯৩ জন । পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে নিহত হন ১২ জন । বেশ কয়েকজন আত্মসমর্পন করে ফিরে আসে জীবনের মূলস্রোতে । তারা বর্ণনা করে কিভাবে তাদেরকে ভ্রান্তপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । এই সময়ের অভিযানে উগ্রবাদীদের থেকে উদ্ধার হয় স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রে , গোলাবারুদসহ নানাহ আপত্তিকর জিনিস তথা নথীপত্র । যেমন - এ.কে ৫৬ রাইফেল - ২টি , এ.কে ৬৬ রাইফেল ১টি , জি

-.৩ রাইফেল - ২টি ৩.৮ রিভলবার - ১টি তিন কিলোগ্রাম উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন গননিধনকারী বিস্ফোরক , ১৬টি জিলেটিন ষ্টিক , ৮ টি ডিটোনেটর , ২টি সেফটি ফিউজ , ১০ টি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বৈদেশিক গ্রেণেড , ১টি এস.বি.এম.এল বন্দুক , এ.কে রাইফেলের ম্যাগাজিন - ৬টি , জি - ৩ রাইফেলের ম্যাগাজিন - ২টি , ৩৬৩ টি জি-৩ রাইফেলের গুলী , ২২৫টি এ.কে. রাইফেলের গুলি , ৫টি ৩.৮ রিভলবারের গুলী , ৮ জোড়া সামরিক পোষাক, ১০০ মিটার সামরিক পোষাকের কাপড় , রাত্রিকালে ব্যবহারের জন্য আধুনীক গ্যাসচালিত লাইট , পোষাক সেলানোর জন্য দুটি সেলাই মেশিন , লুট করে আনা গাড়ী একটি , তাদের চাঁদার রসিদ, নানাহ্ বই ইত্যাদি । থেমে নেই টাকারজলা অঞ্চলের মানুষ , পুলিশ , নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শান্তি সম্প্রীতির মিছিল করে , পথসভা করে । মিছিলে সামিল হয় নর - নারী , ছাত্র - ছাত্রী , যুবকরাও শান্তিপ্রিয় মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়েছে নতুন করে এলাকা সাজানোর ইচ্ছায় । আগামী প্রজন্মকে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দেওয়ার জন্য , অনেকের মুখেই প্রশ্ন করতে শোনা যায় অত কিসের শোষণ , বঞ্চনা , যার কারণে অস্ত্র হাতে নিতে হবে ? নৈতিক ও বাস্তবিক দাবী আদায়ের জন্য তো গণতান্ত্রিক পথে অনেক উপায় আছে । উগ্রবাদীদের অত্যাচারে বহু ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত , হানাহানি - খুনোখুনিতে বিদ্বেষ রক্তস্নাত হয়েছিল টাকারজলা পবিত্র " বুড়ীমার" জল ও মাটি । ওদের অবাধ ধ্বংসের অবাধ পদধ্বনিতে পাহাড় ছিল অস্থির , পাহাড়ী সৌন্দর্য , ঐতিহ্য ছিল প্রশ্নবোধক চিহ্নের মুখে । উগ্রপন্থার মতো জগদ্দল পাথর সৌন্দর্যময়ী পাহাড়কে অস্থির করে তুলেছিল । বর্ব্বরদের বর্ব্বরতায় টাকারজলায় প্রচন্ড ক্ষতি হয়েছিল কিন্তু ধ্বংস হয় নি । উগ্ররা মুখে উপজাতি সমাজের উন্নতির কথা বলে দরদ দেখায় , মুলতঃ দেখা যায় উপজাতিরাই উগ্রবাদীদের ধারা সবচেয়ে বেশী নিষ্পেসিত , নিপীড়িত ও শোষিত । সমাজকে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে বেশীদিন বোকা বানিয়ে রাখা সম্ভব নয় । যার ফলশ্রুতি ২০০৩ সালে টাকার জলার মানুষ টাকারজলার আকাশে রক্তিম সূর্যোদয়ের আশা বুনে । ২রা ডিসেম্বর ২০০৩ ইং অগণিত নরনারী , ছাত্র - ছাত্রী , যুবক - যুবতী টাকারজলার মাটি থেকে বর্ব্বরদের উচ্ছেদ করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পথচলা শুরু করে । হাতের ব্যানারে লিখা " সন্ত্রাসরা তংকাচাং নাইঅ" " টাকারজলা সন্ত্রাসবাদী অমনি বাগৌ কুমাইথাংদি "। টাকারজলার মানুষ ঘরে - বাইরে ওদের প্রতিরোধ শুরু করে ।

পরাধীনতার শৃঙ্খলে চলা যায় না , এযেন টাকারজলাবাসীর প্রতিজ্ঞা , চাপা যন্ত্রণা চোখে মুখে স্পষ্ট - এভাবে চলতে দেবো না । কঠোর কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ টাকারজলাবাসীর জয় , কঠিন পরিস্থিতি উত্তরণ করে নতুনভাবে সমাজ সাজানোর উদ্যোগে টাকারজলা এলাকার মানুষ এগিয়ে চলেছে । শুধুই সময়ের প্রতীক্ষা -- এ জয় মানবতার জয় ।

প্রতিবাদী বাঙালী

বাঙালীরা অভিমানী , ভাবপ্রবন তবে নিঃসন্দেহে প্রতিবাদী হয়ত বা পৃথিবীর আর কোনও জাতিসত্বার মতো নয় । মনে হয় বাঙালীদের সংস্কৃতি , চালচলন সবকিছুই যেন একটু আলাদা । যদি ও এই বিষয়ে অনেক আলোচনা , পর্যালোচনা হয়েছে গবেষনা হয়েছে তাই ঐতিহাসিক ঘটনা ও ইতিহাসের তথ্য ঘেঁটে দেখা দরকার সত্যিই কি বাঙালীরা প্রতিবাদী , বাঙালীদের আত্মপ্রকাশ , পতন - অভ্যুদয় , কর্ম চিন্তা অজস্র আন্দোলন সংঘাত যে পথ কখনোও মসৃন ছিল না । ইতিহাস তার যুগ যুগান্তরের স্বাক্ষী । প্রথম সামাজিক বিপ্লব সম্ভবত শুরু হয় শ্রী চৈতন্য ও নিত্যানন্দ যখন দলিত জনসাধারণের বিদ্রোহকে সামাজিক বিপ্লবে রূপ দিয়েছিলেন তারপর শুরু করা যাক শিক্ষার উৎকৃষ্ট সেই রামকৃষ্ণ মিশন দিয়ে । উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়ের মাধ্যমে যে ধর্ম্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামানুসারেই হয়েছিল । পরম পুরুষ দক্ষিনেশ্বরের কালীবাড়ির একজন পূজারী ছিলেন মাত্র । শিক্ষা বলতে প্রচলিত অর্থে যা বুঝায় তা কিন্তু উনার ছিল না , তবু ও তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী পুরুষ । তিনি বলতেন যে , সকল ধর্মে একই ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে । হিন্দু , মুসলমান , বৌদ্ধ , খ্রীষ্টান , সকল ধর্মের লক্ষ্য একেই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে ' রামকৃষ্ণ মিশন " এর সূত্রপাত হয় । যদি ও পরে তা বেলুড়ে স্থানান্তরিত হয় । নরেন্দ্রনাথ দত্ত সন্ন্যাস জীবনে যিনি " স্বামী বিবেকানন্দ " নামে পরিচিত তিনিই ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একজন প্রধান শিষ্য । বিবেকানন্দ গতানুগতিকতার বিরোধী হলে ও ভারতের শ্বাশত আত্মাকে কোনো সময়েই অস্বীকার করেন নাই । নিষ্ঠা ও সংস্কৃতির সাহায্যে নবীন জীবন গড়িয়ে তোলাই ছিল তার উদ্দেশ্য । তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের দাড়াতে হলি শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে । সেই শক্তি হলো দৈহিক ও আধ্যাতিক যা পরবর্ত্তী কালে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীমতি

অ্যানি বেশান্তও অকপটে স্বীকার করে গেছেন । তারপরে আমরা আসি রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন সম্পর্কে বলেছিলেন বহুযুগব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চল তাকেই পবিত্রতা বলে স্থির করে নিস্তব্দ ছিল এমন সময়েই রামমোহনের অর্বিভাব। অশিক্ষা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার গ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে যখন আমরা নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছিলাম তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্তির নির্মল বাতাস সঞ্চারিত করিয়াছিলেন রামমোহন , রামমোহন ভারতের সর্বপ্রথম আধুনিক মানুষ যিনি শত শত বৎসরের বিকৃত সমাজ ব্যবস্থা ও সংকীর্নতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং আমাদের নতুন দিগন্তের সূচনা করেন । কুসংস্কার ও জাতিভেদ রোধে তিনিই যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানশ্রিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেন । ইহা অনস্বীকার্য যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়াই আমাদের জড়তা মুক্তি ঘটিয়াছিল । শুধু তাই নয় জাতিভেদ প্রথা দুরীকরণ এবং বিদেশীরা কিভাবে আমাদের সম্পদও কৃষকদের শোষন করিতেছে তা প্রথম রামমোহনের রচনায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয় । ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে রাজ রামমোহন রায় বাংলা সাহিত্যে গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনা করিয়া বাংলা ভাষার মর্যাদাকে যথেষ্ঠ পরিমাণে বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচিত " বেতাল পঞ্চবিংশতি " বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বলা চলে । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার আবির্ভূত যে সকল সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারিচাঁদ মিত্র , কালীপ্রসন্ন সিংহ , অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচয়িতা । বঙ্কিমচন্দ্রে পরবর্ত্তী কালে তারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় , রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমখ উপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন । কাব্য রচনার ক্ষেত্রে যারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত , মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, নবীন চন্দ্র সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন , তাছাড়া বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে দীনবন্ধু মিত্রের রচিত " নীলদর্পন" নাট্য সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ বলিয়া আজো বিবেচিত হইয়া থাকে । শুধু তাই নয় দেশীয় ভাষার মধ্যে বাংলায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় । ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম " বেঙ্গল গেজেট" নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় । দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে রামমোহন রায়ের অবদান অনস্বীকার্য । তিনি প্রথম " সম্মাদ কৌমুদী" নামে একটি বাংলা পত্রিকার সম্পাদন করেন । ১৮২১ খ্রীঃ এবং প্রবন্ধ আকারে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পত্রিকায় লিখে সমালোচনা ও প্রতিবাদ করতে শুরু করেন । ইহা ছাড়াও রামমোহন ইংরেজী , হিন্দী এবং পার্শী ভাষায় তিনখানা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন । ১৮২২ খ্রীঃ রামমোহন রায় , দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কয়েকজন মিলে " বঙ্গদুত " নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন । সংবাদ পত্রের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে "জাভাস

" উক্তি করেছিলেন - " লাইসেন্স বিহীন সংবাদ পত্র গুলি যদি যথেচ্ছভাবে প্রচার করিতে দেওয়া হয় তা হইলে ইংরেজ সরকারের ভিত্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে " রামমোহন রায় , হিন্দু কলেজ বা ইয়ং বেঙ্গলের নেতৃত্বে আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থায়ী সভা সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন , ১৮৩৭ খ্রীঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর , কালীনাথ রায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব " বঙ্গভাষা প্রকাশিক সভা" নামে একটি সমিতি গঠন করেন । ইহাই বাংলা তথা সমগ্র ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংঘ হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে ।

১৮৪৩ খ্রীঃ ভারত হিতৈষী টমসন সাহেব দ্বারকানাথ ঠাকুরের অনুরোধে কলিকাতায় আসেন । তাহার সহযোগিতায় কতিপয় বাঙালী চিন্তাশীল ব্যক্তি ইংরেজ , শাসনের দোষ ত্রুটির প্রতিকার এবং ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য " বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি " প্রতিষ্ঠা করেন । এই সমিতি ভারতবাসীর সমস্যা সম্পর্কে ইংলন্ডে ব্যাপক প্রচার শুরু করেছিল । ১৮৭৬ খ্রীঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যাক্তির উৎসাহে কোলকাতায় " ভারত সভা" নামে একটি শক্তিশালী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । যার উদ্দেশ্য চিল দেশে শক্তিশালী জনমত গঠন করা , ভারতে বিভিন্ন জাতিও ধর্ম্মের মানুষকে একেই রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা, হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীভাব বৃদ্ধি করা এবং এই আন্দোলনে সমস্ত জনসাধারণকে সামিল করা । ১৮৪৭ খ্রীঃ প্যারীচরণ সরকার , কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ সভ্রান্ত ব্যক্তির উদ্যোগে কলিকাতার সন্নিকটে বারাসতেই প্রথম প্রাকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৮৭৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬৪০ , বালকদের জন্য প্রাথমিক স্কুল ২৬,৪৭৩ টি , পাশ্চাত্য শিক্ষা - দীক্ষা , সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের সংঘাত বাঙালীর মনে যে নবজাগরণের সূচনা হয় তাহা সমসাময়িক সমাজ ধর্ম ও রাজনীতিকে বিশেষভাব প্রভাবিত করিয়াছিল । রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালীর জীবনে চৈতন্যের বিস্ফোরন ঘটিয়াছিল তাহা তদানীন্তন সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল । ইংরেজ শাসনের প্রতি আস্থা হারাইয়া সমাজ নেতা , দেশ নেতা , কবি সাহিত্যিক নাট্যকার সকলেই একযোগে শেতাঙ্গদের বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্র , রঙ্গলাল , তারকনাথ , নবীন চন্দ্র অক্ষয়কুমার কামিনী রায় , দীনবন্ধু প্রমুখের দেশ বাৎসল্য ও বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিবাদ , সর্বত্র এক নতুন স্পন্দনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বঙ্গ ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাতেই সর্বপ্রথম স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। পরাধীন ভারতের দুর্দশায় কবি র্মমাহত হইয়া ছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার স্বদেশ ভাবনা মূলক কবি । তার মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার মর্ম বাণী জাগাইয়া তুলিয়াছিল এবং ভারত সন্তানদিগকে স্বদেশের সেবায় আত্ম নিয়োগ করিবার আহবান জানাইয়া ছিলেন । অল্প কথায় , ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গভীর দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া

এবং দেশ ও জাতির উন্নত কামনা করিয়াই তাহার লেখনী পরিচালনা করিয়াছিল । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরবর্তী কালে যে সকল কবি ও সাহিত্যিক তাহাদের রচনার মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে স্বাদেশিকতা ও দেশ বাৎসল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , দীনবন্ধু মিত্র , রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় , মনমোহন বসূ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । বঙ্কিম চন্দ্রের মনে দেশপ্রেমের বীজ সুপ্ত হইয়াছিল ঈশ্বর গুপ্তের দেশ প্রেমমুলক রচনা হইতে বঙ্কিম প্রতিভার প্রধান উৎস ছিলেন দেশাত্ম বোধী স্বাধীনতা , অপহরণ কারী ইংরেজদের নিকট হইতে মাতৃভূমিতে স্বাধীন করিতে হইলে বিরুপ অনুশীলনের প্রয়োজন । বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই " আনন্দ মঠ" উপন্যাসে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন । বিখ্যাত " বন্দেমাতরম" সঙ্গীত এই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত । ভারতবাসীর অন্তরে দেশ মাতৃমুক্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে " আনন্দমঠে " দেশদ্ধার ব্রতী 'সন্তান' ভবানন্দের মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল । আমরা অন্য মা মানি না - জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গদপি গরীয়সী । আমরা বলি , "জন্ম ভূমিই জননী ।" আনন্দমঠ উপন্যাসে রচনায় বঙ্কিম চন্দ্র কতখানি স্বদেশ প্রীতির্ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন উহা তাহার একটি মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যায় । কবি হেমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে এক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া ছিলেন যদি সাহিত্যের দ্বারা এদেশের মঙ্গল সাধনা করা যায় না মনে করিতাম , তাহা হইলে আমি আনন্দমঠ লিখিতাম না । আমার বিশ্বাস , আমার আনন্দমঠে দেশের একদিন উপকার হইবে । বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভবিষ্যবানী মিথ্যা হয় নাই । আনন্দমঠ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে বিপুল অ নুপ্রেরণা জাগাইয়া ছিল । আনন্দমঠ ব্যতীত " দেবী চৌধুরাণী " সীতারাম প্রভৃতি গ্রন্থেও বঙ্কিমচন্দ্রে দেশ ভক্তির আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছিল ।

পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করিয়া রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশ্যেই লেখনী ধারন করিয়াছিলেন সমসাময়িক বাংলায় এমন কোনো পাঠক ছিলেন না যিনি তাহার কবিতার দ্বারা অনুপ্রানিত হন নাই । ঐতিহাসিক আখ্যান অবলম্বনে তাহার রচিত চারটি কাব্য পদ্মিনি উপাখ্যান , কর্মদেবী , সুরসুন্দরী এবং কাঞ্চিকাবেরী স্বদেশনুরাগ ও জাতীয়তাবাদ আদশে পরি পূর্ণ । রঙ্গলালের দেশাত্মবোধ সম্পর্কিত একটি গান ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিয়ে চায় , হে কে বাঁচিয়ে চায় ? তাছাড়া তিনি " উৎকল দর্পন " সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন ।

পরাধীনতা তথা দাসত্বের বিরুদ্ধে মাইকেল মধুসুদন দত্ত যে বিদ্রোহের মনোভাব পোষন করিতেন তাহাই " মেঘনাধ বধ" কাব্যের রচনায় চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল । মেঘনাধবধ কাব্যের রাবন ও মেঘনাধ ছিল যথাক্রমে শক্তি ও নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্রতীক । রাবনের মুখে দেশের আত্মত্যাগের যে আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে তাহা পরাধীন ভারতবাসীর দীক্ষামন্ত্র ছিল জন্মভূমি রক্ষা যে

ডরে মরিতে , ভীরু সে মূঢ় শতধিকভাবে ।" অল্প বয়স হইতেই হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন । পরিনত বয়সে তিনি স্বদেহ প্রীতিমুলক কবিতা রচনার মাধ্যমে দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন ।হেমচন্দ্রের " ভারত সঙ্গীত " ও ভারত বিলাপ ' কবিতাদ্বয় এবং "বীরবাহু কাব্যে " দেশ প্রেমের উচ্ছাস পূর্ণ উত্তেজনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । " ইলবার্ট বিল" উপলক্ষে আনেদলনের সময়ে তাহার রচিত বঙ্গ কবিতা । " নেভার নেভার" খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল ।

সাহিত্য সাধনার দ্বারা যে সকল কবি সাহিত্যিক দেশবাসীর মনে স্বদেশে প্রেমের উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে নবীন চন্দ্র সেন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন । সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং এই অত্যাচার হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করাই ছিল নবীন চন্দ্রের সাহিত্য সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য । পরাধীনতার জ্বালায় জর্জরিত , ছিন্ন বিচ্ছন্ন ভারতকে ঐক্যের মহাবন্ধন বাধিবার আশায় তিনি তাহার " কুরুক্ষেত্র " মহাকাব্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতিত " পলাশীর যুদ্ধ 'রঙ্গমতী প্রভৃতি জাতীয়তামূলক কাব্য ছিল নবীন চন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি ।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অন্য দুইজন ব্যক্তি যাহার স্বদেশ প্রীতিমূলক রচনার মাধ্যমে প্রাতঃস্মরনীয় হইয়া আছেন তাহাদের নাম রমেশচন্দ্র দত্ত ও ঈশান চন্দ্র বন্দোপাধ্যয় । বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় রমেশ চন্দ্র দত্ত " রাজপুত জীবন প্রভাত " ও " রাজপুত জীবন সন্ধ্যা " নামক যে দুইটি স্বদেশ প্রতি মূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলা , সাহিত্যে উপহার দিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । উপরিউক্ত দুইটি উপন্যাসের প্রথমটি একটি নিদ্রিত জাতিকে জাগ্রত করিবার এবং দ্বিতীয়টি জাগ্রত জাতিকে জাগাইয়া রাখবার গানে মুখর । করি হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশান চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও অগ্রজের ন্যায় জাতিবৈরী জনিত স্বদেশ প্রেমে উদবুদ্ধ হইয়া " কি লিখিব আজ , স্বভাবে কি অর্থ নাই " প্রভৃতি স্বদেশ প্রতিমূলক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । মধুসুধনের পরবর্তী কালে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য । " নীলদর্পন " নাটকে দিনবন্ধুর নাট্য প্রতিভার স্ফুরন না ঘটিলেও ইহাতে উৎপীড়িত অসহায় এক শ্রেণীর বাঙালীর প্রতি যে মর্মবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা এই নাটকটিকে অমরত্ব দান করিয়াছে । তাছাড়া বাংলাদেশে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি সর্বপ্রথম সর্বদলীয় ঘৃনা বিদ্বেষ সঞ্চারিত হইয়াছিল এই নাটকাভিনয় । স্বাদেশিকগণ আন্দোলনের ভিত্তি ভুমিও ছিল এই নাটক ।উইনশ শেষভাগে দীনবন্ধু মিত্র ব্যতীত অপর যে সকল ব্যক্তি নাট্যকার হিসাবে প্রসি দ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে জ্যোতিন্দ্র নাথ ঠাকুর , গিরিশচন্দ্র ঘোষ , রাজকৃষ্ণ রায় , অমৃত লাল বসু ক্ষীরোদ প্রসাদ , বিদ্যা বিনোদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । " চৈত্র " বা হিন্দুমেলার অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাত ঠাকুরের রচিত " গাও ভারতের জয় " - যে জাতীয় সঙ্গীতটি গাওয়া হত্রে ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইতিহাসে তাহার স্থান সুনির্দিষ্ট । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৬৭ সালে

হিন্দুমেলার সূচনা হয় । হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাদের মধ্যে গনেন্দ্র নাথ ঠাকুর , নবগোপাল মিত্র , সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । বাংলার কবি সাহিত্যিক ও নাট্যকার গন ভারত মাতার অশ্রুজল নিবারনে দেশবাসীকে যখন আহ্বান জানাইতে ছিলেন সেই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় (১৮৮৫ খ্রীঃ) । কংগ্রেসের কর্মকর্তাগণ কবি সাহিত্যিকদের তেমন ধার না ধারিলেও তাহারা কংগ্রেসকে সহানুভূতির দৃষ্টিতেই দেখিতেন । সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর যে জাতীয় মিলন সঙ্গীতের সূচনা করিয়াছিলেন পরবর্তী কালে উহার প্রসার ঘটিয়াছিল । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাদেশিকতার আবহাওয়াতেই বর্ধিত হইয়াছিলেন । হিন্দু মেলা অনুষ্ঠানে বালক রবীন্দ্রনাথ একটি জোরালো স্বদেশী কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন । পরবর্তী কালে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সহিত রবীন্দ্রনাথের মনের মিল ঘটিয়াছিল , কারণ উহার মাধ্যমে তিনি সমগ্র জাতির উত্থানের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন । ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রদত্ত " স্বদেশী সমাজ" বক্তৃতা সমসাময়িক সমাজ ও রাজনৈতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বঙ্গ সাহিত্যে যে স্বাদেশিকতার বন্যা লক্ষ্য করা যায় , তা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ , রজনী কান্ত সেন , কালী প্রসন্ন , অতুল সেন , সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখের আবেগময়ী গান ও কবিতা ব্যতীত এমন সাহিত্যিক বোধ হয় খুব কমই ছিলেন যাহারা দেশ ও স্বাজাতির জন্য অন্তত দুই ছত্র লিখেন নাই । স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিরচিত " আমার সোনার বাংলা" আমি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি .. সঙ্গীত সমুহ বাংলার আপামর মানুষের মনে উম্মাদনার সৃষ্টি করিত ।

স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অবদান নানা দিক দিয়া অসামান্য । সভা সমিতিতে বক্তৃতা , সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ , কবিতা , গল্প প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জাতীয় জীবনে চিরস্মরনীয় হইয়া থাকিবে । তাহার ছাপ স্বদেশী যুগে তাহার রচিত দেশপ্রেম মুলক সঙ্গীত তাহার গভীর দেশ দেশ প্রেম এবং জাতীয় আন্দোলনে আত্মোৎসর্গের ই অভিব্যক্তি । সেই সময় বাংলা দেশের সর্বত্র জনসভা হাটে মাঠে , ঘাটে রবীন্দ্রনাথের ঐ সকল সংগীত গাওয়া হইত । ইংরেজী সরকারের নৃশংস অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও রবীন্দ্রনাথের লেখনী মুখরিত ছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন । বড় লাটের নিকট লিখিত এক পত্রে তিনি জালিয়ানওয়াবাগ হত্যাকান্ড ও পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত " স্যার " উপাধি ত্যাগ করেন । এই পত্রে কবির লেখনী হইতে যে তেজোময়ী প্রতিবাদ নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহার তুলনা নাই ।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঞ্চিতের মর্মবেদনা এবং

নারী হৃদয়ের জটিল সমস্যার আলেখ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন । তাহার রচিত 'পথের দাবীতে ' বিদেশী আপশাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল তাহা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল । ইংরেজ সরকার রাজদ্রোহমুলক প্রচারের অজুহাতে তাহাকে নিষিদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া ঘোষনা করিয়াছিল।

কলিকাতার জোরাসাকোর ঠাকুর বাড়ী দ্বারকনাথের প্রপৌত্র অবনীন্দ্র নাথের শিল্পাদর্শ যে ভারতীয় শিল্পে নবজাগরনের সৃষ্টি করিয়াছিল । একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ।

হ্যাভেলের সহযোগিতায় অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় প্রাচীন শিল্প সর্ম্পকে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন । হ্যাভেল অবনীন্দ্র নাথের শিল্প প্রতিভা উপলব্দি করিয়া তাহাকে কলিকাতা আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন । ইতিপূর্বে আর কোনো ভারতীয়ই এই পদ লাভ করে নাই । অবনীন্দ্রনাথের শিল্পবৈশিষ্ট হইল , ভারতীয় প্রাচীন শিল্পসত্তার যুগোপনযোগী প্রকাশ । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পে যে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা - নন্দলাল বসু , অসিতকুমার হালদার , যমিনী রায় মহীশূরের ভেঙ্কটাপ্পা প্রমুখের শিল্প সৃষ্টির দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়াছিল এবং অবনীন্দ্রনাথের শিল্প পদ্ধতি এক নতুন শিল্প শৈলীতে উন্নীত হইয়াছিল ।

নন্দলাল বসু ছিলেন অবনীন্দ্র নাথের প্রধান শিল্প শিষ্য । কলিকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র হিসাবে নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আসিয়া ছিলেন । ছাত্রাবস্থায় তিনি " বসুমতী " ছবি আকিয়া প্রাচ্য কলাম মন্ডলীর নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন । নন্দলালের অংঙ্কিত অসংখ্য স্বেচ ও চিত্র পাটগুলি এক অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি । প্রকরন পদ্ধতি ও রূপ রসের দিক দিয়া নন্দলালের শিল্প সৃষ্টি অভিনবত্বে অবনীন্দ্রনাথ অপেক্ষা কোনো অংশ কম ছিল না । এই প্রসঙ্গে কানাই সামন্তের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল পরস্পরের পরিপূরক । অতিশয় সংক্ষেপে বলা যায় , পাশ্চাত্য চিত্ররীতির প্রতিষ্ঠাভূমি প্রাচ্যরূপ কলার সন্ধানে যাত্রা করেন অবনীন্দ্রনাথ , নন্দলাল ,যাত্রা করেন ভারতীয় ধ্রুবচিত্র রীতি তথা মুক্তি কথার সহজ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে হইতে ।

নন্দনাল ব্যতীত অবনীন্দ্রনাথের অন্যান্য যে সকল শিষ্য শিল্পে বাংলায় নব যুগকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ কর , সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত , শৈলেন্দ্রনাথ দে , মুকুল দে প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । সুরেন্দ্রনাথ কর ওয়াল পেইন্টিং এবং মিনিচেয়চার ছবির জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । অবনীন্দ্রনাথের জ্যষ্টভ্রাতা গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর । (১৮৬৭ -১৯৩৮ খ্রীঃ) ছিলেন উপরি উক্ত শিল্পী অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির । তিনি ছিলেন বাস্তববাদী শিল্পী । সমসাময়িক রাজনীতি , সমাজ ও অর্থনীতির উপর তাহার অঙ্কিত ব্যাঙ্গাচিত্র গুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল ।

ইংরেজ শাসনাধীক ভারত বাসীর দুর্দশা ও হতাশা যখন তাহাদিগকে পাশ্চত্য সভ্যতার প্রতি

বিরুপ করিয়া তুলিয়াছে সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীর " নব হিন্দু বাদ" এর প্রচার দেশবাসীকে ভারতের সনাতন দর্ম ও প্রাচীন সভ্যতার প্রতি আগ্রহশীল করিয়া তুলিয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্ব প্রথম যুক্তির আলোকে প্রাচীন হিন্দু কলুষতা দূর করিয়া উহাকে স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সঙ্গে হইয়া ছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের " বন্দে মাতরম" সঙ্গীতে হিন্দুদের আরাধ্যা দেবী দুর্গার সহিত দেশ মাতৃকাকে এক করিয়া দেখিবার ফলে দেশবাসীর দেশাত্মবোধ বহুল পরিমানে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী কালে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব ও তাহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম সাধনা ধর্ম ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করিতে যে রুপ সাহায্য করিয়াছিল অপর কোনো ধমান্দোলনই তাহা করিতে পারে নাই । শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি দেশবাসী , বিশেষত ইংরেজী শিক্ষায় ব্যাক্তিদের বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন স্বামী বিবেকান্দ । হিন্দু ধর্মের মূল সত্য ব্যাখ্যা করিয়া তিনি উহাকে বিশ্বের দরবারে স্বমহিমায় পূনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । তাহার ধর্ম সাধানার উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশ গৌরববোধ হিন্দু সম্প্রদায়ের পুনরুত্থান এবং ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন । বিবেকানন্দ কেবল অতীত ভারতের গৌরবোজ্জল যুগেরই প্রচারক ছিলেন না তিনি ছিলেন হিন্দু ভারতের জাগরনের ও অগ্রদূত তিনি দেশবাসীকে দুঃখ ও দারিদ্র হইতে মুক্ত করিয়া শিক্ষাদীক্ষা শক্তি সাহসে এক বলিষ্ঠ জাতিতে পরিনত করিতে চাহিয়াছিলেন । বিবেকানন্দের তেজোদীপ্ত বানী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের অন্তরে গভীর প্রেরনার সঞ্চার করিয়াছিল। তাহাদের এক হাতে থাকত গীতা , অন্য হাতে তরবারি এবং অন্তরে থাকিত বিবেকানন্দের আর্দশ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , স্বামী বিবেকানন্দ , দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ মনিষীর আদর্শ ও বানী উ গ্রপন্থী ভাবধারা বিকাশের আদর্শ গত ভিত্তি রচনা করিয়াছিল । স্বাধীনতা অপহরণ কারী বিদেশী শাসকদের অত্যাচারে হইতে ভারতকে মুক্ত করিতে হইলে যে শক্তি ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন একথা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম প্রচার করিয়া ছিলেন । বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের মূল সত্য প্রকাশ করিয়া সমগ্র ভারতের ঐক্যসাধন ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন । এক কথায় মনীষিগণ ভারতবাসীকে কাপুরুষতা ও ভীরুতা পরিত্যাগ করিয়া শক্তি সাধানার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করিবার যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহা দেশবাসীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রামী প্রেরনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল । ভারেতবাসী উপলব্ধি কায়িা ছিল যে একমাত্র তাহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ বর্তমান অপেক্ষা উন্নতর অবস্থায় উপনীত হইতে পারে । ভারতের সন্ত্রাসবাদীগণ দেশ ও বিদেশ উভয় স্থান হইতেই সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন ।

উপনীত হইতে পারে । ভারতের সন্ত্রাসবাদীগণ দেশ ও বিদেশ উভয় স্থান হইতেই সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন ।

বাংলা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , স্বামী বিবেকানন্দ , অরবিন্দ ঘোষ , মহারাষ্ট্রের বলে গঙ্গাঁধর তিলক , পাঞ্জাবের লাল লাজপৎ বায় , মাদ্রাজের চিদম্বরম পিল্লাই প্রমুখের দেশাত্মবোধ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ভারতের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রেরনা সঞ্চার করিয়া ছিল । ইহা ব্যতীত ফরাসী বিপ্লব , আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম , জাপানীদের দেহ হিতৈষনা ও রাশিয়ার জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিহিলস্টদের গুপ্তহত্যার কাহিনী প্রভৃতির ইতিহাস পাঠ ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার জাগরনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল ।

বাংলাদেশ প্রথম বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি গঠনের কৃতিত্ব প্রমথ নাথ মিত্র মহাশয়ের । তিনি ১৯০২ খ্রীঃ কলিকাতায় " অনুশীলন সমিতি" নামে একটি বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে শিক্ষা দান করা হইত । ইহার উদ্দেশ্য ছিল এমন একদল তরুন সৈনিকের সৃষ্টি করা যাহারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে ।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হইলে বাংলার বিপ্লবীরাও অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই সময়ে " অনুশীলন সমিতি " ব্যতীত আরও অনেক গুপ্ত সমিতি বাংলার বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছিল । এই সকল সমিতির মধ্যে ময়মন সিংহের " সাধনা সমিতি" ঢাকার " অনুশীলন সমিতি " ফরিদপুরের " ব্রতী সমিতি" প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য । ইহা ভিন্ন সেই সময়ে বারীন ঘোষের নেতৃত্বে " যুগান্তর " নামে অপর একটি বিপ্লবী দলও গড়িয়া উঠিয়াছিল । " অনুশীলন সমিতি "র প্রমথ নাথ মিত্রের মত পার্থক্যের ফলেই এই নতুন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছিল । ইতিমধ্যে অরবিন্দ ঘোষ বরোদার চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন । তিনি ছিলেন যুগান্তর দলের মন্ত্রণা গুরু এবং তাহার ভ্রাতা বারীন ঘোষ চিলেন ঐ দলের সর্বাধিনায়ক ।

১৯০৭ খ্রীঃ 'যুগান্তর' দলের সদস্যগণ কলিকাতার মানিকতলা অঞ্চলে মুরারি পুকুরের বাগান বাড়ীতে একটি গুপ্ত বিপ্লবী কেন্দ্র গড়িয়া তোলেন এবং তাহারাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার হিংসাত্মক কার্য কলাপে লিপ্ত হন । যুগান্তর দলের নেতৃত্বে কলিকাতা আদালতের বিচারপতি কিংস্ফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্র সমসাময়িক ভারতের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কিংসফোর্ড ছিলেন একজন কুখ্যাত বিচারপতি । তিনি বিচারের নামে বিপ্লবীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইতেন । এই অত্যাচারী বিচার পতিকে হত্যার উদ্দেশ্যে যুগান্তর দল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী - বাংলার দুই নির্ভীক সন্তানকে নিযুক্ত করিয়াছিল । কিন্তু বিপ্লবীরা ভুলবশত কিংস্ফোডের পরিবর্তে দুইজন ইংরেজ মহিলাকে বোমার আঘাতে হত্যা করিয়া বসেন । পুলিশের নিকট ধরা পরিবার পূবেই প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরামকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে । আদালতের বিচারে ক্ষুদিরামের

ফাঁসির হুকুম হয় ।

কিংস্‌ফোর্ডের হত্যা সর্ম্পকে অনুসন্ধান চালাইতে গিয়া ইংরেজ সরকার মুরারি পুকুর বাগান গুপ্তসমিতির সন্ধান পায় । এই সুত্রে যুগান্তর দলের বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয় । তাহাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা, শুরু করেন । মামলার বিচারে বারীন ঘোষ , উল্লাস কর দত্ত প্রভৃতিকে দীপান্তরে প্রেরণ করা হয় এবং অন্যান্য কয়েকজনকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয় ।

কিংসফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্র বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ এই হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু করিয়াছিলেন তাহাই " আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা " নামে খ্যাত। ইহা ছিল বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রথম ষড়যন্ত্র মামলা । দ্বিতীয় , ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জনের দৃষ্টান্ত বাংলার যুবকদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে উৎসাহিত করিয়া ছিল । এই ঘটনার অব্যবহিত পরে বাংলার সর্বত্র বিপ্লবীদের গুপ্তহত্যা এবং রাজনৈতিক লুন্ঠন শাসক গোষ্ঠীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল । এই হত্যাকান্ডের সমর্থনে বাংলার বাহিরে বহু বিপ্লবী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে । মহারাষ্ট্রের তিলক এই রুপ একটি প্রবন্ধ লিখিয়া বাংলার বিপ্লবীকে সমর্থন জানাইলে তাহাকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয় । তৃতীয়ত ঃ- হত্যাকান্ডের স্বল্প কালের মধ্যেই ইংরেজ সরকার বহু সংখ্যক সমিতি ও সংগঠনকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষনা করে। ইহার ফলস্বরুপ প্রধান্য সমিতির অন্তরালে যে গুপ্ত কর্মপন্থা চলিত তাহা বন্ধ হইয়া যায়। তখন বিপ্লবীরা লোক চক্ষুর অন্তরালে আত্মাগোপন করেন ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিব্রত ইংরেজদের উপর চরম আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে ভারতে যে বিপ্লব প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছিল যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী বসু ছিলেন উহার প্রাণস্বরূপ । আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার পরবর্তী কালে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘাযতীন এর নেতৃত্বে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বৈপ্লবিক কার্য্য কলাপ চলিতে থাকে । যতীন্দ্র নাথ বিদেশ হইতে অস্ত্র আমদানি করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন । তিনি এম. এন. রায় (মানবেন্দ্র নাথ রায়) কে ইংরেজদের প্রধান শত্রু জার্মানদের সহিত যোগাযোগের জন্য বাটাভিয়ার প্রেরন করিয়াছিলেন । ১৯১৫ খ্রী ঃ জার্মানী হইতে জাহাজ বোঝায় অস্ত্র - শস্ত্র বলেশ্বরে আসিয়া পৌছিতেছে এই সংবাদ পাইয়া যতীন্দ্রনাথ কয়েক জন বৈপ্লবী সহ বালেশ্বরে উপস্থিত হন । এই খবর ইংরেজ পুলিশ পূর্বাহ্নে জানিতে পারিয়া বহু সিপাহী লইয়া বিপ্লবীদের পশ্চাদ্ধারন করে । বুড়ীবলাম নদীর তীরে ইংরেজ সিপাহীর সহিত বিপ্লবীদের প্রচন্ড লড়াই হয় । শেষ পর্যন্ত এই লড়াইয়ে বিপ্লবী চিত্ত প্রিয় রায় চৌধুরী মারা যান এবং যতীন্দ্রনাথ সহ অন্যরা ধরা পড়ে । এই ভাবে বৈদেশিক সাহায্যে বাংলার বিপ্লবীদের প্রথম প্রয়াস বিফলতার পর্যবসিত হইয়া ছিল ।

১৯১৫ খ্রীঃ " ভারত রক্ষা" আইনের দ্বারা শতশত যুবককে গ্রেপ্তার করা হইলে সাময়িকভাবে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে ভাটা পড়িয়াছিল ।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় যখন বিপ্লবী কার্যকলাপ চলিতেছিল , সেই সময়ে উত্তর ভারতে রাসবিহারী বসু ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করেন । তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে দিল্লী , লাহোর প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল । ১৯১২ খ্রীঃ দিল্লীর বড়লাট হার্ডিঞ্জ কে হত্যার পরিকল্পনা রাসবিহারী বসুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিপ্লব প্রচেষ্টা । দুই বৎসর পরে তিনি সমগ্র উত্তর ভারত ব্যাপী ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিয়া ছিলেন । এই আয়োজনের মুল কেন্দ্র ছিল পাঞ্জাব । বিভিন্ন অঞ্চলের গুপ্ত সমিতির সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া তিনি ১৯১৫ খ্রীঃ ২১ ফ্রেঃ অভ্যুত্থানের দিন ধার্য করিয়াছিলেন । কিন্তু ইংরেজ সরকারের নিকট এই সংবাদ পূর্বেই ফাঁস হইয়া গেলে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছিল । উত্তর ভারতের সর্বত্র পুলিশী তৎপরতার ফলে সেই সময়ে অনেকে বিপ্লবী ধরা পড়িয়া ছিলেন এবং রাসবিহারী বসুকে এক নম্বর আসামী বলিয়া ঘোষনা করাইয়াছিল। রাসবিহারী বসু সেই সময়ে " পি ঠাকুর " ছদ্মনামে জাপানে চলিয়া যান । বাংলায় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও উত্তর ভারতে রাসবিহারী বসুর বিপ্লব প্রচেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হইলে ভারত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল ।

ভারতীয় স্বাধানতা সংগ্রামের ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকা যেমন ছিল উজ্জ্বল তেমটি প্রেরনার উদ্দীপক । মৃত্যু ভয়কে জয় করিয়া এবং আত্ম বিসর্জনের শপথ গ্রহন করিয়া তাহারা যেভাবে দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপাইয়া পরিয়াছিলেন তাহাতে বিদেশী শাসকবর্গ আতঙ্কিত হইয়াছিল । তাহারা বুঝিয়াছিল যে ভারতে তাহাদের শাসনের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে । তথাপি ইহা অনস্বিকার্য যে কঠোর আত্মত্যাগ সত্বেও সন্ত্রাসবাদীদের সাফল্য ছিল খুবই সীমিত ।

ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে , সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও নেতৃত্বের অভাবে সন্ত্রাসবাদীগণ ভারতীয় জন সাধারনের হৃদয়ে তেমন উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারেন নাই । গুপ্ত সমিতি গুলিতে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অধিপত্য ছিল, কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণীকে এই সংগ্রামের অংশীদার করা সম্ভবপর হয় নাই । তাহা দ্বারা সুসংবদ্ধ লক্ষ্যের অভাবে রাশিয়ার নিহিলিষ্ট এবং আয়ার ল্যান্ডের সন্ত্রাসবাদীদের ন্যায় ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ও কতিপয় অত্যাচারী সরকারী কর্মচারী হত্যা এবং সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা কার্জনের নীতির দ্বায়া সৃষ্টি হয়নি । ইংরেজ আমলে প্রধান তিনটি রাজনীতিক বিভাগ ছিল - এরা হল বঙ্গ প্রেসিডেন্সী , বম্বে প্রেসিডেন্সি ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী শাসকদের কাছে বঙ্গ প্রেসিডেন্সী বহু

দিন ধরেই দুরূহ সমস্যা উপস্থিত করেছিলেন । প্রদেশের আয়তন ও জনসংখ্যার পরিমাণ সুষ্ঠ শাসন ব্যাবস্থার পরিপন্থী ছিল । এই বিভাজনের পদ্ধতি কার্যত আরম্ভ হয়েছিল ১৮৭৪ সালে , যখন অসামকে বিভক্ত করে চীফ কমিশনারের কতৃত্বাধীন করা হয় । এতে অবশ্য সমস্যা মেটেনি । ১৮৯৬ সালে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার করিকল্পনা রচিত হয়েছিল । কিন্তু এটা ব্যয়বহুল হওয়ার দরুন পরিত্যক্ত হয়েছিল । শুধু এর পরিনাম স্বরূপ লুসাই পার্বত্য অঞ্চল আসামে যুক্ত হয়েছিল । ১৯০১ সালের আদম সুমারীতে যখন দেখা গেল বাংলার জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ তখন আর একটি পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল উড়িষ্যাকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে একত্রিত করা ।

এই অবস্থায় কার্জনের মাথায় এই চিন্তার উদয় হল যে " বাংলাদেশ " একজনের পক্ষে নিঃসন্দেহে অতি বিশাল উপরন্তু কার্জনের মনে হয়েছিল - বাংলা , আসাম এবং মধ্যপ্রদেশের চতুঃসীমা - সেকেলে , অযৌক্তিক ও অদক্ষতার জন্মদাতা ।

স্যার এন্ডোফ্রেজার কর্তৃক একটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল যেটা ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে সর্ব সাধারনের কাছে বিদিত করা হয়েছিল । চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা , ঢাকা জিলা , ময়মনসিংহ জিলা আসামের ভেতর যাবে । আর ছোটনাগপুর যাবে মধ্যপ্রদেশে। এর পরিবর্তে বাংলা মধ্যপ্রদেশ থেকে পাবে সম্বলপুর আর মাদ্রাজ থেকে পাবে গঞ্জাম । এই পরিকল্পনার পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি গুলি দেখানো হয়েছিল।

১) বাংলার অধিকতর নিজস্ব শাসনের ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল । পুর্নগঠনের পরে বাংলার লোক সংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে কমে ৬কোটি ৭ লক্ষ দাঁড়াত ।

২) বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলা গুলির কলকাতার কর্তত্ব থেকে মুক্ত হত ।

৩) পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলির মুসলমান অধিক সুখ সুবিধা পেত ।

৪) আসামের চা বাইরে আসার পথ পেত ।

৫) সমস্ত উড়িষ্যা ভাষীরা একটি শাসন ব্যবস্থার অধীন হত । শেষ পর্যন্ত কার্জনের দ্বারা পরিকল্পনা অবলুষ্ঠিত তাতে ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে ১৫ টি জিলা নিয়ে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ তৈরী করা । এবং রাজধানী ছিল ঢাকা । এর জন সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১ লক্ষ তাতে মুসলমানদেরই প্রাধান্য।

এই শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত যুক্তিগুলির পশ্চাতে এক ক্ষতি সাধক রাজনৈতিক মতলব ছিল যা প্রতিফলিত হয়েছিল লর্ড কাজনের " স্বদেশ " কর্তৃক্ষপের সাথে পত্র আদান প্রদানের মধ্যে । " ঐক্যবদ্ধ বাংলা একটি শক্তি " - এটি তার দ্বারাই লিখিত হয়েছিল এবং দেশভঙ্গের মধ্যে দিয়ে সেই শক্তিকে খর্ব করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তার মতলব ছিল ব্রিটিশ শাসনের একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ

দলকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দুর্বল করে দেওয়া । বাঙালীরা নিজেদের একটি জাতি বলে ভেবে নিয়েছিল , এই ধরনের চিন্তা ছিল ব্রিটিশ শাসনের সুপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিপদজনক সুতরাং এই চিন্তাকে ধ্বংস করাই ছিল কার্জনের লক্ষ্য । কংগ্রেস রাজনীতির কেন্দ্র স্থল ছিল কলকাতা এই শহরটির প্রাধান্য ও বৈশিষ্ঠ হরন ছিল লক্ষ ।

অবশ্য লর্ড কার্জনের গোপন মতলবগুলি সে সময়ে সাধারন লোকে কিছুই জানত না । শুধু এটা বুঝতে পেরেছিল যে বাঙালীর সংহতি ভেঙ্গে দেওয়াটাই কার্জনের আসল অভিপ্রায় । এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রবল প্রতিবাদ এসেছিল । এমন কি সেক্রেটারি অফ স্টেটের দ্বারাও একথা স্বীকৃত হয়েছিল যে , একটি সমশ্রেণী ভুক্ত সম্পাদায়কে খন্ডখন্ড করে দিলে তাদের প্রতিবাদ করাটাই স্বাভাবিক । সমালোচকদের বক্তব্য ছিল মাত্র কোটি দশ লক্ষ লোককে সরিয়ে নিলে শাসন ব্যবস্থার চাপ মূলতঃ হালকা হবে না । উপরন্তু , ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাবে । এই পরিকল্পনার পিছনে যে সাম্প্রদায়িক মতলব ছিল এটা স্পিয়ারের দ্বারাও স্বীকৃত হয়েছে । স্পিয়ারের বক্তব্য ছিল - " হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চল , মুসলিক অধ্যুসিত পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সুন্দর ভারসাম্য ছিল , উভয় সম্প্রদায়ের বিশেস প্রয়োজনগুলি পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করা যেত ।"

এই সাম্প্রদায়িকতার কীর্তিই কার্জনকে শক্তি জুগিয়ে ছিল ১৯০৪ সালে তার পূর্ববঙ্গ পরিদর্শন কালে । কার্জনের পরিকল্পনা একটি রাজনৈতিক রূপ গ্রহন করেছিল । একটি মুসলিম প্রদেশ গঠনই ছিল তার উদ্দেশ্য যা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রাননাশক হবে । ১৯০৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে নবাব আতিকুল্লা খাঁতার বক্তৃতার এই সংবাদ টিকে দৃঢ়তার সঙ্গে সত্য বলে ঘোষনা করেন ।

পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা সকলেই এই পরিকল্পনার অংশীদার ছিলেন না । আব্দুল রসুল ও লিয়াকৎ হোসেন বদরুদ্দিন আয়েবজি ও শিবলী মহান ভাবধারাকে ধরে রেখেছিল । কিন্তু ঢাকার নবাব সালিম উল্লা খাঁ কার্জ্জনের কাছ থেকে এক লক্ষ পাউন্ড ধার পাওয়া প্রতিশ্রুতি পেয়ে চক্রান্তের কাজে অংশ দিতে রাজী হয়েছিল । স্যার হেনরী কটনের ভাষায় বলতে গেলে, " লর্ড কার্জনের নীতির সার বস্তু ছিল বর্ধিষ্ণু শক্তিগুলিকে দুর্বল করে দেওয়া আর দেশপ্রেমের চেতনা থেকে উদ্ভুত রাজনৈতিক মনোভাবকে ধ্বংস করে দেওয়া । স্পিয়ারের ভাষায় - ন্যায় সঙ্গত প্রতিবাদ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর পরিচালনায় জনগণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের রূপ নিয়ে ছিল ।

একজন বিচক্ষন শাসকের কর্তব্য এই ধরনের বিক্ষোভকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা কিন্তু জনগণের এই বিরোধিতা, কার্জনকেকরে তুলল আরও অদম্য । এই বিক্ষোভ কার্জনের কাছে স্বার্থপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক এই আখ্যা পেল , আর বলা হল এটা বাগাড়ম্বর ও অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতা

ছাড়া আর কিছুই নয় ।

উকিল সভার (Bar) বিরোধীতা কার্জনের কাছে মনে হল ঢাকায় পৃথক হাইকোর্ট গঠনের ফলে কলিকাতার হাইকোর্ট উকিল সভার কায়েমী স্বার্থের যে ক্ষতি হবে তার ভয়ে । কিন্তু যদি তাই হবে , তা হলে পূর্ববঙ্গের খ্যাত নামা উকিলেরা এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করতেন না । এদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার আনন্দ চন্দ্র রায় , শিলচরের কামিনী কুমার চন্দ্র ও বরিশালের দীনবন্ধু সেন ।

এর পরে আসে ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলির কথা । সংবাদ পত্রগুলি যে বিরোধিতা জানিয়াছিল সেক্ষা কার্জনের মতে গ্রাহক হারানোর ভয়ে । এটা সত্য হলে এক মাত্র " অমৃত বাজার পত্রিকার ক্ষেত্রেই ইহা সত্য হতে পারত , কিন্তু 'সঞ্জীবনী ' 'সন্ধ্যা' ' নিউ ইন্ডিয়া" ও ইন্ডিয়ান মিররে'র মতো অন্যান্য কাগজের ক্ষেত্রে নয় । আর 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া , স্টেটস্‌ম্যান" ও ইংলিশম্যান সম্বন্ধে কি বলা চলতে পারে ? কার্জনের মতে জমিদারেরা বিরোধিতা করেছিলন খাজনা হারানোর ভয়ে । এটা সত্য যে মৈমন সিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর দিনাজ পুরের রাজা এবং ভাগ্যকুলের জানকী নাথ রায় প্রবল আপত্তি জানিয়ে ছিলেন । কিন্তু তাদের আপত্তি যতটা ছিল খাজনা হারানোর জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী তারা রেভিনিউ বোর্ডের এক্তিয়ারের বাইরে হয়ে যাবেন বলে ।

সর্বশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে - কার্জনের মতে , মধ্যবিত্ত হিন্দুরা বিরোধীতা করেছিলেন কর্ম সংস্থানের সুযোগ হারানোর ভয়ে ।

প্রকৃত পক্ষে এটা ছিল নবজাতি আত্মসচেতন বাঙালী জাতীয়তাবাদের অনুভতি । উনবিংশ শতাব্দীর আলোক প্রাপ্তি থেকেই এই জাতিয়তাবাদ জন্ম নিয়েছিল আর আত্ম প্রকাশ করেছিল এই বিরোধিতার মাধ্যমে । সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় এর মতো নেতারা শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য রাজ্যাংশের পূর্ণগঠনের বিরোধী ছিলেন না । হিন্দী ভাষী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে একটি হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত ঘন সন্নিকিস্ট বাংলা ভাষী রাজ্য গঠন করা যেত এবং সেটা অনেক ভালো হত । কিন্তু এটা হবার উপায় ছিল না । লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্য ছিল দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করানো যার দ্বারা তারা পৃথক হয়ে যায় । আর তা হলে কংগ্রেস সৃষ্ট জাতীয়তাবাদ ও দুর্বল হয়ে পড়বে । ১৯০০ সালে লিখিত কার্জনের অভিমত ছিল - ' কংগ্রেসে পড়ে যাওয়ার আগে টলছে , - আমার ভারতবর্ষ অবস্থান কালে যত বড় বড় অভিলাষ গুলি আছে তার মধ্যে একটি হল - কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ অবসানের জন্য সহযোগীতা করা ।

বিচ্ছন্ন করার বিষয়ে কার্জনের ভূমিকা ছিল পাহাড়ের মত কঠিন , সংকল্প ছিল অটল । সেক্রেটারী অফ স্টেটের অনুমোদন নিয়ে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে দেশ বিভাগ কার্যত সাধিত হল । বিভাগের পরে বাংলার লোকসংখ্যা দাঁড়ল ৪ কোটি ২০ হিন্দু এবং ৯০ লক্ষ মুসলমান ,

অপরদিকে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে লোক সংখ্যা দাঁড়াল ১কোটি ৮.০ লক্ষ মুসলমান এবং ১ কোটি ২ লক্ষ হিন্দু । এই মুসলিম প্রদেশ গঠন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেছিল ১৯৪৭ এর ঘটনাগুলি ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাদের ছায়া ফেলেছিল । এই যে পরিকল্পনাকে সুপ্রসারিত করা এবং শাসন ব্যবস্থার জন্য পুনগঠনের রাজনৈতিক বিভাগে রূপান্তরিত করা , এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী কার্জন । সুশাসনের দক্ষতাই যদি কার্জনের লক্ষ হত তাহলে হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাদ না লাগিয়ে বাংলার অসুবিধা জনক আয়তনকে কমিয়ে সুবিধা জনক করা যেত । তাই এই ক্ষেত্রে কার্জনের ভূমিকা শাসকের নয় , ধূর্ত রাজনীতি বিদের ।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী শাসকের নয় , জন্ম হয়েছিল এই অনুভূতি থেকে যে বাংলা দেশ বঙ্গ ভাষীদের মাতৃভূমি তার সন্তানদের তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও সেই দেশকে খন্ডিত করা হয়েছে বাঙালীরা রাজনীতির দিক থেকে দুবর্ল করে দেয়ার জন্য । এই অন্দোলন প্রধানতঃ হিন্দুদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল । এর প্রাণশক্তি যে গভীর আবেগময় জাতীয়তা মুসলমানদের স্পর্শ করে । আর তা চাড়া ঢাকার নবাবের সাহায্যে ব্রিটিশেরা তাদের আন্দোলনের বাইরে রেখে দিয়েছিল ।

এই আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করেছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মধ্যদিয়ে , এর অনিবার্য পরিমান দেখা দিল পরিপূরক রূপে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার । এই আন্দোলনে নেতৃত্বে দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতো বড় বড় নেতারা। রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভাও এই আন্দোলনে যোগ না দিয়ে পারেনি । ১৯০৫ সালে গোখলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে এই বর্জনের আন্দোলন সমর্থিত হল । ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাকে এই বর্জনের আন্দোলন সমর্থিত হল । ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হল দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে তাতে বর্জন আন্দোলনের ন্যায্যতা প্রতিপাদিত হল এবং দাবি করা হল এই বিভাজনের প্রত্যাহার ।

ব্রিটিশ লেখকদের মতে বঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বিপ্লবী মতবাদ প্রচারের প্রচুর গুপ্ত সুযোগ দিয়েছিল । পূর্ব বঙ্গে বর্জন আন্দোলনকে মুসলমানেরা বাধা দিয়েছিল এবং দাঙ্গা ও বেধেছিল ঘন ঘন । জাতীয়তাবাদী লেখকের মতে এটা ঘটেছিল সরকারী প্ররোচনায় ও সমর্থনে । বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতিগুলি তৎপর হয়ে উঠেছিল । ভারতীয় সংবাদগুলি সর্বান্ত করনে সমর্থন জানিয়ে ছিল এই আন্দোলনকে এই দিকে নির্যাতন ও শুরু হয়েছিল নানাভাবে ।

যাই হোক , এ আন্দোলন বিফল হয়নি । ১৯১১ সালে এই বিভাজনকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হল । তবে বাঙালী হিন্দুদের দন্ডিত করা হল বিশাল বাংলা ভাষী এলাকাকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত করা আর ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করে ।

দেশ বিভাগের ফলে কার্জনের উদ্দেশ্য একদিক দিয়ে সফল হয়েছিল । অর্থাৎ হিন্দু ও

মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ীভাবে একটা গোজাপুতে দেওয়া হল তাদের পৃথক করে রাখার জন্য। জাতিয়তাবাদকে ও অনেক খানি দুর্বল করে দিল এই বিভাজন আর পূর্বাভাস দিল ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের।

আর এক দিক থেকে দেখতে গেলে, এই বিভাজন শক্তি ও প্রেরণা জুগিয়ে ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে। এই বিভাজন বাঙালীর হৃদয় যে আত্মিক ক্ষতির সৃষ্টি করেছিল, বিশেষ করে প্রাশ্চাত্য পন্থীদের মনে, তা কোন সময়ই পূর্ন নিরাময় হয়নি। এই আত্মিক ক্ষত সন্ত্রাসবাদ ও উগ্র মতবাদ জাগিয়ে তুলেছিল। এ ছাড়া মধ্যপন্থীদের স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেরণাকে ও এই বিভাজন সফল করে তুলেছিল তাই।

বঙ্গ বিভাগ ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি সংকল্প গ্রহনের অধ্যায়কে সূচিত করে।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মীয় মনোভাব যুক্ত হয়ে পড়ে। সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী তরুন সম্প্রদায় কালী, গীতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। সন্ত্রাসবাদ ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কত ব্রিটিশ রাজকর্মচারী গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বন্দেমাতর্ম সঙ্গীত খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই সময় বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতিও গঠিত হয়। সন্ত্রাসবাদ দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার নানা প্রকার দমন মূলক আইন প্রণয়ন করে। স্যার আন্ড ফ্রেজার ও কিংস ফোর্ডকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচাকী ১৯০৮ খ্রীঃ মৃত্যুবরন করেন। এই বছরই বিপ্লবী আন্দেলনে জড়িত থাকার অভিযোগে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ কানাই লাল দত্ত, সত্যেন বসু, উল্লাস কর দত্ত প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে দমন করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র সহ নয় জন জননেতাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করে।

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ও তার সরকারী ঘোষনা সারা বাংলাদেশে এক তীব্র ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সমাজের সকল শ্রেণী ও সকলস্তরের মানুষ এবং সংবাদপত্র পত্রিকার এই দুরভিসন্ধিমূলক আদেশের প্রতিবাদে মুখর উঠে। বিভিন্ন সভা সমিতিতে বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করে এবং এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশের সরকার, ভারত সরকার ,ও ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে শত শত প্রতিবাদপত্র পাঠানো হতে থাকে। বিভিন্ন মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বঙ্গ -ভঙ্গের বিরুদ্ধে গনস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টার নিস্ফলতা জনগনকে এক ব্যাপকতর ও বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করে তোলে।

সঞ্জীবনী কাগজের সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র দেশ বাসীকে বিদেশী দ্রব্য ও স্বদেশী দ্রব্য

ছাত্র সমাজরে মধ্যেও এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হয় । বঙ্গ -ভঙ্গ রোধে ও বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার ছাত্র বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে যোগ দিতে থাকে । বিভিন্ন সংবাদপত্র পত্রিকা এবং সাহিত্যের মাধ্যমে "বয়কট" ও স্বদেশী এই দুই আদর্শ ও লক্ষ্য ছড়িয়ে পড়ে । রবীন্দ্রনাথ , দ্বিজেন্দ্রলাল রায় , রজনীকান্ত সেন প্রমুখ কবিদের গান , কবিতা নাটক প্রভৃতি জনগনের স্বদেশপ্রেম ও ভাবাবেগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । " ব্রতী সমিতি " সনাতন সম্প্রদায় , বন্দেমাতরম্ সোসাইটি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুলোর স্বদেশী ভাবধারা প্রচার ও স্বদেশ প্রেমের বিকাশে তৎপর হয় । সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯০৫ খ্রীঃ ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকারী হয় । রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ দিনটি " রাখী বন্ধন" দিবস রূপে পালিত হয় । পূর্ববাংলা , পশ্চিমবাংলা , ধনী দরিদ্র , হিন্দু , মুসলমান খ্রীষ্টান নির্বিশেষে ' বাঙ্গালী জাতির ভ্রাতৃত্ব ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের কথা ঘোষনা করাই ছিল এই উৎসবের তাৎপর্য । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় " কোন শক্তি মদমত্ত রাজশক্তিই বাঙ্গালীর ঐক্যকে ভাঙ্গতে পারবে না । " এ কথাই প্রমাণিত হল রাখী বন্ধন উৎসবে রাখীবন্দন ছাড়া ঐ দিনটি " অরন্ধন দিবস" রূপে ও পালন করা হয় । সমগ্র বাঙ্গালী জাতি সেদিন রন্ধন না পালন করে ব্রিটিশ সরকারের স্বৈরাচারী নীতির মৌন প্রতিবাদ জানায়।

বঙ্গ-ভঙ্গের দিনটিতে জন জীবনের স্রোত বন্ধ হয়ে যায় । স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ শোভাযাত্রা ও জনসভার মধ্য দিয়ে বাংলায় মানুষ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে । অল্পকালের মধ্যেই আন্দোলন এক বিরাট গন অভ্যুথানের আকার ধারন করে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে ।

বিদেশী দ্রব্য বর্জন বা বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার বা 'স্বদেশী' এই দুই ছিল আন্দোলনের প্রধান আর্দশ ও কর্মসূচী। এই দুই লক্ষ ও নীতি ছিল পরস্পরের সমপূরক । বিদেশীদ্রব্য বর্জন কার্যকরী না হলে স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি সম্ভব ছিল না । তেমনি উপযুক্ত স্বদেশী পন্যদ্রব্য সহজলভ্য না হলে প্রয়োজনীয় বিদেশীদ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন করা ছিল দুঃসাধ্য । বিদেশীদ্রব্য বর্জনের আর একটি লক্ষ ছিল যে , 'বয়কট' আন্দোলন সফল হলে ক্ষতিগ্রস্থ ইংরেজ বনিকরা ব্রিটিশ সরকারকে তাদের নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপ দিতে বাধ্য হবে । তা ছাড়া , সুলভ ও উৎকৃষ্ঠ বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের ফলে জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে । তাদের মনোবল ও আত্মনির্ভরতা বোধ বৃদ্ধি পাে । স্বদেশী ভাবধারার অনুপ্রেরনায় বহু কাপড়ের কল ব্যাঙ্ক , মোজা গেঞ্জি , সাবান , চামড়া ঔষধ ইত্যাদির কারখানা , বীমা প্রতিষ্ঠান প্রভলতি গড়ে ওঠে । স্বদেশী দোকান ও বিভিন্ন স্থানে খোলা হয় । কুটির শিল্পেরও উন্নতি শুরু করে । দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক বাড়ী বাড়ী খুরে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রি করতে শুরু করে । জনসভা , মিছিল ,বিদেহী দ্রব্যের মহোৎসব , পিকেটিং , দেশাত্মকবোধক সঙ্গীত ও বক্তিতার মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের দুর্বার গতি অব্যাহত থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , বিপিন চন্দ্র পাল , অশ্বিনীকুমার দত্ত ,

আরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনকে আর ও শক্তিশালী ও গনভিত্তিক করে তুলতে সচেষ্ট হন ।

বয়কট আন্দোলনের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শিক্ষা বর্জন কিনতু বিদেশী পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ পায় সে জন্য আন্দোলনের নেতৃবর্গ গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন । এই উদ্দেশ্যে ১৯০৬খ্রী ঃ ১১ ই মার্চ জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ " গঠিত হয় । বঙ্গীয় জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয় । জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের দায়িত্ব লাভ করেন অরবিন্দ ঘোষ । জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক একলক্ষ টাকা এবং পরে ময়মানসিংহের জমিদারগন প্রচুর টাকা পয়সা দান করেন । এই সব দান ছাড়াও সাধারন লোকও জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের তহবিলে অর্থ দান করেন । সাধারন মানুষের স্বেচ্ছা সেবায় এবং অকৃপন দানে রাতারাতি গড়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গে ১১/১২ টি এবং পূর্ববঙ্গে ৪০ টি স্কুল । জন্ম হল যাদব পুর কারিগরী কলেজের যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেঝে বর্তমানের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উৎস ছিল জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং জাতির মানসিকতার ভিত্তিতে জাতির প্রয়োজন মেটানো এবং আশা আকাঙ্খা পুরনের জন্য বিদেশী শাসনের ঔপনিবেশিক ভাবধারাও নিয়ন্ত্রনের বাইরে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা । তাই জাতির অতীতকে জানবার জন্য জাতীয় স্কুলগুলোর পাঠক্রমে ভারতের ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব দেওয়া হয় । অপর দিকে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হল কারিগরী বিদ্যার উপর । মাতৃভাষা ও সাহিত্য এবং উচ্চতর স্বরে মানবিক বিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা হয় ।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র স্বগৃহে অন্তরীন অবস্থা থেকে ছদ্মবেশে দেশ ত্যাগ করেন এবং কাবুল উপস্থিত হন । কাবুল থেকে তিনি বার্লিনে যান । জার্মানীতে উপস্থিত হয়ে তিনি জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাত করে ইউরোপে ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা পেশ করেন । ইতিমধ্যে ১৯৪১ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর জাপান ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে বেং পার্ল হারবারের মার্কিন ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষন করে । ফলে প্রাচ্য রনাঙ্গনে জটিলতার সৃষ্টি হয় । দ্রুতগতিতে জাপান দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অধিপত্য স্থাপন করে। ১৯৪২ খ্রীঃ ১০ই মার্চ জাপান সিঙ্গাপুর এবং মার্চ মাসের প্রথম দিকে ব্রহ্মদেশ অধিকার করে । জাপানের দ্রুত সাফল্যে ব্রিটিশ সরকারের মনে ত্রাসর সৃষ্টি হয় । ভারতের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তারা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রী সভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠান কিন্তু তার প্রস্তাব ভারতের জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের আশা আকাঙ্খপূরণে ব্যর্থ হয়। অপর দিকে জাপানের অভাবনীয় সাফল্য দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মনে দারুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করে মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য জাপানে প্রবাসী

ভারতীয় বিপ্লবী রাস বিহারী বসু উদ্যোগী হন । ১৯৪২ খ্রীঃ ১৫ জুন ব্যাংককে ভারতীয়দের এক সমাবেশে তিনি ভারতীয় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন এবং তার উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ।এই সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র বসুকে দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার আগমনের জন্য আমন্ত্রণ করা হয় । ইতিমধ্যে ১৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মোহন সিং এর প্রচেষ্টায় সিঙ্গাপুরের পতনের পর যুদ্ধবন্দী ভারতের সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করে আজান হিন্দ বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয় ।অপর দিকে ব্যাংককে সম্মেলনে ভারতীয় সংঘ সুভাষ চন্দ্রকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কার্য পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা সাদরে গ্রহন করেন । কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জার্মানী থেকে জাপানে উপস্থিত হওয়া কোন ক্রমেই নিরাপদ ছিল না ।তথাপি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী জার্মানী ত্যাগ করে সাবমেরিনের সাহায্যে সুভাষ চন্দ্র টোকিও অভিমুখে যাত্রা করেন ।এই দুঃসাহসিক অভিযান সমাপ্ত করে ১৬ই মে তিনি টোকিও পৌছান ।
টোকিও পৌছেই তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাপানের সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র সংগ্রাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । তার পরে সুভাষ চন্দ্র সিঙ্গাপুরে এসে উপস্থিত হন এবং ২রা জুলাই বিহারী বসুর কাছ থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের দায়িত্ব গ্রহন করেন ।উপস্থিত ভারতীয়গন সানন্দে তার নেতৃত্ব স্বীকার করেন এবং তাকে "নেতাজী" নামে অভিহিত করেন ।

সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হওয়ার পরই সুভাষচন্দ্র ভারতে অভিযান পরিচালনার জন্য সামরিক বাহিনী পূর্ণ গঠন ও অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা শুরু করেন । ১৯৪৩ খ্রীঃ ২৫শে আগষ্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিক ভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহন করেন এবং সৈন্যবাহিনীর উন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানের দিকে মনোযোগ দেন । আজাদ হিন্দ বাহিনীর পূর্বে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল তেরো হাজার । তিনি তা পঞ্চাশ হাজারে পরিণত করেন । নেতাজী আজাদ হিন্দ কাহিনীকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন এবং নারী , পুরুষ উভয় ধরনের বাহিনী গঠন করেন ।নারী সৈন্যদের জন্য তিনি ঝাঁসি বাহিনী নামে একটি ব্রিগেড গঠন করেন । প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের নিকট আবেদন করেন ।

সেনাবাহিনীর পূন গঠিত করার পর নেতাজী অস্থায়ী গঠনের কাজে ব্রতী হন । সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের অধিবেশনে তিনি আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের কথা ঘোষনা করেন । নেতাজীর মতে তার সরকারের প্রধান লক্ষ্য হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাদের বিরুদ্ধে শেষ চূড়ান্ত সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং ভারতের মাটিতে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো। তিনি আশা করেন যে এই সরকার ভারতের মাটিতে স্থানান্তরীত হওয়ার পর স্থায়ী জাতীয় সরকারের স্থান গ্রহন করবে । অস্থায়ী সরকারের মূল ধ্বনি হল জয়হিন্দ ও দিল্লী চলো । জাতীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হল হিন্দুস্থানী । কংগ্রেসের ত্রির্বন রঞ্জিত পতাকার মর্যাদা পায় এবং রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের " জনগনমন" গানটি

জাতীয় সঙ্গীত রূপে নির্বাচিত হয় । শ্রীঘ্রই জাপান , জার্মানি , ইতালি , ও অন্য ছটি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দান করে । ১৯৪৩ খ্রীঃ ২৩ শে অক্টোবর আজাদ হিন্দের সরকার ইংলন্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে ।

১৯৪৩ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে নেতাজী টোকিও শহরে অনুষ্ঠিত বৃহৎ পূর্ব এশিয়া শক্তি সম্মেলনে যোগ দেন । এই সম্মেলনে ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন । জাপানের মন্ত্রী তোজো ভারতের মুক্তিযুদ্ধে জাপানের সাহায্য দানের কথা ঘোষনা করেন । জাপানের সহযোগিতার নিদর্শন স্বরূপ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ১৯৪৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে সর্মপন করা হয় । এই সম্মেলনের পরেই নেতাজী ভারতের মুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন । জাতীয় বাহিনী গঠন এবং বৈদেশিক সাহয্য লাভ এই দুটির ভিত্তিতে আজাদ হিন্দ বাহিনী সশস্ত্র অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে । ১৯৪৪ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে নেতাজী হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান কর্মকেন্দ্র রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করেন কারন ব্রহ্মদেশকে ভিত্তি করে ভারতের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করা সহজতর । এই সময় সুভাষ চন্দ্র সম্মিলিত জাপানী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে চট্রগ্রাম আক্রমন করার প্রস্তাব করেন । জাপান এই প্রস্তাবে আপত্তি জানায় , কারণ জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সম মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না । কিন্তু সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বাহিনীকে জাপানী সৈন্যের সহায়ক বাহিনী রূপে ব্যবহার করার বিরোধী ছিলেন । তার মতে , ভারতের মাটি মুক্তি যুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরাই প্রথম রক্তবিন্দু দান করবে । শেষ পর্যন্ত সুভাষ বসু ও জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষ কাওয়ারের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে স্থির হয় যে , আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং জাপানী বাহিনী যৌথ ভাবে আরাকান ফ্রন্ট আক্রমন করবে এবং ইম্ফল অভিমুখে অগ্রসর হবে । মার্চের প্রথম দিকে অভিযান শুরু হয় মে মাসের শেষ দিকে ইম্ফলের পতন ঘটে । এপ্রিলের প্রথম দিকে কোহিমা অবরুদ্ধ হয় । এই সময় ঠিক হয় যে বর্ষার পর আজাদ হিন্দ ফৌজ আসাম হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে । কিন্তু মে মাসের শেষ দিকে আজাদহিন্দ বাহিনী যখন কোহিমায় এসে উপস্থিত হয় তখন জাপানের সামরিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে । এই সুযোগে ইম্ফল ও কোহিমা ব্রিটিশ সৈন্যেদের ব্যাপক সমাবেশ শুরু হয় । তবু আজাদ হিন্দ বাহিনী তাদের দখলী কৃতস্থান গুলো রক্ষার জন্য বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে । কিন্তু বর্ষার সমাগমে জাপানী সৈন্যদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরা রনাঙ্গন পরিত্যাগ করতে শুরু করে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা সত্বেও ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে তার অভিযানের গুরুত্ব অপরিসীম । ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে আজাদ হিন্দ বাহিনীর যে পরোক্ষ ভাবে সাহায্য সক্রিয়

ছিল তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় । ব্রিটিশ সরকার এই সময় থেকেই স্পষ্ঠভাবে উপলব্ধি করে যে ভারতের উপর তাদের আধিপত্য বেশি দিন বজায় রাখা সম্ভব নয় । আজাদ হিন্দ বাহিনীর দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়েই নৌবাহিনী বিদ্রোহের পথ গ্রহন করে । ভারতের জন সাধারন ও এই বাহিনীর কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে পড়ে । তাই সরকার যখন ঘোষনা করে যে ব্রিটিশ রাজের প্রতি অনুগত্য ভঙ্গ এবং রাজদ্রোহের অপরাধে আজাদ্ হিন্দ বাহিনীর উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের বিচার করা হবে তখন সারা দেশ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে । এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ সারা দেশে গন বিক্ষোভ দেখা দেয় । সকলেই জাতীয় বাহিনীর অফিসারদের মুক্তি দাবি করে । ভুলাভাই দেশাই , তেজ বাহাদুর সাপ্রু কৈলাস নাথ কাটজু , আসফ আলি প্রমুখ আইন জীবিদের নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করে এবং বিচারাধীন অফিসারদের পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব এই কমিটি গ্রহন করে । দিল্লীর লাল কেল্লায় এই নাটকীয় বিচার কার্য সম্পাদিত হয় এবং কোর্ট মার্শালে বিচারাধীন সকল অফিসারই দোষী সাব্যস্ত এবং তাদের দন্ডাদেশ দেওয়া হয় । কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনমতের কাছে সরকারের নীতি স্বীকার করতে হয় এবং সকল নেতাই সসম্মানে মুক্তি লাভ করেন ।

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা মহারাষ্ট্রে হলেও এই আন্দোলন বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপকতা লাভ করে । ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই বাংলা দেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা দেখা দেয় । নবগোপাল মিত্রের নেতৃত্বে হিন্দু মেলা সংগঠন ও ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে সঞ্জীবনী সভা যুব সম্প্রদায়কে নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন চেতনার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় । ফলে ১৯০২ খ্রীঃ কলকাতায় তিনটি ও মেদিনী পুরে একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয় । এই সব সমিতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল অনুশীলন সমিতি । অনুশীলন সমিতির নামের সঙ্গে এই সংস্থার সভাপতি ব্যারিস্টার পি.মিত্রের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকলে ও১৯০২ খ্রীঃ ২৪ শে মার্চ সতীশ চন্দ্র বসুর প্রচেষ্ঠার বাস্তব রূপ গ্রহন করে এবং শরীর চর্চার রূপে আত্মপ্রকাশ করে ।বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের অনুকরনে এই সমিতির নাম করন করা হয় । কিছু দিন পরে " যুগান্তর " নামে একটি দল গঠিত হয় । ইতিমধ্যে ১৯০১ খ্রীঃ অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে তরুন বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠান এবং তিনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন । বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রায় জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গেই অনুশীলন সমিতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে ।

ক্রমশঃ কলকাতার বাইরে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে এই সমিতির শাখা গড়ে ওঠে এবং কলকাতায় সমিতির প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় ।

তবে ১৯০৫ খ্রীঃ পূর্বে অনুশীলন সমিতি ও বাংলাদেশের অন্যান্য সমিতিগুলো শরীর চর্চা , লাঠিখেলা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত ছিল এবং সক্রিয় রাজনৈতিক কার্য কলাপে জড়িত ছিল না । ।

কিন্তু ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হলে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন নতুন রূপে গ্রহন করে ১৯০৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের বিপ্লবীরা প্রথম নিখিল বঙ্গ সম্মেলন আহবান করেন এবং এই সম্মেলনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীদের মধ্যে সংহতি দৃঢ়তর হয় তবে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক তৎপরতা প্রকাশ্য ও গোপন এই দুটি খাতে প্রবাহিত হয় । একটি গোষ্ঠী নিষক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রকাশ্য ভাবে আন্দোলন পরিচালনার পক্ষপাতী ছিল । অপর দলটি ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র বিকল করার উদ্দেশ্যে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পথ অবলম্বন করে । হিংসাত্মক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষ , বারীন্দ্র কুমার ঘোষ , ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত , অবিনাশ ভট্টাচার্য , উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান ভূমিকা গ্রহন করেন । জনগণের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ।

" ভবানী মন্দির " নামক একটি গল্প প্রকাশ করেন । অরবিন্দ ঘোষের " বন্দেমাতরম" এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত " সন্ধ্যা" পত্রিকাও এই বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে । পরে বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে বিপ্লবী সংঘগুলো রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করে । ১৯০৭ খ্রীঃ বাংলার বিপ্লবীদল সর্ব প্রথম গুপ্ত হত্যার পরি কল্পনা গ্রহন করে । এই সময় তারা পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গর্ভনর ব্যামফিল্ড কুলারকে হত্যার চেষ্টা করে । কিন্তু তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় । ইতিমধ্যে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ , হেমচন্দ্র কানুনগো , উল্লাস কর দত্ত প্রভৃতি মানিক তলার মুরারী পুকুর অঞ্চলে বোমা প্রস্তুত করার কারখানা নির্মান করেন এবং তারা ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করে শাসনযন্ত্র বিকল করার সংকল্প গ্রহন করেন । অত্যাচারী প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড তাদের প্রধান লক্ষ্যে পরিনত হন । ব্রিটিশ সরকার কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে মজঃফর পুরে বদলি করে । ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামক দুজন তরুন বিপ্লবীর উপর কিংসফোর্ডকে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয় । কিন্তু তাদের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি মাকে দুজন নিরপরাধ মহিলা মারা যায় । পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার থেকে অব্যাহিত পাওয়ার জন্য প্রফুল্ল চাকী নিজের গুলিতে আত্মহত্যা করেন । কিন্তু ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং বিচারে তার প্রাণদন্ড হয় । অপর দিকে মুরারী পু কুরের বিপ্লবীদের আস্তানায় হানা দিয়ে পুলিশ অরবিন্দ ঘোষ সহ ছিষট্রিজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে এবং আসামীদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত আলিপুরের বোমার শুরু হয় । এই সময় নরেন গোসাই একজন দুর্বল চিত্ত বিপ্লবী পুলিশের নিকট অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করায় ঐ মামলার অপর দুই আসামী কানাই লাল দত্ত ও সত্যেন বসু নরেন গোসাইকে ,জেলের মধ্যেই গুলি করে হত্যা করেন । ফলে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেনবসুর ফাঁসি হয় । আলিপু র বোমার মামলার ব্যারিস্টার চিত্র রঞ্জন দাসের প্রচেষ্টায় অরবিন্দ ঘোষ খালাস পেলেও অপরাপর আসামীদের অনেকেরই যাবজ্জীবন দীপান্তর হয় ।

আলিপুর বোমার মামলার পর বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কিছু পরিমানে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে । সক্রিয় রাজনীতি থেকে অরবিন্দের বিদায় গ্রহন সরকারের কঠোর দমন নীতি এবং অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায় । তা ছাড়া এইসব বিপ্লব বাদের প্রকৃতিগত পরিবর্তন দেখা দেয় । প্রথম দিকে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা হলেও পরে এই সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় ।

বিপ্লবী কর্মপন্থা সংক্রান্ত ব্যাপারে ও পরিবর্তন ঘটে এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে বোমা নিক্ষেপের পরিবর্তে সার্থক বিপ্লবের জন্য শ্রমিক ও সৈন্য বাহিনীর মধ্যে সভা গঠনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং বৈদিশিক সাহায্যের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহনের কর্মসূচী তৈরী করা হয় । তা সত্বেও ১৯০৮ থেকে ১৯১৭ খ্রীঃ মধ্যে বিপ্লবীগণ প্রায় ৬৪জন সরকারী কর্মচারীকে হত্যাকরার চেষ্টা করেন তার মধ্যে ১৯০৮ খ্রীঃ বাংলার ছোটলাট ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা , পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে হত্যা ১৯০৯ খ্রীঃ সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা , ১৯১০ খ্রীঃ পুলিশ অফিসার সামসুল আলমের প্রাণনাশ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন " সাহিত্যের কর্মযোগী " সুতরাং তিনি রাজনীতির সঙ্গে ঘটিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন কিনা তা বড় প্রশ্ন নয় । আসল কথা হল বঙ্কিমের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তা দেশের রাজনৈতিক ভাবনায় কতটা সহায়ক হয়েছে।

বঙ্গদর্শন এর প্রথম দিকে তাঁকে রাজনীতি সম্পর্কে বিমুখ দেখা যায়নি । তবে যার অনেকখানিই ঐতিহাসিক তাড়নায় এবং স্বদেশ চিন্তার প্রনোদিত । বাঙ্গালীর "বাহু বল" , " ভারতকলঙ্ক" , " ভারত বর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা " প্রাচীন ভারতের রাজনীতি , বাংলার ইতিহাস , বাংলার কলঙ্ক " প্রচলিত বহু রাজনৈতিক রচনা । অনেক গুলো লেখা আবার সমাজতাত্ত্বিক চিন্তায় ও পরোক্ষভাবে স্বদেশ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ । " সাম্য " বঙ্গদেশের কৃষক এবং কমলা কান্তের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উক্তি এই শ্রেণীর অন্তগর্ত । প্রথম শ্রেণীর লেখাগুলোতে যে মূল রাজনীতি ভাবনার ও চিন্তার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র করে ছিলেন তা শিক্ষিত শ্রেণীকে স্বদেশ বিষয়ে সচেতন করে তোলার কথা পরাজিত বাঙ্গালী ও ভারতবাসীকে কিছুটা উৎসাহ দানেরও কথা । অন্যান্য অনেক লেখাই জাতীয়তার উদ্বোধন হিসাবে রাজনীতি সম্পর্কিত । কমলাকান্তের পত্রে'র পলিটিকস্ বিশ্লেষন কুক্কুর জাতীয় ও বৃষজাতীয় পলিটিক্সের ব্যাখা একদিকে যেমন উপভোগ্য তেমনি অপরদিকে বাস্তব রাজনৈতিক বোধএর প্রমান ।

বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি বিশিষ্ট কীর্তি হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা । বারেবারে তিনি হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানিয়েছেন । এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আনুগত্য জন্মগত । যুগ শিক্ষায় সুশিক্ষিত যোগের জ্ঞান বিজ্ঞানের সহায়তায়

তিনি হিন্দুধর্মের পক্ষে যা করেন তা তার প্রতিভার পরিচয় । হিন্দুধর্মের সমস্ত শাস্ত্রকে আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী পরীক্ষা করে , বিচার করে , যুক্তির পর যুক্তির সাহায্যে গীতায় উক্ত নিষ্কাম ধর্মকেই এইমাত্র হিন্দুধর্মরূপে ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণকে আদর্শ মনুস্যরূপে স্থাপন , জন্মগত বিশ্বাস কে যুগ সঙ্গত যুক্তির ধরতেই পুষ্ট করে তিনি একটি নতুন দিকের উন্মোচন করেন । বঙ্কিমের এই প্রচেষ্টা সমকালীন চিন্তাশীল ব্যাক্তিদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা থেকে তা জানা যায় । তিনি বলেন যে আধুনিক যুগ গ্রাহ্য হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রথম বঙ্কিমই অগ্রনী হন ।

সংক্ষেপে বলা যায় যে বঙ্কিমের মধ্যে দিয়ে হিন্দুধর্মের পুনর্জীবনের আভাস দেখা যায় । সমাজ সংস্কার অপেক্ষা সংরক্ষনের দিকে তাঁর বেশি ঝোঁক থাকলেও তিনি কট্টর গোড়াপন্থী ছিলেন না । বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জীবননিষ্ঠ এবং মানবতাবাদী সুতরাং তিনি মানবীয় , বৃত্তি সমুহের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের মধ্যে দিয়ে সর্বাঙ্গীন পুরুষার্থ লাভের কথা বলেছেন । ধমর্মতত্তব ও কলত্র চরিতের মাধ্যমে তিনি হিন্দুধর্মের নানাদিক সম্পর্কে সংগর্ভ আলোচনা করেন । বঙ্কিম কায়মনোবাক্যে হিন্দু ধর্মের উজ্জল ভবিষ্যতে বিশ্বাস করতেন । সে জন্য তিনি বলেন , " যেদিন ইয়োরেপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প ও ভারতের নিষ্কাম কর্ম একত্র হইবে সেদিন মনুষ্য দেবতা হইবে ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদ স্পষ্ঠভাবে প্রকাশিত না হলেও তার রাজনৈতিক আদর্শ ভারতীয় বিশেষভাবে বাংলার রাজনীতির উপর আর গভীর প্রভাব বিস্তার করে । তাঁর দেশপ্রেম রাজনৈতিক দর্শন বহু রাজনীতি বিদকেই উদ্বুদ্ধ করে তোলে । তার সর্ম্পকে বলা হয় যে তিনি স্বদেশ প্রেমকে ধর্মের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন । শ্রীঅরবিন্দ , বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিন্তা ধারাকে স্বদেশ প্রেমের ধর্ম বলে বর্ণনা করেন । ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রায় অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেন যে তিনি স্বদেশ , প্রেমকে এবং ধর্মকে স্বদেশ প্রেমে পরিণত করতে সমর্থ হন । কিন্তু স্বদেশ প্রেম ও ধর্ম বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ সমর্থন ছিল সে কথা মনে করলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হবে । তার মানবপ্রেম সমাজ , কাল ও দেশের গন্ডী অতিক্রম করে এক বিশ্বজনীন মানবতাবাদে পরিণত হয় । প্রকৃত পক্ষে তার মানবপ্রেম স্বদেশ অপেক্ষা প্রেম অপেক্ষা ও অনেক বেশী গভীর ছিল । তিনি পাশ্চাত্য দেশে অনুসৃত স্থাপত্যবোধ ও দেশপ্রেম সম্পর্কে খুব উচ্চধারনা পোষন করতেন না এবং ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে পাশ্চাত্যের অনুকরন করে স্বদেশ প্রেমের নতুন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাও পছন্দ করতে পারেন নি । বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমস্ত প্রাণীকে সমভাবে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম । কিন্তু মানব সভ্যতার অপূর্ণতার জন্য সমস্ত প্রাণীকে সমভাবে ভালবাসা অসম্ভব সুতরাং স্বদেশ প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করা উচিত । তার নিজের ভাষায় " সকল ধর্মের উপর স্বদেশ প্রীতি " । তার এই স্বদেশ প্রীতির চিন্তাধারা ভারতের চরমপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে তুলতে অনেকাংশে সাহায্য করে । বিশেষত এই ব্যাপারে " আনন্দমঠ " ও তার অন্তভুক্ত "

বন্দেমাতরম" ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট গভীর অনুপ্রেরণা রূপে দেখা যায় ।আনন্দমঠের সন্ন্যাসীগণ অর্থাৎ সন্তানদল চরমপন্থী আন্দোলন কারীদের নিকট আদর্শ রূপে পরিগনিত হতেন । ভারতীয় বিপ্লবীদের কাচে আনন্দমঠ ছিল আনন্দমঠ ছিল প্রেরনার প্রতীক নিষ্কাম স্বদেশ প্রেমের দীক্ষায় ,স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ । সমগ্র আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রাণ বাণী " বন্দেমাতরম " ছিল চরম পন্থীদের মহাসঙ্গীত এবং মাতৃমন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে তারা যে কোন দুঃসাহসিক কর্মে আত্মনিয়োগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না ।আনন্দমঠের সন্তান দলের কাছে দেশই ছিল মা ।এই গ্রন্থে মায়ের ত্রিমুর্ত্তি প্রদর্শিত হয়েছে ।অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ভারত বর্ষ ' স্বৈরাচারী শাসনে মা হৃত সর্বস্বা , দেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছে মা অন্ধকারাচ্ছন্ন কালী কালিমাময়ী 'মা হইয়াছেন। দেশ প্রেমিক সন্তান দলের ধ্যাননেত্রে স্বপ্ন সাধন ও কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মায়ের এক ঐশ্বর্যময় মূর্তি - বিদ্যা , বুদ্ধি সাময়িক বল, ধনৈশ্বর্য এবং গনশক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে গড়া আগামী দিনের নতুন ভারতবর্ষ মা যা হইবেন । ' অন্ধকারাচ্ছন্না কালিমাময়ী মাকে হৃত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল আনন্দমঠের একমাত্র ধর্ম, লক্ষ্য, সাধনা , কামনা ও বাসনা এই লক্ষ্যেই ধাবিত হত তাঁদের সকল ধর্ম প্রয়াসএবং তারা কালী মূর্তির আরাধনার দ্বারা শক্তি ও সাহসকে উদ্দীপ্ত করে তোলার চেষ্টা করেন । ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে আনন্দ মঠ ব্যতীত অন্য কোন উপন্যাস তরুন বাঙ্গালীদের উপর এরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি । চরম পন্থীদলের অন্যতম প্রধান নায়ক অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৭ খ্রীঃ তার সম্পাদিত বন্দেমাতরম পত্রিকায় লেখেন , যে নতুন শক্তি জাতিকে পুনরুত্থানের ও স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করতে সমর্থ হয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্রই তার উৎসাহদাতা এবং রাজনৈতিকগুরু । অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে নবভারতের স্রষ্ঠাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন । ১৯০১ খ্রীঃ ১০ই এপ্রিল বন্দেমতরম পত্রিকায় প্রকাশিত " ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র " শীর্ষক প্রবন্ধে অরবিন্ধ ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্রকে ' ঋষি' অভিধায় ভূষিত করেন । তিনি বলেন বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে বন্দেমাতরম মন্ত্রদান করেছেন সেইজন্যই তিনি ঋষি কপালকুন্ডলা , বিষবৃক্ষতা কৃষ্ণকান্তের উইলের রচয়িতা শিল্পী ও উপন্যাসিক , বঙ্কিমচন্দ্র নন - দেবী চৌধুরাণী আনন্দমঠ , কৃষ্ণচরিত এবং ধর্মমত তত্বের রচয়িতা জাতি সংগঠক ও ঋষি বঙ্কিই নব ভারতের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে অন্যতম । জাতি নেতৃবৃন্ধের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আবেদন নিবেদন নীতির অসারতা উপলব্ধি করেন এবং দেশের মুক্তির জন্য বঙ্কিম চন্দ্র চেয়েছিলেন নৈতিক বল , যার ভিত্তি হল পূর্ণ আত্মনিবেদন , সংগঠন , নিয়মানুবর্তিতা এবং দেশ ও প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় । অরবিন্দের মতে বঙ্কিম রচনাবলীর মূল কথাই হল স্বদেশ প্রেম ধর্ম এবং এটাই আনন্দমঠের প্রাণবানী। যে বন্দেমাতরম আজ অখন্ডভারতের জাতীয় সঙ্গীত সেই মহাসঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই ঐ প্রাণবানীর অনবদ্য ছন্দোময় প্রকাশ। অন্যত্র অরবিন্দ বলেন যে , জাতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল এই যে তিনি আমাদের মাতৃভূমি দিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনাতে যে ভাবে মার্তৃমূর্তি দর্শন করেন , সেই ভাবেই তা দেশবাসীর নিকট চিত্রিত করার চেষ্টা করেন ।তার

আদর্শেই সমগ্র জাতি মাতৃমন্ত্রে দীক্ষীত হয় । ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১১ই আশ্বিন ধর্ম পত্রিকায় তিনি লিখেছেন , স্বদেশ প্রেমের ভিত্তিই মাতৃ পূজা । যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রে বন্দেমাতরম গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রানে আঘাত করিল , সেদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগিল , মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠিত হইল । দেশ অরবিন্দের নিকট নিছক একটি জড় পদার্থ নয় মাঠ , ক্ষেত ,বন পর্বত বা নদী নয় - " আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি , ভক্তি করি পূজা করি ।" বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব নিঃসন্দেহে তাঁকে এই রূপ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হয় । ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ধর্ম পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত যুগাস্ত্রোত্রে তার স্বদেশ প্রেম ও মার্তৃ চিন্তার সম্যক পীরচয় পাওয়া যায় । কমলাকান্তের মতোই তিনি দেবী দুর্গাকে বলদায়িনী প্রেম দায়িনী , জ্ঞান দায়িনী , শক্তি রূপিনী ভীমে , সৌম্য রৌদ্র রূ পিনী বলে আহ্বান জানিয়েছেন । দেশের দুগতি নাশের জন্য মায়ের কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছে । মাতা দুর্গে তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করি না , শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের জোরে বাঁধিয়া রাখিব । তার রচিত ভবানী মন্দির এবং দি মাদার এর মধ্যেও অনুরূপ চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে ।

বাঙালী জাতির প্রতিবাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তারিখ যেমন -

১) ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (ইংরেজী ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে) বাংলাদেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর প্রতিবাদে পশ্চিমবাংলা সহ বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চল ক্ষোভে ফেটে পড়ে । ২) ১৭৭৪ খ্রীঃ প্রতিবাদী নন্দকুমার ফাঁসী মিথ্যা জালিয়াতির অভিযোগে । ৩) ১৮১৭খ্রী ঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা । ৪)১৮৩৯ খ্রীঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্তবোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন । ৫) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভাকর ও তত্তবোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন যাতে ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হতো । ৬) ১৮৬৭ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে মহারাষ্ট্রে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা ।১৮৬৭ খ্রীঃ নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে হিন্দু মেলা শুরু হয় । ৮) ১৮৩৭ খ্রীঃ দ্বারকনাথ ঠাকুর , কাশীনাথ রায় প্রমুখ " বঙ্গভাষা প্রকাশিত সভা" প্রতিষ্ঠিত করেন, সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । ১০) ১৯৭৬ খ্রীঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের ভারত সভা প্রতিষ্ঠিত হয় । ১১) ১৮৮৫ খ্রীঃ উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন । ১২) ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন । ১৩) ১৮২৫ খ্রীঃ " নববিধান" এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কেশব চন্দ্র সেন । ১৪) " নীলদর্পন " গ্রন্থের প্রনেতা দীনবন্ধু মিত্র নীলচাষীদের অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি এই গ্রন্থে আছে । ১৫) আনন্দমঠ এর রচয়িতা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যা বাঙালী যুব সমাজকে প্রেরনা যুগিয়েছিল । ১৬) ১৮৫৯ খ্রীঃ দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরন বিশ্বাস নীলবিদ্রোহ শুরু করেন । ১৭) বাংলায় ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা তিতুমীর নারিকেল বেড়িয়ার সৈন্যবাহিনীর সহিত লড়াই চালাইয়াছিলেন । ১৮) বাঙালীদের আন্দোলনের চাপে ইংরেজ সরকার ১৮৬৩ খ্রীঃ কলিকাতা কর্পোরেশন গঠন করেন । ১৯) ১৮৪৯ খ্রীঃ কলিকাতায় ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা । ২০) ১৮৫৭ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । ২১) অবনীন্দ্র ঠাকুর ও নন্দলাল বসু প্রাচ্যকলার দু জন প্রবক্তা । ২২) অরবিন্দ ঘোষ উগ্র

জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা । ২৩) ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ । ২৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাব অনুসারে রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান পালিত হয় । ২৫) ১৯০৬ খ্রীঃ রাসবিহারী সু প্রথম " জাতীয় শিক্ষা পরিষদের " সভাপতি ছিলেন । ২৬) বাংলার বিপ্লবীদের দুইটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি হল অনুশীলন সমিতি ও সাধনা সমিতি । ২৭) ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ খ্রীঃ সূর্য সেন এর নেতৃত্বে চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অনুষ্ঠিত হয় । ২৮) ত্রিপুরী কংগ্রেস এ সুভাষ চন্দ্র বসু সভাপতি পদে নির্বাচিত হন ।

এছাড়া ও দেশের ঐক্যবদ্ধতার স্বার্থে অন্যায় , অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এ রকম শত শত প্রমান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বর্তমান ।

****

শ্রমিক মালিক সম্পর্ক

কর্মকর্তা নানা ধরনের আছেন । কর্মকর্তা পুরুষ বা নারী ,যুবক , পৌঢ় যে কোন কেউই হোক না কেন পরিচালন পদ্ধতিই কর্মদক্ষতার পরিচায়ক । বিভাগীয় ও স্বীয় উন্নতির জন্যে কেউ কেউ অতি অজুহাতে সামলাতে গিয়ে অধনস্থ কর্মচারীদের বিরাগ ভাজন হন , কিন্তু বিভাগীয় ওপরওয়ালার কুনজর কেড়ে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে প্রচেষ্টা করেন ,ও প্রচার করেন , স্বেচ্ছাচারী, বাস্তব বিরোধী , কেউ নিজের লাভ বাড়ানোর জন্য যে কোন কিছু করতে প্রস্তুত । অনেক ভালো কর্তা ও দেখা যায় যারা দক্ষ এবং অধিনস্থদের থেকে কাজ নিতে জানেন কিন্তু পরোক্ষ বিভাগীয় কতৃপক্ষের কাছে বিরাগ ভাজন হন। ক্ষতিও হয় তারা সাধারণ সুবিবেচক ও সুহৃদয় । সক্রিয় কর্মকর্তাগন যেমন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখেন তেমনি যাদের নিয়ে কাজ করেন তাদেরকেও নিজের নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারেন , যার ফলে , কর্মচারী ও বিভাগের সমান লাভ হয় । অধস্তন কর্মচারীদের বাদ দিয়ে কখনো সাফল্য পাওয়া যায় না । সুতরাং বিবেচিত কর্মকর্তা সবসময় নিজের দক্ষতা নিয়ে ওয়াকিবহল বিচক্ষন কর্মকর্তা নিজের দক্ষতা জেনেও কাজের মাধ্যমে অন্য কর্মচারীদের দিয়ে কাজ নেন । নিজের দক্ষতাই কর্মকর্তার পরিচালন ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ । অদক্ষ কর্মকর্তাদের কারণেই সাধারণত দুস্কমের উত্তর আসে , কর্মচারীদের এরূপ ও কর্মকর্তার এরূপ যাতে সামঞ্জস্য থেকেই যায় ।

বর্তমানে শোনা যায় কর্মকর্তার সাথে শ্রমিকের কাজের অনেক ফারক । উভয়ের চিন্তাধারা একরকম। এরূপ গঠনা দুর্লভ, তিরস্কার করাই কর্মকর্তার বাহাদুরী তা শুধু নিজের অদক্ষতাকে লুকানো।

কর্মকর্তাদের লক্ষ্য ঃ অদক্ষ কর্মকর্তারা নিজেই জানেন না উনার কী দায়িত্ব এবং কি জন্য উনি দায়বদ্দ শ্রমিককে শাসানো ও রক্তচক্ষু দেখানো ও নানা অজুহাতে দমিয়ে রেখে দক্ষ শ্রমিককে

অদক্ষ বানানোই নিজেদের প্রশংসা বলে মনে করে। কূটবুদ্ধিসম্পন্ন , অযোগ্য অদক্ষ কর্তারা নিজেরা সুকৌশলে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গলি দেখিয়ে শ্রমিকের উপর আইনী বোঝা চাপিয়ে দিতে তৎপর । সুতরাং দক্ষ শ্রমিক আইন বাচিয়ে অস্থিত্ব রক্ষার কারনে ৮০ ভাগ ফল তার প্রতিষ্ঠানকে দিতে পারে না শতকরা ২০ দক্ষকর্তার প্রয়োজনে, যেহেতু উনি ও বেতনভোগী কিন্তু পাছে যদি শ্রমিককে জিজ্ঞাসায় নিজের প্রশংসা কমে এই ভাবনায় যেহেতু প্রখর সুতরাং মিছি অভিযোগে বলে শ্রমিককে তিরষ্কার করাই কর্তার কাম্য । যোগ্যতার ও অদক্ষতার মাপকাঠি বিবেচনা করার ফুরস্য কর্তার নেয় কারণ তাহলে শ্রমিককে দক্ষতার পরিচয় দিতে হতে পারে ।

দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা ঃ- দক্ষ শ্রমিক মনে করে কোন কাজে প্রথমবার দ্বিতীয়বার তৃতীয় বারেও হয়ত সুফল লাভ হতে নাও পারে । সমস্যা হতেই পারে , কিন্তু সমস্যার জাল খুজে বের করার জন্য কিছু সমাধান সুত্র কর্মকর্তাদের কাছে প্রত্যাশা করে । যদিও সুদক্ষ শ্রমিক নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করে কিন্তু পরামর্শের দাবী করে । কারণ ভুল সবাই ধরতে পারে । দক্ষ শ্রমিক উপযুক্ত ও সাফল্য কাজের জন্য কর্তার কাছে প্রশংসা দাবী করে । দক্ষ শ্রমিক মনে করে তার কাজের প্রশংসা শুধু তারই নয় কর্মকর্তারিও বটে এবং তাতে শ্রমিকরা আশ্বস্ত হন যে কর্তা শ্রমিকের কথা ভাবেন । যার ফলে শ্রমিক কর্তা ও প্রতিষ্ঠান সবারই সাফল্য এবং এই সাফল্যের জন্য পুনরীক্ষনের অপেক্ষা করতে হয় না , কর্মকর্তা যদি দক্ষ শ্রমিকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কাজের বাস্তবতা বুঝিয়ে দেন তাহলে কর্তার দক্ষতা সম্বন্ধে ও কর্তার আন্তরীকতা সম্বন্ধে শ্রমিকের সন্দেহ থাকে না । যদি কর্তার আচরণ দুর ও সঙ্গতি পূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক হয় , হয়ত ফলে শ্রমিকের কাজের অগ্রগতি ও অব্যাহত থাকে , শ্রমিক প্রত্যাশা করে তার কাজের প্রসংশা এবং শ্রমিককে সহমর্মী ভেবে তাকে কাজের বাস্তবতা বুঝিয়ে দেওয়া ও কাজের উৎসাহ দেওয়া পাশাপাশি তার সুবিধা , অসুবিধাগুলো উপলব্ধি করা ।

তিরস্কার কখন প্রাপ্য ঃ- বর্তমানে অনেক শ্রমিকের মুখে শোনা যায় অদক্ষ কর্মকর্তারা নিজের দোষ ঢাকতে শ্রমিকদের দোষী সাব্যস্ত করতে তৎপর । মনে রাখা যায় , ভুল জানার পর তিরষ্কার করা চলে , তবে ভুলটা কি ,সে বিষয়ে পরিষ্কার করে বলা এবং ভুল কিভাবে শোধরানো যায় তা নির্দ্বিধায় বুঝানো এবং কাজটুকু কেন সমর্থন করা যায় না তা জানানো , এবং নিজে অনুভব করা তবে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন হয় ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন । তিরষ্কার যেন ব্যাক্তিগত না হয় , তা যেন কাজের মূল্যায়নের উপরেই হয় । দক্ষতা থাকা সত্বেও শ্রমিকের ভুল হতে পারে তা বিবেচনা করে তিরষ্কারই কাম্য । এ প্রান্তে ও প্রান্তে ছুটাছুটি করে তিরষ্কার করে শ্রমিক থেকে সুফল পাওয়া যায় না । শ্রমিক মনে করে কাজের সময় শ্রমিক ও কর্মকর্তা মিলেমিশে কাজ করলেই দুসাধ্য কাজও

সহজ হয়ে পড়ে । শ্রমিককে কাগজে ভুল দেখিয়ে জয়ী হওয়া যায়না বরঞ্চ কাগজের অপচয় ঘটে , এবং শ্রমিক পরাজিত ছদ্মবেশে থাকলেও কর্তাকে জয়ী হতে সাহায্য করে না মুলত কাজের মুল্যায়ন হয় না , কাজও লক্ষ্যের বন্ধন সুত্রও পাওয়া যায় না , শেষ পর্যন্ত কর্তার শ্রমিকের জন্যই প্রার্থনা করতে হয় সে পছন্দের বা অপছন্দের যাই হোক অন্ততঃ রুটিন কাজ চলার নিমিত্তে ।

কর্তার দক্ষতার কেন প্রয়োজন ঃ- শ্রমিককে দিয়ে কাজ করাতে হলে কর্তার সেই কাজ সমন্ধে দক্ষতার প্রয়োজন আছে , নিজে কাজ না জেনে , না বুঝে অন্যকে জ্ঞান দেওয়া আর খালি মাঠে গোল দেওয়া প্রায় সমান । কেননা যারা দক্ষ তারা নিজেরাই বুঝতে পারেন কখন ঠিকভাবে কাজ করা যাবে আর কখন করা যাবে না । ঠিক কাজও কাজের যোগ্যতা যাচাই করা প্রয়োজন । ত্রুটি ধরার জন্য ওত পেতে বসে থাকলে শ্রমিক ভাবে তার কাজের পরিবেশ প্রতিকূল সুতরাং অনভিজ্ঞ সেজে থাকাই শ্রেয় । পরিমানে দক্ষশ্রমিকেরা যতটুকু কাজ না করলে না হয় তার বেশী করতে চান না । কারণ যেহেতু কাজের মান , পরিমাণ যোগ্যতা সবটাই ভুলুণ্ঠিত ।

বাঞ্চনীয় ঃ কর্মকর্তা দক্ষ ও পক্ষ পাতহীন হয়ে সৎ থাকলে পরিনাম ভালো হয় । দক্ষকর্তা শ্রমিকের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবেন ফলত কাজ হয় আপোসহীন , শ্রমিকের উৎসাহ অনুপ্রেরণা বাড়ে বিভাগের সাফল্যও বাড়ে । পরিশেষে বলা চলে যোগ্য ব্যাক্তিই যোগ্য আসনে প্রশংসনীয় ।

****

নারী " একাল - সেকাল "

যে কালে নারী সমাজ পরিচালিত হতো ধর্মীয় অনুশাসনের উপর যদিও অনেকেই তা মানেন আবার অনেকে তা মানেন না । কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ধর্মগুলোতে নারীদের সম্পর্কে কি মত পোষণ করা হয়েছে সে দিকে নজর দিলে দেখা যেতে পারে , হিন্দু, ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মে নারীকে উচ্চস্থানে রাখা হয়েছে , যদিও ব্যতিক্রম থাকতেই পারে । এটাও সত্য যে ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়মাবলীতে নারীদের অবস্থান কোথাও কোথাও সীমাহীন অবনমন ঘটিয়েছে । আলোচনা করলে দেখা যায় " নিউ টেষ্টামেন্ট " যা খ্রীষ্ট ধর্মের মুল গ্রন্থ , যেখানে স্ত্রী / পুরুষ তাদের অবস্থান , অধিকার , পারস্পরিক সম্পর্ক তেমন কোন বিস্তারিত আলোচনা নেই । যদিও খ্রীস্ট ধর্মে বিবাহ বন্ধনে এক পবিত্র বন্ধন বলে উল্লেখ করা হইয়াছে । তেমনি কিছু বিতর্কিত বিষয়ও শোনা যায় যেমন স্ত্রী পিতার অধীনের চেয়ে ও স্বামীর কাছে নারীর অধীনতা কঠোর তাছাড়া নারীকে কোন গুরুত্ব পূর্ণ পদে দেওয়া উচিৎ নয় ইত্যাদি । যদিও পাশাপাশি ক্যাথলিক অংশে বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ । একদা এক সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদেও নারীর অধিকার ছিল সীমিত । জন্মনিয়ন্ত্রন ছিল নিষিদ্ধ , নারীর গর্ভপাত বিবাহ বিচ্ছেদের কারণও হতে পারে । সন্তানহীনা নারী কোন দত্তক সন্তানকে গ্রহন করতে পারবে না । সন্তানের অধিকার ও ঘরপোষে নারীর অধিকার অত্যন্ত সীমিত , বিবাহ বিচ্ছেদের পরে পিতার সম্পত্তি যে কোন ভাইয়ের চাইতে কম অংশ পাবে । ভিন্ন ধর্মে বিবাহ নিষিদ্ধ । ইতিহাস বলে ধর্মচ্যুতির শিকার অজস্র নারী । " ডাইনী শিকার " যা বর্তমানেও কখনো কখনো শোনা যায় এই উইচ হান্টিং নাম দিয়ে বহু নারীকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে । ১৯০৫ সালে রাসিয়াতে বিপ্লবের পর জার্মানি নেত্রী রোসা লুক সেম বার্গের "Socilism and churches" রচনাতে নারী সমাজ নিয়ে চাচ ও রাষ্ট্রের

ভূমিকা এক চমৎকার বৃত্তান্ত তুলে ধরেছিলেন । ইসলাম ধর্মেও প্রধান উৎস সরিয়া (কোরান) , হাদীস এবং ফুকার সম্মিলিত মতামত থেকে বলা হয় ইজমা । যদিও কাল পরিক্রমায় কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটলেও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি ।ইসলামি আইনে মুল ধারা গুলি হলো হানিফি, মালিকি , শফিই হামবলি , প্রাহিরী ও সরিয়া ।ঈশ্বর (আল্লা)পুরুষকেনারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কারণ পুরুষ নারীর জন্য ধন ব্যয় করে । রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্কের নারীকে দ্বারা জাত কন্যাকে বিবাহ করা যাইতে পারে ।পুরুষরাই নবী হবেন নারীরা নয় ।অবাধ্য স্ত্রীর শয্যা বর্জন , প্রয়োজনে প্রহার ।স্বামীর পক্ষ থেকে তিন বার তালাক উচ্চারন করার দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ করা যায় কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে অনুমোদন নেই ।সম্প্রতি উত্তরাধীকারী ক্ষেত্রে এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান হবে ।দুইজন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষের সমান বলে বিবেচিত হবে ।কোন নারী অন্য পুরুষের দিকে তাকাতে পারবে না । হিন্দুধর্মেও নারীর সম্পর্কে বলতে গেলে তেত্তিরীয় সঙ্গিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় - সর্ব গুনান্বিতা শ্রেষ্ঠ মহিলাও অধমতম পুরুষের থেকে হীন । নারীকে ধর্ম উপাসনার প্রকাশ্য সভায় যাওয়ার , শিক্ষা অর্জনের , সম্পদ সংগ্রহ ও তা ইচ্ছা মত ভোগ করার সম্মতি ব্যতীত নিজ দেহকে অন্যের ভোগ করা থেকে নিবৃত করার স্বামীর একাধিক পত্নী , উপপত্নী ও অন্য নারী সংসর্গ থাকলেও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদটুকু করা প্রভৃতির অধিকার ও নেই নারীর । স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অবারিত অধিকার দেওয়া আছে স্বামীর জন্য ।স্বামীর অধিকার পরিপূর্ণভাবে কায়েম করতে স্ত্রীকে বেত , রজ্জু বা হাত দিয়ে প্রহার করার শাস্ত্রীয় অধিকার দেওয়া হয়েছে স্বামীকে ।পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারে কন্যাকে প্রায় পুরোপুরি বঞ্চিত করা হয়েছে। পুরুষের আত্মরক্ষার জন্য ধনের মতো প্রয়োজনে অধিকার দেওয়া হয়েছে স্ত্রীকেও বিনিময়ের ।বিধবাদের মৃত স্বামীর সাথে চিতায় আত্মদান , বিধবাদের পুনবিবাহ নিষিদ্ধ সহ কঠোর জীবনের বিধান , অনুঢ় নারীদের জীবন্ত পাপীনী হিসাবে চিহ্নিত করা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর দিকও রয়েছে হিন্দুশাস্ত্রে ।বিভিন্ন আধুনিক রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট ধর্মগুলিতে বর্ণিত নারীদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সহ ধর্মীয় সামাজিক আচার বিচার নীতির বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেছে ।ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষত ধর্ম সংস্কার আন্দোলন , নব জাগরণ নারীদের ধর্মীয় নানাবিধ বন্ধন থেকে কিছুটা মুক্ত করেছিল ।উত্তর আফ্রিকা , মধ্য এশিয়া , দক্ষিন এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইসলাম অধ্যুষিত দেশগুলিতে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনও ইউরোপীয় ভাবাদর্শের প্রভাব বা কোথাও কোথাও সীমাবদ্ধ চরিত্রের বিপ্লব ইসলামের সামাজিকনীতির নানা সংস্কার সাধন করেছিল ।নারীদের প্রসঙ্গে বহু গোঁড়ামি মূলক ব্যবস্থা অবসান ঘটিয়ে ছিল উক্ত ধর্ম দুটির সংস্কার আন্দোলন ।ভারতের মধ্যযুগে ভক্তি ও সুফী আন্দোলনের যে ধর্ম সমন্বয় ও সংস্কারের পথে এগিয়েছিল তার মধ্যে দিয়ে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মৌলবাদী ব্যবস্থার (বিশেষত ঃ নারীদের প্রসঙ্গে) বিরুদ্ধে ও জোরালো আঘাত হেনেছিল ।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় দশক থেকে রামমোহন , দ্বারকানাথও ডিরোজিয়ানরা এবং পঞ্চাশের দশক থেকে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে সংস্কার আন্দোলন হিন্দু ধর্মে নারীদের উপর নিপীড়ন মুলক বেশ কিছু ব্যবস্থার অপসারন ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল । ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের শতমুখী ধারাও বিপ্লবের অসম্পূর্ণতা সত্বেও , নারী প্রগতির দ্বারা কিছুটা উন্মুক্ত করেছিল । ধর্মীয় সমস্ত ধরনের গোঁড়ামি থেকে মুক্তি ব্যাপক সুযোগ মিলেছিল রাষ্ট্রীয় সামাজিক ব্যবস্থা কেবল নারীদের অধঃস্তন ব্যস্তবতা থেকে পরিত্রান দেয়নি , অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সহ জীবনের প্রায় সবলস্তরেই নারী পুরুষের মধ্যে বহুলাংশে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল ।

১৯৫১ সালে ভ্যাটিকানের পোপ প্রায়াস টুয়েলভথ নারীদের জন্মনিয়ন্ত্রন , গর্ভপাত ও বিবাহ বিচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য নতুন করে উদ্যোগ নেন ।

১৯৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হবার পর আইজেনহাওয়ার দেশকে এক ধরনের ধর্ম রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করার চেষ্টা করেন । ষাট এর দশকের শুরু থেকেই আমেরিকার গোঁড়া চার্চগুলি জন্মনিয়ন্ত্রণ , গর্ভ সর্ম্পকে চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ , গর্ভপাত প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে । নানা ধণনের সংস্থাও গড়ে ওঠে । ১৯৬৮ সালে ভ্যাটিকানের নতুন পোপ পল্‌তসক্‌স্থ তার রাচিত " হিউমানেই ভিটেয়ি" পুস্তকে এই জাতীয় কঠোর অনুশাসন সংঘবদ্ধ করলেন ।

১৯৭১ সালে চার্চের অনুশাসন এগুলিকে নারীদের পক্ষে পাপ ও ভ্রূণ হত্যাকে নরহত্যার সমতুল্য ঘোষনা করে শাস্তি হিসাবে ধর্ম থেকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় । এই সিদ্ধান্তের পর ইউরোপ সহ ক্যাথলিক প্রধান প্রায় প্রত্যেকটি দেশে নারীদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান গোঁড়া ধর্মীয় ব্যবস্থা পত্তনের দাবীর আন্দোলন বাড়তি উদ্যম পায় । যথা , আয়ারল্যান্ড, লোসাথো , আর্জেন্টিনা , বলিভিয়া , কানাডা , আমেরিকা , ইতালি , ফ্রান্স , জার্মানি প্রভৃতি দেশে । ফলে বহু দেশের সরকার গর্ভপাতকে বেআইনী ঘোষনা করে আইন করেছে অথবা করতে চলেছে । আমেরিকাতে ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রপতি রেগন ভাটিকানের পোপ জনপল দি সেকেন্ড যে নতুন কি কার্ড অব ম্যানয়ুল প্রকাশ করে তাতে ধর্মান্ধ সিদ্ধান্তই ঘোষনা করা হয় । পাশাপাশি লক্ষনীয় যে , ইউরোপ মূল ভুখন্ডে বিগত কয়েক বছর হলো যে নয়া নারীবাদী বহু সংগঠন আন্দোলনের আর্বিভাব ঘটেছে , সেগুলি নারীবাদী দর্শনের ধারানুযায়ী নারীদের চাকুরী ও বৃত্তি থেকে অপসারণ করার এবং একমাত্র গৃহস্থলী কাজে নারীদের যুক্ত রাখার দাবি তুলেছে । খ্রিস্টান ধর্মান্ধতা ও নারী বিদ্বেষী ভূমিকার সম্প্রতিকতম নিদর্শন হলো বসনিয়া ও ক্রোশিয়ার মুসলমান নারীদের উপর সংগঠিতভাবে খ্রিষ্টান সার্ভ বাহিনীর অত্যাচার । এতে লক্ষাধিক মুসলমান নারী ধর্ষিতা ও গর্ভবতী হয়েছেন । রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর হাতে ধৃত দুষ্কৃতকারীদের জবান বন্দীতে জানা গেছে যে , মিলিশিয়াদের উপর সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে মুসলমান

রমনীদের এমনভাবে ধর্ষন করতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে খ্রিষ্টানের জননী হন । ইসলাম ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসাবে যে গুলি ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে, যেমন সৌদি আরব , ইরান , ওমান , আফগানিস্তান পাকিস্তান , কুয়েত , সুদান প্রভৃতি দেশে নারীদের বিষয়ে ধর্মীয় বিধিকে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত করা হয়েছে । প্রাপ্ত বয়স্কা বিবাহিতার যৌন অপরাধের জন্য পাথর ছুঁড়ে হত্যা , বাধ্যতামূলক ভাবে বোরখা পরা , প্রকাশ্য স্থানে চাকুরী বা একাকী চলাফেরা করা বন্ধ , জন্ম নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাকে অ-ইসলামি ঘোষনা , পুরুষের একচ্ছত্র তালাকের অধিকার , উত্তরাধিকার ও সম্পত্তিতে নারীদের কার্যত স্বীকৃতি না দেওয়া , পুরুষের বহু বিবাহের অধিকার , নারীদের জন্য আধুনিক শিক্ষা বন্ধ , স্কুলে একসাথে ছেলেমেয়েদের পড়া নিষিদ্ধ , বিচারকালে নারীর স্বাক্ষ্যকে পুরুষের সমান হিসাবে গন্য না করা , খেলাধুলাতে নারীদের অংশ গ্রহন নিষেধ ও ১২ বৎসরের উর্ধ্বে নারীদের প্রকাশ্য খেলা দেখাও বন্দ প্রভৃতি হলো এইসব - আইনের বিভিন্ন দিক । ইসলাম ধর্মীয় রাষ্ট্রে এখনও পরিণত না হলেও সম্প্রদায়িক শক্তির প্রবল চাপ এখন মিশর , ইরাক , লিবিয়া , জর্ডন , বাংলাদেশ , আলজিরিয়া , সিরিয়া , মরক্কো , টিউনিসিয়া, তুরস্ক প্রভৃতিতে পড়তে শুরু করেচে । এই পরিস্থিতির চাপে দেশগুলি কোন কোনটিতে নারীদের ক্ষেত্রে তৈরী হয়েছে কিছু গোঁড়ামিমূলক আইন তাছাড়া প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত বর্তমান আজারবাইজান , উজবেকিস্তান , আর্মেনিয়া , মোলদাভিয়া , জর্জিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রেও মুসলিম সম্প্রদায়িক শক্তি এখন নারীদের প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে অনুরূপ ব্যবস্থা চালু করতে শুরু করেছে । আন্তর্জাতিক স্তরে ইসলাম সম্প্রদায়িকতা বিস্তার ইরান " ওয়ার্ল্ড আর্গনাইজেশন অব ইসলামিক লিবারেশন মুভমেন্ট " এবং সৌদি আরব অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ইনস্টিটিউট অফ মুসলিম মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স নামে দুটি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে । এগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বিপুল অর্থ দেওয়া হয় ইসলাম সাম্প্রদায়িকতা প্রসার ও তার প্রয়োজনীয় সংগঠন আন্দোলন বিস্তারের জন্য যার অন্যতম উপাদান হলো নারী প্রসঙ্গে ইসলামী মতাদর্শ প্রচার । এই সব সংস্থাগুলি মদতে সংখ্যালঘু ইসলাম অধ্যুষিত দেশগুলিতে ও যাতে রাষ্ট্র নারীদের জন্য অনুরূপ আইন তৈরী করে , সেইমতো রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয় । হিন্দুরা কম বেশি বাস করেন পৃথিবীর ৮৮ টি দেশে , যেমন ভারত , নেপাল , মরিসাস , গুয়ানা , সুরিনাম , ত্রিনিদাদ, টোবাগো , ভূটান, শ্রীলঙ্কা , বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা , ইন্দোনেশিয়া , পাকিস্তান , ইংল্যান্ড , কানাডা , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি । ভারতের হিন্দুবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি এই দেশগুলিতেও শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে । অনাবাসী ধনী ভারতীয় হিন্দুদের অনেকেই স্থানীয় মৌলবাদী সংস্থাগুলির মাধ্যমে ভারতের মূল সংগঠন গুলিকে আর্থিক সাহায্য করে থাকে ।

গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ক্রোশিয়ার সম্রাট - খ্রীষ্টান ধর্মীয় ধারনার সাথে নারীদের প্রসঙ্গে যে বক্তব্য বলেছিলেন নাজী জার্মানীতে হিটলার এই শ্লোগানই দিয়েছিলেন - ইংরেজী হরফের

তিন 'কে' ক্রোচি , কুচি অ্যান্ত কিন্ডার (চার্চ রান্না ঘর ও সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি) আধুনিক খ্রীষ্টান মৌলবাদীদের স্লোগান একই , মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড মুঘফিরতিয়া , জুন্দু , আল্লা মুন্মাজামাত আল জিহাদ সিরিয়ার ন্যাশনাল এ্যালায়েন্স ফর লিবারেশন অব সিরিয়া ইরাক ও কুয়েত " অল দাওয়া বাহারিনে ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট লেবাননে পার্টি অব আল্লা , হিজবোল্লা ও " ইসলামিক আমন " আলজিরিয়ার " ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট" বাংলাদেশে ও ভারতের " জামাত ই - ইসলামি " প্রভৃতি সংগঠন নারীদের সম্পর্কে হুবহু একই দাবি তুলেছে । ইতিহাস ও সাহিত্যের পাপ থেকে সংকলিত কিছু ঘটনাবলি যা আধুনিক বিশ্বে তথা ভারত বর্ষে আলোরন সৃষ্টি করেছিল ,

যেমন - ১৮১৮ সালে রামমোহন রায়ের সহমরন বিষয়ক " প্রবর্ত্তক ও নির্বত্তকের সংবাদ " প্রকাশিত । ১৮১৯ সালে কলকাতার গৌরী বাড়িতে বাঙালি মেয়েদের জন্য ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির উদ্যোগে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় । একই সালে রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক " প্রবর্ত্তক ও নির্বত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ প্রকাশিত হয় ।

১৮২৯ সালে ৪ই ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বিধিতে স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সতীদাহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয় ।

১৮৪৯ সালে বাংলায় প্রতিষ্ঠানিক নারী শিক্ষার সূচনা । মে মাসে জে.ই.ডি বেথুন কলকাতায় স্থাপন করলেন ক্যালমাটা ফিমেল স্কুল , পরে যেটি বেথুন স্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে । ১৮৫৫ সনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক) প্রকাশিত হয় ।

১৮৫৬ সালে ৩৬ শে জুলাই , বিধবা বিবাহ , আইন প্রবর্তিত হয় । বঙ্গ মহিলা রচিত সর্ব প্রথম পুস্তক কৃষ্ণকামিনী দাসীর চিত্র বিলাসিনী প্রকাশিত হয় । উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হিসাবে পুত্রের সঙ্গে কন্যার স্বীকৃতি লাভ হয় ।

১৮৬৩ সালে "বামাবোধিনী " পত্রিকার প্রকাশ । প্রধান উদ্যোক্তা ও সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত । উদ্দেশ্য ছিল অন্তঃ পুরের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো ।

১৮৬৮ সালে রাম সুন্দরী দেবীর " আমার জীবন " বাঙালী মহিলার লেখা প্রথম আত্মজীবনী । (মতান্তরে ১৮৭৬), ১৮৮২ সালে মহারাষ্ট্রীয় নারীবাদী পত্রিকা রামাবাই কর্তৃক " আর্য মহিলা সমাজ" এর প্রতিষ্ঠা । (মতান্তরে ১৮৮৩ সালে) বাংলার প্রথম দুই মহিলা স্নাতক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও চন্দ্রমুখি বসু । ১৮৮৬ পরিচালিত প্রতিষ্ঠান । ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতিসূচক আইন (Age of Consent bill) পাশ হয় । ১৯০৪ সালে রোকেয়ার বিপ্লবী প্রবন্ধ " আমাদের অবনতি " প্রকাশিত হয় নবনূর পত্রিকায়।

১৯১০ সালে ভারতে পর্দানষিন মহিলাদের শিক্ষার জন্য সরলা দেবী " ভারত স্ত্রী মহামন্ডলী" স্থাপন করেন ।

১৯১৩ সালে শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ের " নারীর মূল্য " প্রকাশিত হয় ।

১৯২০ সালে ভারতীয় নারীদের প্রথম ভোটাধিকার লাভ মাদ্রাজ প্রদেশে , ১৯২১ এ বম্বেতে এবং বাংলায় ১৯২৫-এ

১৯২৭ সালে অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স (ALWE) এর প্রতিষ্ঠা যার প্রথম অধিবেশনটি হয় পুনেতে ।

১৯২৯ সালে বাল্য বিবাহ নিরোধক আইন পাশ হয় যার ফলে মেয়েদের বিবাহের ন্যুনতম বয়স ১৪ এবং ছেলেদের ১৮ । ১৯৪৩ সালে ৭-৮ মে কলকাতার ওভারটুন হলে প্রথম প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । সভানেত্রী ছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী।

১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইন পাশ ।

১৯৬১ সালে পণ প্রতিষেধ আইন (Dowry prohibition Act) বলবত হয় যাকে পরবর্তী কালে ১৯৮৪ এবং ১৯৮৬ সালের সংশোধনীয় মাধ্যমে আরও কার্যকরী করে তোলা হয়েছে । অবশ্য কেন কয়েকটি রাজ্যে পণ প্রথা এখনও ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে ।

১৯৭১ সালে মেডিকেল টারমিনেশন অব প্রেগন্যান্সি আইন বলবত । শারীরিক প্রয়োজনে এবং অবাঞ্চিত মাতৃত্বের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এই আইন বিধিবদ্ধ হয় ।

১৯৭৪ সালে স্টেটাস কমিটির রিপোর্ট Towards Equality প্রকাশ হয় । " মথুরা রেপ কেস" (১৯৭২) সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতিবাদে দেশব্যাপী নারী আন্দোলন সংগঠিত হয় ।

১৯৭৬ সালে নারী শ্রমিকের পুরুষের সমান মজুরি পাওয়ার দাবি স্বীকৃত হয়েছে । ১৯৮৩ সালে রেপ বিল সংশোধন করা হয় । বিচার হবে বদ্ধ ঘরে এবং নির্যাতিতার নাম প্রকাশ করা হবে না।

১৯৮৬ সালে ঐতিহাসিক শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে যে বির্তক ও প্রতিরোধের সৃষ্টি হয় তারই পরিপেক্ষিতে মুসলমান মহিলাদের বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত অধিকার সুরক্ষা The Muslim women(Protection of rights or divorce Bill) নামক বিলটি পাশ হয় । ১৯৮৫ সালের ২৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট শাহবানু মামলায় ভূপাল হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে শাহবানুকে প্রতিমাসে ২৫ টাকার পরিবর্তে ১৭৯.১০ টাকা খোরপোষ পাবার অধিকার দান করে । এর বিরুদ্ধে মৌলবাদীরা যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে তার কাছে তৎকালীন সরকার এমনকী শাহবানু পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং নতি স্বীকারেরই ফল হল উপরোক্ত আইনটি ।

১৯৮৭ সালে ৪ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের দেওরালায় ১৮ বছরের রূপকানোয়ার " সতী" হলেন । এর পর প্রবল জনমতের চাপে পড়ে ভারত সরকার ১৯৮৭ সালেই সতীদাহ প্রতিরোধ আইন পাশ করে । 'সতী' হওয়ার চেষ্টা কিংবা এই প্রথা চালু রাখার ব্যাপারে কোন ও উদ্যোগে নেওয়া দুইই এই আইন অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গন্য হবে । ১৯৯১ সালে জাতীয় মহিলা কমিশন গঠিত হয় । ১৯৯৭ সালের ১৩ই আগষ্ট , ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রায় দান করে । ১৯৯৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী , নাবালক সন্তানের উপর মায়ের অভিভাবকত্বের অধিকারকে স্বীকৃতি দিল সুপ্রীম কোর্ট ।

২০০০ সালে কলকাতা হাইকোর্ট আবার অধিকার বিবাহবিচ্ছেদ মুসলমান মহিলাদের পুন বিবাহ না করা পর্যন্ত খোরপোষ পাবার অধিকারের পক্ষে রায় দান করে । এই রায়ের ফলে পরবর্তী বিবাহ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত মুসলমান মহিলারা - " The muslim women (Protection of Rights on Divirce bill) বলবৎ থাকা সত্বেও ইদ্দৎকাল এর পরেও খোরপোষ পেতে পারেন।

১৯৭২ সালে মেরি উলস্টোক্রাফটের " A virdication of the Right of women" নামক গ্রন্থের প্রকাশ , বইটির প্রকাশের পর যথেষ্ঠ সমালোচিত হলেও পরবর্তী কালে দেড়শো বছরের ব্যবধানে এটিই নারী বাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক আকার গন্থ হিসাবে বিবেচিত হয় ।

১৮৩৭ সালে আমেরিকায় প্রথম দাস প্রথা বিরোধ নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ।

১৮৪৮ সালের ১৯ -২০ শে জুলাই " সেনেকা ফস্ কন্ভেনশন " নামে খ্যাতি লাভ করে নারী অধিকার আন্দোলনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নিউইয়র্কের সেনেকা ফস্স - এ ।

১৮৫৭ সালের ৮ ই মার্চ , আমেরিকায় বস্ত্রশিল্পের মহিলা শ্রমিকদের দৈনিক ১০ ঘন্টা কাজ ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় । ১৮৯৩ সালে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সাফাজেট (Suf-fragette) আন্দোলন সাফল্য লাভ করল । মহিলারা প্রথম ভোটাধিকার পেলেন । নিউজিল্যান্ডে ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেন হেগেল কমিউনিষ্ট নেত্রী ক্লারা ভোটকিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে গৃহীত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্যাপনের প্রস্তাব ।

১৯১৪ সালের ১৮ ই মার্চ , প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় ।

১৯১৮ সালে ব্রিটেনের মহিলাদের ভোটাধিকার লাভ ;

১৯২০ সালে আমেরিকার মহিলাদের ভোটাধিকার লাভ ।

১৯২১ সালে মারী স্টেপস ব্রিটেনে প্রথম নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র চালু করেন ।

১৯২৯ সালে ভার্জিনিয়া উলফের 'A Room of one's own' প্রকাশিত এই প্রখ্যাত

গ্রন্থে লেখিকা দাবি করেন যে , নারীদের যদি নিজস্ব পরিসর দেওয়া হয় , তাদের সৃজন ও সমান উৎকর্ষ অর্জন করবে।

১৯৪৯ সালে পরবর্তী সমস্ত নারীবাদী চিন্তা ও আন্দোলনের অগ্রদূত সিমেনদ্য রোভোয়ারের " The Second Sex" প্রকাশিত হল । বইটিতে লেখিকা বললেন , সমাজ পুরুষের তৈরী করেছে সদর্থক রূপে এবং নারী ( ) নগ্ন রূপে , দ্বিতীয় লিঙ্গ বা পুরুষের 'অপর' হিসাবে । ফলে অস্বীকার করা হয়েছে নারীর স্বকীয়তা ও তার দায়িত্ব বহনের অধিকারকে । এই বইতে লেখিকার বিখ্যাত উক্তি হল " কন্যা সন্তান নারী হয়ে জন্মায় না , সমাজ তাকে নারী করে তোলে" ।

১৯৬৩ সালে আমেরিকান নয়া - নারীবাদ প্রচারক প্রথম বই বেটি ফ্রেডানের " The Feminine Mystique" এর প্রকাশ হয় । বইটিতে সিমোন দ্য বোভায়ারের ধারনাটিকেই গ্রহন করেন ফ্রেডান । নারী পুরুষের " অন্য " অংশ হিসাবেই সমাজ ও ইতিহাস চিহ্নিত । আমেরিকান নারীদের একটি প্রাঞ্জল পর্যালোচনাও আমরা এখানে দেখি ।

১৯৭০ সালে কেট মিলেট এর " Sexual politics " প্রকাশিত হল । পাশ্চাত্যে নারী বাদী চিন্তা চেতনায় 'পিতৃতন্ত্র ' সম্পর্কিত ধারনার স্পষ্ট আকার ধারন করে এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর । কেট মিলেট-ই সর্ব প্রথম নারী পুরুষের সম্পর্ককে রাজনৈতিক সর্ম্পক বলে চিহ্নিত করেন এবং জনন ও যৌনতা সম্পর্কিত এই নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনাই দ্বিতীয় ধারার নারীবাদী চিন্তার পথ প্রস্তুত করে ।

১৯৭২ সালে প্যাট কারবাইন , গ্লোরিয়া স্টেনেম প্রমুখ Ms. পত্রিকার প্রকাশ করলেন । Ms. এই প্রথম নারীবাদের কথা সকলের সামনে তুলে ধরেন ।

১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসাবে এই বছরটি চিহ্নিত করল রাষ্ট্রসংঘ । সাম্য উন্নয়ন , এবং শান্তির স্লোগান কণ্ঠে নিয়ে আন্তজার্তিক নারীবর্ষ পালিত হল । আন্তর্জাতিক নারীদশকের শুরু মেক্সিকোতে ১৯ জুন , ২রা রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে প্রথম বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ।

১৯৭৯ সালে মেয়েদের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্য বিলাপের জন্য দাবিসনদ রাষ্ট্রপুঞ্জে গৃহীত হয় ।

১৯৮০ সালে কোপেন হেগে এ অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বনারী সম্মেলন ।

১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন ।

১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন । ১৯৯৫ সালে সাম্য উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে বেজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ।

১৯২৫ সাল থেকেই ভারতে মুসলমান নারীদের জন্য শরিয়তি আইন চালু করার দাবি তুলেছিল

জমিয়ত - উলেম -ই - হিন্দ । ১৯৩৫ সালে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অনুরূপ কিছু আইন চালু করতে সাম্প্রদায়িক শক্তি সক্ষম ও হয় । ১৯৩৫ সালেই ফেডারাল লেজিসলেটিব অ্যাসেম্বলিতে তারা এ ধরনের কিছু আইনও পাশ করতে সাফল্য পায় । ১৯৩৭ সালে মৌলানা আসরফ তনভি রচিত । " অল হিতলাত নাজি জালিল হ্যালিম্মাৎ অল আজা' পুস্তক অনুযায়ী ও শরিয়ৎ ভিত্তিক আর একটি বিল তারা ফেড়ারেল লেজিসলেটিভে পেশ করেন । ১৯৩৯ সালে সেটিকে আংশিক গ্রহন করে আইনও পাশ হয়। স্বাধীনতার পর স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৯৫৪ , ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড ১৯৭৩ এবং দি অ্যাড পশন বিল ১৯৭২ কে কেন্দ্র করে মৌলবাদীরা ভারতে সাধ্যমত প্রবল সম্প্রদায়িক উন্মাদনা ছড়ায় । ১৯৮৫ সালে শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে তারা সারা দেশে জিহাদ' ঘোষনা করে । ভারতের আইন কমিশনের ১৯৬০ সালের পঞ্চদশ রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সরকার ১৯৬২ সালে ক্রিশ্চিয়ান ম্যারেজ অ্যাক্ট ম্যাট্রিমনিয়াল কলেজ বিল পার্লামেন্টে পেশ করলেও খ্রিস্টান চার্চের চাপে তা পাশ হতে পারে নি । ১৯৮৩ সালেও আইন কমিশনের রিপোর্ট এর পরিনাম একই দাঁড়ায় । ১৯৮৬ সালে সুপ্রিম কোট মেরিরায় বনাম কেরালা সরকার ও অন্যান্য মামলাতে ঐতিহাসিক রায় দিয়ে খ্রিস্টান নারীদের পুরুষের সমান উত্তরাধিকার দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষনা করলে দেশের অধিকাংশ চার্চ ব্যাপক প্রতিবাদ জানায় ও বিক্ষোভ সংগঠিত করে। একেই সাথে ভারতের বিবাহ বিচ্ছেদ আইনকে আরও কঠোর ভারে খ্রীষ্টান মহিলা বিরোধী করার দাবিও তোলে এরা ।

১৯৫৫ সালের হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট এবং ১৯৫৬ সালের হিন্দু সাকশেসন অ্যাক্ট এ পুরুষের এক বিবাহ, পিতার সম্পতিতে কন্যার ও ভ্রাতার সমান অধিকার প্রভৃতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও মৌলবাদীর দেশব্যাপী তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল । ১৯৮৭ সালে রাজস্থানে রূপ কানোয়ারকে জোর করে সতী তথা স্বামীর চিতায় সহমরনে বাধ্য করার পর 'সতী প্রিভেনশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল রচনা হয়। এ সব সত্যেও মধ্যযুগীয় প্রথা শেষ হলেও একটি প্রথা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি যার নাম " পণপ্রথা" । আমার মনে হয় পণ প্রথা সামাজিক অভিশাপ । দেশের শত শত মেয়ের জীবনে পণপ্রথার করাল গ্রাস জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে । আজও পণের টাকা দিতে না পেরে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার বিপদাপন্ন হন । প্রতিষ্ঠানের খবরের কাগজের শিরোনাম পণের জন্য বধূ নির্যাতন , বধূ হত্যা , বধূ পুড়িয়ে মারা ইত্যাদি ইত্যাদি । পণপ্রথার প্রকোপ যেন দিনে দিনে বাড়ছে । আগে পণ ছিল শুধু টাকা ও গহনা , আজ আরো অন্যধরনের, ফ্রিজ , টি.ভি গাড়ী আরো মূল্যবান সামগ্রী , এ ক্ষেত্রে যেন শিক্ষিত / অশিক্ষিত কোন ভেদাভেদ নেই । ডাক্তার , ইঞ্জিনীয়ার , বড় চাকুরীওয়ালা যেন পনের বড়ো দাবিদার । হয়তো ভাবতেও অবাক লাগে যখন এ সমাজের শিক্ষিত লোকগুলি এই বর্বরোচিত পণ

প্রথাকে পশ্রয় দিয়ে হতভাগ্য পিতাদের রাস্তায় নামিয়ে দেয়.। সত্যিই ভবিষ্যৎটা কি বলা মুশকিল ? পণপ্রথার বিরুদ্ধে এত আইন আছে আর - আইনের ভয়ে এই প্রথাটিকে প্রাকাশ্য রাস্তা ছেড়ে সুকৌশলে গোপন রাস্তা ধরেছে এ যেন গুপ্ত ভয়ংঙ্কর ব্যাধি । আমাদের সবার উচিত এই ভয়ংঙ্কর ব্যাধির প্রচার মাধ্যম থেকে শুরু করে ব্যাক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে খোলামনে পণপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। তাহলে হয়ত এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে । মনে হয় প্রতিনি..ত লেগে থাকাই বেঁচে থাকা । এ ভাবেই সমাজ বাঁচতে পারে । মাথা উচু করে নিতে পারে কুসংস্কার মুক্ত নতুন সমাজ ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ সমস্যা এবং সমাধানসুত্র

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা মুলত শুরু হয় সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে যখন মানুষ একত্রে বসবাস করতে শেখে ।একত্রে বসবাসের মধ্যে অবসর বিনোদনের প্রচুর সময় পাওয়া যায় । যদিও মানুষের উন্নত চিন্তাধারা পৃথিবীকে নতুন করে সাজানোর চিন্তা শুরু করে । প্রকৃতির উপর জয় পাওয়ার নেশায় মানুষ একের পর এক সৃষ্টি করে চলেছে, আধুনিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি । বিজ্ঞানের বিস্তৃত জ্ঞান মানুষকে শিখিয়েছে রোগ প্রতিরোধ করা । মৃত্যুর হার কমানো । শিক্ষা ও আধুনিক চিকিৎসার ফলে মানুষর গড় আয়ুস্কাল বেড়েছে । বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার সমস্যা নিয়ে সকলেই উদগ্রীব কারণ যে হারে মানুসের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে ।একদিন হয়ত খাদ্য , বাসস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হবে । বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি জ্বলন্ত সমস্যা । তিনটি বিষয় দেখলে তা পরিষ্কার হয়ে যায় ।(১) জনসংখ্যার ঘনত্ব ,জন্মের হার বয়ঃসীমা জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সর্তকতা , পাশাপাশি অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল , ছোট পরিবারের সুবিধা , স্বাস্থ্য , জনসংখ্যার ঘনত্ব , ভুমি সংস্কার , জীবনের মানোন্নয়ন ও লোকসংখ্যার সম্পর্ক , বিভিন্ন বয়সের লোকসংখ্যা , বিশ্বে জনসংখ্যার ঘনত্ব , জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমানো . জীবনের মান বাড়ানো , খাদ্যের মান বাড়ানো , ক্ষুধা নিবারন , পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি, অন্তত ঃ ৫০ হাজার বছর আগে , এবং বৃদ্ধির কারণ জন্ম হার বৃদ্ধি , মৃত্যুর হার কমে যাওয়া , একরাষ্ট্র থেকে অন্যরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ , ১০ হাজার বছর আগে থেকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বাড়াতে থাকে আজ তা এক বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে ।

পৃথিবীতে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি

বৎসর	সর্বমোট জনসংখ্যা (বিলিয়ন)	জনসংখ্যার বৃদ্ধির গতি প্রকৃতি পৃথিবীতে
১২,০০০ বি.সি.	১০ ছয়গুন বেড়েছে	১৩,৬৫০ বৎসরে
১ এ.ডি	৫৪৫ দ্বিগুন বেড়েছে	২০০ বৎসর
১৬৫০ ,,	৭২৮ দ্বিগুণ বড়েছে	১০০ বৎসর
১৭৫০ ,,	১১৭১	
১৯৭৮ ,,	৩৯০০	
১৯৯৮ ,,	৫৯০০	৩৫ বৎসরে দ্বিগুন
২০০০ ,,	১২ অক্টোবর ৬ বিলিয়ন অতিক্রান্ত	

জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতের তুলনা

বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায় । ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল ১০১১ কোটি , ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ২১১৩ কোটি , ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ২২৪.৬ কোটি , ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ২৪৯.৫ কোটি, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯১.৭ কোটি ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ৩১৭.৬ কোটি এবং ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪১২ কোটিতে পরিণত হয় । কিন্তু এই জনসংখ্যার বৃহত্তম সংখ্যাই এশিয়া মহাদেশের অধিবাসী । এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের জনসংখ্যা একযোগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে । ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে চীনের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১২৫ কোটি এবং ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৬৮.৩৮ কোটি একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়াকে বাদ দিলে আমেরিকা ও ইয়োরোপের জনসংখ্যার দ্বিগুন অপেক্ষা ও বেশী লোক আফ্রিকাও এশিয়ায় বসবাস করে ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রচন্ড সমস্যা ভারতের মত উন্নয়ণশীল দেশে এক দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িঁয়েছে তুলনামূলক পাশ্চাত্য দেশগুলোতে জনসংখ্যার সমস্যা ততটা প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি । কারণ সেখানে নতুন নতুন ভূমির আবিস্কার ও শিল্প কারখানা তৈরী দারিদ্রতা ও খাদ্যভাব দূর করতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করেছে । উপরন্তু পাশচত্য দেশগুলোতে শিক্ষার হার বেশী হওয়ায় দেশগুলির মধ্যে গণচেতনার উন্মেষ ঘটেছে এবং দ্রুত জনসংখ্যা প্রতিরোধে পরিকল্পনাগুলো সফল হয়েছে । বরংচ কোন কোন দেশে জনসংখ্যার হার খুব বেশী কমে গিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে । কিন্তু আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্দি অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । আমাদের দেশের জনসংখ্যার হার দ্রুত বর্ধমান এখনোও আমরা দরিদ্রতা ও অশিক্ষার

অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে সচেতন হতে পারেনি ।

ভারতবর্ষে জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা

১৮৯১ এ ভারতবর্ষে জনসংখ্যা ছিল ২৩৬.৬ মিলিয়ন , বৃদ্ধির হার ছিল, এতো বেশী ছিল না কিন্তু ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এ জনসংখ্যা ছিল ২৩৮.৩ মিলিয়ন সাথে বৃদ্ধির হার ছিল ০.২ । ১৯১১ , ১৯২১ , ১৯৩১ , ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ছিল , ২৫২.০ , ২৫১.২ , ২৭৮.৯ , ৩১৮.৫ অর্থাৎ জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল এই সময়ে ৫.৮ থেকে ১৪ পর্যন্ত । ১৯৬১ থেকে জনসংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে সংখ্যা দাড়ায় ৪৩৯.১ মিলিয়ন এবং ১৯৭১ এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪৭.৯ অর্থাৎ বৃদ্ধির হার এক লাফে দাঁড়ায় ২৪.৬ এ । বর্তমান জনসংখ্যা ভারতে প্রায় ১০০০০ মিলিয়ন এর উপর এবং বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে ১৬ জন । এই গতিপ্রকৃতি যদি চলতে থাকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত ভারত বিশ্বের সর্বাধিক লোকসংখ্যা গত দেশ বলে পরিগনিত হবে । যদিও চেষ্টা চলছে ২০৪৫ সাল পর্যন্ত যাতে জনসংখ্যা ১১০ কোটির মধ্যে থাকে ।

মিলিয়ন ভিত্তিক হিসেবে জনসংখ্যার হিসেব নিম্নরূপ

বছর	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন হিসেবে)	বৃদ্ধির হার
১৮৯১	২৩৬.৬	
১৯০১	২৩৮.৩	০.২
১৯১১	২৫২.০	৫.৪
১৯২১	২৫১.২	০.৩
১৯৩১	২৭৮.৯	১১.০
১৯৪১	৩১৮.৫	১৪.২
১৯৫১	৩৬১.০	১৩.৩
১৯৬১	৪৩৯.১	২১.৬
১৯৭১	৫৪৭.৯	২৪.৬
১৯৮১	৬৮৪.০	২৭.০
১৯৯১	৮৪৪.০	২৩.৪
২০০১	১০২৭.০	২১.৭

উপরোক্ত জনগণনার হিসেব অনুযায়ী ভারতে জনসংখ্যার তিন ধরনের গতি প্রকৃতি দেখা যায়। প্রথম ধাপে ১৮৯১ - ১৯২১ এ বৃদ্ধির হার ছিল না ততবেশী। দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ ১৯২১ - ১৯৫১ বৃদ্ধির হার ছিল সাধারণ থেকে ১৪ পর্যন্ত । তৃতীয় ধাপে -১৯৫১ এর পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রচন্ডভাবে বেড়ে যায়

(২৫- ২৬) জনসংখ্যা দ্বিগুন বেড়ে যায় ২৫১.২ মিলিয়ন । ১৯২১ সালে আর ১৯৭১ সালে ৫৪৭.৯ মিলিয়ন সময়টা মাত্র ৫০ (পঞ্চাশ)বছর । প্রতি বছর ১৫.৫ মিলিয়ন লোকসংখযা আমাদের দেশে যোগ হচ্ছে এই গতি চলতে থাকলে প্রতি ৩৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুন হবে । ১১ই মে ২০০০ পর্যন্ত জনসংখ্যা ১ বিলিয়ন স্পর্শ করেছে ।

কারণ সরকারী তথ্য অনুযায়ী ১০০০ মিলিয়ন শিশু জন্ম নিয়েছে ১ ১মে ২০০০ , সময় ১২৫৬ মিনিট , দিল্লীর সফদজং হাসপাতালে ,ওই দিনের শেষ শিশুটির নাম অষ্ট , সাধারণ ঘরের সন্তান , অঞ্জনা ও অশোক আরোরার । পাশাপাশি ৫ বিলিয়ন শিশু পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে ১১ই জুলাই ১৯৮৭ ইং তে এবং দিনটিকে " পৃথিবীর জনসংখ্যা দিবস " হিসাবে প্রতি বছর পালিত হয় ।

সবকিছুর নির্দিষ্ট সীমা আছে । মানুষের চাই খাদ্য , বাসস্থান , পরিবেশ , সুতরাং মানুসের স্বার্থেই সুন্দর পৃথিবীর জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ জরুরী হয়ে পড়েছে ।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ থমাস আর মালথুস এর মতে ১৭৭৮ সাল পর্যন্ত ক্ষুদা , সংক্রামক ব্যাধি বন্যা , ভুমিকম্প এর কারনে জনসংখ্যার ব্যালান্স সৃষ্টি হতো ।

অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় জনসংখ্যা , আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গুলো প্রতিনিয়ত বাধার সম্মুখীন হচ্ছে দেশের অস্বাভাবিক জনসংখ্যার ফলে দেশের ভবিষৎ আশংঙ্কা তীব্রতর হচ্ছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে উৎপাদক ব্যবস্থা ও বন্টন পদ্ধতি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে । দরিদ্র দেশে বিপুল জনবসতি নিয়ে দেশ প্রতিনিয়ত বিব্রত । এখনো প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসম্পদের সুষ্ঠ অর্থনৈতিক সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়নি । যা দূরদর্শী , সুষ্ঠ পরিকল্পনা প্রয়োজন সর্বস্তরে।

আমাদের দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির নানাহ কারণ আছে । আমাদের দেশ আবহাওয়াগত ভাবে গ্রীষ্ম প্রধান দেশ যা লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুকুল । হয়ত বিবাহ ব্যবস্থা , কারণ বিবাহ আমাদের দেশের এক আবশ্যিক কর্ম , উপার্জনের চিন্তা ও অনেক সময় বিবেচ্য হয় না । শিক্ষিত পরিবার গুলো ব্যাতীত এদেশে এখনোও বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত । তৃতীয় দারিদ্র , অশিক্ষিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ , চতুর্থত , বন্যা , খরা নিয়ন্ত্রনের ফলে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি নিবারিত । মৃত্যুহার হ্রাসপ্রাপ্ত, মহামারী নিয়ন্ত্রিত ও জনসংখ্যা ক্রমবর্ধিত। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বাস্থের যত্ন , ভাল চিকিৎসার ফলে মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রন, রোগ থেকে রক্ষা । আধুনিক পদ্ধতিতে শিশুর যত্ন , খাদ্যাল্পতা নিয়ন্ত্রন , উপযোগী খাবার, সংক্রামক ব্যাধির নিয়ন্ত্রন , নিরক্ষরতা ও গ্রামীন ধর্মান্ধতা , ছেলে সন্তানের জন্য উদগ্রীব ও অস্বাভাবিক ইচ্ছা , গ্রামীন এলাকাতে আনন্দের অভাব , বৈচিত্রতা কম ফলে যৌনতার প্রতি বিশেষ আকর্যন ।

কেবল ভারতবর্ষেই বিশ্বের ১৬ % লোক বসবাস করে ।

জনসংখ্যা ঘনত্বের ফল

ভুমির পরিমান কমে যাচ্ছে , কৃষি ও লোকসংখ্যার আধুনিক অনুপাত , সর্বশেষ গণনা অনুযায়ী চীনের সর্বাধিক লোকসংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে লোকসংখ্যা - ১২৩৪ মিলিয়ন । পৃথিবীর মধ্যে বেশী জনসংখ্যার বৃদ্ধি - কেনিয়া , (৫.৫ %)

ঘন জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশ।

কম জনসংখ্যার দেশ গ্রীনল্যান্ড ।

ঘন লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে (৭৬৬/কিমি)

ছড়ানো ছিটানো লোকসংখ্যা অরুনাচল প্রদেশ (১০ কিমি২)

টৌকও সর্ববৃহৎ শহর লোকসংখ্যা ২৬.৫ মিলিয়ন ।

মুম্বাই ভারতের আধুনিক শহর লোকসংখ্যা - ১৮.৯ মিলিয়ন ।

উত্তর প্রদেশে ভারতের সবপ্রদেশ চাইতে বেশী , লোকসংখ্যা - ১৩৮ , ৭৬০ , ৪১৭ জন।

সর্বশেষ লোকগণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী নাগাল্যান্ডে , বন সম্পদের উপর চরম আঘাত আসছে । বনসম্পদ নষ্টের ফলে বন্যা ও ভুমিক্ষয় দেখা যাচ্ছে । প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য ভান্ডার ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে । বৃহৎ পরিবার গুলোতে সমস্যার জন্ম নিচ্ছে । শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নমান , আর্থিক অসঙ্গতির কারণে যুগোনোপযোগী শিক্ষা দিতে ব্যর্থ ।

বৃহৎ পরিবার প্রকৃত চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত । বৃহৎ জনসংখ্যা, বেকার বৃদ্ধি পাচ্ছে , সামাজিক অপরাধ উৎসাহিত হচ্ছে ।

বৃহৎ জনসংখ্যা প্রকৃতির ভারসাম্যে আঘাত হানছে এবং নতুন রোগের আমন্ত্রন দিচ্ছে । জনসংখ্যার তুলনায় জিনিষের স্বল্পতা বাড়ছে । বৃহৎ পরিবারে একমাত্র উপার্জনীয় ব্যাক্তি ফলে ঃ পারিবারিক সমস্যা , আধপেটা , অর্ধশিক্ষা , নানাহ সমস্যার জন্ম ।

বেকারত্ব এবং কোলাহল , অশান্তিকে আমন্ত্রন দেয় রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভৌগলিক বিষয়গুলি হল আবহাওয়া , জল , মাটি , খনিজপদার্থ , কলখারখানা , তৈল ইত্যাদি , যোগাযোগ ব্যবস্থা । ৫৬.৮৬ % , সবচেয়ে কম কেরালা ১৩.৯৬ %

১৯৯১ এর জনগণনা অনুযায়ী ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৮৪ কোটি বর্তমান হয়ত বা ১০০ কোটির কম নয় এর মধ্যে কর্মক্ষম জনসংখ্যা মাত্র ৫৩.৪ শতাংশ । অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন জনসংখ্যা মাত্র ৩৬ শতাংশ । সেই কারণে অনেকে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে জনবিস্ফোরন ও বলেন । এ ভাবে চলতে থাকলে উৎপাদন বৃদ্ধি , সুষম বন্টন , অর্থনীতির উপর চরম আঘাত আসতে পারে বলেই বিশেষজ্ঞ রা মনে করেন ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অর্থনৈতিক সংকট

জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিশেষ কোন আর্ন্তজাতিক সমস্যা সৃষ্টি করেনি ।ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো তখন এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অন্তভুক্ত বেশীর ভাগ অঞ্চল শাসন করতো । সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর শোষন ও শাসনের এই সব দেশের অবস্থা শোচনীয় ছিল উপরন্তু অর্থনৈতিক , বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী দিক থেকে পাশ্চাৎপদ ছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এই সব দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী শাস্তির হাত থেকে মুক্তি নাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর শক্তি বিপর্যস্ত হয় এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করতে সমর্থ হয় । পাশ্চাত্যের দেশগুলো প্রাচ্যের তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলিকে অর্থনৈতিক শোষনে জর্জরিত করে তুললেও শাসক গোষ্ঠীর সাহিত্য ও দর্শন থেকেই তারা সর্বপ্রথম সাম্য , মৈত্রী ও স্বাধীনতার বানীর সঙ্গে পরিচিতি হওয়ার সুযোগ লাভ করে । পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েই প্রাচ্য জগতের অধিবাসীরা সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে থাকে । যার ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে আত্মনিয়ন্ত্রনের প্রচেষ্টা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরোধিতার রূপ গ্রহণ করে । জন জাগরণকে প্রতিহত করার ক্ষমতা যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে নেই । সে কথা শাসকগোষ্ঠী ভালভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় । এশিয়া ও আফ্রিকা দেশগুলো যে জনশক্তিতে বলীয়ান এবং একযোগে চেষ্টা করলে শাসন গোষ্ঠীকে বিতাড়ন করা যে সম্ভব সে কথা পাশ্চাত্যের শাসকগোষ্ঠী সহজেই অনুধাবন করতে পারে । পাশ্চাত্যের শাসকগোষ্ঠী বুঝতে পেরেছিল শোষনের যুগের অবসান আসন্ন যে কথা উপলব্ধি করেই তারা অনেক ক্ষেত্রে খুব সহজেই শাসন দায়িত্ব স্থানীয়দের হাতে সমর্পন করে সসম্মানে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন । পাশ্চাত্যের শাসকরা এও বুঝতে পারেন বিশাল জনসংখ্যাকে পদানত রেখে , অনবরত শোষন করে আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় রাখা অসম্ভব সে কথাও অনুধাবন করতে পারেন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী যে আর্থিক সঙ্কটের সূচনা হয় সে জন্য সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শোষণনীতি ও যে অনেকাংশে দায়ী , তাও স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে । তা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নিজেদের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করার জন্য যে ভ্রান্ত অর্থনৈতিক পথ অনুসরণ করছে অর্থাৎ নিজ নিজ দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য অধিকৃত অঞ্চল গুলোতে কাঁচামাল উৎপাদনের এবং শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রে পরিনত করে নীতির ত্রুটির ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিশেষভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় । কৃষি পন্যের মূল্য হ্রাসের ফলে বর্তমান শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে শুরু করে । নানাহ ব্যবস্থা গ্রহন করেও অর্থনৈতিক মান রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে । সুতরাং বর্তমানে অনুন্নত এবং উন্নতিশীল দেশগুলোকে নানারূপ আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য দিয়ে উন্নত দেশগুলো

আর্ন্তজাতিক ভারসাম্য অর্থনৈতিক দিকদিয়ে বজায় রাখার চেষ্টা শুরু করেছে । অপরপক্ষে অনুন্নত ও উন্নয়ণশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাদের এই প্রচেষ্ঠা বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি । আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জনসংখ্যার সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার প্রচেষ্ঠা শুরু হয়েছে ।

জনসংখ্যার রাজনৈতিক সমস্যা

জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি যেমন অর্থনৈতিক সমস্যার সৃস্টি করছে । তেমনি এই সমস্যা মেটানোর জন্য বিশ্বব্যাপী সমবেত প্রচেষ্ঠা প্রয়োজনের কথা ও অনুভুত হচ্ছে। সম্মিলিত প্রচেষ্ঠার দ্বারা দারিদ্র , অভাব , অনটন , মহামারী , দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দূর করে পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সকলেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হচ্ছে । কারণ দেখা গেছে দুর্ভিক্ষ , মহামারী এমনকি যুদ্ধের ফলে প্রচুর লোক মৃত্যুরমুখে পতিত হলেও জনসংখ্যার ক্রম উদ্ধগতি স্তিমিত হয়নি । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তীকালে বিভিন্ন সংঘর্ষে বহুলোক মারা গেলে ও ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়নি । ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে জাতিপুঞ্জের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জনসংখ্যা ৪১২ কোটি হলেও তা এখন ৬০০ কোটির উপরে বলেই মনে করা হয় । আধুনিক যুগে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসের মতবাদ গৃহীত না হলেও এ কথা ঠিক যে অনুনত এবং দরিদ্র দেশেই জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বেশী । আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলো তা প্রমান করে । জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হ্রাস করতে হলে দরিদ্র দূরীকরণ আবশ্যক । দারিদ্রতার সঙ্গে রাজনীতি ও ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত । কারণ দরিদ্রতা অধ্যুষিত অঞ্চলেই রাজনৈতিক অস্থিরতা বেশী দেখা যায় ।

দক্ষিন - পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রধান কারণ দরিদ্রতা পাশাপাশি ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলো ও এই অভিশাপ থেকে মুক্ত নয় । দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে বিত্তবান দেশগুলো দরিদ্র দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করে । কারণ আর্থিক সাহায্য দানের প্রলোভন দেখিয়ে বিত্তবান শক্তিশালী দেশগুলো নিজেদের প্রভাব দরিদ্র দেশগুলোর উপর বজায় রাখে । আধুনিক বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ কুটনীতি তারই নামান্তর ।

জনসংখ্যা সমস্যা - সমাধানের উপায়

আফ্রিকা ও এশিয়া অনুন্নত ও উন্নতশীল দেশগুলোর খাদ্য , আশ্রয়, শিক্ষা , স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক উপায় উদ্ভাবন করা যেতে পারে । আধুনিক সভ্যতায় ব্যক্তি তার অধিকার পুরোপুরি ভোগ করতে সচেষ্ট । সুতরাং অধিকারের পথে বাধা আসলেই মানুষ সংঘর্ষের পথে যেতে কুন্ঠাবোধ করে না । মানুষ মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রা কাটাতে চায় । বর্তমান উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর মানুষ সাম্যবাদের প্রতি বিশেষ ভাবে

আকৃষ্ট । সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে শোষনহীন সমাজব্যবস্থা গড়তে মানুষ উদগ্রীব । সুতরাং নতুন অর্থনৈতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য অবসান হওয়া প্রয়োজন । জনসংখ্যা অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক অনেকে অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী । জনসাধারণ স্থানান্তরনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলে অধিক জনসংখ্যা আনয়ন করলে ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপযোগী সৎব্যবহার করলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হতে পারে । জাতিপুঞ্জের মতো সংস্থার মাধ্যমে তা না হলে সমস্যাটি বাস্তব রূপ নিতে নাও পারে । কারণ দারিদ্র দেশগুলোর সমস্যা সমাধানের কোন সুষ্ঠ নীতি এখনো হয়নি । আর্ন্তজাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সমস্যা সমাধানের অনুকুল নয় । সাম্যবাদী বা গণতান্ত্রিক দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গিও এক নয় । সংস্কীর্ণচেতা ও সন্দেহ পরায়ণতা পরিহার প্রয়োজন । জনসংখ্যা বৃদ্ধির মতো স্পর্শকাতর আর্ন্তজাতিক সংকটের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য মানুষকে উদার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষাদানের প্রয়োজন , বর্ণবৈষম্য নীতি পরিহার করা উচিত । জাতপাত , বর্ণ পরিহার করে স্বচ্ছল ও শোষনমুক্ত সমাজ গঠন করা , যার ফলে দেশ ও আর্ন্তজাতিক শক্তির ভিত্তি সুদৃঢ় হতে সাহায্য করবে।

আমাদের বিশাল ভারতবর্ষে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে দরকার শিক্ষা , পরিবার নিয়ন্ত্রন , ধর্মান্ধিতা দূরীকরণ ইত্যাদি পাশাপাশি কুফল সম্বন্ধে প্রচার , পাশাপাশি পরিবেশ , প্রাণী , বন , ভূমি জলবায়ু ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করানো বনভূমি সংরক্ষন করানো , পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন করে দেশের সমস্যা সমাধানে উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন । পরিবার পরিকল্পনা কর্মসুচীকে সার্থক রুপায়নের প্রচেষ্টা নিতে হবে । দারিদ্র ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা জন্মহার নিয়ন্ত্রনে অনেকাংশে সুফল প্রদান করবে । গনচেতনা জাগ্রত করতে হবে । জনশক্তির সাথে কৃষি বিপ্লব ও শিল্পের উন্নতি আবশ্যক । জনসংখ্যা বিশাল সমস্যা কিন্তু তারপরে ও সমাধান আছে । দরিদ্র, নিরক্ষরতা , কুসংস্কার , বিভেদনীতি , সংকীর্ণ মন এগুলো থেকে মুক্তির মাধ্যমে ও জন সচেতনতার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব । সুতরাং দোষ না চাপিয়ে আশু সমস্যা সমাধানের জন্য উপরোক্ত পন্থাতে মনোনিবেশ গঠন করা সম্ভব । যা হবে দৃষ্টান্ত । শুধু প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টার তবেই সমস্যার সমাধান সম্ভব ।

দ্বি- খন্ডিত বাংলা সাম্প্রদায়িক সমস্য আলোচনা

অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রিমিয়ার ছিলেন হুসেন শাহিদ সুরাবর্দি। দ্বি-খন্ডিত বাংলা এবং ভূমির হস্তান্তর এক হৃদয় বিদারক । ঘটনা সময় কালস্রোতে বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু ক্ষত ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী হয়ে আছে আর বয়ে গেছে মানুষের মনের আবেগে। আন্দোলন, অবরোধ, বর্জ্জন উগ্র জাতীয়তাবাদ নিয়ে তৎ পরবর্তী অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি পাশাপাশি দুঃর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িকতা, চোরাগোপ্তা আক্রমন হত্যা, দাঙ্গা, সরকার কুটকৌশল, বাংলায় বিদেশী শাসকদের আগমন, বনিক থেকে শাসক, শোষন ,সমস্তদীর্ণ বাংলা। বহিরাগত ইংরেজী শাসকদের কাছে বঙ্গ প্রেসিডেন্সী বহুদিন ধরেই দুরুহ সমস্যা উপস্থিত করেছিল । তাদের মতে প্রদেশের আয়তন ও জনসংখ্যার পরিমান সুষ্ঠ শাসন ব্যবস্থার পরিপন্থি, তাই বিভাজনের প্রথম যুক্তি ছিল এবং এই বিভাজনের পদ্ধতি কার্যত ঃ আরম্ভ হয়েছিল ১৮৭৪ সালে। যখন আসামকে বিভক্ত করে চীফ কমিশনারের কর্তৃত্বাধীন করা হয় । ১৯৯৬ সালে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা এবং চট্রগ্রাম বিভাগকে আসামের সাথে যুক্ত হয়েছিল ১৯০১ সালের আদম সুমারীতে যখন দেখা গেল বাংলার জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ তখন একটি পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল উড়িষ্যাকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে একত্রিত করা ।

এমতাবস্থায় সু -চতুর ইংরেজ শাসক কার্জনের মাথাই এই চিন্তাই উদয় হল যে " বাংলাদেশ একজনের পক্ষে নিঃসন্দেহে অতি বিশাল "। কার্জনের অপর যুক্তি বাংলা, আসাম, এবং মধ্যপ্রদেশের চতুঃসীমা -পৌরানিক, অযৌক্তিকতা ও অদক্ষতার জন্ম দেয় ।

স্যার এন্ডোফ্রেজার সেজার কতৃর্ক পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল এবং তা ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বসাধারনের কাছে বিদিত করা হয়েছে । চট্রগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা জিলা, ময়মনসিংহ জিলা আসামের ভিতর যাবে, ছোটনাগপুর যাবে মধ্যপ্রদেশ । পরিবর্তে বাংলা মধ্যপ্রদেশ থেকে পাবে সম্বলপুর এবং মাদ্রাজ থেকে পাবে গঞ্জাম ।

এই পরিকল্পনার স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছিল ।

১) বাংলার লোকসংখ্যা অধিকতর অর্থাৎ ৭ কোটি ৮০ লক্ষ তা কমে দাঁড়াবে ৬ কোটি ৭ লক্ষ ।

২) বাংলার পূর্ব্বাঞ্চলের কলকাতার কতৃত্ব থেকে মুক্ত ।

৩) পূর্ব্বাঞ্চলের জেলাগুলোর মুসলমানদের অধিক সুখ - সুবিধা ।

৪) আসামের চা - বাইরে যাওয়ার পথ ইত্যাদি ইত্যাদি ।

শেষ পর্যন্ত কার্জনের দ্বারা যে পরিকল্পনা অবলম্বিত হয়েছিল তাতে ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে ১৫টি জিলা নিয়ে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ তৈরী করা ।এর রাজধানী ঢাকা । এর জনসংখ্যা তিন কোটি (৩) ১ (এক) লক্ষ এবং তাতে মুসলমানদের প্রাধান্য ।

উপরিউক্ত যুক্তি গুলোর পশ্চাতে রাজনৈতিক কু -মতলব ছিল তা পরিস্কার কারণ কার্জন স্বদেশস্থ কর্তৃপক্ষের সাথে পত্র আদান - প্রদান শুরু করেছিল ।এটা পরিস্কার " ঐক্যবদ্ধ বাংলা এক বিশাল শক্তি " সুতরাং বঙ্গ ভঙ্গ করে ভূমির হস্তান্তর ঘটিয়ে এই সুসংহত শক্তিকে দুর্ব্বল করাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় ঃ বাঙালীরা নিজেদের একটি জাতি বলে ভেবে নিয়েছিল এবং কলকাতা ছিল রাজনীতির কেন্দ্র স্থল সুতরাং বাঙালী জাতি এবং কলকাতার প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য হরণই ছিল শাসকগোষ্ঠীর লক্ষ্য নহেতু ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতি ব্রিটিশ শাসনের জন্য বিপদজ্জনক হয়ে পড়বে ।

সুচতুর শাসক কার্জনের গোপন কু -মলতল্ গুলো সে সময় সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনি তবে এটুকু বুঝতে পেরেছিল কার্জনের মুল উদ্দেশ্য রাঙালীদের সংহতি বুকে আঘাত করা । যার ফলে জনসাধারনের কাছ থেকে এসেছিল প্রবল প্রতিবাদ।

একটি সমশ্রেণী ভুক্ত সম্প্রদায়কে খন্ড খন্ড করে দিল তাদের প্রতিবাদ করাটাই স্বাভাবিক । এই উদ্ধতি করেছিল সেক্রেটারী অফষ্টেট ।অনেক সমালোচকদের বক্তব্য হল মাত্র দশ লক্ষ লোককে সরিয়ে নিলে শাসন ব্যাবস্থার চাপ মুলতঃ হাল্কা হবে না ।উপরন্তু ব্যায় বৃদ্ধি পাবে এবং সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পারে ।কার্জনের এই পরিকল্পনার পেছনে যে সাম্প্রদায়িক মতলব ছিল তা স্পিয়ারের দ্বারা ও স্বীকৃত হয়েছে ।

স্পিয়ারের বক্তব্য ছিল - " হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল " পশ্চিমাঞ্চল এবং মুসলীম অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চল খুব সুন্দর ভারসাম্য ছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন গুলো পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করা যেতো ।

১৯০৪ সালে কার্জনের পূর্ববঙ্গ পরিদর্শনকালে এই সাম্প্রদায়িকতার কীতিই কার্জনকে মানষিক শক্তি জুগিয়েছিল এবং তার পরিকল্পনা একটি রাজনৈতিক রূপ পেয়েছিলো। তার উদ্দেশ্য ছিল

একটি মুসলীম ঐক্যের প্রাণ নাশক হয় । ১৯০৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে নবাব আতিকুল্লা খাঁ তার বক্তৃতায় এই সংবাদটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে সত্য বলে ঘোষনা করেন । তবে ইহা সত্য. পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা সকলেই এই পরিকল্পনার অংশীদার ছিলেন না। আব্দুল রসুল ও লিয়াকৎ হোসেন বদরুদ্দিন তায়েবজি ও শিবলী নোমানির মহান ভাবধারাকে ধরে রেখেছিলেন । কিন্তু ঢাকার নবাব সালিমউল্লা খাঁ কার্জনের কাছ থেকে এক লক্ষ পাউন্ড ধার পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে চক্রান্তের কাজে অংশ নিতে রাজী হয়েছিলেন ।

স্যার হেনরী কটনের ভাষায় বলতে গেলে " লর্ড কার্জনের নীতির সারবস্তু ছিল বর্ধিষ্ণু শক্তিগুলিকে দুর্বল করে দেওয়া আর দেশ প্রেমের চেতনা থেকে উদ্ভুত রাজনৈতিক মনোভাবকে ধ্বংস করে দেওয়া । স্পিয়ারের ভাষায় ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির পরিচালনায় জনগণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের রূপ নিয়েছিল ।"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কার্জন এই বিক্ষোভকে মোটেই গুরুত্ব না দিয়ে উপরন্তু বলল এই বিক্ষোভ স্বার্থপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক এবং বাগাড়ম্বর অলংকারপূর্ণ বক্তৃতা ছাড়া আর কিছু নয় । উকিল সভার বিরোধিতা সর্ম্পকে কার্জনের মন্তব্য ঢাকার পৃথক হাইকোর্ট গঠনের ফলে কলকাতার হাইকোর্ট এর উকিলদের কায়েমী স্বার্থের যে ক্ষতি হবে তার ভয়ে । কিন্তু প্রশ্ন হল তাই যদি হত তাহলে পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা উকিলেরা কেন বিরোধিতা করলেন যেমন ঢাকার আনন্দ চন্দ্র রায় শিলচরের কামিনীকুমার চন্দ ও বরিশালের দীনবন্ধু যেন প্রমুখ ।

সংবাদপত্রের বিরোধীতা সম্পর্কে কার্জনের মন্তব্য গ্রাহক হারানোর ভয়ে ওদের বিরোধীতা । কিন্তু প্রশ্ন হল অমৃত বাজারের মতো , সঞ্জীবনী , সন্ধ্যা নিউ ইন্ডিয়া, ইন্ডয়ান মিরর কেন ঝাঁপিয়ে পড়লো ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া , ষ্টেটস্ ম্যান ও ইংলিশ ম্যান সম্বন্ধে কি মন্তব্য হতে পারে ।

জমিদারদের বিরোধিতা প্রসঙ্গে কার্জনের মন্তব্য খাজনা হারানোর ভয়ে । কিন্তু জমিদারদের বিরোধীতা যতটা ছিল খাজনা হারানোর জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী তারা রেভিনিউ বোর্ডের এক্তিয়ারের বাইরে যাবেন না । প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন মৈমনসিংহের মহারাজ সূর্যকান্ত , পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর , দিনাজপুরের রাজা এবং ভাগ্যকুলের জানকীনাথ রায়।

কার্জনের মতে মধ্যবিত্ত হিন্দুরা বিরোধিতা করেছিল কর্ম সংস্থানের সুযোগ হারানোর ভয়ে । নিঃসন্দেহে বলা যায় এই বিরোধিতার মাধ্যমে জন্মনিয়েছিল নবজাত আত্মসচেতন বাঙালী জাতীয়তাবাদের অনুভূতি । সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতো নেতারা শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য রাজ্যাংশের পুনগঠনের বিরোধী ছিলেন না হিন্দী ভাষী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে একটি হিন্দু - মুসলমান অধ্যুষিত ঘন সন্নিবিষ্ট বাংলা ভাষী রাজ্য গঠন করা যেত এবং সেটা অনেক ভালো হত বলে সমালোচকরা

মনে করেন । কিন্তু তা হবার উপায় ছিল না । কিন্তু কার্জনের উদ্দেশ্যই ছিল দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করানো যার মাধ্যমে তারা পৃথক হয়ে যায় ।

বঙ্গ বিভাজনের ক্ষেত্রে কার্জনের সংকল্প ছিল অটল এবং ভূমিকা ছিল কঠিন । কার্জন শাসক ছিল বটে কার্যতি তার কর্মপন্থা ছিল ধূর্ত রাজনীতিবিদের । অবশেষে সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের অনুমোদন নিয়ে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে দেশ বিভাগ কার্যতি সাধিত হল । বিভাগের পর বাংলার বাঙালীকে রাজনৈতিক ভাবে দুর্ব্বল করার জন্য দেশকে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছিল এর ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জন্ম হয় যেহেতু বাংলাদেশ বঙ্গ ভাষীদের মাতৃভূমি ,আর এই ভূমির সন্তানদের তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও ভূমিকে দ্বিখন্ডিত করা হল । আর একটি দেখার বিষয় হলো ব্রিটিশ ঢাকার সাহায্যে মুসলমানদের আন্দোলনের বাইরে রেখেছিল ।

তবে আন্দোলনের সূত্রপাত বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মধ্যে দিয়ে এবং স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারের মধ্যদিয়ে আন্দোলনের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতো বড় বড় নেতারা । রবীন্দ্রনাথের মতো কবি প্রতিভা ও চুপ থাকতে পারেনি অনেক ব্রিটিশ লেখকের মতে, বঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বিপ্লবী মতবাদ প্রচারের প্রচুর গুপ্ত সুযোগ দিয়েছিল যদিও পূর্ববঙ্গে অনেক স্থানে ব্রিটিশের প্ররোচনার মুসলমানেরা বর্জন আন্দোলনকে বাধা দিয়েছিলো । ফলশ্রুতিতে ঘন ঘন হিন্দু - মুসলমান দাঙ্গা বেধেছিল । জাতীয়তাবাদী লেখকরা স্পষ্টই বলেছিলেন এসব ঘটনা ঘটবে সরকারী নীতির ফলে এবং তাদের প্ররোচনায় ও সমর্থনে । সংবাদপত্র-গুলি আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছিল । নানাভাবে সরকারী নির্যাতন সত্বেও বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলো তৎপর হয়ে উঠেছিল ।

আন্দোলন বিফল হয়নি । ১৯১১ সালে বঙ্গ বিভাজনকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হল এবং বাঙালী হিন্দুদের দন্ডিত করা হল বিশাল বাংলা ভাষী এলাকাকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত করে এবং ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করে ।

দেশ বিভাগের মূল উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিবাদ সৃষ্টি করা যাতে একে অপর থেকে পৃথক থাকে । জাতীয়তাবাদ ও দুর্বল হয়ে পড়ে আর এমনি সংকেত দিয়ে গেল ১৯৪৭ সালের দেশ - বিভাগের এই ভঙ্গ বঙ্গ বাঙালীয় হৃদয়ে যে আত্মিক ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল তা আজো ও নিরাময় হয়নি । ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের নির্দ্দেশনামা ঘোষিত হয় ।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী , যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর , নরেন্দ্রনাথ সেন মতিলাল ঘোষ এই আন্দোলনের পুরোভাগে দায়িত্ব নেন। সরকারী ঘোষনা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ কুমার মিত্র তাঁর সঞ্জীবনী প্রত্রিকার মাধ্যমে বিদেশী পণ্য দ্রব্য বর্জন করার উদ্দেশ্যে শপথ গ্রহণ করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান । কলকাতা সহ সমস্ত মফঃস্বল বাংলায় এই আবেদন স্বতঃস্পুর্ত সাড়া জাগাতে

সমর্থ হয় । বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভা শুরু হয় জনসাধারন বিদেশী দ্রব্য বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার "বঙ্গদর্শণ" পত্রিকায় বাংলার জনসাধারনকে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াইয়ের জন্য আবেদন করেন । সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট কলকাতা টাউন হলে বিশাল জনসভা আহুত হয় । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , কবি রজনীকান্ত সেন এবং অন্যান্য কবিও গীতিকারগণ তাদের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে জনমনে আলোড়ণ সৃষ্টি করে তোলে । সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় , বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ বক্তৃতার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন । বাংলা সন্ধ্যা , যুগান্তর , নবশক্তি , বন্দেমাতরম , প্রভৃতি পত্র - পত্রিকায় বিপ্লবের বানী প্রচারিত হতে থাকে । বাঙালী মেয়েরা ও চুপ থাকেনি, মেয়েরা ও সক্রিয় হয়ে উঠে , সভা , সমিতিতে যোগদান করে । স্কুল কলেজের ছাত্ররা ও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জমিদার শ্রেণীর এক বিশাল অংশ আর্থিক ভাবে আন্দোলনকারীদের সাহায্যে নেমে পড়ে এবং সক্রিয় ভাবে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন । নতুন করে আন্দোলন কারীদের সংগঠন তৈরী হয় এর মধ্যে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা পরিচালিত ব্রতী সংঘ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নেতৃত্বে বন্দেমাতরম সংঘ , দক্ষিন কলকাতার তরুণদের দ্বারা পরিচালিত সন্তান সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । বাঙালী মনীষীদের উদ্যোগে জাতীয় মেডিক্যাল কলেজ , জাতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয় । ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয় এবং রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক শিক্ষা পরিষদকে এক লক্ষ টাকা দান করেন । এ - ছাড় ও বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠে স্বদেশী কাপড়ের কল , জাতীয় ব্যাঙ্ক , জীবন বীমা কোম্পানী , সাবান আরো নানাহ প্রয়োজনীয় কলকারখানা । বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা স্থাপিত হয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে । অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও চারন কবি মুকুন্দ দাস ও নেতৃত্বে বরিশালে অধিবাসীরা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহন করে । ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল শহর প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গঠিত সংগঠন স্বদেশ বান্ধব সমিতি । এই সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন আব্দুল রসুল । এই সম্মেলনে যোগদা ন করেন বাংলার বিশিষ্ট নেতারা যেমন রাসবিহারী ঘোষ , কৃষ্ণকুমার মিত্র , পুলিনবিহারী দাস , শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী , মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা , সুবোধকুমার মল্লিক প্রমুখ। সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সম্মেলনে বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারিত হলে ইংরেজ সরকারের অধিন গোর্খা রাইফেলস্ বাহিনীর আক্রমনে এই সম্মেলন ছাত্রভঙ্গ হয় । সম্মেলন উপস্থিত নেতৃবর্গের সকলই গ্রেপ্তার হন । বঙ্গদেশের গনআন্দোলনের উপর ইংরেজ সরকারের এই প্রথম পুলিশী নির্যাতন । এই ঘটনার পর থেকেই বাংলার চরমপন্থী আন্দোলন গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পথ ধরে । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মীয় মনোভাব ও যুক্ত হয়ে পড়ে ।

সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী তরুন সম্প্রদায় কালী , গীতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ দ্বারা অনুপ্রানিত হয় । সন্ত্রাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে বহু ব্রিটিশ রাজকর্মচারীকে গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয় । বঙ্কিমচন্দ্র রচিত বন্দেমাতরম সঙ্গীত খুব জনপ্রিয় লাভ করে । সন্ত্রাসবাদ দমনে ব্রিটিশ সরকার নানা প্রকার কঠোর দমনমুলক আইন প্রণয়ন করে । স্যার আন্ডু ফ্রেজার ও কিংসফোর্ডকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয় । কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ আইনের বিচারে ফাঁসীকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করেন । ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দেই বি প্লবী আন্দোলনে জরিত থাকার অভিযোগে অরবিন্দ ঘোষ , বারিন ঘোষ , কানাইলাল দত্ত , সত্যেন বসু , উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেকে গ্রেপ্তার হন । সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার অশ্বিনীকুমার দত্ত বেং কৃষ্ণকুমার মিত্র সহ নজন জননেতাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করে ।

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত মুলত হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা । তবুও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে আব্দুল রসুল , লিয়াকৎ শুসেন , গজনভী প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ অংশ গ্রহণ করেন । শিক্ষিত মুসলীম সম্প্রদায় সাধারণভাবে সরকারী নীতির বিরোধীতা করতে প্রস্তুত ছিল না । কেন্দ্রীয় মুসলীম সমিতি বঙ্গভঙ্গের যৌক্তিকতা সর্ম্পকে কোন মতামত প্রকাশ করতে সম্মত হয়নি । বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অংশ্রগ্রহনকারীগণ হিন্দু দেবদেবীর পূর্জাচনা ও ধর্মীয় মনোভাব জাগ্রত করার চেষ্টা করলে মুসলীম সম্প্রদায়ের মনে বিদ্বেষ ও ঘৃনার সৃষ্টি হয় । কারণ মুসলমানদের পক্ষে বন্দেমাতরম ও কালীর প্রতি শ্রদ্ধা পোষন করা সম্ভব ছিল না । মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ট পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হলে মুসলিম সম্প্রদায় স্বাভাবিক ভাবেই বঙ্গভঙ্গের সরকারী নীতিকে সমর্থন করতে শুরু করে ।

বিপ্লব আন্দোলনের তীব্রতা শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারকে বঙ্গ বিভাগ বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে । দিল্লীর দরবারের ঘোষনা অনুযায়ী ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভঙ্গ বঙ্গ আবার যুক্ত হয় ।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ দিনটি " রাখীবন্ধন " দিবসরূপে পালিত হয় , পূর্ব বাংলা , পশ্চিম বাংলা , ধনীদরিদ্র , হিন্দু - মুসলমান খ্রীষ্টান - নির্বিশেষে বাঙ্গালীজাতির ভ্রাতৃত্ব ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের কথা ঘোষনা করাই ছিল এই উৎসবের তাৎপর্য । কবির ভাষায় ," কোন শক্তি মদমত্ত বাজশক্তি বাঙ্গালীর ঐক্যকে ভাঙ্গতে পারবে না " এ কথাই প্রমাণিত হল রাখীবন্দন উৎসবে । এছাড়া ও এই দিনটিকে " অরন্দন দিবস" রূপেও পালন করা হয় । সমগ্র বাঙ্গালী জাতি সেদিন অরন্ধন পালন করে স্বৈরাচারী ব্রিটিশ সরকারের নীতির মৌন প্রতিবাদ জানায় । এই দিনটিতে জনজীবনের স্রোত বন্ধ হয়ে যায় ।

স্বতঃস্ফুর্ত প্রতিবাদ , বিক্ষোভ , শোভাযাত্রা ও জনসভার মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে । হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার ও চরমপন্থী উদ্ভবের একটি প্রধান কারণ । ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বব্যাখ্যা করেন । ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উপর বিবেকানন্দের প্রচন্ড বিশ্বাস ছিল এবং তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে মনে করতেন যে , পরাধীন ভারতের পক্ষে এই চিন্তাধারা কার্যকরী সম্ভব নয় । স্বামীজির এই চিন্তাধারা বাংলা তথা ভারতের অনেককেই উদ্বুদ্ধ করে তোলে । শ্রী অরবিন্দ ও জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরনের জন্য হিন্দু ধর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন । বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনা ও ভারতীয়দের নতুন চিন্তাধারার উদ্বুদ্ধ করে তোলে ।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ ও চরমপন্থী উদ্ভবের অন্যতম কারণ । খাদ্যভাবে যখন লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যু পথযাত্রী ঠিক সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসবে ব্যস্ত । বিশেষত , খাদ্যক্লিষ্ট ব্যাক্তিদের সাহায্যের অর্থ জুবিলী উৎসবে ব্যয় করায় ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নির্মম মনোভাব অনেককেই ব্যাথিত করে তোলে । অপরদিকে এই সময় বোম্বেই প্রেসিডেন্সিতে প্লেগ কমিশনার মিষ্টার র‍্যান্ডের অত্যাচারে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যান্ড ও তার সহকারী আয়েষ্টকে হত্যা করা হয় । ইহা সত্য বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুধুমাত্র বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না । এই আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রায় সমগ্র ভারতেই বিস্তৃত হয়ে পড়ে । স্পিয়ারের মতে বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলাদেশ , পশ্চিম ভারত , পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদের সুচনা হয় ।

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের সুচনা মহারাষ্ট্রে হলেও এই আন্দোলন বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপকতা লাভ করে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই বাংলাদেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা দেখা যায় । নবগোপাল মিত্রের নেতৃত্বে হিন্দু মেলা সংগঠন ও ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে সঞ্জীবনী সভা যুব সম্প্রদায়কে নতুন ভাবে ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে । বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন চেতনার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় । ফলে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় তিনটি ও মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয় । এইসব সমিতির মধ্যে সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল অনুশীলন সমিতি । অনুশীলন সমিতির নামের সঙ্গে এই সংস্থার সভাপতি ব্যারিষ্টার পি, মিত্রের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকলেও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ শে মার্চ সতীশচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টার ফলেই বাস্তব রূপ গ্রহন করে এবং শরীর চর্চ্চার সংস্থারূপে আত্মপ্রকাশ করে । বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের অনুকরণে এই সমিতির নাম করণ করা হয় । কিছুদিন পরেই যুগান্তর নামে একটি দল গঠিত হয় । ইতিমধ্যে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে তরুন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠান এবং তিনি অনুশীলন সমিতির সলে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রায় সকল জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গেই অনুশীলন সমিতির সম্পর্কে গড়ে ওঠে। ক্রমশ ঃ কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এই সমিতির শাখা গড়ে ওঠে এবং কলকাতায় সমিতির প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। তবে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে অনুশীলন সমিতি ও বাংলাদেশের অন্যান্য সমিতিগুলো শরীর চর্চা, লাঠিখেলা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত ছিল কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের সুত্রপাত হলে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন নতুন রূপ গ্রহন করে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেহেণ বিপ্লবীরা প্রথম নিখিলবঙ্গ সম্মেলনের আহ্বান করেন এবং এই সম্মেলনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীদের মধ্যে সংহতি দৃঢ়তর হয় তবে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক তৎপরতা প্রকাশ্য ও গোপন দুটি খাতে প্রবাহিত হয়। একটি গোষ্ঠী নিক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে আন্দোলন পরিচালনার পক্ষপাতি ছিল। অপর দলটি ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র বিকল করার উদ্দেশ্যে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পথ অবলম্বন করে। হিংসাত্মক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান ভূমিকা গ্রহন করে। জনগণের মধ্যে বি প্লবী আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ভবানী মন্দির নামক একটি গল্প প্রকাশ করেন। অরবিন্দ ঘোষ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরে বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়ানের জন্য অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে বিপ্লবী সঙ্ঘগুলো " রাজনৈতিক ডাকাতি " শুরু করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলার বিপ্লবীদল সর্বপ্রথম গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা গ্রহন করে। এই সময় তারা " পূর্ববঙ্গ ও আসামের " লেকটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, উল্লাসকর দত্ত, প্রভৃতি মানিকতলার মুরারী পুকুর অঞ্চলে বোমা প্রস্তুত করার কারখানা নির্মান করেন এবং তাঁরা ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করে শাসনযন্ত্র বিকল্প করার সংকল্প গ্রহন করে। অত্যাচারী প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ট তাদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। ব্রিটিশ সরকার কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে মজঃফরপুরে বদলী করে। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে কিংসফোর্ড হত্যার দায়ীত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের নিক্ষিপ্ত বোমায়মিসে্স কেনেডি ও মিস কেনেডি নামে দুজন নিরপরাধ মহিলা মারা যান। অপরদিকে মুরারী পুকুরের বিপ্লবীদের আস্তানায় হানা দিয়ে পুলিশ অরবিন্দ ঘোষ সহ ছিষট্টিজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে এবং আসামীদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা শুরু হয়। এই সময় নরেন গোঁসাই নামে একজন দুবর্লচিত্ত বিপ্লবী পুলিশের নিকট অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করায় ঐ মামলার অপর দুই আসামী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যেই গুলী করে হত্যা করে। ফলে

কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর ফাঁসি হয় । আলিপুর বোমার মামলার ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টায় অরবিন্দ ঘোষ খালাস পেলে ও অপরাপর আসামীদের অনেকেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

আলিপুর বোমা মামলার পর বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কিছু পরিমানে নিক্রিয় হয়ে পড়ে। সক্রিয় রাজনীতি থেকে অরবিন্দের বিদায় গ্রহন , সরকারের কঠোর দমননীতি এবং অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায় , তা ছাড়া বিপ্লববাদের প্রকৃতিগত পরিবর্তন দেখা যায় । প্রথমদিকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা হলেও ফরে এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় ।

বিপ্লবী কর্মপন্থা সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিবর্তন ঘটে এবং বিক্ষিপ্তভাবে বোমা নিক্ষেপের পরিবর্তে সার্থক বিপ্লবের জন্য কৃষক , শ্রমিকও সৈন্যব াহিনীর মধ্যে সভা গঠনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং বৈদেশিক সাহায্যের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহনের কর্মসূচী তৈরী করা হয় । তা সত্বেও ১৯০৮ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিপ্লবীগণ প্রায় ৬৪ জন সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করার চেষ্টা করে । তারমধ্যে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ছোর্টলাটফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা , পুলিশ সাব - ইন্সপেক্টর নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়কে হত্যা , ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশ অফিসার সামসুল আলমের প্রাণনাশ প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত , বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাজা মহেন্দ্র প্রকাশ বরতুল্লা , মনসুর , ধীরেন্দ্র সরকার প্রভৃতি বি প্লবীগণ বৈপ্লবিক প্রয়াসকে সুসংহত করার জন্য বার্লিন কমিটি গঠন করেন । জার্মানীতে বসবাসকারী ভারতীয়দের অনেকেই এই বৈপ্লবিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন ।

একটু পিছন ফিরে তাকালে দেখা যায় , যার জ্বলন্ত স্বাক্ষাৎ ইতিহাস ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে জুন বাংলার স্বাধীনতা খর্ব হয় কারণ পলাশীর যুদ্ধ অস্ত্রবলে হয়নি , বিশ্বাস ঘাতকতার দ্বারা হয়েছে এবং এই জয়ের ফলে ক্লাইভের পদোন্নতি হল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যারণ অফ পলাশী নামে অভিহত হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইংল্যান্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ও হলেন। বৃহত্তম ক্ষেত্রে এই যুদ্ধের জয়ের ফলে বানিজ্যিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকে বাংলায় ব্রিটিশ প্রভাব যেমন সুদৃঢ় হয় যা এক দশকের মধ্যেই গাঙ্গেয় উপত্যকায় ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হয় ।

পলাশীর যুদ্ধ সামরিক কৃতিত্বের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য না হলেও রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে এক বৃহৎ ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা একখন্ড জমিদারী পেল এবং এই ভাবেই বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ রাজ্যের পত্তন হল । এটা এক ধরনের রাজনৈতিক বিপ্লব ও বলা চলে কারণ বাংলায় দেশীয় শক্তি এখানেই থেমে থাকেনি বাংলার বিপ্লবীরা , ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের সাহারানপুরে প্রবাসী বাঙ্গালী জে.এম চট্টোপাধ্যায় এবং অপর কয়কজন বাঙালী যুবক প্রথমে একটি গোপন সমিতি

গঠন করেন । পরবর্ত্তীতে হরদয়াল , অজিতসিংহ , আম্বাপ্রসাদ এই সমিতিতে যোগ দান পাঞ্জাবের বি প্লবীরাও বাংলার বিপ্লবীদের মতো অস্ত্র সংগ্রহ ও বোমা নির্মানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন । উত্তর ভারতে বাঙালী বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কার্যকলাপ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ।১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাসবিহারী বসুর সহকর্মী বসন্ত বিশ্বাস দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রার উপর বোমা নিক্ষেপ করেন । পুলিশ রাসবিহারীকে সন্দেহ করলে তিনি আত্মগোপন করে বেনারসে আশ্রয় নিয়ে বৈপ্লবিক সংগঠন তৈরী করার চেষ্টা শুরু করেন । পরবর্তীতে তিনি আমেরিকায় গঠিত বিপ্লবী গদরপার্টির সহায়তায় ভারতের সৈন্যদের মধ্যে বৈ প্লবিক চেতনা শুরু করান পরবর্তীতে উনার প্রচেষ্টাই ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে বিখ্যাত আজাদ্ হিন্দ বাহিনী গঠন এবং শেষ পর্যন্ত সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫০০০ হাজারেরও বেশী, পরবর্তী তে রাসবিহারী বোস জাপানে আত্মগোপন করেন । ভারতীয় প্রবাসী বাঙালী তারকনাথ দাস ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে " ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ" নামে বৈপ্লবিক সংগঠন করেন , প্রবাসী বাঙালীদের নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র পরিনত হয় । ভারতের মুক্তির জন্য ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত , অবনী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীগণ বৈপ্লবিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং যুদ্ধ সুচনার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মান সরকারের সঙ্গে মর্মান্তিক আঘাত পেল এবং বিদেশী শক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করল । পলাশি ভারত বিজয়ের চাবিকাঠি ইংরেজদের হাতে তুলেছিল । বাংলা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের সমৃদ্ধতম প্রদেশ ছিল । এই সম্পদ কুক্ষিগত করিয়া পরবর্ত্তী সময়ে ইংরেজরা সারা ভারত জয় করতে পেরেছিল । পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ইংরেজরা ছি ল বনিক , এখন হল দেশের ভাগ্যবিধাতা । বাংলার রাজনৈতিক জীবন যে সে যুগে কত কলুষিত হয়েছিল পলাশির যুদ্ধ তার পরিচয় । তার পরবর্তীতে বক্সারের যুদ্ধ ঘটেছিল ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে অক্টোবর ।

ডঃ ভি, এ স্মিথকে অনুসরণ করে বলা যায় যে , পলাশিতে শুরু , বক্সারের যুদ্ধ শেষ বাংলায় ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপিত হল। এবং ব্রিটিশ শক্তি অপ্রতিদ্বন্দী হল । পলাশী বাংলায় ব্রিটিশ শক্তি প্রসারের সুচনা , বক্সারে সেই সুচনা সফল পরিণত ।

নানাহ ঘট না প্রবাহে ব্রিটিশরা ভারতে শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখে । বঙ্গ বিভাগ কুটকৌশলে ইংরেজরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ও উস্কানী দিয়েছিল ফল শ্রুতিতে স্বাধীনতার পূর্ব্বে প্রায় এক বৎসর ধরে দাঙ্গা চলেছিল । শুধু কলকাতা নই , বাংলার প্রায় সব এলাকাতেই , দুই সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে বহুপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয় । ঘরছাড়া হয়েছে অনেক মানুষ । গৃহদাহ , খুন ইত্যাদি উভয় সম্প্রদায়ের লোকই শুরু করে । এই দ্বিখন্ডিত নীতির রুপকার ছিল ইংরেজরা । এক বছর ধরে দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক হত্যা চললে ও ১৬ আগষ্টের উন্মত্ততা চার পাঁচ দিনের মধ্যে কমে গিয়েছিল ।

বা সাম্প্রদায়িক হত্যা চললে ও ১৬ আগষ্টের উন্মত্ততা চার পাঁচ দিনের মধ্যে কমে গিয়েছিল। তারপর চলেছিল উদ্ধার ও ত্রানের পালা। সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা সাধারণ মানুষের জীবনে বরাবরই দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। তাদের ঠাঁই হয়েছে খোলা আকাশের নীচে ত্রানকেন্দ্রে। তবে এই সম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা মনোরঞ্জন রায় লিখেছেন ১৯৪৬ এর ১৬ -১৭-১৮ আগষ্ট এই তিন দিন একদিকে যেমন মুসলমান শ্রমিকেরা স্থানে স্থানে সংখ্যালঘু হিন্দু শ্রমিকদের দাঙ্গা বাজদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন তেমনই কালীঘাট, কালীগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলে মুসলিম শ্রমিকদের হিন্দু দাঙ্গা বাজদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন হিন্দু শ্রমিকরাই। এই হল শ্রমিকদের পারস্পরিক রক্ষা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার দিক। তখন মুসলীম কাগজ পড়লে মনে হত দাঙ্গাকারীরা সকলে হিন্দু আর জাতীয়তাবাদী কাগজ পড়লে মনে হত দাঙ্গা মুসলমানেরাই করেছেন। অথচ ঘটনা এই যে দাঙ্গা দু-পক্ষই করেছিল, দুই সম্প্রদায়ের মানুষের কিছু কিছু ঘটনা উল্লেখযোগ্য যেমন সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠে রাজাবাজারের হিন্দু বাসিন্দাদের বাঁচানোর মুসলীম শ্রমিকদের প্রয়াস। রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর ঠিক বিপরীত দিকেই ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুল, কলেজ ও তার হোষ্টেল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের মধ্যে সব সময় সমাজ বিরোধীদের প্রাধান্য থাকে সেবার ও কোন ব্যাতিক্রম ছিল না। রাজাবাজার অঞ্চলে দাঙ্গাবাজ সমাজবিরোধীদের মূল লক্ষ্য সেই-হোষ্টেলটি। কিন্তু ট্রাম শ্রমিক সেলিমের নেতৃত্বে রাজাবাজারের মুসলিম ট্রাম শ্রমিকরা তিন দিন তিন রাত্র দাঙ্গাবাজদের পুনঃ পুনঃ আক্রমনের হাত থেকে ভিক্টোরিয়া স্কুল ও কলেজের আবাসিক ছাত্রীদের সেদিন রক্ষা করেছিল। কারণ দাঙ্গাবাজরা কখনো নিরস্ত্র থাকে না সুতরাং তাদের রুখতে গেলে রক্ষাকারীদের ও সেভাবেই প্রস্তুত থাকতে হত। এরপর দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা কতিপয় মুসলিম প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কের উন্নতির জন্য পুলিশ ও সেনা যা নিয়োগ করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক, অপরুপ ভাবে হিন্দু নেতারা ও এই দাবীকে সমর্থন করে। উভয় পক্ষের দাবী উদ্বাস্তুরা যাতে স্বগৃহে ফিরে যান তার ব্যবস্থাও হোক। সিদ্ধান্ত হলো উদ্বাস্তুরা স্বগৃহে ফেরার পর তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি থাকবে যারা উভয় সম্পাদায়ের প্রত্যাগতদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবেন। গান্ধীজী সেই সময়ে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা সফর করেন। গান্ধীজী পৌঁছানোর আগেই ত্রান কাজের জন্য কয়েকটি সুপরিচিত সংগঠন নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় পৌঁছলে ও তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাদের কাজকর্ম প্রধানত শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। যারা হাঙ্গামার জন্য বা হাঙ্গামার আশংঙ্কায় ঘরবাড়ি ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ শহরাঞ্চলে আশ্রয় নিতে পেরেছিলেন ত্রান প্রতিষ্ঠানগুলি মুখ্যত তাঁদের মধ্যেই কাজ করত। গান্ধীজী নোয়াখলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে নানা নামের ত্রান ও সেবা সংগঠন নোয়াখালি ও ত্রিপুরায়

ছড়িয়ে পড়তে লাগল , গান্ধীজীর নোয়াখালি সফরের ফলে সত্যিকারের হৃদয়ের পরিবর্তন না হলেও দুস্কৃতিদের মধ্যে বেপরোয়া আইন শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের প্রবণতা কমেছিল ব্রিটিশ শাসনে বাঙালীদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আরো ও একধাপ এগিয়ে গেলে দেখা যায় কারান্তরালে বাস করার সময় চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য দল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন । ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচনে বাংলাদেশে স্বরাজ্যদল অপূর্ব সাফল্য অর্জ্জন করে । সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় , এস , আর দাস প্রমুখ তখন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন । হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সর্ম্পক গড়ে তোলার জন্য ও স্বরাজ্য দল সচেষ্ট হয় । বাংলার হিন্দু ও মুসলিম ঐক্যের জন্য স্বরাজ্য দল ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর মুসলীম নেতাদের সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কিত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন । এই চুক্তি বেঙ্গল প্যাকট নামে পরিচিত । ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী জে, এম, সেনগুপ্ত আইন সভায় " ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী ধৃত সমস্ত রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে " এই মর্মে একটি প্রস্তাব পেশ করেন । প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে তুমুল বির্তকের সৃষ্টি হয় । অল্পদিনের ব্যবধান স্বরাজ্য দলের উত্থান ও পতন হলে ও বাংলাদেশ তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই দলের ভুমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । বাংলাদেশের মন্ত্রী পরিষদের উপর এই দল অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সমর্থ হয় । তাদের আন্দোলন ও সাংগঠনিক যোগাযোগই পরবর্ত্তীকালে আইন অমান্য আন্দোলনের পটভুমিকা রচনা করে । ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বরাজ্য দলের অস্তিত্ব লোপ পায় । চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর ফলে স্বরাজ্য দলের অপূরনীয় ক্ষতি হয়।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার ভুমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য । যদিও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল খুবই কম । তবে এই সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক হিতবাদী ও সন্ধ্যা পত্রিকার যথেষ্ঠ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল । কিন্তু সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল আশ্চার্য রকম বেশী । ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা ও বিভিন্ন স্থান থেকে ৫৬ টি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত । তার মধ্যে কলকাতা থেকে ১৮টি , বর্ধমান বিভাগ থেকে ১৩টি , ঢাকা বিভাগ থেকে ৮ টি , প্রেসিডেন্সি বিভাগ থেকে ৭টি , চট্রগ্রাম বিভাগ থেকে ৬টি , রাজশাহী বিভাগ থেকে ৫টি প্রকাশিত হত । কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদিত হিতবাদী পত্রিকা , জলধর সেন ও দীনেন্দ্র কুমার রায় সম্পাদিত বসুমতী , যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সম্পাদিত বঙ্গবাসী এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত সঞ্জীবনী পত্রিকা সবচাইতে জনপ্রিয় ছিল । হিতবাদী ও সঞ্জীবনী পত্রিকা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় গৌরব জনক ভুমিকা গ্রহন করে । সঞ্জীবনী পত্রিকাই সর্বপ্রথম বয়কট আন্দোলনের আহ্বান দিলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন একটি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে । সাপ্তাহিক পত্রিকার অধিকাংশই নরমপন্থীদের আন্দোলনের ধারায় তীব্র সমালোচনা করে আন্দোলনের গতি পবিবর্তনের জন্য চেষ্টা শুরু করেন । সরকারী নীতির ও তারা তীব্র সমালোচনা করেন ।

চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ও নিজেদের মত প্রকাশের জন্য অতি দ্রুত পত্র- পত্রিকা প্রকাশ করার চেষ্টা শুরু করেন । তাদের প্রকাশিত পত্র- পত্রিকার বাধাবিঘ্নপূর্ণ আয়ুস্কাল ভারতের সংবাদ ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে । প্রাক্তন সাব - ইন্সপেক্টর জ্যোতিলাল মুখার্জী সম্পাদিত " প্রতিজ্ঞা " আবেদন নিবেদনের নীতি পরিবর্তনের দাবি জানায় । তিনি " ঘুষির আবেদন " শীর্ষক প্রবন্ধে পুলিশের গুপ্তচরদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন ।

তবে গুরুত্ব ও প্রভাবের দিক থেকে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিল সন্ধ্যা দৈনিক " সন্ধ্যা" চাতুর্থ , প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, উগ্রজাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রভৃতির জন্য সন্ধ্যা অনতিবিলম্বে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে । ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্দব উপাধ্যায় " স্বরাজ" নামে একটি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন । বঙ্কিমচন্দ্র , রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব , এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছবি সহ বহু প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । তিনি আত্মরক্ষার জন্য স্বদেশী থানা গঠনের কথাও বলেন । মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার " নবশক্তি" পত্রিকায় চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শের কথা ও সুন্দর ভাবে ব্যাখা করা হত ।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পালের সাপ্তাহিক পত্রিকা " নিউ ইন্ডিয়া" বাংলার চরমপন্থীদের রাজনৈতিক মতবাদ জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্ব গ্রহন করে । কিছুদিন পরেই বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা " বন্দেমাতরম " প্রকাশিত হয় । প্রথমদিকে এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহন করেন বিপিনচন্দ্র পাল । কিন্তু অরবিন্দ ঘোষ , শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী , হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যাক্তিগণ এই পত্রিকা পরিচালনা করতে শুরু করে । সুবোধচন্দ্র মল্লিক এই পত্রিকা প্রকাশনার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন । প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রিকা জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করার সুযোগ পায় ।

সন্ধ্যা , নবশক্তি , বন্দেমাতরম প্রভৃতি পত্রিকা নিয়মিত বিপ্লবাত্মক আদর্শ প্রচার করত । বিশেষতঃ অরবিন্দ ঘোষের বাংলাদেশের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল । বিপ্লবাত্মক রচনার জন্য সব চাইতে বিখ্যাত ছিল বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা " যুগান্তর " ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে অবিনাশ ভট্টাচার্য , ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ব্যাক্তিদের সহযোগীতায় মাত্র চারশ টাকা মূলধন নিয়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এই পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন । প্রথমদিকে যুগান্তরের গ্রাহক সংখ্যা খুবই কম ছিল কিন্তু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভুপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাদন্ড হলে জুলাই মাসে বিপ্লবী পত্রিকা প্রকাশনের অপরাধে এই পত্রিকার বিক্রি সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় । যুগান্তর নিস্ক্রিয় প্রতিরোধ পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে এবং প্রকাশ্য বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে । " রক্তপাত ভিন্ন দেবীর পূজা সম্পাদিক হতে পারে না " এই অভিমত যুগান্তর বারবার প্রচার করে । যুগান্তর আরো ঘোষনা করে , যে দেশের সাধারণ লোক সাধারণত ঃ কখন ও একযোগে বিপ্লবী হয়ে

ওঠে না , কতিপয় ব্যাক্তির আত্ম - উৎসর্গের মাধ্যমে জনসাধারনের মুক্তির পথ প্রশস্ত হয় । সেজন্য যুগান্তর শিক্ষিত ভারতবাসী সকলকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে আহ্বান জানায় ।

কলকাতার বাইরে বিভিন্ন মফঃস্বল শহর থেকে ও নানারকম পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে । ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত এবং আইনজীবী বৈকুন্ঠনাথ সোম কর্তৃক সম্পাদিত চারুমিহির সাপ্তাহিক পত্রিকা বিভাগে প্রথম থেকেই সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করে । এই পত্রিকায় লিয়াকৎ হোসেন রচিত একটি প্রবন্ধের জন্য পুলিশ অফিসে হানা দেয় । অশ্বিনীকুমার দত্তের সহকর্ম্মী এবং স্বদেশ বান্ধব সমিতির সদস্য দুর্গা সেনের পরিচালনায় বরিশাল শহর থেকে " বরিশাল হিতৈষী " নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় । মফঃস্বলে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে বরিশাল হিতৈষী পত্রিকাই সর্বপ্রথম সরকারী কোপানলে পতিত হয় । সরকার বিরোধী রচনা প্রকাশের জন্য দুর্গামোহন সেনকে একবছরের মেয়াদী সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয় । জয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত রংপুর থেকে প্রকাশিত রংপুর বার্তাবহ , ঢাকা থেকে প্রকাশিত পূর্ববাংলা খুলনা থেকে প্রকাশিত খুলনাবাসী, খুলনার বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত পল্লীচিত্র প্রভৃতি পত্রিকা সরকারের নির্দেশে প্রকাশ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় । এস , কাব্যতীর্থ সম্পাদিত হাওড়া হিতৈষী এবং যশোর থেকে যশোহর পত্রিকা ও চরমপন্থী রাজনীতি প্রচার করতে শুরু করে ।

সংবাদপত্রের উপর সরকারী দমননীতি ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের পত্র পত্রিকাগুলো সরকার বিরোধী বহুসংখ্যক রচনা প্রকাশ করলেও সরকার তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি । কিন্তু পাঞ্জাবের রাজনৈতিক ঘটনা সরকারকে সতর্ক করে দেয় এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বাংলাদেশের সরকার সন্ধ্যা , বন্দেমাতরম এবঃ যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে । কেন্দ্রীয় সরকার এই সময় প্রদেশিক সরকারগুলোকে সরকার বিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী মতবাদের প্রচারক পত্রিকা সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশ দেয় । যুগান্তর , সন্ধ্যা , বন্দেমাতরম এ তিনটি পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে । ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার পরে ও বিদেশী সরকারের বিচারালয়ের দেশপ্রেমিককে শাস্তি দেওয়ার অধিকার আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন । ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত একক ভাবে যুগান্তরের সব দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন । সরকারী আইনের সুবিধা গ্রহণ করে অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তারের হাত থেকে অব্যাহতি পেলে অন্যান্য সম্পাদকগণ ও সেই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহন করে পত্রিকা প্রকাশনা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেন । কিন্তু সরকার আবার নতুন আইন প্রনয়ণ করে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মুদ্রণযন্ত্র বাজেয়াপ্ত ও পত্রিকা প্রকাশনা স্থগিত রাখার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শুরু করে । ফলে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বন্দেমাতরম

, সন্ধ্যা , যুগান্তর , নবশক্তি , নিউ ইন্ডিয়া , প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর অরবিন্দ বন্দেমাতরম এর আদর্শে বাংলা ভাষায় ধর্ম ও ইংরেজী ভাষায় কর্মযোগী পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন । কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি পন্ডিচেরী চলে যাওয়ায় উগ্রস্বদেশীকতাবাদী ও বিপ্লবাত্মক পত্র- পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় , একমাত্র পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত নায়ক পত্রিকা তাঁর পূর্বসুরীদের কার্যকলাপের অনুসরণ শুরু করে।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে প্রকাশিত পত্র- পত্রিকা সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করে । এই সব পত্রিকার রচনায় যুক্তির চেয়ে আবেগ বেশী গুরুত্ব প্রকাশ পেলে ও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সার্থকতা ও সাফল্য প্রমাণ করে , স্বল্পায়ু এই সব পত্রিকার প্রভাবেই বাংলাদেশ তথা ভারতের সর্বত্র বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সমধিক গুরুত্ব লাভ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি একটি বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠার ভিত্তি স্থাপিত হয় । বাংলার বিভিন্ন স্থানে উগ্রজাতীয়তাবাদের মধ্যে ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় নগরীর সীমানা অতিক্রম করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র দুরবর্তী গ্রামে ও বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ পায় ।

উগ্রজাতীয়তাবাদে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কিভাবে উৎসাহিত করেছিল এই প্রসঙ্গে বলতে গেলে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের অনিবার্যতা স্বীকার করতেন বলেই আনন্দ মঠের আখ্যান বস্তুতঃ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ । পাঠকরা আনন্দমঠকে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী বলেই গ্রহন করেছে । আনন্দমঠ ব্যতীত বঙ্কিমের স্বাজাত্যবোধর প্রধান দুই কীর্তি আনন্দমঠের অন্তর্ভুক্ত " বন্দেমাতরম" এবং কমলাকান্তের " আমার দুর্গোৎসব"। বঙ্কিমকে " বন্দেমাতরম " ঋষি বলা চলে , দেশমাতৃকার কল্পনা মূর্তির উদ্ভাবক ও উদ্যাতা বলে চলে । বঙ্কিম ছিলেন " সাহিত্যের কর্মযোগী " । বাঙালীর "বাহুবল" ভারতকলঙ্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা , প্রাচীন ভারতের রাজনীতি , বাংলার ইতিহাস , বাংলার কলঙ্ক প্রভৃতি রাজনৈতিক রচনা । অনেকগুলো লেখা আবার সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ও পরোক্ষভাবে স্বদেশ চিন্তার উদ্বুদ্ধ । সাম্য , বঙ্গদেশের কৃষক , এবং কমলাকান্তের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উক্তি এই শ্রেণীর অর্ন্তগত তার প্রথম লেখাগুলো পরাজিত বাঙালী ও ভারতবাসীকে উৎসাহদানের কথা । বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি বিশিষ্ট কীর্তি হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা । হিন্দুধর্ম ও এই সমাজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আনুগত্য জন্মগত , বঙ্কিম কায়মনোবাক্য হিন্দু ধর্মের উজ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাস করতেন । সেজন্য তিনি বলেন , "যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প ভারতের নিস্কাম কর্ম একত্র হইবে সেদিন মনুষ্য দেবতা হইবে । বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হলেও তার রাজনৈতিক আদর্শ ভারতীয় , বিশেষ ভাবে বাংলার রাজনীতির উপর তার গভীর প্রভাব বিস্তার

করে । শ্রী অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারাকে স্বদেশ প্রেমের ধর্ম বলে বর্ণনা করেন ।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রায় অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেন যে তিনি স্বদেশ প্রেমকে ধর্ম ও ধর্মকে স্বদেশ প্রেমে পরিণত করতে সমর্থ হন । তার মানবপ্রেম সমাজ, কাল ও দেশের গন্ডী অতিক্রম করে এক বিশ্ব জনীন মানবতাবাদে পরিনত হয় । তার মানব প্রেম স্বদেশ প্রেম অপেক্ষা ও অনেক বেশী গভীর ছিল । তার ভাষায় সকলধর্মের উপর স্বদেশ প্রীতি । তার এই স্বদেশ প্রীতির চিন্তাধারা ভারতের চরমপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে তুলতে অনেকাংশে সাহায্য করে । তার অর্ন্তভুক্ত বন্দেমাতরম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট গভীর অনুপ্রেরণা রূপে দেখা যায় ।

ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে আনন্দমঠ ছিল প্রেরণার প্রতীক - নিষ্কাম স্বদেশ প্রেমের দীক্ষায় , স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ । বন্দেমাতরম ছিল চরমপন্থীদের মহাসঙ্গীত এবং মাতৃমন্ত্র তা কণ্ঠে নিয়ে তারা যে কোন দুঃসাহসিক কর্মে আত্মনিয়োগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না ।

আনন্দমঠের সন্তানদলের কাছে দেশই ছিল মা । এই গ্রন্থে মায়ের ত্রিমূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়েছে । স্বৈরাচারী শাসনে মা হৃত সর্বস্বা , দেশ শ্মশানে পরিনত হয়েছে , দেশপ্রেমিক সন্তানদলের ধ্যাননেত্রে স্বপ্ন সাধনা ও কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মায়ের এক ঐশ্বর্যময় মূর্ত্তি - বিদ্যা , বুদ্ধি ,সামরিক বল , ধনৈশ্বর্য এবং গনশক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে গড়া আগামীদিনের নতুন ভারতবর্ষ মা, যা , হইবেন । চরমপন্থীদের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের মায়ের নানাহ বর্ণনা ও দুর্দশা গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং তারা কালীমুর্ত্তির আরাধনার দ্বারা শক্তি ও সাহসকে উদ্দিপ্ত করে তোলার চেষ্টা করেন । ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে আনন্দমঠ ব্যাতিত অন্য কোন উপন্যাস তরুণ বাঙালীদের উপর এরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি ।

চরমপন্থী দলের অন্যতম প্রধান নায়ক অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তার সম্পাদিত বন্দেমাতরম পত্রিকায় লেখেন , যে নতুন শক্তি জাতিকে পুনরুত্থান ও স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করতে সমর্থ হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রই তার উৎসাহদাতা ও রাজনৈতিক গুরু । অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে নবভারতের শ্রষ্ঠাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন । ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ই এপ্রিল বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত " ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধে অরবিন্দ ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্রকে " ঋষি" অভিধায় ভুষিত করেন । তিনি বলেন বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে বন্দেমাতরম মন্ত্র দান করেছেন তাই তিনি ঋষি ।

বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইলের রচয়িতা শিল্পী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র নন - দেবী চৌধুরানী , আনন্দমঠ কৃষ্ণ রচিত এবং ধর্মতত্ত্বের রচয়িতা জাতিসংগঠক ও ঋষি বঙ্কিমই নব ভারতের শ্রষ্ঠাদের মধ্যে অন্যতম । জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আবেদন - নিবেদন নীতির অসারতা উপলব্ধি বিদ্রুপ বান বর্ষন করেন । অরবিন্দের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যান দৃষ্টিতে প্রতিভাত দ্বিসপ্তকোটি হস্তে

উন্মুক্ত তরবারি বিদ্যমান- ভিক্ষাপাত্র নয় ।অরবিন্দের মতে বঙ্কিম রচনাবলীর মুল কথাই হল স্বদেশপ্রেম ধর্ম এবং এটাই আনন্দমঠের প্রাণবানী । যে বন্দেমাতরম আজ স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত সেই মহাসঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই ঐ প্রাণবানীর অনবদ্য ছন্দোময় প্রকাশ । অরবিন্দের ভাষায় " জাতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের মাতৃমূর্ত্তি দিয়েছেন ।" ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১১ই আশ্বিন "ধর্ম" পত্রিকায় তিনি লিখেছেন "স্বদেশ প্রেমের ভিত্তি মাতৃ পূজা ।" দেশ অরবিন্দের মতে নিছক একটি জড় পদার্থ নয় , মাঠ, ক্ষেত , বন , পর্বত বা নদী নয় - আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি , ভক্তি করি , পূজা করি । অরবিন্দের রচিত ভবানী মন্দির এবং The Mother এর মধ্যে ও অনুরূপ চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে ।

ডক্টর অমলেশ ত্রিপাটি বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শন এবং চরমপন্থীর রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন । তিনি মনে করেন আনন্দমঠের মাতৃবন্দির ছত্রপতি শিবাজীর ভবানী মন্দিরের এবং পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রীকদের প্রেরণার উৎস পার্থেননের এথেনার মন্দির আদর্শের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে চরমপন্থীদের মতবাদ গড়ে তুলতে সাহায্য করে ।

এতসবের পরেও বিপ্লবী আন্দোলনের অবসান সম্পর্কে বলা যায় অবসানের মূলে সরকারী দমন নীতির সক্রিয় ভূমিকা ছিল এ কথা সত্য , তবে এই আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল কর্মপদ্ধতির ক্রটি - বিচ্যুতি ও অনেকাংশে সাংগটনিক দুর্বলতা । বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দুবর্লতা ছিল যে এই আন্দোলনে মুলতঃ অংশ গ্রহন করত ছাত্র সমাজ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাক্তিরা । শ্রমিক , কৃষক এই বিপ্লববাদী তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত না হওয়ার ফলে বিপ্লববাদের শিকড় কখনো ও গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পায়নি তা ছাড়া হিন্দু ধর্মভিত্তিক কর্মপন্থা থাকার ফলে মুসলমান সম্প্রদায় এই আন্দোলন থেকে দুরে সরে যায় । তবে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতো কিছু মুসলীম নেতা ও বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী গতিধারার সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত চেতনা সঞ্চার করার চেষ্টা করেন । কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি । তা - ছাড়া বৈপ্লবিক আন্দোলনের অপর একটি ক্রটি হলো আভ্যন্তরীন মত বিরোধ । বিপ্লবের পন্থা নিয়ে মতবিরোধ থাকার ফলে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সুসংবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি । প্রমথনাথ মিত্র , যদুগোপাল মুখার্জ্জী , প্রভৃতি বিপ্লবীগণ গণ সংযোগের পক্ষপাতী ছিলেন , অপরদিকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ , ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত , পুলিন দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ হত্যা ও সন্ত্রাসের উপর বেশী জোর দেন । প্রকৃতপক্ষে বাংলার অধিকাংশ বিপ্লবীই সন্ত্রাসবাদের পক্ষপাতী ছিলেন । কারণ ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব অবসানে যে কোন মুল্য দিতে তারা প্রস্তুত ছিলেন এবং ধীর স্থির ভাবে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না । তাদের এই নীতির ফলে জনসংযোগের অভাবে ব্যাপক বৈপ্লবিক আন্দোলনের শক্ত ভিত্তি গড়ে উঠে নি । উপরন্তু বাংলার চরমপন্থী আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে যে উদ্দীপনার অবতারনা করেছিল

শেষ পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়নি । তবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না বঙ্গভঙ্গ এর পর থেকে বাংলার উত্থান আন্দোলন ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল এবং পরবর্তী পদক্ষেপে নতুন শক্তি সঞ্চয় করেছিল । ইতিহাস আজো এই সব বীর সন্তানদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে , ইতিহাসের পাতায় তারা চিরস্মরনীয় ।

জনজীবন ও ব্যাক্তিগত জীবনের অজ্ঞতা ও দুর্নীতি

অজ্ঞতা থেকেই দুর্নীতির জন্ম কেবল তাই ঠিক নয় । অনৈতিক ও বে- আইনী লাভের জন্য ও অনেকে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে । পাশাপাশি অন্যদের প্রভাবিত করে ,ফলত ব্যাক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনে তার প্রতিফলন ঘটে । অনেক সময় অজ্ঞতা থেকে লোভের জন্ম হয় এবং লোভ ব্যাক্তি ও সমষ্টিকে অন্যায়ের পথে ধাবিত করে ।

যুবকদের একটা অংশের মধ্যে ভবিষ্যত সম্পর্কে অজ্ঞতা অনেক সময় অপসংস্কৃতির দিকে ঝোঁক বাড়ায় । ফলতঃ শুরু হয় দুর্নীতি , কখনো পথক্রান্ত হয়ে মাথা কাটা ফোটানি , কখনো ও বা অলীক কুসুম স্বপ্ন , কখনও মানুষের জৈব সম্পর্ক এবং তার অনুপুঙ্খ উত্তেজক বিবরণ । কখনো উল্টোপথে রোজগারের আশায় দুর্নীতিতে জড়িত হয়ে মার দাঙ্গা করা , কখনো বা বাঁকা পথে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে অজ্ঞতা স্বরূপ যুব শ্রেণীকে দুর্নীতি দেখিয়ে প্রভাবিত করা । এই অজ্ঞতাই মানুষের মূল্যবোধ , ও নৈতিকতার প্রথম শত্রু । মূল্যবোধহীন মানুষ অজ্ঞ এবং ব্যাক্তিজীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে না । বরংচ জনজীবন ও ব্যাক্তিজীবনকে আংশিক ভাবে হলেও দুর্নীতি পরায়ণ করে তোলে অজ্ঞতার কারণেই আমাদের আদিম সমাজ নগ্ন ছিল । হয়ত বর্তমানে আমাদের অনেকাংশে উন্নতি হয়েছে কিন্তু অতি আধুনিকতা অপসংস্কৃতির জন্মদিয়ে তার করাল গ্রাস বাড়ন্ত যৌবনের সামনে পাহাড় স্বরূপ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, দুর্নীতি পরায়ণ জাতি , সমাজ , বা ব্যাক্তি কোন অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করতে পারে না । অজ্ঞতা মানুষকে আদর্শভ্রষ্ট করে আর আদর্শভ্রষ্ট মানুষ বা সমাজ কখনো ও কোন মহৎ কাজ করতে পারে না । অজ্ঞতার আধার কাটিয়ে নৈতিকতাও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে । দুর্নীতি পরিহার করে গ্রীক - রোম সভ্যতা সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছিল । কিন্তু যদি ও আজ প্রাচীন সাম্রাজ্য গুলির অস্তিত্ব নেই তবুও ইতিহাসে তারা যে স্থায়ী আসন লাভ করছে তাদের অনুশীলিত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার জন্যই ।

বর্তমানে এক ভয়ঙ্কর ক্রান্তিলগ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। একধরনের বিকৃত রুচী আমাদেরকে অ ঞ করে তুলেছে ফলত দুর্নীতি ব্যাক্তি জীব-, ও সমাজ জীবনের একাংশের আকরে ে.খেছে ভোগ বিলাস ও আত্মম্ভরিতায় দেওলিয়া হয়ে জীবনের পথে দুর্নীতির অবাধ আধিপত্য স্থাপিত হচ্ছে। খুন, রাহাজানি, উগ্রপন্থা, ঘুষ আর ফটকাবাজীর দাপটে সমাজজীবন কলুষিত, ভোগ বিলাসের মাত্রা আকাশ চুম্বী। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ভিত্তি ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শুধু কেবল শিক্ষায় অজ্ঞতা নয়, বে - আইনী পথে প্রতিষ্ঠার জন্য ও অজ্ঞ মানুষ ক্রমশ ভুল করে যাচ্ছে। সাথে টানছে আরও একটা অংশকে তাই যে সর্বত্র দুর্নীতি অবাধলীলা - খাদ্যের ভেজাল জীবনদায়ী ঔষধে ভেজাল, মজুতদায়ী আর চোরাকারবারীর ব্যাপক ভূমিকা। জ্ঞান থেকে ও লোভের বশীভূত হয়ে মানুষ অজ্ঞ হচ্ছে ব্যাক্তির সাথে তৈরী হচ্ছে সমষ্টি জন্ম হচ্ছে দুর্নীতির, দুর্নীতি আজ প্রশাসনে, শিক্ষাব্যবস্থায়, রাজনীতিতে ধর্মের ক্ষেত্রে ও ব্যাপক বিস্তৃতি দুর্নীতি নিমর্জ্জিত হয়ে ও এক অংশের মানুষ শাস্তি এড়িয়ে যাচ্ছে, কারণ সমাজের সর্তক প্রহরা ও আজ দুর্নীতি কবলিত। লোভ ও ভোগবিলাসের বেষ্টনীতে এক অংশের মানুষ অজ্ঞ হয়ে যাচ্ছে এবং এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতি সমাজ দেহকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পরিত্রানের বদলে আমরা সর্বত্র প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছি অধোগামিতাকে। মনে হচ্ছে তৈরী হচ্ছে এক ভয়ংঙ্কর নরক।

এই অবক্ষয়ী অজ্ঞতা ও দুর্নীতি থেকে সমাজকে চূড়ান্ত পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে প্রতিকারের পন্থার অন্বেষণ করতে হবে। প্রথমে অজ্ঞতা তারপর দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করতে হবে। আর তার মুল্যবোধ ও নৈতিকতার আদর্শকে পুনরুদ্ধার করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। নিরলস প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মুল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ব্যাক্তি ও সমাজের মর্মলোক থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে হবে। সমাজপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম, মানব হিতৈষনা ইত্যাদি শুভবোধগুলির বিকাশ ঘটতে হবে। ব্যাক্তি ও সমাজ যেভাবে দুরাচারের পঙ্ককুন্ডে নিমজ্জিত হয়ে চলেছে, তা থেকে উদ্বার পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অজ্ঞতা ও দুর্নীতি পরিহার করে জীবনাদর্শকে উপলব্দি করার সময় এসে গেছে কারণ মুল্যবোধ ও নৈতিকতাই একদিন দেশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করতে পারে। কেউ জ্ঞান অজ্ঞ, কেউ বা লোভে অজ্ঞ কেউ বা অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা দূর করতে ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে পরিকল্পনা মাফিক সমাজও দেশকে এগিয়ে যেতে হবে। ভদ্র ও সৎ হতে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। ভদ্রতা কায়েম করতে অজ্ঞতা ও দুর্নীতি রোধ করতে চাই পরিবেশ ও জ্ঞানের আলো। অজ্ঞানতর ফলেই অমার্জিত রুচির আগমন ঘটে। সৌজন্যবোধ ও ব্যাক্তিত্ব এই দুই শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তবে কটু হলেও সত্য এযুগে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সৎলোককে মানুষ সহজ সরল ভাবে গ্রহণ ও করতে চায় না, ইতিহাসে ও স্বীকার্য সৎ ব্যাক্তির ও সততার দুর্দশার কথা। মহাজ্ঞানী ও সৎ ব্যাক্তি সক্রেটিসকে ও একদিন বাধ্য হয়ে বিষ পান করে আত্মহুতি দিতে হয়েছিল কেবল সত্য ও সততাকে মর্যাদা দানের

জন্য । কিন্তু সক্রেটিসকে ও সৃষ্টিকে আজ ও কেউ আগ্রহ্য করতে পারে না ।

অজ্ঞতা ও দুর্নীতি মু্ক্ত হতে হলে নিজেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে শুধু ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিলে হয় না । তাই নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন " I shall make my own fortune " । তিনি জীবনের কাছে ভাগ্যের কাছে নতি স্বীকার করেননি । এ ভাবেই ইতিহাসের উপর রেখে গেছেন তার চিরকালীন মতবাদ ।

অজ্ঞতাই হতাশা, দুর্নীতিই মৃত্যু , দুর্নীতির কাছে আত্ম সমর্পন জীবনে দুঃখকে আমন্ত্রণ দেওয়া । জীবনের স্পন্দন কাজের মধ্যেই লুকানো । কাজের মধ্যেই জীবনের গতিশীলতা । জীবনের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষ করেই প্রকৃত যোগ্যতার স্বীকৃতি ও সৃষ্টির কাছে তার স্থান করে নেয় । এক বস্তুকেই এক একজন লোক এক এক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেন এখানেই দূরদর্শিতা , উদাহরণ স্বরুপ দেখুন দুরদর্শণ কেউ বা দেখে জানার জন্য কেউ বা অজ্ঞতা বশতঃ তার কুফল টুকু গ্রহণ করছে ব্যাক্তির অজ্ঞতা ব্যাক্তিকে দুর্নীতির দিকে টেনে নিয়ে যায় । কিন্তু এই টেলিভিশনের আবিষ্কার কর্তা হিসাবে স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানী জন লেগি বেয়ার্ড চিরস্মরনীয় হয়ে আছেন । দুরদর্শনের দেখানো অভিজাত্য জীবন দেখে অজ্ঞতা বশতঃ মানুষ সেই প্রতিযোগীতাই নেমে পড়ে স্বভাবত কারণেই দুর্নীতি তখন অন্ত্রে রন্ধ্রে গ্রাস করে । পাশাপাশি অজ্ঞতা বশতঃ হিংসা ও অশ্লীলতার প্রতি আকর্ষন জনজীবনের একটি অংশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে । অজ্ঞতার ও নিজের আনন্দ , কখনো নেশায় বুদ হয়ে প্রথমে মাদক দ্রব্য - মদ্যপান আর একটু ঘুড়িয়ে আর এক ধাপ এগিয়ে ব্রাউন সুগার , হোয়াইট সুগার , ম্যারিজুয়ানা , হাসিস্ , চরস্ কোকেন , এল .এস.ডি স্ম্যাক , আফিম তো সে কাল থেকে স্বমহিমায় আছেই । এ- ভাবেই নানাহ উপায়ে করুণ মর্মন্তুদ কাহিনীর মাধ্যমেই সমাপ্তি ঘটে দুর্নীতির ।

আজকের জনজীবন ও ব্যাক্তিগত জীবনে অজ্ঞতা ও দুর্নীতি করাল গ্রাস শোচনীয় পরিস্থিতিতে ছাত্র - ছাত্রী ও যুব সমাজই হাল ধরার কথা। কিন্তু লক্ষ করলেই দেখা যায় যুব সমাজ দিগভ্রান্ত গা এলিয়ে দিয়েছে দুর্নীতি ও উশৃঙ্খলতার মাঝে এ যেন চোরাবালির স্রোত । একটা বড় অংশের যুবক অজ্ঞতার কারণে মোহচ্ছন্ন হয়ে নৈতিকতার বিসর্জ্জন দিয়ে সমাজ বিরোধী এমনকি দেশবিরোধী অপকর্মে জড়িত । অজ্ঞতা ডেকে আনে রাজনৈতিক সংকীর্ণতা , দলাদলি আর দুর্নীতি , মিথ্যাগপখর যার ফলে নৈতিক মুল্যবোধ আর চারিত্রিক ভিত্তি দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে । চোখ ধাঁধানো আকর্ষন , রুচিহীন কদর্য পোশাক , সস্তা প্রমোদ , নেশা গুলো ও কি দুর্নীতি নয় । কতিপয় স্বার্থান্বেষী নেতা অপরাধ জগতের দাদারা কিছু কালোবাজারী , ব্যবসায়ী যৌবন শক্তিতে মত্ত , ভবিষৎ সম্পর্কে অজ্ঞ ছেলেদের নিয়ে দুর্নীতি করিয়ে নিজেরা মুনাফা লুটছে ।

সুতরাং সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা , প্রচার , মানবিক আবেদন , আলোচনা সভা , ঘরে বাইরে সমাজে চলতে থাকলে মানুষের জীবনে সে ব্যাক্তিগত জীবনেই হোক বা সামাজিক জীবনেই হোক পরিবর্তন আসতে বাধ্য । হয়ত সময় লাগবে কিন্তু নিস্কলুষ পরিবেশ সৃষ্টি হবেই ।

মিলন ভুমি

এই পথে রিকসাও চলে না বা বাস সার্ভিস ও নেই। যদি রিজার্ভ গাড়ী বা পার্সোনেল গাড়ী না থাকে তাহলে নরসিংগড় বাজার থেকে পায়ে হেটে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে সাজানো বাগিচার মতো গ্রাম। একদম ভারত - বাংলাদেশ সীমান্ত গ্রাম। এ-পার , ওপার দুপারেই একই নামকরণ ভাগলপুর শুধু মাঝখানে কাঁটাতারের বেড়া । সন্ধ্যার অন্ধকার অনেকটা হাঁটতে হবে তাই কিছুটা অস্বস্তি ছিল । যেহেতু উদ্দেশ্য নিয়ে বের হওয়া সেহেতু যেতে তো হবেই । ক্রমেই ঢুকেই দেখি হাজারো মানুষের সমাগম , আনন্দ , উৎসব মুখরিত । একটু সামনে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম , এতো লোক সমাগম কেন ? একজন বলে উঠলেন , জানেন না , " গাজী বাবার দরগার মেলা" । কৌতুহলবশত জিজ্ঞাস করলাম দরগা কোথায় , ডানদিকে সোজা চলে যান , চললাম , একটু সামনে গিয়ে দেখি প্রচুর ভীড় , ব্যাবসায়ীরা নানাহ পসরা নিয়ে মেলায় এসেছে। রকমারী দোকান, দূরদুরান্ত থেকে মানুষ এসেছে । পাশাপাশি গ্রাম , বিনপাড়া , উদালতলী , উচামুড়া , বগাদী থেকেও অনেক মানুষ এসেছে । অত আনন্দ ভাবতেও পারিনি । আস্তে আস্তে মেলার ভীড়ে আমি ও মিশে গেলাম । এগিয়ে গেলাম খানিকটা দূরে দেখতে পেলাম পাহাড়ের মতো উচু জায়গায় মাঝখানে স্বচ্ছ জলের বিশাল দীঘি । চারপারে লোকে লোকারণ্য । জলে নামার ঘাট ও নজরে পড়ল । দেখলাম অনেক মানুষ দীঘির জলে পূণ্যস্নান করছে । একটু সামনে এগিয়ে দেখলাম বিশাল বিশাল পুরানো বটগাছ , তেঁতুল গাছ ও পুরানো বেলগাছ গাজীবাবার দরগার শোভা বর্ধন করে রেখেছে । দরগার পাশে পুরানো জমানার ইট সিমেন্টের তৈরী বসার জায়গা , একটি সাজানো ঘর যার ভেতরে শায়িত গাজী বাবা । হিন্দু , মুসলীম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে ধর্মীয় স্থান এই গাজী বাবার দরগা । সবার সাথে আমিও গাজী বাবার দরগা দর্শন করলাম , পূজো দিলাম । হঠাৎ নজরে এল দরগার ভেতরে বসে আছে এক অশীতিপর বৃদ্ধ । লোকজনকে জিজ্ঞাস করতেই জানতে পারলাম উনার নাম ফকির কুটু

মিঞা । উনিই গাজী বাবার দরগার রক্ষণাবেক্ষণ করেন । মানুষ দরগাতে মনোবাসনা পুরনের জন্য মানত করে , ধূপ , মোমবাতি জ্বালায় , দুধ দেয় আর ফকির কুটু মিঞা যেন গাজী বাবার দরগার সর্বক্ষণের প্রহরী ।

কিছুক্ষন বসে থাকার পর ফকির কুটু মিঞার সাথে শুরু করলাম আলাপচারিতা । মানুষ মেলার আনন্দে মশগুল । জানতে চাইলাম এই ভাগলপুর গ্রামের সীমান্তের অপরপাশের গ্রামের নাম কি ? উনি বললেন ওই গ্রামটুকুর নামও ভাগলপুর। দেশভাগের আগে উভয় অংশ হিন্দু , মুসলমান সম্প্রদায় মিলে বৃহৎ ভাগলপুরে ছিল , উভয় সীমান্তের মানুষের সম্পর্কও ছিল খুবই ভাল । আর এ দরগা সু - প্রাচীন , এ দিককার অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী । কিছু যুবক আধাসামরিক বাহিনীতে চাকুরী করে । গ্রামের লোক অধিকাংশই অক্ষর সম্পন্ন । উনি আরো বলেন এই এলাকার বর্তমান প্রধান স্বপন দত্ত এবং উনার বাবা প্রায় ৯২ বৎসর বয়স্ক দীনেশ দত্ত এবং অখিল সরকার এ - দুজনই এই এলাকার প্রাচীন লোক ।

বাংলাদেশ ভাগলপুরের মীরাসান হাইস্কুলের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক জুরুল হক ওরফে জোরালী মাস্টার উভয় সীমান্তে শান্তিপুর্ণ সম্পর্ক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । তাছাড়াও আশেম মিঞা পুরানো চেয়ারম্যান , মামন মিঞা প্রাক্তন চোয়রম্যান , বর্তমান চেয়ারম্যান এডভোকেট ফজলুর রহমান উনারা চেষ্টা করেন এলাকায় এবং উভয়সীমান্তে সম্প্রীতি বজায় রাখতে । কুটুমিঞার বক্তব্য কাঁটাতারের বেড়া হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওপার ভাগলপুর ও অন্যান্য গ্রাম থেকে প্রচুর পরিমান ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা গাজী বাবার দরগার মেলায় আসতেন ।

ইত্যবসরে দেখা হয়ে যায় বয়োবৃদ্ধ এলাকার নাগরিক দীনেশ দত্ত মহাশয়ের সাথে , উনি বহু পুরানো বাসিন্দা , উনি বলেন গাজীবাবার দরগা রাজরাজাদের আমলের এবং তখনই এই দীঘি খনন হয়েছিল এবং এই দীঘি গাজী বাবার দীঘি নামে পরিচিত । বহু বছর ধরে বৈশাখ মাসে তিনদিন ব্যাপী মেলা হয় দীঘির চারপাশ ধরে । এ-তো সম্প্রীতির মেলা , মানুষ এই দীঘিতে পূণ্যস্নান করে এখান থেকে পবিত্র জল নিয়ে যায় । এবং তাই চিরাচরিত বিশ্বাস , সবচেয়ে বড় ব্যাপার এই মেলা সম্প্রীতির সুদৃঢ় মেল বন্ধন ।

দরগা এবং দিঘীর চারপাশে প্রচুর ঘন জঙ্গল ছিল । বসতি ছিল না । বন্য পশুরা ছিল গাজী বাবার সঙ্গী । প্রবাদ আছে গাজী বাবার কুটিরের পাশে একটি বাঘ থাকত । অনেকে নাকি তা দেখেছেনও লোকে নাকি এই বাঘটিকে ফকিরালী বাঘ বলে ডাকত । তা যাই হোক পুরানো গাছগুলো ,দীঘি , পুরানো অনেক স্মৃতি এখনও গাজী বাবার দরগার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। আরো প্রবাদ আছে

গাজীও কালু দুই বন্ধু ছিল । কালু ছিলেন শিবের উপাসক । ভাগলপুর সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ক্যাম্পের ভেতরের শিবমন্দির টুকু নাকি কালুর শিব মন্দির নামে পরিচিত । এলাকার ধর্মনপ্রাণ মানুষ আজো এই বিশ্বাস উৎসবে , পার্বনে , শুভকাজে এই শিব মন্দিরে এবং গাজী বাবার দরগায় পূজো অর্চনা দেয় । শান্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতির অপরূপ সজ্জায় গাজী বাবার দরগা এই অঞ্চলের শান্তি সম্প্রীতির প্রতিক বলেই মানুষের বিশ্বাস ।

যুগের পরিবর্তনে এলাকারও পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু গাজী বাবার দরগা সমানভাবে ঐতিহ্য নিয়ে চলেছে । পিচের রাস্তা ধরে ভাগলপুর গাঁয়ে না ঢুকে রাস্তা দিয়ে সোজা চলে গেলে নির্জন রাস্তা ধরে একটু সামনের বাঁকেই দেখা যাবে বিশাল দীঘি , সেই দীঘির পাড়েই প্রকৃতির মনোরম পরিবেশ গাজী বাবা শায়িত । সেখানেই গড়ে উঠেঝে ধর্মপ্রাণ সকল শ্রেণীর মানুষের বিশ্বাস " গাজী বাবার দরগা " ।

সকাল - সন্ধ্যা মানুষ আসে , গাজী বাবার দরবারে , সংগোপনে মনের কথা বলে যান গাজীবাবার কাছে , একটু সমস্যার যেন হাল হয় । দেব , দেবতা , মানুষ সমস্ত রহস্য যেন এখানে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে । টাকার বিনিময়ে ও প্রকৃতির মনোরম পরিবেশ , পাখীর কলবিতান , দীঘির স্নিগ্ধ হাওয়া , বনফুলের গন্ধ , আলোকিত জ্যোৎস্না খুঁজে পাওয়া যাবে না । একবার ঘুরে আসলে মনে হবে যেন বারবার ফিরে আসি সম্প্রীতির পীঠস্থান , প্রকৃতির উপহার গাজী বাবার দরগায় ।

১৫ই আগষ্ট - মাতৃমুক্তির দিন

ভোরের আলো ফোটেনি কিন্তু মধ্যগগনে তারারা জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল , অপেক্ষা ছিল ভোরের আলোর কিন্তু না ভোর পর্যন্ত সহ্য করা যাচ্ছে না , এ যে মাকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি করানো। ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাতে যখন সমস্ত বিশ্ব নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন ভারতবাসী আনন্দে উদ্বেল হয়ে , নিরলস অক্লান্ত মনে , দৃঢ় প্রতিজ্ঞাচিত্তে মায়ের পায়ের শিকল ছিঁড়ে ফেলে । সাথে ছিঁড়ে ফেলে দীর্ঘ প্রায় দুশো বছরের পরাধীনতার গোলামীর দলিল । এ যেন মাতৃ মুক্তির দিন , যন্ত্রণা মুক্তির দিন , দূর্ভাগ্যের অবসান । ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত থেকেই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ দখলদার ইংরেজ শাসনমুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয় । পরাধীনতা আর ক্রীতদাসত্ব একে অপরের পরিপূরক । সুতরাং পরাধীন জাতি উন্নত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না । ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ দুশো বছরের পরাধীনতার এ তো অবর্ণনীয় বাস্তব কাহিনী । তার মাঝে ও পদলেহক , গৃহশত্রু , জাতির শত্রু , দেশের শত্রু এক শ্রেণীর অনুগৃহীত বিশ্বাসঘাতক , দখলদার শাসকদের আনুগত্য লাভ করিয়া , মাতৃভূমিকে দখলদারদের হাতে বন্ধক রাখিয়া সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে ফুলে ফেঁপে উঠে অর্থনীতিতে , বিনিময়ে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল দেশকে। দীর্ঘদিন ধরে চলছিল স্বাধীনতার আন্দোলন । নদীর জলের মতো তরতাজা শহীদদের রক্ত বয়েছে , অগণিত প্রাণ ঝড়েছে , কারাবন্দী হয়েছে , দৈন্য দুদর্শা তা তো কখনো শেষ করা যাবে না । অনেক ঘটনা কালস্রোতে হারিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা পর্যন্ত আসেনি কিন্তু তারপরে ও যা সত্য তা হল ভারতীয় বীর শহীদদের রক্ত ব্যর্থ হয়নি । মায়ের চোখের জল , স্বামীহারা , স্বজনহারাদের আর্তনাদ ও চোখের জল লিখেছে স্বাধীনতার নতুন ইতিহাস । ভারতবর্ষ স্বাধীন , স্বাধীনতার পর শিক্ষা , সংস্কৃতি , নারীশিক্ষা , কৃষি বিজ্ঞান , প্রযুক্তি , চিকিৎসা বিজ্ঞান , শিল্পক্ষেত্র এবং অর্থনীতিতে যথেষ্ঠ

অগ্রগতি হয়েছে , এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই । শুধু তাই নয় মহাকাশ বিজ্ঞান এবং পরমাণু গবেষণায় ভারত পিছিয়ে নেই । প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ আর্যভট্ট ছাড়া পরবর্তীকালে ভাস্কর , অ্যাপেল , বিভিন্ন ইনস্যাট প্রকল্প , রোহিনী -ডি.,কে, রকেট ও উপগ্রহ প্রযুক্তি ছাড়া ও অগ্নি ,পৃথ্বী , ত্রিশূল ক্ষেপনাস্ত্র নিমার্ণে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নিজেদের কৃতিত্ব প্রমাণ করেছেন । শিল্প প্রযুক্তি পাশাপাশি , বিশ্ব শান্তিতে ভারতের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

আমাদের অগ্রগতি হয়েছে এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ । দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন ভারতের নির্ভীক দেশবাসী ,অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন ভারতমাকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি করতে কারারুদ্ধ হয়েছেন অগনিত মানুষ , অত্যাচারিত হয়েছেন অগনিত দেশবাসী , তাদের বলিদান আমাদের স্বাধীনতা । তাই সেই বীর / বীরাঙ্গনাদের জানাই অকৃপন শ্রদ্ধা , ঐ দিনে স্মরণ করি তাদের শ্রদ্ধা অবণত মস্তকে । এতকিছুর পরেও বলতে হয় আমরা কিন্তু অখন্ড স্বাধীনতা পায়নি অনেক আন্দোলন হয়েছে , উগ্র জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছে , ইলবার্ট বিল বিতর্ক নিয়ে ভয়াবহ আন্দোলন হয়েছে । অসহযোগ আন্দোলন হয়েছে । অনেক চুক্তি হয়েছে আন্দোলনের চাপে যেমন লক্ষ্ণৌ চুক্তি , স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতীর নেতৃত্বে শুরু হয় উগ্রজাতীয়তাবাদী আন্দোলন , ১৯১৯ থেকে ১৯২২ উত্তরপ্রদেশে হয় ভয়াবহ কৃষক আন্দোলন । জেমস ইউলসনের অর্থনৈতিক শাসন ব্যবস্থার উপর আন্দোলন , নীল চাষীদের বিদ্রোহ , শিল্প আন্দোলন ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ , ভারতীয় কাউন্সিল এ্যাক্টের প্রতিবাদে (১৮৬১ এবং১৮৯২)ভয়াবহ আন্দোলন । ২০শের দশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভয়াবহ চেহারা দেখা যায় সারা হিন্দু মুসলীমের মধ্যে ভাতৃঘাতী সংঘর্ষ শুরু করিয়ে দেয় । ১৯৪৩ এ বাংলায় মহামারী , ১৯২১ - ১৯২২ এ সমস্ত ভারতবর্ষে মহামারী এবং ব্রিটিশদের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের চেহারা ফুটে উঠে । ১৯৩০ - ৩২ এ অন্ধ ,মালাবার , উত্তর প্রদেশ , বাংলাদেশ, গুন্টুর প্রভৃতি স্থানে ভয়াবহ কৃষক আন্দোলন ব্রিটিশ শাসকের বর্বর অত্যাচার , ১৯৩৬ এ নিখিল ভারত কৃষক সভা , ১৯৪৬ এ হায়দ্রাবাদে তেলেঙ্গা কৃষক বিদ্রোহ, ১৯২০ - ২৫ , নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন , ১৯২৭ সালে ১লা মে বোম্বেতে প্রথম শ্রমিক দিবস পালিত হয় । ১৯২৮ এ ভয়াবহ শ্রমিক ধর্মঘট , ১৯২৯ এ ব্রিটিশ পুলিশ দ্বারা শ্রমিক নেতারা গ্রেপ্তার , ১৯৩৩ এ সাজানো মামলায় নেতাদের কারাদন্ড , ১৯৩৪ এ প্রতিবাদে সোলাপুর , নাগপুর , বোম্বে প্রভৃতিস্থানে ভয়াবহ আন্দোলন , ব্রিটিশ বাহিনীর অত্যাচার , ১৯৩৯ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ , ভারতীয়দের বাধ্য হয়ে যুদ্ধে যোগদান , দেশে অসন্তোষ , ১৯৩৯ এর ২রা অক্টোবর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক , কৃষক , ছাত্র , যুব প্রতিবাদ ধর্মঘট যুদ্ধের বিরুদ্ধে মগ ১৯৪৬ - ৪৭ এ ব্রিটিশ কংগ্রেস মুসলীম লীগ এর মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরে কুট কৌশল , নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে রাসবিহারী বোসের সহায়তায় ভারতীয় যুবকদের দ্বারা আজাদ

হিন্দ বাহিনী গঠন এবং মাতৃভূমির রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়া । ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে শাসনের অজুহাতে বঙ্গভঙ্গ । কার্জনের মাধ্যমে ব্রিটিশ দ্বিখন্ডিত নীতি । ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে চরমপন্থী আন্দোলন ও ব্রিটিশ দ্বারা বর্ব্বর ভাবে দমন । ১৯১৬ কংগ্রেস - মুসলীম লীগ চুক্তি । ১৯১৯ এ মন্টেন্ড জেমসফোর্ড চুক্তি ভারতীয়দের অসন্তোষ এর আন্দোলন । খিলাফৎ আন্দোলন , ১৯৩১ গান্ধী - আরউইন চুক্তি , ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ (কালো আইন) ১৯৩০ -৪০ এ দ্বিখন্ডিত করণ আন্দোলন (ব্রিটিশের প্রচ্ছন্ন মদতে)। পুনা চুক্তি , ১৯৪৪ এ ক্যাবিনেট মিশন , ওয়াহাবি আন্দোলন , ফরাসি আন্দোলন তিতুমীর বিদ্রোহ , ১৯৪২ এ ভারত ছাড়ো আন্দোলন । কলকাতা , পাঞ্জাব , চট্টগ্রাম , নোয়াখালি , দিল্লী এবং উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ আন্দোলন , অসংখ্যা , বলিদান , অত্যাচার , কারাবন্দী এ এক সুদীর্ঘ নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা কাহিনী । এত কিছু র পরেও আমাদের অখন্ডিত ভারতভূমি দখল করা যায়নি । ইংরেজদের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ব্রিটিশ সরকার দ্বারা ২৪শে মার্চ ১৯৪৭ লর্ড মাউন্ট ব্যাটনকে ভারতবর্ষে প্রেরণ এবং উনার পরিকল্পনা (১) ভারতে মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলিকে লইয়া একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা । সেইক্ষেত্রে বাংলা ও পাঞ্জাবকে খন্ডিত করিয়াই তাহা গঠিত হইবে (২) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে যোগদান করিবে কি না উহা সেখানকার জনসাধারণের গণভোটে (রেফারেন্ডাম) দ্বারা সিদ্ধান্ত হইবে (৩) আসামের শ্রীহট্ট জেলা পাকিস্থানে যোগদান করিবে কি না তাও গণভোটের মাধ্যমে স্থির করা হইবে । বাংলা ও পাকিস্তানের কোন কোন অংশ পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত হইবে তার জন্য কমিশন গঠন । জাতীয় কংগ্রেস , মুসলীম লীগ উভয়ে মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা মানিয়া লইলে খুব দ্রুত গতিতে ঐ পরিকল্পনা কার্যকর করা হয় । উদ্দেশ্য ভারত ভূমিকে দুর্বল করিয়া দেওয়া । সীমানা নির্ধারণের জন্য স্যার সাইরিল ব্যাডক্লিক এর নেতৃত্বে দুটি কমিশন গঠন করা হয় । ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের দ্বারা বীজ রোপিত সাম্প্রদায়িকতার ফল বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের জন্মের মাধ্যমে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিল । যাহা হউক , ভাঙ্গা গড়ার মাঝেই ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনমুক্তি এক স্বাধীন রাষ্ট্রহিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নেয় , ১৯৪৭ এর স্বাধীনতার পর দীর্ঘপথ অতিক্রান্ত হয়ে সমস্ত দিকে উন্নয়নের রূপরেখা তৈরী করে আজ ২০০৯ সালেও আমাদেরকে ভাবতে হয় এই বলে উন্নয়নের শত্রু বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী শক্তি আজো মাতৃভূমির বুকে কুঠারাঘাত করতে চায় । এরা চায় ভারত ভূমিকে টুকরো করে দিতে । কোথাও বিচ্ছন্নতাবাদ নাম দিয়ে , কোথাও উগ্রপন্থা কোথাও উগ্র মৌলবাদ , প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা আমাদেরকে দুর্বল করে দেওয়ার নগ্ন প্রচেষ্টা চলছে । আমাদের দেশের সুদৃঢ় সংহতিকে ভেঙে, চুড়ে দিতে চলছে ঘরের ভেতরে , বাইরে । আমাদের হতোদ্যম হলে চলবে না । আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ভারত এক বৃহৎ শক্তি । সংহতির স্বার্থে ,

ঐতিহ্যের সার্থে দেশের স্বাথে , আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতের স্বার্থে যে সংগ্রাম আমাদের দেশের বীরেরা আত্মবলিদান দিয়ে করেছিল , তার থেকে পিছপা হয়ে গেলে শত্রুরা পুনরায় মায়ের বুকচিরে নিতে পারে সুতরাং উন্নয়নের প্রশ্নে ঐক্য সংহতির প্রশ্নে সমগ্র দেশবাসী মিলিত প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে । যা কারো একার পক্ষে সম্ভব নয় । সম্মিলিত প্রচেষ্টাই ভারত ভূমিকে চিরদিন ঐক্য ও সংহতির প্রতীক করে রাখবে । ১৫ই আগষ্ট ভারতবাসীর কাছে মাতৃমুক্তির দিন , যন্ত্রণা মুক্তির দিন ।

আর্দশ ও অনুপ্রেরনায় বাঙালী

সত্যিই ,আমাদের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে , কোথাও বা স্বল্প পরিসরে তা শুরু হয়েছে । বাঙালিদের বিবর্তিত বর্তমান জীবন ।ইতিহাস বলে বাঙালি জাতি এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে না । তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের স্রোত এসেছে তবে কেউ কেউ মনে করেন তা যেন বাঙালিত্ব ঘুচিয়ে না দেয় । পাশাপাশি জাতীয়তাবোধটুকু যেন আমাদের নষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখার সময় এসেছে । আত্মকেন্দ্রীকতায় যেন আমাদের সত্বার ক্ষতি না হয়ে যায় । শিক্ষা , সংস্কৃতি, মননশীলতার পরিচায়ক তা বলে প্রতিবাদ করার সাহস যেন লুপ্ত না হয় । অবশ্যই প্রতিবাদ হতে হবে নৈতিকমূল্যায়নের ভিত্তিতেই নয়তো আমরা মধ্যযুগের দাসত্ব প্রথাকেই মেনে নিতে হবে । জাতি হিসাবে জাতির নিজস্ব স্বকীয়তা , স্বাজত্যাভিমান, পরিবর্তন ও আধুনিকতার পাশাপাশি মুল্যায়ণ , উচ্চবিত্ত , মধ্যবিত্ত , নিম্নবিত্ত , এমনকি শহর গ্রাম , পাহাড়ের খেটে খাওয়া মানুষ সমস্ত মানুষেরই একটা নিজস্ব স্বকীয়তা বা স্বত্বার প্রয়োজন আছে । কাজের বিতর্ক থাকতেই পারে , তাই বলে শিক্ষা - দিক্ষা নিয়ে আধুনিকতার ছোঁয়ায় যেন আমরা আমাদের অস্তিত্ব ভুলে না যাই । আমরা যদি আমাদের ইতিহাস ভুলে যাই তবে তা আগামীর জন্য তৈরী হবে এক ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ। এখনো আমাদের এক বিশাল অংশের মধ্যে পুরনো মূল্যবোধ , রুচিবোধ , স্বাজ্যাত্যাভিমান নিজস্বতা সবই আছে, আধুনিক পরিবর্তনের ঢেউ কিন্তু তা মুছে দিতে পারেনি , যদি মুছেই গেল তবে তো জাতির প্রতি অবমাননা । অনেক ভুল , ত্রুটি আছে , থাকতেই পারে , জীবনতো আর জড় পাথর নয় যে ভুল হবে না কাজ করলেই তো ভুল হয় আর ভুল হলেই তো সংশোধনের প্রশ্ন । আগামী পথ তৈরীর ভাবনা ইত্যাদি ইত্যাদি । আমাদের সমাজের এক বিশালশ্রেণীর কাছে এখন একটা ক্ষুধা পরিলক্ষিত হয় তা হল "

শহরের ক্ষুধা'' । শররেই নাকি সব , কেন না আমরা গ্রাম -শহরের মধ্যে একটি সেতু নির্মান করি , যার মাধ্যমে সভ্যতা আরো সুন্দরভাবে বিকশিত হতে পারে ।

চিন্তা ,অনুভুতি , সভ্যতা , কর্মসংস্থান ইত্যাদির প্রেরক হবে গ্রাম - শহরের সেতু বন্ধন । বাস্তবের আদান - প্রদানই জীবনের সমাজের , সভ্যতার বাস্তব রূপ । ঘৃণা নয় , বোঝাপড়ার মাধ্যমেই হাল হোক সমস্যার । শুধু ভোগবাদী জীবন কেন কিছুটা হলে ও কর্মবাদী চিন্তাধারার প্রয়োজন আছে । আমি বিত্তবান বলিয়া কি দারিদ্র নিম্নবিত্তকে হেলায় বা বিদ্বেষে ফেলিয়া দেবো ? তা - হলে তো তৈরী হবে ঠুনকো সভ্যতা , সংস্কৃতি ? গ্রাম , শহরের মিলিত বন্ধনেই তৈরী হয় নতুন সংস্কৃতি । ধৈর্য্য, শান্তি , সৃষ্টি , কৃষ্টি , সংস্কৃতি এগুলো হলো জাতির সভ্যতার প্রতীক । সৃষ্টি শক্তিই সর্বদা শ্রেষ্ঠ ও জাতির উন্নয়নের সোপান। পরিবর্তনের জোয়ারে আমরা যেন তা থেকে ছিটকে না পড়ি । আমরা যেন হারিয়ে না যাই , পিছিয়ে না পড়ি । শিল্প , সংস্কৃতি, সাহিত্য , বিজ্ঞান , গবেষণা , কৃষিশিক্ষা , সমাজশিক্ষা , প্রযুক্তিবিদ্যা সবদিক থেকে এগিয়ে সামাজিক ও মানষিক ভারসাম্য তৈরী করলেই সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব । নিজেদের শ্রেণী বিন্যাসে যেন আমরা তলাইয়া না যাই । প্রতিযোগীতা করেই এগিয়ে যেতে হয় । সাম্প্রদায়িকতা বা কায়েমী স্বার্থ নিয়ে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব তাতে হয়ত ব্যক্তি বিশেষের লাভ হতে পারে কিন্তু সামগ্রীকভাবে বিশাল ক্ষতি । শিক্ষিত ও সমাজসচেতন মানুষেরাই পারে সমাজের সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে । ইতিহাস শিক্ষাদেয় , বিজ্ঞান , প্রযুক্তি , উৎপাদন সবটারই বিশেষ প্রয়োজন আছে নয়তো আমরা থমকে যাবো । ইতিহাস বলে শিক্ষা ,সংস্কৃতি , বিজ্ঞান , সাহিত্য , সবটার মধুর মিলন এবং কৌশল ও পদ্ধতিগতভাবে ব্যাবহার জাতি , সমাজ , দেশকে উন্নত করে । ভোগবাদ , বৈষ্যম্যের কারণে যেন শ্রেণী বিন্যাস হয়ে না যায় তবে তো মধ্যযুগ পুনরায় লজ্জা পাবে , পাশাপাশি দেখা দেবে ক্ষুধা লাঞ্ছনা , অশিক্ষা , দারিদ্রতা , নিপীড়ন , দাসত্ব প্রথা উৎসাহিত হবে মূল্যবোধের অবক্ষয় । সুতরাং আমরা তা মেনে নেবো না । হিংসা , হানাহানি , সন্ত্রাসমুক্ত , পরিবর্তনশীল , ভেদাভেদ শুন্য আধুনিক সমাজ হতে হবে লক্ষ্য। হয়ত কাজটা বেশ কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয় । আর্থিক , পারিপার্শ্বিক কারণে যৌথ পরিবার হয়ত ভেঙে গেছে তা বলে পরিবার, সমাজ দ্বিখন্ডিত হবে কেন । আমাদের সময় এসেছে অতীতকে লক্ষ্য করে ভবিষ্যতের রূপ রেখা তৈরী করার । জাতির নিজস্ব স্বকীয়তা যেন আমরা ভুলে না যাই । পরিবার , গ্রাম , সমাজ , জিলা , রাজ্য , দেশ একে অপরের পরিপূরক তা ভুললে সবই মিথ্যা । তবে তো দেশকে চিনতে অনেক বিলম্ব ঘটবে । নিজস্ব জাতি সত্বাকে জানা অপরাধ নয়। উদ্যমতা ঐক্য সংস্কৃতি ও সাহস অনুপ্রেরণা নিয়ে আমাদের জানতে হবে আমাদের বরণ্যেদের তবেই তো তৈরী হবে বাঙ্গালী জাতির আগামী সুসংহত পথ ।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজতে খুঁজতে তাদের নাম পাওয়া গেছে, অনেকেরই নাম প্রচারের আলোতে বা ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি যদি ও তা সত্যি বাঙালীজাতির এই মহান বরেণ্যরা সেদিন প্রাণপনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো নামের প্রচারের জন্য নয়, পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য কেউ বা আত্মবলিদান দিয়েছেন কেউ বা কারাবাসে, কেউ বা পঙ্গু হয়েছেন, কেউ বা নিখোঁজ। এতো মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। তা যেন পুঁথির অন্তরালে চাপা না পড়ে যায়। তারা বরেণ্য, তাদের বলিদান, ফলে আমরা স্বাধীন তাদের মহান ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হলে আমাদেরকে লড়াকু মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জাতি হিসাবে সমস্ত দুর্গম পথ পেরোতে হবে, তবেই তো অপেক্ষা করবে প্রস্ফুটিত আগামী।

শ্রদ্ধাবনত মস্তকে তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে খুঁটে খুঁটে তাদের বীরত্ব, বলিদান, সৃষ্টিকে খুঁজে বের করে আগামী প্রজন্মের জন্য একনজরের একটি সংক্ষিপ্ত জ্বলন্ত অথচ বাস্তব প্রেরণার তথ্য তৈরী করতে চাই।

১) শহীদ ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯ - ১৯০৮) মজঃফরপুরে অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় দুই ইংরেজ মহিলাকে বোমা মেরে হত্যার মামলায় ১১ই আগষ্ট ১৯০৮ এ মজঃফরপুর জেলে ফাঁসী হয়।

২) শহীদ সত্যেন বোস, (১৮৮২-১৯০৮) জেলের ভেতর রাজস্বাক্ষী প্রতারক / বিশ্বাসভাতক নরেন্দ্র গোসাইকে হত্যা মামলায় ২০ই নভেম্বর ১৯০৮ ইং ফাঁসী হয়।

৩) শহীদ কানাইলাল দত্ত, (১৮৮৮-১৯০৮)একই মামলায় ১০ই নভেম্বর কানাইলাল দত্তের ফাঁসী হয়।

৪) ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে যিনি আলীপুর বোমা মামলার সরকারী উকিল ছিলেন, তাকে হত্যার দায়ে ১৯শে মার্চ ১৯০৯ ইং চারুচন্দ্র বোসের ফাঁসী হয়।

৫) আলীপুর বোমা মামলার শুনানীর সময় ডি.এস.পি শ্যামওসুল আলমকে উচ্চ আদালত প্রাঙ্গনে হত্যার দায়ে ২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯১০ ইং বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্তের ফাঁসী হয়।

৬) ইংরেজ বাহিনীর সাথে বালেশ্বরের যুদ্ধে বিপ্লবী বাঘা যতীনের দুই সহযোগী নীরেন্দ্র দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ইংরেজ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে পরবর্তীতে উভয়ের ফাঁসী হয়।

৭) ১৯২৫ সালে বোমা তৈরীর কারখানায় দক্ষিণেশ্বর (কোলকাতা) রাজেন্দ্রনাথ লাহিরী ধরা পড়েন, বিচারে উনার মৃত্যুদন্ড হয়।

৮) প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও অনন্তহরি মিত্র উভয়ে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর সাথে গ্রেপ্তার হন পরবর্তীর্তে গোয়েন্দা অফিসার ভুপেন ব্যানার্জীকে জেলে পিটিয়ে হত্যার দায়ে ১৯২৬ এ উভয়ের

ফাঁসী হয় ।

৯)১৯২৪ এর মার্চ মাসে গোপীনাথ সাহার ফাঁসী হয় কোলকাতার রাজপথে ব্রিটিশ ''ডে'' কে হত্যার অভিযোগে । উনি '' ডে'' কে হত্যার অভিযোগে । উনি ''ডে'' কে অত্যাচারী চার্লিস টেগার্ট ভেবে হত্যা করেন ।

১০) ১৯৩৩ সালের ৭ই জুলাই ২২ বছরের তরুন দীনেশ চন্দ্র মজুমদারের ফাঁসী হয় কোলকাতায় পুলিশের উপর গুলী চালানোর মামলায় ।

১১) ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী রাত্রি ১২ টায় ফাঁসী হয় চট্টগ্রাম খ্যাত '' মাষ্টার দা'' অর্থাৎ সূর্যসেন এবং চট্টগ্রামের আর এক বিপ্লবী তারকেশ্বর ঘোষ দস্তিদারের । চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন মামলায় ।

১২) ১৯৩৯ এর জানুয়ারী মাসে পুলিশ ইন্সপেক্টরকে হত্যার অভিযোগে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী হয় ।

১৩) ঢাকা জেলার বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তকে ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই আলীপুর জেলে ফাঁসী দেওয়া হয় । অভিযোগ , কর্নেল সিম্পনসকে রাইটার্স এর ভেতরে ঢুকে হত্যা করার ।

১৪) তরতাজা ২০ বৎসরের যুবক প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্যকে ১৯৩০ ,১২ই জানুয়ারী ফাঁসী হয় মেদিনীপুরের ডগলাসকে হত্যার অভিযোগে ।

১৫) ১৯৩৪ এর ২৫ শে অক্টোবর আর এক বিপ্লবী ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তীর ফাঁসী হয় অভিযোগ মেদিনীপুরের জেলাশাসক '' বার্জ'' হত্যার ।

১৬) ১৯৩৪ এর ২৬ শে অক্টোবর একই মামলায় রামকৃষ্ণ রায়ের ফাঁসী হয় ।

১৭) ১৯৩৪ এর ২৬ শে অক্টোবর বার্জ হত্যার মামলায় নিমর্লজীবন ঘোষের ফাঁসী হয় ।

১৮) কচি ১৭ বছরের তরুণ হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ফাঁসী হয় ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৪ এ অভিযোগ চট্টগ্রামে খেলার মাঠে ইংরেজ শাসককে হত্যা ।

১৯) একই মামলায় ফাঁসী হয় ভবানী ভট্টাচার্য্যের । অভিযোগ দার্জিলিং এ রেস কোর্সে লেঃ গভর্নর এর উপর গুলী চালানো ।

২০) ১৯৩৩ এ ফাঁসী হয় কালিপদ মুখার্জীর । অভিযোগ ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা ।

২১) ১৯৩৩ এ ফাঁসী হয় কালিপদ মুখার্জীর । অভিযোগ ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা।

২২) মতিলাল মল্লিকের ফাঁসী হয় ১৯৩৪ এর এপ্রিল মাসে গ্রামরক্ষী হত্যার অভিযোগে ।

২৩) বিপ্লবী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যকে ফাঁসী দেওয়া হয় ডাকাতী মামলায় ।

২৪) আর এক বিপ্লবী অসিত ভট্টাচার্যকে ফাঁসী দেওয়া হয় ডাকাতী মামলায় ।

২৫) গোয়ান্দা অফিসার প্রফুল্ল রায়কে হত্যার অভিযোগ বিপ্লবী প্রেমানন্দ দত্তকে ফাঁসীতে ঝোলানো হয় ।

২৬) অতীন্দ্রমোহন রায় জন্ম ১৮৯৬ এ , দীর্ঘ কারাভোগ করেন ।

২৭) রাজেন্দ্র নাথ লাহিড়ী মাত্র ২৬ বছর বয়সে কাকোড়ী ট্রেন ডাকাতি মামলায় ১৯২৭ এর ১৭ই ডিসেম্বর উনার ফাঁসী হয় ।

২৮) অনন্ত হরি মিত্র আলিপুর জেলে ডেপুটি কমিশনারকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে ১৯২৬ এর ২৮এ সেপ্টেম্বর উনার ফাঁসী হয় ।

২৯) প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী একই অপরাধে একইদিনে উনার ফাঁসী হয় ।

৩০) সন্তোষ কুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত হিজলী বন্দিশালায় ১৯৩১ এর ১৬ আগষ্ট রাতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ।

৩১) নরেন্দ্র সেন , প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী , রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত , যতীন্দ্র চন্দ্র রায় , বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় , সতীশচন্দ্র পাকাড়াশী , নিরঞ্জন সেনগুপ্ত স্বাধীনতার আন্দেলনে দীর্ঘদিন কারাবাস করেন ।

অনুশীলন সমিতির বই এবং বাংলার বিপ্লবীদের ইতিহাস থেকে খুঁজে পাওয়া যায় আরো অনেক বরেণ্য যাদের জীবনের বেশ বড় অংশ কারান্তরালে বা জেলে মৃত্যু বা পলাতক অবস্থায় মৃত্যু সংগৃহীত তথ্য থেকে দেওয়া হলো ।

১) যতীন্দ্র দাশ লাহোর জেলে ৬৪ দিন আমরণ অনশন করে মৃত্যু বরণ করেন ১৯২৯ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর ।

২) মোহিত মৈত্র - আন্দামানে সেলুলার জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন ।

৩) মোহন দাস - আন্দামানে সেলুলার জেলে প্রাণত্যাগ করেন ।

৪) হরেন্দ্র মুন্সী - ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করেন ।

৫) অনিল কুমার দাস - ঢাকা জেলে মৃত্যু ১৯৩১ সালে ।

৬) মনীশ নাথ ব্যানার্জী - ফতেহগড় সেন্ট্রাল জেলে অনশনে মৃত্যু ।

৭) ১৯৩১ এ ১৬ আগষ্ট ১০০ শতজন বন্দী পুলিশের গুলিতে হিজলী বন্দী খানায় গুরুতর আহত হন ।

৮) ফনী ভুষন নন্দী - জেলে মৃত্যু - বিনা চিকিৎসায় ।

৯) হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য - আন্দামান জেলে মৃত্যু ।

১০) মোহিত অধীকারী - জেলে মৃত্যু ।

১১) রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী - জেলে মৃত্যু ।

১২) ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য - মেদিনীপুরে আত্মহত্যা ।

১৩) নবজীবন ঘোষ - পলাতক অবস্থায় আত্মহত্যা ।

১৪) ইন্দুভুষন রায় - আন্দামান সেলুলার জেলে আত্মহত্যা ।

১৫) প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী - ১৯০৭ সনে বোমা তৈরী করার সময় নিহত হন ।

১৬) সুশীল সেন - ১৯০৭ সনে কিংসফোর্ডের নির্দ্দেশে অমানুষিক পেটানো হয় তখন বয়স মাত্র ১৫ বৎসর । তাহার শব নদীতে খুঁজে পাওয়া যায়নি ।

১৭) নরেন দত্ত - আগ্রা জেলে অত্যাচারে তার মৃত্যু হয় ।

১৮) গোপেশ রায় - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু হয় ।

১৯) প্রবোধ ভট্টাচার্য - পলাতক অবস্থায় ১৯১৬ সনে ললিত নগরে ফেরার সময় সাপের কামড়ে মৃত্যু।

২০) গোপাল সেন - ১৯০৮ সনের ২রা জুন পুলিশের গুলিতে নিহত হন ।

২১) সত্যেন সরকার - ১৯১৮ সনে পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

২২) শচীন দাশগুপ্ত - পলাতক অবস্থায় রংপুরে ১৯১৭ সনে আত্মহত্যা করেন ।

২৩) যোগেশ রায় - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

২৪) নৃপেন্দ্র চক্তবর্ত্তী পলাতক অবস্থায় কাশীতে আত্মহত্যা করেন ।

২৫) অনুরূপ সেন - পলাতক অবস্থায় ১৯২৬ এ মৃত্যু হয় ।

২৬) শান্তনা গুহ (সাহিত্যিক) - জেলে অত্যাচারে মৃত্যু ।

২৭) সঞ্জীব রায় - ১৯১৫ সনে ময়মনসিং জেলে মৃত্যু ।

২৮) রসিক সরকার - রাজশাহী জেলে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন ।

২৯) শিশির গুহ রায় - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

৩০) বিপিন বিহারী দত্ত - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

৩১) অশ্বিনী রায় (আইনজীবি) - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু হয় ১৯২৩ ।

৩২) সন্তোষ গাঙ্গুলী - ১৯৩০ সনে দেউলী জেলে গলায় ফাঁসী দিয়ে আত্মহত্যা ।

৩৩) জগদীশ চক্রবর্ত্তী - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

৩৪) সাতকড়ি ব্যানার্জী - দেতালি বন্দী নিবাসে মৃত্যু ।

৩৫) ভোলানাথ চ্যাটার্জী - পুনা জেলে আত্মহত্যা করেন ।

৩৬) জিতেন মল্লিক - লক্ষ্ণৌ জেলে মৃত্যু ।

৩৭) সুনীল চক্রবর্ত্তী - রাজশাহী জেলে মৃত্যু ।

৩৮) হর্ষ চ্যাটার্জী - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

৩৯) চন্ডী নাগ - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

৪০) রেবতী নাগ - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

৪১) জিতেন সমাদ্দার - অন্তরীন অবস্থায় মৃত্যু ।

এ যেন মৃত্যুর মিছিল কিন্তু বিপ্লবীরা মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ , একটুকুও বিচলিত ছিলেন না । কারাভ্যন্তরে যারা রয়েছেন হয়তো বা সব নাম সংগ্রহ ও করা যায়নি । আগামীর উদ্দীপনা তৈরী হোক , সুশৃঙ্খল যুব সমাজ তৈরী হোক বাঙালী জাতির ঐতিহ্য ও আদর্শের বলিদান - এর খন্ড খন্ড বাস্তবচিত্রগুলো তাই তুলে ধরার প্রয়াস । সমাজ , জাতি ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পে যা কেবল যুবক / যুবতীরাই পারে ।

কে , কতদিন , জেলে ছিলেন - (সংগৃহিত তথ্য থেকে)

১) প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী - জেলে ২৮ বৎসর , অনশন ৮০ দিন , পলাতক ১৪ মাস ।

২) রমেশচন্দ্র আচার্য - জেলে ২৭ বৎসর , অনশন ২৬ দিন , পলাতক ১০ মাস ।

৩) রবীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত - জেলে ২৭ বৎসর , অনশন

৪) যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী - জেল ২৪ বৎসর , ১২৩ দিন অনশন , ২৮ মাস পলাতক ।

৫) গোবিন্দ কর - জেল ২২ বৎসর ২৪ দিন অনশন ৮০ মাস পলাতক ।

৬) তরনী সোম - জেল ২২ বৎসর ।

৭) সতীশচন্দ্র পাকড়াশী - জেল ২১ বৎসর , ১৮ দিন অনশন , ২৪ মাস পলাতক ।

৮) মদনমোহন সেনগুপ্ত - জেল ১৬ বৎসর , ২৪ দিন অনশন , ৩৮ মাস পলাতক ।

৯) নরেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত - জেল ১৫ বৎসর , ২২দিন অনশন , ৪২ মাস পলাতক ।

১০) অমৃত হাজরা - জেল ১৫ বৎসর , ৬০ মাস পলাতক ।

১১) চিরঞ্জীব মিত্র - জেল ১৫ বৎসর , ২২দিন অনশন , ১২ মাস পলাতক ।

১২) রবি বসু - জেল ১৫ বৎসর , ১০ দিন অনশন , ১২ মাস পলাতক ।

১৩) পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত - জেল ১৪ বৎসর , ২৪ দিন অনশন ।

১৪) চারু চন্দ্র রায় - জেল ১৪ বৎসর ।

১৫) খগেন্দ্র চৌধুরী - জেল ১৩ বৎসর , ২৪ মাস পলাতক ।

১৬) সুশীল চন্দ্র ঘোষ - জেল ১৩ বৎসর , ১৮ দিন অনশন , ১২ মাস পলাতক ।

১৭) রাখালচন্দ্র ঘোষ - জেল ১৩ বৎসর ।

১৮) হীরেন্দ্র মজুমদার - জেল ১২ বৎসর , ২২দিন অনশন ।

১৯) দুর্গেশ ভট্টাচার্য - জেল ১২ বৎসর , ১২ দিন অনশন , ১৩ মাস পলাতক ।

২০) ধীরেন্দ্র গাঙ্গুলী - জেল ১২ বৎসর ।

২১) সরল সেনগুপ্ত - জেল ১২ বৎসর ।

২২) মাখন লাল দত্ত - জেল ১২ বৎসর ।

২৩) আশুতোষ দাশগুপ্ত - জেল ১১ বৎসর ।

২৪) বিজয় কৃষ্ণ ব্যানার্জী - জেল ১১ বৎসর , ৭ মাস পলাতক ।

২৫) তারাপদ চক্রবর্তী - জেল ১৬ বৎসর ।

২৬) নলীনিকান্ত ঘোষ - জেল ১০ বৎসর , অনশন ১৪ দিন , ৪৬ মাস পলাতক ।

২৭) নলিনীকিশোর গুহ - জেল ১০ বৎসর ।

২৮) আদিত্য দত্ত - জেল ১০ বৎসর , পলাতক ৩৬ মাস ।

২৯) অধির মুখার্জী - জেল ১০ বৎসর , ২৯ দিন অ নশন ।

৩০) সতীশচন্দ্র রায় - জেল ১০ বৎসর ।

৩১) ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য - জেল ১০ বৎসর ।

৩২) বিনোদ চক্রবর্ত্তী - জেল ১০ বৎসর ।

৩৩) ভূপতি পাল - জেল ১০ বৎসর ।

৩৪) সুধীর কুশারী - জেল ১০ বৎসর ।

৩৫) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী - জেল ৩০ বৎসর , ১৬ দিন অনশন ৬০ মাস পলাতক ।

৩৬) জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার - জেল ২৬ বৎসর ।

৩৭) রমেশচন্দ্র চৌধুরী - জেল ২৫ বৎসর , ৯০ দিন অনশন , পলাতক ৩৬ মাস ।

৩৮) অমূল্যচন্দ্র অধিকারি - জেল ২০ বৎসর অনশন ৫০ দিন ।

৩৯) প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী - জেল ১৭ বৎসর , ২৮ দিন অনশন ।

৪০) যোগেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য - জেল ১৬ বৎসর , অনশন ৩৪ দিন , পলাতক ৫২ মাস ।

৪১) সতীশচন্দ্র রায় - জেল ১৫ বৎসর ।

৪২) পুলিনবিহারী দাস - জেল ১০ বৎসর ।

৪৩)নরেশচন্দ্র সোম - জেল ১৫ বৎসর ।

৪৪) আশুতোষ কাহালী - জেল ২৫ বৎসর , ৭০ দিন অনশন , ৯০ মাস পলাতক ।

৪৫) কেদারশ্বর সেনগুপ্ত - জেল ১৫ বৎসর , ৩২ দিন অনশন , ৫ মাস পলাতক ।

৪৬) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - জেল ২৪ বৎসর , ৪০ দিন অনশন , ৯৬ মাস পলাতক ।
৪৭) দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস - জেল ১৪ বৎসর , ৩২ দিন অনশন , ৪৮ মাস পলাতক ।
৪৮) শচীন্দ্র মোহন কর - জেল ১৩ বৎসর , ১৮ দিন অনশন , ১৫ মাস পলাতক ।
৪৯) জীবন ঠাকুরতা - জেল ১২ বৎসর ।
৫০) যতীন্দ্রনাথ রায় - জেল ২৪ বৎসর , ১২০ দিন অনশন , ১৮ মাস পলাতক ।
৫১) দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ - জেল ২১ বৎসর , ২৬ দিন অনশন , ১৬ মাস পলাতক ।
৫২) দেবকুমার ঘোষ - জেল ১৫ বৎসর ।
৫৩) নরেন্দ্রনাথ দাস - জেল ১৪ বৎসর ।
৫৪) তীর্থরঞ্জন চক্রবর্ত্তী - জেল ১২ বৎসর , ৩০ দিন অনশন , ২৪ মাস পলাতক ।
৫৫) তারা গুপ্ত - জেল ১২ বৎসর ।
৫৬) কুমুদ গুহ ঠাকুরতা - জেল ১২ বৎসর ।
৫৭) গোপাল মুখার্জী- জেল ১১ বৎসর ।
৫৮) প্রিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত - জেল ১১ বৎসর ।
৫৯) যোগেশ মজুমদার - জেল ১১ বৎসর ।
৬০) নিরঞ্জন সেনগুপ্ত - জেল ১০ বৎসর ।
৬১) নিশিকান্ত পাইন - জেল ১০ বৎসর , ৬৪ দিন অনশন , ১২ মাস পলাতক ।
৬২) প্রিয়লাল সরকার - জেল ১০ বৎসর ।
৬৩) ননী সেন - জেল ১০ বৎসর ।
৬৪) দিলীপ দাশগুপ্ত - জেল ১০ বৎসর ।
৬৫) নলীনি দাশগুপ্ত - জেল ১০ বৎসর ।
৬৬) রমেশচন্দ্র ব্যানার্জী - জেল ১০ বৎসর ।
৬৭) অতীন্দ্র মোহন রায় - জেল ২৪ বৎসর , ৩৫ দিন অনশন , ১৮ মাস পলাতক ।
৬৮) অমূল্য মুখার্জী - জেল ১৫ বৎসর , ২০ দিন অনশন ।
৬৯) মনীন্দ্র চক্রবর্ত্তী - জেল ১৫ বৎসর , ১৮ দিন অনশন ।
৭০) যোগেশ চক্রবর্ত্তী - জেল ১২ বৎসর ১৮ দিন অনশন ।
৭১) নিকুঞ্জ পাল - জেল ১৪ বৎসর , ৪৮ মাস পলাতক ।
৭২) সুরেশচন্দ্র ভরদ্বাজ - জেলে ১২ বৎসর ।
৭৩) মথুর চক্রবর্ত্তী - জেল ১০ বৎসর , ১২ মাস পলাতক ।

৭৪) অতুলচন্দ্র দত্ত মজুমদার - জেল ১০ বৎসর , ২৪ মাস পলাতক ।

৭৫) সতীশচন্দ্র সিংহ - জেল ১০ বৎসণ ।

৭৬) প্রফুল্ল কুমার সেন - জেল ১৫ বৎসর , অনশন ৫১ দিন , পলাতক ৪৮ মাস ।

৭৭) সুরেন্দ্র কুমার রায় - জেল ১৪ বৎসর ।

৭৮) মনীন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত - জে- ১১ বৎসর , ১৮ মাস পলাতক ।

৭৯) নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী - জেল ১০ বৎরে , ১৪ দিন অনশন ।

তাছাড়াও বাকীদের নাম যারা কারান্তরালে দীর্ঘদিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেচেন যেমন , পুলিন গুপ্ত , অনন্ত দে , পুলিন পাল , ক্ষেত্রমোহন সিংহ , ভগবান দাস , কালীপসন্ন মজুমদার , কালাপ্রসন্ন মজুমদার , অনঙ্গ সরকার , শশী মজুমদার , শান্তি সিংহরায় , শচীন্দ্র কায়েত , কুমুদ নাগ , জিতেন ভট্টাচার্য , প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী , অতুল দত্ত , মাখন দত্ত, যামিনীকান্ত পাল , উপেন্দ্র চৌধুরী , অমূল্য দত্ত , নিতীশ ভৌমিক নীহার রায় , মণি দাশগুপ্ত দীনেশচন্দ্র ঘটক , বিশ্ব সেন , রমেশ ঘোষ , বিনোদ গোপ, রবি ভট্টাচার্য , প্রিয়নাথ ব্যানার্জী (আইনজীবি) , সুকুমার ভৌমিক , বীরেন দত্ত , তেজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত , নীরোদ বরণ সেনগুপ্ত , দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত , সুখময় সেনগুপ্ত , শচীন্দ্রলাল সিং , প্রভাত রায় , চারু বিকাশ দত্ত , প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত , যশোদা চক্রবর্ত্তী , শ্যামাচরণ বিশ্বাস , মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী , প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী, মনমোহন সাহা, গিরিজা শঙ্কর চৌধুরী , মহেশ বরুয়া, কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য , মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য , উত্তম কুমারে ধর , সুধাংশু দত্ত, সুধাংশু সেনগুপ্ত , সুমতি মজুমদার, মহেন্দ্র মজুমদার , সুধাংশু দাস , প্রবীন দাস , ব্রজেন দাস , নরেন্দ্রবিজয় চৌধুরী , ক্ষেত্র সেন , অনুকুল চক্রবর্ত্তী , সুবীর সিংহ রায় হৃষীকেশ দাশগুপ্ত , প্রতুল চৌধুরী, যোগেশ মজুমদার , শান্তিময় দত্ত ,মাখন পাল , স্নেহময় দত্ত , গিরিজা দত্ত , প্রফুল্ল রায়, প্রীতিরঞ্জন , সুরেশ দেব , প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী , সুধাংশু চোধএূরী , জিতেন লাহিড়ী , কালী মৈত্র , ক্ষিতিশ দেব , বীরেন সরকার, অমিয় সান্যাল , কেদারনাথ সিংহ , সুরেণ রায় , রাধারমন ভট্টাচার্য অমলেন্দু বাগচী , সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী , নরেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য , মহেন্দ্র দাস ,বিভুতিভূষণ লাহিড়ী , অনাথবন্ধু ঘোষ , দেবেন্দ্র দাস, বঙ্কিমচন্দ্র রায় , অমূল্য লাহিড়ী , সুধীর মজুমদার , মনীন্দ্র লাহিড়ী , অনাথ লাহিড়ী ,সুধিন্দ্র সরকার , নরেন্দ্র ভট্টাচার্য , শহীদ রাজেন্দ্র লাহিড়ী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সুবোধ লাহিড়ী , সতীশ সরকার , সুশীলচন্দ্র দেব , পরেশ চন্দ্র গুহ , শহীদ নলীনি বাগচী , প্রবোধ চন্দ্র বিশ্বাস , প্রফুল্ল বিশ্বাস , ধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী , ত্রিদেব চৌধুরী , মিহির মুখীর্জী , সুকুমার রায় চৌধুরী , নিরু সেনগুপ্ত , অনন্তদ ভট্টাচার্য , গৌর প্রসাদ সেন , তারাপদ গুপ্ত , প্রফুল্ল গুপ্ত , ননী ভট্টাচার্য , সন্দিপ নীরদ সরকার , নির্মলেন্দু বাগচী , অরবিন্দ ভট্টাচার্য , বিশ্বমোহন সান্যাল , যতীন দাস , সুশীল ব্যানীর্জী , কিরণ দাস , মন্মথ গাঙ্গুলী , ধীরেন্দ্র নাথ

মুখার্জী , হেম দাশগুপ্ত (সুপারিনটেনডেন্ট - যাবদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) , অনাদি সেন (বিশিষ্ট ব্যবসায়ী) , ডাক্তার সতীশ সেন , জিতেন চক্রবর্ত্তী , রামবিহারী পাল , মধুসুধন রায় , দীনেশ বিশ্বাস , সুমতি মজুমদার, সারদা ভট্টাচার্য , কেদারনাথ ভট্টাচার্য , নরেন দাস প্রফুল্ল সেন , অনাথ চক্রবর্ত্তী , হৃষী দেব শর্মা , ডাক্তার রমেশ ঘোষ , ডাঃবিনয় সেন , নরেন ঘোষ , সঞ্জীব মুখার্জী , নবীন দাশ , প্রফুল্ল কুমার ভট্রশলী , ডাক্তার গজেন ঘোষ , হীরালাল দে।

বাঙালী নারীরাও স্বাধীনতা আন্দোলনের পিছপা ছিলেন না , মাতৃমুক্তির বৈপ্লবিক আন্দোলনে তারাও আত্মহুতি দেন কারা বরণ যেমন লীলা রায় , রেনু সেন , শৈল সেন , কল্যানী দেবী , শান্তিসুধা ঘোষ , কমলা চ্যাটার্জী , কমলা দাশগুপ্তা , সুরমা দাশগুপ্তা , লাবন্যপ্রভা দাশগুপ্তা ,উষা মুখার্জী , সুনীতি দেবী , সরযু চৌধুরী , বিমল প্রতিভাদেবী ,ইন্দুসুধা ঘোষ , প্রফুল্ল নলিনী ব্রহ্ম আশা দাশগুপ্তা , অরুণা সান্ন্যাল সুষমা দাশগুপ্তা , সুপ্রভা ভদ্র , শান্তিকনা সেনগুপ্ত মমতা মুখার্জী , হাস্যবালা দেবী , সরোজ নাগ , পারুল মুখার্জী , উষা মুখার্জী , সৌদামনী দেবী , নির্মলা আর্তনী , নিরুপমা আচার্য ,শুবর্ণ প্রভা দত্ত , শান্তি দাশ , সুনীতি চৌধুরী , রানা দাস ।

ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও বাঙালী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলন ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১) ডাক্তার ভুপেশনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ২) তারক নাথ দাস ৩) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যয় ৪) হেরম্বলাল গুপ্ত ৫) ধীরেন্দ্র নাথ সরকার (অধ্যাপক বিনয় সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ৬) অনিবাশ ভট্টাচার্য ৭) নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ৮) শিবপ্রসাদ গুপ্ত ৯) খগেন্দ্র চন্দ্র দাস ১০) বীরেন দাশগুপ্ত ১১) রাসবিহারী বসু ১২) ধ নগোপাল মুখার্জী ১৩) শৈলেন ঘোষ ১৪) অরনী মুখার্জী ১৫) চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী ১৬) হেমেন্দ্র রক্ষিত ১৭) সুরেন কর ১৮) নলিনী গুপ্ত ১৯) ডাঃসুধীর বসু ২০) বাসুদেব ভট্টাচার্য ২১) সত্যেন সেন ২২) জীতেন্দ্র নাথ লাহিড়ী ২৩) ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দাশগুপ্ত , ২৪) অধ্যাপক শ্রীশ চন্দ্র সেন , ২৫) সতীশ চন্দ্র রায় ।

বহুগুন , বহু মেধা নেমে পড়েছে মাতৃমুক্তির অন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে , যেমন

১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (ব্যারিষ্টার) ২) ব্যারিষ্টার বি.সি চ্যাটার্জী , ৩) ব্যারিষ্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ৪) বীরেন্দ্রনাথ দত্ত - ব্যারিষ্টার ৫) শরৎচন্দ্র বসু - ব্যারিএটার ৬) কিরণশঙ্কর রায় - ব্যারিষ্টার ৭) নিশীথ চন্দ্র সেন - ব্যারিষ্টার ৮) সুরেন্দ্র হালদার - ব্যারিষ্টার ৯) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১০) প্রফেসার - নৃপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জী ১১) ডাঃ হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত ১২) বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাথ সাহা , ১৩) বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৪) বিজ্ঞানী আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৫) ডঃ ত্রিগুনা সেন ১৬) ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ।

আরো অনেকে , অনেকের নামই লিখা হয়নি যাদের অনেকেই জীবনের বেশীরভাগ সময় জেলের অভ্যান্তরে কাটান এবং অনেকে আত্মহুতি দেন বা অনেকে ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে জীবন বিসর্জন

দেন । মাতৃভূমির ডাকে বহু ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশ অনুগত বাহিনীর হাতে প্রাণ ত্যাগ করেন , বিচারের নামে প্রহসন করে বহু সৈন্যকে (ভারতীয়) গুলী করে হত্যা করা হয় । বহু সৈন্যের জীবন জেলের ভেতরে কাটে, বাঙালী জাতির মধ্যেই সেদিন জন্ম হয়েছিল সুভাষ চন্দ্র বোসের মত তেজস্বী পুরুষরা তেমনি পারুল মুখার্জী , প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মত দুর্ধর্ষ সাহসিনি , তাদের ভুলে গেলে আমি মনে করি জাতির প্রতি অবমাননা করা ।

বাঙালীরা অভিমানী , ভাব প্রবণ তবে নিঃসন্দেহে প্রতিবাদী হয়ত বা পৃথিবীর আর কোন ও জাতি সত্বার মতো নয় । মনে হয় বাঙালীদের সংস্কৃতি ,চালচলন সব কিছুই যেন একটু আলাদা । যদিও এই বিষয়ে অনেক আলোচনা , পর্যালোচনা হয়েছে গবেষণা হয়েছে তাই ঐতিহাসিক ঘটনা ও ইতিহাসের তথ্য ঘেঁটে দেখা দরকার সত্যিই কি বাঙালীরা প্রতিবাদী , বাঙালীদের আত্ম প্রকাশ বন্ধ পতন অভ্যুদয় , কর্ম , চিন্তা অজস্র আন্দোলন সংঘাত যে পথ কখনো মসৃণ ছিল না ।ইতিহাস তার যুগ যুগান্তরের স্বাক্ষী । প্রথম সামাজিক বিপ্লব সম্ভবত শুরু হয় শ্রী চৈতন্য ও নিত্যানন্দ যখন দলিত জন সাধারণের বিদ্রোহকে সামাজিক বিপ্লবে রুপ দিয়েছিলেন তারপর শুরু করা যাক শিক্ষার উৎকৃষ্ট সেই রামকৃষ্ণ মিশন দিয়ে । উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চত্য ভাবধারার সমন্বয়ের মাধ্যমে যে ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশন তাতে এক অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল । " রামকৃষ্ণ মিশন " রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামানুসারেই হয়েছিল । পরম পুরুষ দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ির একজন পূজারী ছিলেন মাত্র । শিক্ষা বলতে প্রচলিত অর্থে যা বুঝায় তা কিন্তু উনার ছিল না । তবু তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী , পুরুষ । তিনি বলতেন যে , সকল ধর্মে একই ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে । হিন্দু - মুসলমান - বৌদ্ধ , খ্রীস্টান , সকল ধর্মের লক্ষ্য একই ।প্রথম কোলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে " রামকৃষ্ণ মিশন " এর সূত্রপাত হয় । যদি ও পরে তা বেলুড়ে স্থানান্তরিত হয় ।নরেন্দ্র নাথ দত্ত সন্ন্যাস জীবনে " স্বামী বিবেকানন্দ " নামে পরিচিত তিনিই ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একজন প্রধান শিষ্য । বিবেকানন্দ গতানুগতিকার বিরোধী হলেও ভারতের শ্বাশত আত্মাকে কোনো সময়ই অস্বীকার করেন নাই । নিষ্ঠা ও সংস্কৃতির সাহায্যে নবীন জীবন গড়িয়া তোলাই ছিল তার উদ্দেশ্য । তিনি বুঝতে পেরেচিলেন আমাদের দাঁড়াতে হইলে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে । সেই শক্তি হলো দৈহিক , মানষিক ও আধ্যাত্মিক যা পরবর্তী কালে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীমতি অ্যানি বেশান্ত ও অকপটে স্বীকার করে গেছেন । তার পরে আমরা আসি রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে বলেছিলেন বহুযুগ ব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চল তাকেই পবিত্রতা বলে স্থির করে নিস্তব্দ ছিল এমন সময়েই রাম মোহনের আবির্ভাব । অশিক্ষা , অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার গ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে যখন আমরা নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছিলাম তখন

অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্তি নির্মল বাতাস সঞ্চারিত করিয়া ছিলেন রামমোহন , রামমোহন ভারতের সর্ব প্রথম আধুনিক মানুষ যিনি শত শত বৎসরের বিকৃত সমাজ ব্যবস্থা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং আমাদের নতুন দিগন্তকে সূচনা করেন । কুসংস্কার ও জাতিভেদ রোধে তিনিই যুক্তি নির্ভর বিজ্ঞানশ্রিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা র প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেন । ইহা অনস্বীকার্য যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়াই আমাদের জড়তা মুক্তি ঘটিয়ে ছিল শুধু তাই নয় জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ এবং বিদেশীরা কিভাবে আমাদের সম্পদ ও কৃষকদের শোষণ করিতেছে তা প্রথম রামমোহন রচনায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয় । ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে রাজারামমোহন রায় বাংলা সাহিত্যে গুরু গম্ভীর বিষয় আলোচনা করিয়া বাংলা ভাষার মর্যাদাকে যথেষ্ঠ পরিমাণে বল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের রচিত " বেতাল পঞ্চবিংশতি " বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বলা চলে । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকার পর্যন্ত বাংলার আর্বিভূত যে সকল সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি শালী করিয়া তুলিয়াছিলেন তাদের মধ্যে টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারিচাঁদ মিত্র , কালী প্রসন্ন সিংহ , অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচয়িতা । বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তীকালে গঙ্গোপাধ্যায় , রমেশ চন্দ্র প্রমুখ উপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটিয়ে ছিলেন । কাব্য রচনার ক্ষেত্রে যারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূধন দত্ত , রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় , নবীন চন্দ্র সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ছিলেন রাম নারায়ন তর্করত্ন । তাছাড়া বাস্তব ঘটনা অবলম্বণে দীনবন্ধু মিত্রের রচিত " নীল দর্পন " নাট্য সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ বলিয়া আজো বিবেচিত হইয়া থাকে । শুধু তাই নয় দেশীয় সাহিত্য অমূল্য সম্পদ বলিয়া আজো বিবেচিত হইয়া থাকে । শুধু তাই নায় দেশীয় ভাষার মধ্যে বাংলায় প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় । ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম " বেঙ্গল গেজেট " নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় । দেহীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ পত্রে রামমোহন রায়ের অবদান অনস্বীকার্য । তিনি প্রথম " সংবাদ কৌমুদী " নামে একটি বাংলা পত্রিকার সম্পাদনা করেন । ১৮২১ খ্রী ঃ এবং প্রবন্ধ আকারে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পত্রিকায় লিখে সমালোচনা ও প্রতিবাদ করতে শুরু করেন । ইহা ছাড়াও রামমোহন ইংরেজী , হিন্দী এবং পার্শী ভাষায় তিন খানি সপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন । ১৮২২ খ্রীঃ রামমোহন রায় , দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কয়েকজন মিলে " বঙ্গদূত নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন । সংবাদ পত্রের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে " জান্ডাস" উক্তি করেছিলেন " লাইসেন্স বিহীন পত্রিকাগুলি যদি যথেচ্ছভাবে প্রচার করিতে দেওয়া হয় তা হইলে ইংরেজ সরকারের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িবে " রামমোহন রায় , হিন্দু কলেজ বা ইয়ং বেঙ্গলের নেতৃত্বে আন্দোলন রাজনৈতিক

উদ্দেশ্যে গঠিত কোন সভা সমিতি মাধ্যমে শুরু হয় নাই । বাঙালী রাজনৈতিক আন্দোলন কারিগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থায়ী সভা - সমিতি ঘটনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন । ১৮৩৭ খ্রীঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর , কালিনাথ রায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব " বঙ্গভাষণ প্রকাশিত সভা" নামে একটি সমিতি গঠন করেন । ইহাই বাংলা তথা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক সংঘ হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে ।

১৮৪৩ খ্রী ঃ ভারত হিতৈষী টমসন সাহেব দ্বারকানাথ ঠাকুরের অনুরোধে কলিকাতায় আসেন । তাহার সহযোগিতায় কতিপয় বাঙালী চিন্তাশীল ব্যক্তি ইংরেজ , শাসনের দোষ ক্রটির প্রতিকার এবং ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য " বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন । এই সমিতি ভারতবাসীর সমস্যা সম্পর্কে ইংল্যান্ডে ব্যাপক প্রচার শুরু করেছিল । ১৮৭৬ খ্রীঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির উৎসাহে কলিকাতার " ভারতসভা " নামে একটি শক্তিশালী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল দেশে শক্তিশালী জনমত গঠন করা , ভারতে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষকে একেই রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা , হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীভাব বৃদ্ধি করা এবং এই আন্দোলনে সমস্ত জনসাধারণকে সামিল করা । ১৮৪৭ খ্রীঃ প্যারীচরণ সরকার , কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ সভ্রান্ত ব্যক্তির উদ্যোগে কলিকাতার সন্নিকটে বারাসতেই প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৮৭৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬৪০ , বালকদের জন্য প্রাথমিক স্কুল ২৬,৪৭৩ টি । পাশ্চাত্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাঙালী মনকেই প্রথম আলোড়িত করিয়াছিল । পাশ্চাত্য শিক্ষা - দীক্ষা , সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের সংঘাত বাঙালীর মনে যে নবজাগরণের সূচনা হয় তাহা সমসাময়িক সমাজ ধর্ম ও রাজনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল । রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালীর জীবনে চৈতন্যের বিস্ফোরণ ঘটিয়াছিল তাহা তদানীন্তন সাহিত্যে হইয়াছিল । ইংরেজ শাসনের প্রতি আস্থা হারাইয়া সমাজ নেতা , দেশ নেতা , কবি , সাহিত্যিক , নাট্যকার সকলেই একযোগে শ্বেতাঙ্গদের বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্র , রঙ্গলাল , তারকনাথ , নবীন চন্দ্র , অক্ষর, কুমার, কামিনী রায় , দীনবন্ধু প্রমুখের দেশ বাৎসল্য ও বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিবাদ , সর্বত্র এক নতুন স্পন্দনের সৃষ্টি করিয়াছিল ।

বঙ্গ ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাতেই সর্ব প্রথম স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব বোধের পরিচয় পাওয়া যায় । পরাধীন ভারতের দুর্দশায় কবি মর্মাহত হইয়া ছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার স্বদেশ ভাবনা মূলক কবি । তার মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার মর্ম বাণী জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন । এবং ভারত সন্তানদিগকে স্বদেশ সেবার আত্ম নিয়োগ করিবার আহ্বান জানাইয়া ছিলেন । অল্প কথায় , ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গভীর দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এবং দেশ

ও জাতির উন্নত কামনা করিয়াই তাহার লেখনী পরিচালনা করিয়াছিল । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরবর্তী কালে যে সকল কবি ও সাহিত্যিক তাহাদের রচনার মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশিকতা ও দেশ বাৎসল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্রপাধ্যায় , দীনবন্ধু মিত্র , রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় , মনমোহন বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । বঙ্কিমের মনে দেশ প্রেমের বীজ সুপ্ত হইয়াছিল ঈশ্বর গুপ্তের দেশ প্রেমমূলক রচনা হইতে বঙ্কিম প্রতিভার প্রধান উৎস ছিল দেশাত্মবোধী স্বাধীনতা , অপহরণকারী ইংরেজদের নিকট হইতে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করিতে হইলে বিরূপ অনুশীলন প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই " আনন্দ মঠ " সঙ্গীত এই উপন্যাসের অর্ন্তভুক্ত । ভারতবাসীর অন্তরে দেশ মাতৃকার মাতৃমুক্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে " আনন্দমঠে" দেশদ্ধার ব্রতী 'সন্তান' ভবানন্দের মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল । আমরা অন্য মা মানি না জননী জন্ম ভুমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী । আমরা বলি , জন্মভূমিই জননী " । আনন্দমঠ উপন্যাসে রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি স্বদেশ প্রীতির দ্বারা অনু প্রাণিত হইয়া ছিলেন উহা তাহার একটি মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যায় । কবি হেমচন্দ্রে উদ্দেশ্যে লিখিত এক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন যদি সাহিত্যের দ্বারা এদেশের মঙ্গল সাধন করা যায় না মনে করিতাম , তাহা হইলে আমি আনন্দমঠ লিখিতাম না । আমার বিশ্বাস , আমার আনন্দমঠে দেশের একদিন উপকার হইবে । বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভবিষ্যবানী মিথ্যা হয় নাই । আনন্দমঠ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে বিপুল অনুপ্রেরণা জাগাইয়া ছিল । আনন্দমঠ ব্যাতীত " দেবী চৌধুরাণী " সীতারাম প্রভৃতি গ্রন্থেও বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ ভক্তির আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছিল ।

পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করিয়া রঙ্গললে বন্দোপাধ্যায় দেশবাসীর মধ্যে দেশ প্রেম সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশেই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন সমসাময়িক বাংলায় এমন কোন পাঠক ছিলেন না যিনি তাহার কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নাই। ঐতিহাসিক আখ্যান অবলম্বনে তাহার রচিত চারিটি কাব্য পদ্মিনী উপাখ্যান , কর্মদেবী , সুর , সুন্দরী এবং কাঞ্চিকাবেরী স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তাবাদী আদর্শে পরিপূর্ণ । রঙ্গলালের দেশাত্মবোধ সম্পর্কিত একটি গান ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নতি হইয়াছে। " স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায় "? তাছাড়া তিনি উৎকল দর্পন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন ।

পরাধীনতা তথা দাসত্বের বিরুদ্ধে মাইকেল মধুসূধন দত্ত যে বিদ্রোহের মনোভাব পোষণ করিতেন তাহাই " মেঘনাদ বধ " কাব্যের রচনার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল । মেঘনাথ বধ কাব্যের রাবন ও মেঘনাধ ছিল যথাক্রমে শক্ত ও বনজাগ্রত জাতীয়তা বোধের প্রতীক । রাবনের মুখে দেশের প্রতি আত্মত্যাগের যে আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে তাহা পরাধীন ভারতবাসীর দীক্ষামন্ত্র ছিল জন্মভূমি রক্ষা যে ভয়ে মরিতে , ভরু মূঢ় , শতাধি ক ভাবে ..... । অল্প বয়স হইতেই হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভুত করিয়াছিলেন । পরিণত বয়সে তিনি স্বদেশ প্রীতি মুলক কবিতা রচনার

মাধ্যমে দেশবাসীকে জাতীয়তাবাধে উদবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন । হেমচন্দ্রের " ভারত সঙ্গীত " ও ভারত বিলাপ " কবিতাদ্বয় এবং " বীরবাহু কাব্যের " দেশে প্রেমের উচ্ছাস পূর্ণ উত্তেজনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । " এলবার্ট বিল" উপলক্ষে আন্দোলনের সময়ে তাহোর রচিত বঙ্গ কবিতা " নেভার নেভার " খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল ।

সাহিত্য সাধনার দ্বারা সে সকল কবি সাহিত্যক দেশবাসীর মনে স্বদেশ প্রেমের উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে নবীন চন্দ্র সেন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন । সর্ব প্রকার অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং এই অত্যাচার হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করাই ছিল নবীন চন্দ্রে সাহিত্য সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য , পরাধীনতার জ্বালায় জর্জরিত , ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারতে ঐক্যের মহা বন্ধনে বাধিবার আশায় তিনি তাহার " কুরুক্ষেত্র " মহাকাব্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন । ইহা ব্যাতিত "পলাশীর যুদ্ধ " রঙ্গমতী প্রভৃতি জাতীয়তা মূলক কাব্য ছিল নবীন চন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অপর দুই জন ব্যক্তি স্বদেশ প্রীতি মূলক রচনার মাধ্যমে চির স্মরণীয় হইয়া আছেন তাহাদের নাম রমেশ চন্দ্র দত্ত ও ঈশান চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় রমেশ চন্দ্র দত্ত " রাজপতি ,জীবন প্রভাত" ও " রাজ পুত জীবন সন্ধ্যা " নামক যে দুটি স্বদেশ প্রীতি মূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের উপহার দিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । উপরিউক্ত দুইটি উপন্যাসের প্রথমটি একটি নিদ্রিত জাতিকে জাগাইয়া রাখবার গানে মুখর । কবি হেমচন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশান চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও অগ্রজের ন্যায় বৈরী জনিত স্বদেশ প্রেমে উদবুদ্ধ হইয়া " কি লিখিব আজ , স্বভাবে কি অর্থ নাই " প্রভৃতি স্বদেশ প্রীতি মূলক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । মধুসূধনের পরবর্তী কালে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য । " নীল দর্পন" নাটকে দিন বন্ধুর নাট্য প্রতিভার স্ফুরণ না ঘটিলে ও ইহাতে উৎপীড়িত অসহায় এক শ্রেণীর বাঙালীর প্রতি যে মর্মবেদনা ফুটিয়ে উঠিয়াছে তাহা এই নাটকটিকে অমরত্ব দান করিয়াছে । তাছাড়া বাংলাদেশে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি সর্বপ্রথম সর্বদলীয় ঘৃণা বিদ্বেষ সঞ্চারিত হইয়াছিল এই নাটকাভিনয় । স্বাদেশিক গণ আন্দোলনের ভিত্তি ভূমি ও ছিল এই নাটক । উনিশ শতকের শেষভাগে দীনবন্ধু মিত্র ব্যতীত অপর যে সকল ব্যক্তি নাটযকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে জ্যোতিন্দ্র নাথ ঠাকুর , গিরিশচন্দ্র ঘোষ , রাজকৃষ্ণ রায় , অমৃতলাল বসু , ক্ষীরোদ প্রসাদ, বিদ্যা বিনোদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । " চৈত্র " বা হিন্দুমেলার অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠঅকুরের রচিত " গাও ভারতের জয় " যে জাতীয় সঙ্গীতটি গাওয়া হইত ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইতিহাসে তাহার স্থান সুনির্দ্দিষ্ট । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলার সূচনা হয় । হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাদের মধ্যে গনেন্দ্রনাথ

ঠাকুর , নবগোপাল মিত্র , সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । বাংলার কবি সাহিত্যিক ও নাট্যকার গণ ভারত মাতার অশ্রুজল নিবারণে দেশবাসীকে যখন আহ্বান জানাইতে ছিলেন সেই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় (১৮৮৫ খ্রীঃ)। কংগ্রেসের কর্মকর্তাগণ কবি সাহিত্যিকদের তেমন ধার না ধরিলেও তাহারা কংগ্রেসকে সহানুভুতির দৃষ্টিতে দেখিতেন। সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর যে জাতীয় মিলন সঙ্গীতের সূচনা করিয়াছিলেন পরবর্তী কালে উহার প্রসার ঘটিয়াছিল । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাদেশিকতার আবহাওয়াতেই বর্ধিত হইয়াছিলেন । হিন্দু মেলা অনুষ্ঠানে বালক রবীন্দ্র একটি জোরালো স্বদেশ কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন । পরবর্তীকালে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সহিত রবীন্দ্রনাথের মনের মিল ঘটিয়াছিল , কারণ উহার মাধ্যমে তিনি সমগ্র জাতির উত্থানের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন । ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রদত্ত" স্বদেশ সমাজ " বক্তৃতা সমসাময়িক সমাজ ও রাজনৈতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল ।

স্বদেশ আন্দোলনের যুগে বঙ্গ সাহিত্যে যে স্বাদেশিকতার বন্যা লক্ষ্য করা যায় , তা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ , রজনী কান্ত সেন , কালী প্রসন্ন , অতুল প্রসাদ সেন , সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখের আবেগময়ী গান ও কবিতা ব্যাতিত এমন সাহিত্যিক বোধ হয় খুব কমই ছিলেন যাহারা দেশ ও স্বজাতির জন্য অন্তত দুই ছত্র লিখেন নাই । স্বদেশ আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিরচিত " আমার সোনার বাংলা" " আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি " সঙ্গীত সমুহ বাংলার আপামর মানুষের মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করিত । স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অবদান নানা দিক দিয়া অসামান্য । সভা সমিতিতে বক্তৃতা , সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ , কবিতা , গল্প প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জাতীয় জীবন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে । তাহার ছাপ স্বদেশী যুগে তাহার রচিত দেশ প্রেম মূলক সঙ্গীত তাহার গভীর দেশ প্রেম এবং জাতীয় আন্দোলনে আত্মোৎসর্গেরই অভিব্যক্তি । সেই সময় বাংলা দেশের সবর্ত্র জনসভা হাটে মাঠে , ঘাটে রবীন্দ্রনাথের ঐ সকল সংগীত পাওয়া যেত । ইংরেজ সরকারের নৃশংস অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও রবীন্দ্রনাথের লেখনী মুখরিত ছিল । জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংশ হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথই সর্ব প্রথম প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন । বড় লাটের নিকট লিখিত এক পত্রে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড ও পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত " স্যার " উপাধি ত্যাগ করেন । এই পত্রে কবির লেখনী হইতে যে তেজময়ী প্রতিবাদ নিঃসৃত হইয়াছিল , তাহার তুলনা নাই ।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগে অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঞ্চিতের মর্মবেদনা এবং নারী হৃদয়ের জটিল সমস্যার আলেচ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন । তাহার রচিত 'পথের দাবীতে ' বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল তাহা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে প্রচন্ড

উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল । ইংরেজ সরকার রাজদ্রোহমূলক অজুহাতে তাহাকে নিষিদ্ধ গন্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল ।

কলিকাতার জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ী দ্বারকানাথের প্রপৌত্র অবনীন্দ্রনাথ শিল্পাদর্শ যে ভারতীয় শিল্পে নবজাগরণের সৃষ্টি করিয়াছিল একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ।

হ্যাডেলের সহযোগীতায় অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় প্রচীন শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথের শিল্প প্রতিভা উপলব্ধি করিয়া তাহাকে কলিকাতা আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন । ইতি পূর্বে আর কোন ভারতীয়ই এই পদ লাভ করে নাই । অবনীন্দ্রনাথের শিল্পবৈশিষ্ট হইল , ভারতীয় প্রাচীন শিল্প সাগর যুগোপযোগী প্রকাশ । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পে যে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা নন্দলাল বসু , অসিত কুমার হালদার, যামিণী রায় মহীশূরের ভেকটটাপ্পা প্রমুখের শিল্প সৃষ্টির দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়াছিল এবং অবনীন্দ্রনাথের শিল্প পদ্ধতি এক নতুন শিল্প শৈলাতে উন্নতি হইয়াছিল ।

নন্দলাল বসু চিলেন অবনীন্দ্র নাথের প্রধান শিল্প শিষ্য । কলিকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র হিসাবে নন্দলাল নাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আসিয়াছিল । ছাত্রবস্তায় " বসুমতী " ছবি আকিয়া প্রাচ্য কলাম বাঙালীর নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন .। নন্দলালের অঙ্কিত অসংখ্য স্কেচ ও চিত্র পটগুলি এক অনবদ্য শিল্প সৃষ্টি । প্রকারণ পদ্ধতি ও রূপ রসের দিক দিয়া নন্দলালের শিল্প সৃষ্টি অভিনবত্বে অবনীন্দ্রনাথ অপেক্ষা কোন অংশ কম ছিল না । অবনীন্দ্র নাথ ও নন্দলাল পরস্পরের পরিপূরক । অতিশয় সংক্ষেপে বলা যায় , পাশ্চাচ্য চিত্ররীতির প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে প্রাচ্যূপ কলার সন্ধানে যাত্রা করেন অবনীন্দ্রনাথ , নন্দলাল যাত্রা করেন ভারতীয় ধ্রুবচিত্র রীতি তথা স্মৃতিকথার সহজ আবিস্কারের ক্ষেত্রে হইতে ।

নন্দলাল ব্যতীত অবনীন্দ্র নাথের অন্যান্য যে সকল শিষ্য শিল্পে বাংলায় নব যুগকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সুরেন্দ্র কর , সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত শৈলেন্দ্র নাথ দে, মুকুল দে প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । সুসরন্দ্রনাথ কর ওয়াল পেইন্টিং এবং মিনিচেয়চার ছবির জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের জেষ্ঠ্য ভ্রাতা গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর । (১৮৫৭-১৯৩৮ খ্রীঃ) ছিলেন উপরিউক্ত শিল্পী অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির । তিনি ছিলেন বাস্তববাদী শিল্পী সমসাময়িক রাজনীতি , সমাজ ও অর্থনীতির উপর তাহার অঙ্কিত ব্যাঙ্গচিত্রগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল ।

ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবাসীর দুর্দশা ও হতাশা যখন তাহাদিগকে পাশ্চত্য সভ্যতার প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছে সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীর " নব আগ্রহশীল করিয়া তুলিয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই সর্ব প্রথম যুক্তির আলোকে প্রাচীন হিন্দু ধর্মের কলুষতা দূর করিয়া উহাকে স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দোমাতরম" সঙ্গীতে হিন্দুদের

আরাধ্যা দেবী দুর্গার সহিত দেশ মাতৃকাকে এক করিয়া দেখিবার ফলে দেশবাসীর দেশাত্মবোধ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী কালে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব ও তাহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম , সাধনা ধর্ম ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করিতে যে রূপ সাহায্য করিয়াছিল অপর কোনো ধর্ম তাহা করিতে পারে নাই । শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি দেশবাসী , বিশেষত ইংরেজ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন ।

হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের মূল সত্য ব্যাখা করিয়া তিনি উহাকে বিশ্বের স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । তাহার ধর্ম সাধনার উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশ গৌরববোধ হিন্দু সম্প্রদায়ের পুনরুত্থান এবং ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন । বিবেকানন্দ কেবল অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল যুগেরই প্রচারক চিলেন না তিনি ছিলেন হিন্দু ভারতের জাগরণের ও অগ্রদূত । তিনি দেশবাসীকে দুঃখ ও দারিদ্র হইতে মুক্ত করিয়া শিক্ষা দীক্ষা সাহসে এক বলিষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন । বিবেকানন্দের তেজদীপ্ত বাণী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের অন্তরে গভীর প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল । তাহাদের এক হাতে থাকত গীতা , অন্য হাতে তরবারি এবং অন্তরে থাকিত বিবেকানন্দের আদর্শ ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ , দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ মনিষীর আদর্শ ও বাণী ও উপগ্রষ্থী ভাবধারা বিকাশের আদর্শগত ভিত্তি রচনা করিয়াছিল । স্বাধীনতা অপহরণকারী বিদেশী শাসকদের অত্যাচার হইতে ভারতকে মুক্ত করিতে হইলে যে শক্তি ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন একথা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম প্রচার করিয়া ছিলেন । বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের মূল সত্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন । এক কথায় মনীষিগণ ভারতবাসীকে কাপুরুষতা ও ভীরুতা পরিত্যাগ করিয়া শক্তি সাধনার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করিবার সে আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহা দেশবাসীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রামী প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছিল । ভারতবাসী উপলব্ধি করিয়া ছিল যে , একমাত্র তাহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ বর্তমান অপেক্ষা উন্নততর অবস্থায় উপনীত হইতে পারে । ভারতের সন্ত্রাসবাদীগণ দেশ ও বিদেশ উভয় স্থান হইতেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন ।

বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যয় , স্বামী বিবেকানন্দ , অরবিন্দ ঘোষ , মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক , পাঞ্জাবের লাল লাজপৎ রায় , মাদ্রাজের চিদাম্বরম পিল্লাই প্রমুখের দেশাত্মবোধ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ভারতের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপবিক প্রেরণা সঞ্চার করিয়া ছিল । ইহা ব্যতীত ফরাসী বিপ্লব , আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম , জাপানীদের দেশ হিতৈষনা ও

রাশিয়ার জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিহিলস্টদের গুপ্ত হত্যার কাহিনী প্রভৃতির ইতিহাস পাঠ ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগরণে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল ।

বাংলাদেশ প্রথমে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি গঠনের কৃতিত্ব প্রমথ নাথ মিত্র মহাশয়ের । তিনি ১৯০২ খ্রীঃ কলিকাতায় " অনুশীলন সমিতি " নামে একটি বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে শিক্ষা দান করা হইত । ইহার উদ্দেশ্য ছিল এমন এক দল তরুন সৈনিকের সৃষ্টি করা যাহারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে । বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হইলে বাংলার বিপ্লবীরাও অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন । সেই সময়ে " অনুশীলন সমিতি " ব্যতীত আরও অনেক গুপ্ত সমিতি বাংলার বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছিল । এই সকল সমিতির মধ্যে ময়মনসিংহের " সাধন সমিতি " ঢাকার " অনুশীলন সমিতি " ফরিদপুরের "ব্রতী সমিতি" প্রভলতি উল্লেখযোগ্য । ইহা ভিন্ন সেই সময়ে বারীন ঘোষের নেতৃত্বে " যুগান্তর " নামে অপর একটি বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠিয়াছিল । " অনুশীলন সমিতির প্রমথনাথ মিত্রের সহিত মত পার্থক্যের ফলেই এই নতুন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছিল । ইতিমধ্যে অরবিন্দ ঘোষ বরোদার চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন । তিনি ছিলেন যুগান্তর দলের মন্ত্রণা গুরু এবং ভ্রাতা বারীণ ঘোষ ছিলেন ঐ দলের সর্বাধিনায়ক ।

১৯০৭ খ্রীঃ ' যুগান্ত ' দলের সদস্যগণ কলিকাতার মানিকতলা অঞ্চলে মুরারি পুকুরের বাগান বাড়ীতে একটি গুপ্ত বিপ্লবী কেন্দ্র গড়িয়া তোলেন এবং তাহারাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হন । যুগান্ত দলের নেতৃত্বে কলিকাতা আদালতের বিচারপতি কিংসফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্র সমসাময়িক ভারতের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিংসফোর্ড ছিলেন একজন কুখ্যাত বিচারপতি । তিনি বিচারের নামে বিপ্লবীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইতেন এই অত্যাচারী বিচারপতিকে হত্যার উদ্দেশ্যে যুগান্তর দল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী বাংলার দুই নির্ভীক সন্তানকে নিযুক্ত করিয়াছিল । কিন্তু বিপ্লবীরা ভুলবশত কিংসফোর্ডের পরিবর্তে দুইজন ইংরেজ মহিলাকে বোমার আঘাতে হত্যা করিয়া বসেন। পুলিশের নিকট ধরা পরিবার পূর্বেই প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরামকে পুলিশ গ্রে প্তার করে । আদালতের বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম হয় ।

কিংসফোর্ডর হত্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইতে গিয়া ইংরেজ সরকার মুরারি পুকুর বাগানবাড়ীর গুপ্ত সমিতির সন্ধান পায় । এই সূত্রে যুগান্তর দলের বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয় । তাহাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করেন । মামলার বিচারে বারীন ঘোষ , উল্লাস কর দত্ত প্রভৃতিকে দীপান্তরে প্রেরণ করা হয় এবং অন্যান্য কয়েকজনকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয় ।

কিংস ফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্র বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই হত্যা কান্ডকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যে মামলা রজ্জু করিয়াছিলেন তাহাই " আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা" নামে খ্যাত । ইহা ছিল বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রথম ষড়যন্ত্র মামলা । দ্বিতীয়ত , ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির দেশের প্রাণ বিসর্জনের দৃষ্টান্ত বাংলার যুবকদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । এই ঘটনার অব্যবহিত পরে বাংলার সর্বত্র বিপ্লবীদের গুপ্ত হত্যা এবং রাজনৈতিক লুণ্ঠন শাসক গোষ্ঠীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল । এই হত্যাকান্ডের সমর্থনে বাংলার বাহিরে বহু বিপ্লবী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে । মহারাষ্ট্রের তিলক এইরূপ একটি প্রবন্ধ বাংলার বিপ্লবীকে সমর্থন জানাইলে তাহাকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয় । তৃতীয়ত, হত্যাকান্ডের স্বল্প কালের মধ্যেই ইংরেজ সরকার বহু সংখ্যক সমিতি ও সংগঠনকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করে । ইহার ফল স্বরূপ প্রধান্য সমিতির অন্তরালে যে গুপ্ত কর্মপন্থা চলিত তাহা বন্ধ হইয়া যায় । তখন বিপ্লবীরা লোক চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করেন ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিব্রত ইংরেজদের উপর চরম আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে ভারতে যে বিপ্লব প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছিল যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী বসু ছিলেন উহার প্রাণস্বরূপ । আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার পরবর্তী কালে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঘাযতীন এর নেতৃত্বে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চলিতে থাকে । যতীন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে অস্ত্র শস্ত্র আমদানি করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন । তিনি এম এন রায় (মানবেন্দ্র নাথ রায়) কে ইংরেজদের প্রধান শত্রু জার্মানদের সহিত যোগাযোগের জন্য বাটাভিয়ার প্রেরণ করিয়াছিলেন । ১৯১৫ খ্রী ঃ জার্মানী হইতে জাহাজ বোঝাই অস্ত্র শস্ত্র বালেশ্বরে আসিয়া পৌছিতেছে এই সংবাদ পাইয়া যতীন্দ্রনাথ কয়েকজন বৈপ্লবীসহ বালেশ্বরে উপস্থিত হন । এই খবর ইংরেজ পুলিশ পূর্বেই জানিতে পারিয়া বহু সিপাহী লইয়া বিপ্লবীদের পশ্চাদ্বাচরণ করেন । বুড়ীবলাম নদী র তীরে ইংরেজ সিপাহীর সহিত বিপ্লবীদের প্রচন্ড লড়াই হয় । শেষ পর্যন্ত এই লড়াইয়ে বিপ্লবী চিত্ত প্রিয় রায় চৌধুরী মারা যান এবং যতীন্দ্র নাথ সহ অন্যান্যরা ধরা পড়ে । এই ভাবে বৈদেশিক সাহায্যের বাংলার বিপ্লবীদের প্রথম বিপ্লব প্রয়াস বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল ।

১৯১৫ খ্রীঃ " ভারত রক্ষা " আইনের দ্বারা শতশত যুবকের গ্রেপ্তার করা হইলে সাময়িকভাবে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে ভাটা পড়িয়াছিল ।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় যখন বিপ্লবী কার্যকলাপ চলিতেছিল , সেই সময়ে উত্তর ভারতে রাস বিহারী বসু ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র অভুত্থানের আয়োজন করেন । তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে দিল্লী , লাহোর, প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল ।

১৯১২ খ্রীঃ দিল্লীতে বড়লাট হার্ডিঞ্জকে হত্যার পরিকল্পনা রাসবিহারী বসুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিপ্লব প্রচেষ্টা । দুই বৎসর পরে তিনি সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিয়াছিলেন । এই আয়োজনের মূল কেন্দ্র ছিল পাঞ্জাব । বিভিন্ন অঞ্চলে গুপ্ত সমিতির সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া তিনি ১৯১৫ খ্রীঃ ফেঃ অভ্যুত্থানের দিন ধার্য করিয়াছিলেন । কিন্তু ইংরেজ সরকারের নিকট এই সংবাদ পূর্বেই ফাঁস হইয়া গেলে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছিল । উত্তর ভারতের সর্বত্র পুলিসী তৎপরতার ফলে হৈ সময়ে অনেক বিপ্লবী ধরা পড়িয়াছিলেন এবং রাসবিহারী বসুকে এক নম্বর আসামী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল । রাসবিহারী বসু সেই সময়ে " পি ঠাকুর " ছদ্ম নামে জাপানে চলিয়া যান । বাংলায় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও উত্তর ভারতে রাস বিহারী বসুর বিপ্লব প্রচেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হইলে ভারত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল ।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকা যেমন ছিল উজ্জ্বল তেমনি প্রেরণার উদ্দীপক । মৃত্যু ভয়কে জয় করিয়া এবং আত্ম বির্সজনের শপথ গ্রহন করিয়া তাহারা যেভাবে দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপাইয়া পরিয়াছিলেন তাহাতে বিদেশী শাসকবর্গ আতঙ্কিত হইয়াছিল । তারা বুঝিয়াছিল যে ভারতে তাহাদের শাসনের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে কঠোর আত্মত্যাগ সত্বেও সন্ত্রাসবাদীদের সাফল্য ছিল খুবই সীমিত ।

ইহার প্রদান কারণ এই যে , সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও নেতৃত্বের অভাবে সন্ত্রাসবাদীগণ ভারতীয় জন সাধারণের হৃদয়ে তেমন উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারেন নাই । গুপ্ত সমিতিগুলিতে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অধিপত্য ছিল , কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণীকে এই সংগ্রামের অংশীদার করা সম্ভবপর হয় নই । তাহা দ্বারা সুসংবদ্ধ অভাবে রাশিয়ার নিহিলিষ্ট এবং আয়ারল্যান্ডের সন্ত্রাসবাদীদের ন্যায় ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ও কতিপয় অত্যাচারী সরকারী কর্মচারী হত্যা এবং সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা কার্জনের নীতির দ্বারা সৃষ্টি হয়নি । ইংরেজ আমলে প্রধান তিনটি রাজনীতিক বিভাগ ছিল । এরা হল - বঙ্গ প্রেসিডেন্সী , বম্বে প্রেসিডেন্সী ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী বহু দিন ধরেই দুরূহ সমস্যা উপস্থিত করেছিলেন । প্রদেশের আয়তন ও জনসংখ্যার পরিমাণ সুষ্ঠ শাসন ব্যবস্থার পরিপন্থী ছিল । এই বিভাজনের পদ্ধতি কার্যত আরম্ভ হয়েছিল ১৮৭৪ সালে , যখন আসামকে বিভক্ত করে চীফ কমিশনারের কতৃত্বাধীন করা হয় । এতে অবশ্য সমস্যা মেটেনি । ১৮৯৬ সালে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল । কিন্তু এটা ব্যয় বহুল হওয়ার দরুন পরিত্যক্ত হয়েছিল । শুধু এর পরিণাম স্বরূপ লুসাই পার্বত্য অঞ্চল আসামে যুক্ত হয়েছিল । ১৯০১ সালের আদম সুমারীতে যখন দেখা গেল বাংলার জন সংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ তখন আর একটি পরিকল্পনা

উদয় হয়েছিল উড়িষ্যাকে মধ্য প্রদেশের সঙ্গে একত্রিত করা ।

এই অবস্থায় কার্জনের মাথায় এই চিন্তার উদয় হল যে " বাংলাদেশ " এক জনের পক্ষে নিঃসন্দেহের অতি বিশাল উপরন্তু কার্জনের মনে হয়েছিল - বাংলা আসাম এবং মধ্যপ্রদেশের চতুঃসীমা - সেকেলে , অযৌক্তিক ও অদক্ষতায় জন্মদাতা।

স্যার এন্ডোফ্রেজার কর্তৃক একটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল যেটা ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর সর্ব সাধারাণের কাছে বিদিত করা হয়েছিল । চট্টগ্রাম বিভাগ পার্বত্য ত্রিপুরা , ঢাকা জিলা ,ময়মনসিংহ জিলা আসামের ভিতর যাবে । আর ছোটনাগপুর যাবে মধ্য প্রদেশে । এর পরিবর্তে বাংলা মধ্য প্রদেশ থেকে পাবে সম্বলপুর আর মাদ্রাজ থেকে পাবে গঞ্জাম । এই পরিকল্পনার পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখানো হয়েছিল -

১) বাংলার অধিকতর নিজস্ব শাসনের ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল । পূর্ণ গঠনের পরে বাংলার লোক সংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে কমে ৬ কোটি ৮ লক্ষ দাঁড়াত ।

২) বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলির কলকাতার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হত ।

৩) পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলির মুসলমান অধিক সুখ সুবিধা পেত ।

৪) আসামের চা বাইরে আসার পথ পেত ।

৫) সমস্ত উড়িষ্যা ভাষীরা একটি শাসন ব্যবস্থার অধীন হত । শেষ পর্যন্ত কার্জনের দ্বারা যে পরিকল্পনা অবলুণ্ঠিত হয়েছিল তাতে ছিল পূর্ব্বঙ্গ থেকে ১৫টি জিলা নিয়ে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ব্বঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ তৈরী করা এবং রাজধানী ছিল ঢাকা । এর জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১ লক্ষ তাকে মুসলমানদেরই প্রাধান্য ।

এই শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত যুক্তিগুলির পশ্চাতে এক ক্ষতি সাধক রাজনৈতিক মতলব ছিল যা প্রতি ফলিত হয়েছিল লর্ড কার্জনের " স্বদেশ " কতৃপক্ষের সাথে পত্র আদান প্রদানের মধ্যে । " ঐক্যবদ্ধ বাংলা একটি শক্তি " - এটি তার দ্বারাই লিখিত হয়েছিল এবং দেশ ভঙ্গের মধেথ্য দিয়ে সেই শক্তিকে খর্ব করাই ছিল তার উদ্দেশ্য । তার মতলব ছিল ব্রিটিশ শাসনের একটি শক্তিশালী প্রতি পক্ষ দলকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে, দুর্বল করে দেওয়া । বাঙালীরা নিজেদের একটি জাতি বলে ভেবে নিয়েছিল , এই ধরনের চিন্তা ছিল ব্রিটিশ শাসনের সুপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিপদজনক সুতরাং এই চিন্তাকে ধ্বংস করাই ছিল কার্জনের লক্ষ্য । কংগ্রেস রাজনীতির কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা , এই শহরটির প্রধান্য ও বৈশিষ্ট্য হরণ ছিল লক্ষ্য ।

অবশ্য লর্ড কার্জনের গোপন মতলবগুলি সে সময়ে সাধারণ লোক কিছুই জানত না । শুধু এটা বুঝতে পেরেছিল যে বাঙালীর সংহতি ভেঙ্গে দেওয়াটাই কার্জনের আসল অভিপ্রায় । পরিকল্পনার

বিরুদ্ধে জনসাধারণের কাছে থেকে প্রবল প্রতিবাদ এসেছিল । এমন কি সেক্রেটারি অফ স্টেটের দ্বারাও একথা স্বীকৃত হয়েছিল যে , একটি সমশ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়কে খন্ড খন্ড করে দিলে তাদের প্রতিবাদ করাটাই স্বাভাবিক । সমালোচকদের বক্তব্য ছিল মাত্র এক কোটি দশ লক্ষ লোককে সরিয়ে নিলে শাসন ব্যবস্থার চাপ মুলত ঃ হালকা হবে না । উপরক্ত , ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাবে । এই পরিকল্পনার পেছনে যে সাম্প্রদায়িক মতলব ছিল এটা স্পিয়ারের দ্বারা ও স্বীকৃত হয়েছিল । স্পিয়ারের বক্তব্য ছিল - " হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চল , মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সুন্দর ভারসাম্য ছিল , উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনগুলি পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা করা যেত ।

এই সাম্প্রদায়িকতার কীর্তিই কার্জনকে শক্তি জুগিয়ে ছিল ১৯০৪ তার পূর্ববঙ্গ পরিদর্শন কালে । কার্জনের পরিকল্পনা একটি রাজনৈতিক চাপ গ্রহন করেছিল । একটি মুসলিক প্রদেশ গঠনই ছিল তার উদ্দেশ্য যা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রাণ নাশক হবে । ১৯০৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে নবাব আতিফুল্ল খাঁ তার বক্তৃতার এই সংবাদটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে সত্য বলে ঘোষণা করেন ।

পূর্ব বঙ্গের মুসলমানেরা সকলেই এই পরিকল্পনার অংশীদার ছিলেন না । আব্দুল রসুল ও লিয়াফৎ হোসেন , বদরুদ্দিন আয়েবজি ও শিবালী নোমানির মহান ভাবধারাকে ধরে রেখেছেন। কিন্তু ঢাকার নবাব সলিমউল্ল খাঁ কার্জনের কাছ থেকে এক লক্ষ পাউন্ড ধার পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে চক্রান্তের কাজে অংশ নিতে রাজী হয়েছিল । স্যার হেনরী কটনের ভাষায় বলতে গেলে " লর্ড কার্জনের নীতির সারবস্তু ছিল বর্ধিষ্ণু শক্তিগুলিকে দুর্বল করে দেওয়া আর দেশ প্রেমের চেতনা থেকে উদ্ভুত রাজনৈতিক মনোভাবকে ধ্বংস করে দেওয়া । স্পিয়ারের ভাষায় ন্যায় সঙ্গত প্রতিবাদ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী পরিচালনায় জনগণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের রূপ নিয়েছিল ।

একজন বিচক্ষণ শাসকের কর্তব্য এই ধরনের বিক্ষোভকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা কিন্তু জনগণের এই বিরোধিতা , কার্জনকে করে তুলল আরও অদম্য । এই বিক্ষোভ কার্জনের কাছে স্বার্থপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মূলক এই আখ্যা পেল , আর বলা হল এটা বাগাড়ম্বর ও অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই নয় ।

উকিল সভার বিরোধিতা কার্জনের কাছে মনে হল ডাকায় পৃথক হাইকোর্ট গঠনের ফলে কলিকাতার হাইকোট উকিল সভার কায়েমী স্বার্থের যে ক্ষতি হবে তার ভয়ে কিন্তু যদি তাই হবে , তা হলে পূর্ববঙ্গের খ্যাত নামা উকিলের এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করতেন না । এদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার আনন্দ চন্দ্র রায় , শিলচরের কামিনী কুমার চন্দ্র ও বরিশালের দীনবন্ধু সেন ।

এরপরে আসে ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলির কথা । সংবাদপত্রগুলি যে বিরোধীতা জানিয়েছিল

সেটা কার্জনের মতে গ্রাহক হারানোর ভয়ে । এটা সত্য হলে এক মাত্র " অমৃত বাজার পত্রিকার ক্ষেত্রেই ইহা সত্য হতে পারত , কিন্তু 'সঞ্জীবনী' , 'সন্ধ্যা', " নিউ ইন্ডিয়া " ও ইন্ডিয়ান মিররের মতো অন্যান্য কাগজের ক্ষেত্রে নয় । আর 'ফ্রেন্ড' অফ ইন্ডিয়া , স্টেটম্যান " ও ইংলিশম্যান সম্বন্ধে কি বলা চলতে পারে ? কার্জনের মতে জমিদারেরা বিরোধীতা করেছিলেন খাজনা হারানোর ভয়ে । এটা সত্য যে ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর , দিনাজ পুরের রাজা এবং ভাগ্যকুলের জানষ্ঠী নাথ রায় প্রবল আপত্তি জানিয়ে ছিলেন । কিন্তু তাদের আপত্তি যতটা ছিল খাজনা হারানোর জন্য তার চেয়ে ঢের বেহী তারা রেভিনিউ বোর্ডের এক্তিয়ারের বাইরে হয়ে যাবেন বলে ।

সর্বশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে কার্জনের মতে মধ্যবিত্ত হিন্দুরা বিরোধীতা করেছি লেন কর্ম সংস্থানের সুযোগ হারানোর ভয়ে ।

প্রকৃত পক্ষে টো ছিল নবজাতি আত্মসচেতন বাঙালী জাতীয়তাবাদের অনুভূতি । উনবিংশ শতাব্দীর আলোক প্রাপ্তি থেকেই এই জাতীয়তাবাদ জন্ম নিয়েছিল আর আত্মপ্রকাশ এই বিরোধীতার মাধ্যমে । সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতো নেতারা শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য রাজ্যাংশের পূর্ণ গঠনের বিরোধী ছিলেন না । হিন্দী ভাষী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে একটি হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত ঘন সন্নিকষ্ট বাংলা ভাষী রাজ্য গঠন করা যেত এবং সেটা অনেক ভালো হত । কিন্তু একটা হবার উপায় ছিল না । লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্য ছিল দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করানো যার দ্বারা তার পৃথক হয়ে যায় । আর তা হলে কংগ্রেস সৃষ্ট জাতীয়তাবাদ ও দুর্বল হয়ে পড়ে । ১৯০০ সালে লিখিত কার্জনের অভিমত ছিল - 'কংগ্রেসে পড়ে যাওয়ার আগে টলছে , - আমার ভারত বর্ষে অবস্থান কালে যে বড় বড় অভিলাষগুলি আছে তার মধ্যে একটি হল - কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ অবসানের জন্য সহযোগীতা করা ।

বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে কার্জনের ভূমিকা ছিল পাহাড়ের মত কঠিন , সংকল্প ছিল অটল । সেক্রেটারী অফ স্টেটের অনুমোদন নিয়ে ১৯০৫ সালের অক্টো বর মাসে দেশ বিভাগ কার্যত সাধিত হল । বিভাগের পরে বাংলার লোক সংখ্যা দাঁড়াল ৪ কোটি লক্ষ হিন্দু এবং ৯০ লক্ষ মুসলমান , অপর দিকে নব গঠিত পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে লোকসংখ্যা দাঁড়াল ১ কোটি ২ লক্ষ হিন্দু । এই মুসলিম খান প্রদেশে গঠন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেছিল ।

১৯৪৭ এর ঘটনাগুলি ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাদের ছায়া ফেলেছিল । এই পরিকল্পনাকে সু প্রসারিত করা এবং শাসন ব্যবস্থার জন্য পুনঃ গঠনকে রাজনৈতিক বিভাগে রূপান্তরিত করা । এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী কার্জন । সুশাসনের দক্ষতাই যদি কার্জনের লক্ষ হত তা হলে হিন্দু ও মুসলমানদের

বিবাদ না লাগিয়ে বাংলার অসুবিধাজনক আয়তনকে কমিয়ে সুবিধা জনক করা যেত । তাই এই ক্ষেত্রে কার্জনের ভূমিকা শাসকের নয় , ধূর্ত রাজনীতিবিদদের মত ।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল এই অনুভূতি থেকে যে বাংলাদেশ বঙ্গ ভাষীদের মাতৃভূমি তার সন্তান তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও সেই দেশকে ভন্ডিত করা হয়েছে বাঙালীর রাজনীতির দিক থেকে দুর্বল করে দেখার জন্য ।এই আন্দোলন প্রধানত ঃ হিন্দুদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল । এর প্রাণশক্তি যে গভীর আবেগময় জাতীয়তা তা মুসলমানদের স্পর্শ করেনি। আর তা ছাড়া ঢাকার নবাবের সাহায্যে ব্রিটিশেরা তাদের আন্দোলনের বাইরে রেখে দিয়েছেন ।

এই আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করেছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মধ্যদিয়ে । রে অনিবার্য পরিণাম দেখা দিল পরিপূরক রূপে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ।এই আন্দোলনে নেতৃত্বে দিয়েছিলেন সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জির মতো বড় বড় নেতারা । রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভাও এই আন্দোলনে যোগ না দিয়ে পারে নি । ১৯০৫ সালে গোখলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে এই বর্জনের আন্দোলন সমর্থিত হল । ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হল দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে , তাতে বর্জন আন্দোলনের ন্যায্যতা প্রতিপাদিত হল এবং দাবি করা হল এই বিভাজনের প্রত্যাহার ।

ব্রিটিশ লেখতের মতে বঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বিপ্লবী মতবাদ প্রচারের গুপ্ত সুযোগ দিয়েছিল । পূর্ববঙ্গ এই বর্জন আন্দোলনকে মুসলমানেরা বাধা দিয়েছিল এবং দাঙ্গা ও বেধেছিল ঘন ঘন । জাতীয়তাবাদী লেখকদের মতে এটা ঘটেছিল সরকারী প্ররোচনায় ও সমর্থনে । বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতিগুলি তৎপর হয়ে উঠেছিল । ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সর্বান্তকরনে সমর্থন জানিয়ে ছিল এই আন্দোলনকে ।একদিকে নির্যাতিন ও শুরু হয়েছিল নানাভাবে ।

যাইহোক , এ আন্দোলন বিফল হয় নি । ১৯১১ সালে এই বিভাজনকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হল । তবে বাঙালী হিন্দুদের দন্ডিত করা হল বিশাল বাংলাভাষী এলাকাকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত করে আর ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করে ।

দেশ বিভাগের ফলে কার্জনের উদ্দেশ্য এক দিক দিয়ে সফল হয়েছিল ।অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ীভাবে একটা গোজাপুতে দেওয়া হল তাদের পৃথ ক করে রাখবার জন্য । জাতিয়তাবাদকে ও অনেক খানি দুর্বল করে দিল এই বিভাজন আর পূর্বাভাস ছিল ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের ।

আর একদিকে থেকে দেখতে গেলে , এই বিভাজন শক্তি ও প্রেরণা জুগিয়ে ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে । এই বিভাজন বাঙালীর হৃদয় যে আত্মিক ক্ষতির সৃষ্টি করেছিল , বিশেষ করে পাশ্চত্য পন্থীদের মনে , তা কোন সময়ই পূর্ণ নিরাময় হয়নি ।এই আত্মিকক্ষত সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রমতবাদ জাগিয়ে তুলেছিল । এছাড়া মধ্যপন্থীদের স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেরণাকেও এই বিভাজন সফল করে তুলেছিল ।তাই বঙ্গ বিভাগ ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি সংকল্প গ্রহণের অধ্যায়কে

সূচিত করে ।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মীয় মনোভাব যুক্ত হয় পড়ে । সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী তরুন সম্প্রদায় কালী , গীতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় । সন্ত্রাসবাদ ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে । কত ব্রিটিশ রাজকর্মচারী গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয় । বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বন্দোমাতরম্ সঙ্গীত খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে । এই সময় বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতি ও গঠিত হয় । সন্ত্রাসবাদ দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার নানা প্রকার দমন মূলক আনি প্রনয়ণ করে। স্যার আন্ড ফ্রেজার ও কিংস ফোর্ডকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয় । কিংসফোর্ডকে হত্যার ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ১৯০৮ খ্রীঃ মৃত্যুবরণ করেন । এই বছরই বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে অরবিন্দ ঘোষ , বারীন ঘোষ , কানাই লাল দত্ত ,সত্যেন বসু , উল্লাস কর দত্ত প্রমুখ অনেকে গ্রেপ্তার হন । সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার অশ্বিনী কুমার দত্ত এবং কৃষ্ণ কুমার মিত্র সহ নয়জন জননেতাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করে ।

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ও তার সহকারী ঘোষণা সারা বাংলাদেশে এক তীব্র ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে । সমাজের সকল শ্রেণী ও সকল স্তরের মানুষ এবং সংবাদ পত্র পত্রিকা এই দুরভিসন্ধি মূলক আদেশের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে । বিভিন্ন সভা সমিতিতে বঙ্গ ভঙ্গের নিন্দা করে এবং এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয় । স্থানীয় কর্তপক্ষ , বাংলাদেশের সরকার ভারত সরকার ও ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে শত শত প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হতে থাকে । বিভিন্ন মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বঙ্গভঙ্গের বিরূদ্ধে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয় । কিন্তু এই সব প্রচেষ্টার নিস্ফলতা জনগণকে এক ব্যাপকতর ও বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করে তোলে ।

সঞ্জীবনী কাগজের সম্পাদক কৃসনকুমার মিত্র দেশবাসীকে বিদেশী দ্রব্য ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সঙ্কল্প গ্রহনের জন্য আহ্বান জানালে তা সর্ব সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায় । বঙ্গ দর্শন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালী সমাজের অটুট মনোবলের স্থির সংকল্পের কথা পুনঃ ঘোষনা করেন । ছাত্র সমাজের মধ্যেও এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হয় । বঙ্গভঙ্গ রোধে ও বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার ছাত্র বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে যোগ দিতে থাকে । বিভিন্ন সংবাদপত্র পত্রিকা এবং সাহিত্যের মাধ্যমে " বয়কট ও স্বদেশী " এই দুই আদর্শ ও লক্ষ্য ছড়িয়ে পড়ে । রবীন্দ্রনাথ , দ্বিজেন্দ্রলাল রায় , রজনীকান্ত সেন প্রমুখ কবিদের গান , কবিতা নাটক প্রভৃতি জনগণের স্বদেশপ্রেম ও ভাবাবেগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । " ব্রতী সমিতি " সনাতন সম্প্রদায় , বন্দেমাতরম্ সোসাইটি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুলোর স্বদেশী ভাবধারা প্রচার ও স্বদেশ প্রেমের বিকাশে তৎপর হয় । সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯০৫ খ্রীঃ ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের

সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় । রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ দিনটি " রাখী বন্দন " দিবস রূপে পালিত হয় । পূর্ব বাংলা , পশ্চিম বাংলা , দনী দরিদ্র , হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নির্বিশেষে , বাঙালী জাতির ভ্রাতৃত্ব ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের কথা ঘোষণা করাই ছিল এই উৎসবের তাৎপর্য । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় " কোন শক্তি মদমত্ত রাজ শক্তিই বাঙালীর ঐক্যকে ভাঙ্গতে পারবে না ।" এ কথাই প্রমাণিত হল রাখী বন্ধন উৎসবে । রাখী বন্ধন ছাড়া ঐ দিনটি " অরন্ধন দিবস" রূপেও পালন করা হয় । সমগ্র বাঙালী জাতি সেদিন বন্ধন না পালন করে ব্রিটিশ সরকারের স্বৈরাচারী নীতির মৌল প্রতিবাদ জানায়

বঙ্গ ভঙ্গের দিনটিতে জন জীবনের স্রোত বন্ধ হয়ে যায় । স্বতঃস্ফুর্ত প্রতিবাদ বিক্ষোভ শোভাযাত্রা ও জনসভার মধ্যদিয়ে বাংলার মানুষ বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে । অল্প কালের মধ্যেই আন্দোলন কে বিরাট গণ অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে ।

বিদেশী দ্রব্য র্জন বা বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার বা 'স্বদেশী' এই দুই ছিল আন্দোলনের প্রধান আদর্শ ও কর্মসূচী । এই দুই লক্ষ ও নীতি পরস্পরের সমপূরক । বিদেশী দ্রব্য বর্জন কার্যকরী না হলে স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি সম্ভব ছিল না । তেমনি উপযুক্ত স্বদেশী প্রণ্যদ্রব্য সহজলভ্য না হলে প্রয়োজনীয় বিদেশী দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন করা ছিল দুঃসাধ্য। বিদেশী দ্রব বর্জনের আর একটি লক্ষ ছিল যে " বয়কট " আন্দোলন সফল হলে ক্ষতিগ্রস্থ ইংরেজ বণিকরা ব্রিটিশ সরকারকে তাদের নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপ দিতে বাধ্য হবে । তা ছাড়া , সুলভ ও উৎকৃষ্ট বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের ফলে জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার অভ্যস্ত হয়ে উঠবে । তাদের মনোবল ও আত্মবির্ভরতা বোধ বৃদ্ধি পাবে । স্বদেশী ভাবধারায় অনুপ্রেরণায় বহু কাপড়ের কল , ব্যাঙ্ক , মোজা গেঞ্জি , সাবান , চামড়া , ঔষধ ইত্যাদির কারখানা বীমা , প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে ওঠে । স্বদেশী দোকানও বিভিন্ন স্থানে খোলা হয় । কুটির শিল্পের উন্নতি হতে শুরু করে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক বাড়ী বাড়ী ঘুরে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রি করতে শুরু করে । জনসভা , মিছিল , বিদেশী দ্রব্যের মহোৎসব , পিকেটিং , দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও বক্তৃতার মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের দুর্বার গতি অব্যাহত থাকে । সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল , অশ্বিনী কুমার দত্ত , অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও গণভিত্তিক করে তুলতে সচেষ্ট হন ।

বয়কট আন্দোলনের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শিক্ষা বর্জন কিন্তু বিদেশী পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ পায় সে জন্য আন্দোলনের নেতৃবর্গ গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন । এই উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খ্রীঃ ১১ই মার্চ " জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎ" গঠিত হয় । বঙ্গীয় জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয় । জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের দায়িত্ব লাভ করেন অরবিন্দ ঘোষ । জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য রাজা সুবোধ

চন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা এবং পরে ময়মনসিংহের জমিদারগণ প্রচুর টাকা পয়সা দান করেন । এই সব দান ছাড়াও সাধারণ লোকও জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের তহবিলে প্রচুর অর্থ দান করেন । সাধারণ মানুসেণ স্বেচ্ছা সেবায় এবং অকৃপন দানে রাতারাতি গড়ে উঠল পশ্চিম বঙ্গে ১১/১২টি এবং পূর্ব বঙ্গে ৪০ টি স্কুল । জন্ম হল যাদবপুর কারিগরী কলেজের যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বর্তমানের যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয় ।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উৎস ছিল জাতীয় সংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং জাতির মানসিকতার ভিত্তিতে জাতির প্রয়োজনে মেটানো এবং আশা আকাঙ্খা পুরণের জন্য বিদেশী শাসনের ঔপনিবেশিক ভাবধারা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে এক স্বয়ং সম্পূর্ণ শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা । তাই জাতির অতীতকে জানবার জন্য জাতীয় স্কুলগুলোর পাঠ্যক্রম ভারতের ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব দেওয়া হয় । অপর দিকে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হল কারিগরী বিদ্যার উপর । মাতৃভাষা ও সাহিত্য এবং উচ্চতর স্তরে মানবিক বিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা হয় ।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী সুভাষ চন্দ্র স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থা থেকে ছদ্মবেশে দেশ ত্যাগ করেন এবং কাবুল উপস্থিত হন । কাবুল থেকে তিনি বার্লিনে যান । জার্মানীতে উপস্থিত হয়েই তিনি জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাত করে ইউরোপের ভারতীয় মুক্তি যুদ্ধ পরিচরলনার পরিকল্পনার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং পার্ল হারবারের মার্কিন ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষন করে । ফলে প্রাচ্য রনাঙ্গনে জটিলতার সৃষ্টি হয় । দ্রুতগতিতে জাপান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে । ১৯৪২ খ্রীঃ ১০ই মার্চ জাপান সিঙ্গাপুর এবং মার্চ মাসের প্রথম দিকে বহ্মদেশ অধিকার করে । জাপানের দ্রুত সাফল্যে ব্রিটিশ সরকারের মনে ত্রাসের সৃষ্টি হয় । ভারতের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তারা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠান । কিন্তু তার প্রস্তাব ভারতের জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের আশা আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ হয় । অপর দিকে জাপানের অভাবনীয় সাফল্য দক্ষিণ এশিয়ার ভারতীয়দের মনে দারুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করে মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য জাপানে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রাস বিহারী বসু উদ্যোগে হন । ১৯৪২ খ্রীঃ ১৫জুন ব্যাংককে ভারতীয়দের এক সমাবেশে তিনি ভারতীয় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন এবং তার উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় । এই সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে সুভাষ চন্দ্র বসুকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আগমনের জন্য আমন্ত্রণ করা হয় । ইতিমধ্যে ১৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মোহন সিং এর প্রচেষ্টায় সিঙ্গাপুরের পতনের যুদ্ধবন্দী ভারতের সৈন্যদের সংঘবদ্ধ করে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয় । অপর দিকে ব্যাঙ্কক

সম্মেলনে ভারতীয় সংঘ সুভাষ চন্দ্রকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কার্য পরিচরলনার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা সাদরে গ্রহন করেন । কিন্তু যুদ্ধ কালীন পরিস্থিতিতে জার্মানী থেকে জাপানে উপস্থিত হওয়া কোন ক্রমেই নিরাপদ ছিল না । তথাপি ১৯৪৩ খ্রীঃ ৮ ই ফেব্রুয়ারী জার্মানী ত্যাগ করে সাবমেরিনের সাহায্যে সুভাষ চন্দ্র টোকিও অভিমুখে যাত্রা করেন এই দুঃসাহসিক অভিযান সমাপ্ত করে ১৬ই মে তিনি টোকিও পৌঁছান ।

টোকিও পৌঁছেই তিনি এক সাংবাধিক সম্মেলনে জাপানের সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র সংগ্রাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তারপরে সুভাষ চন্দ্র সিঙ্গাপুরে এসে উপস্থিত হন এবং ২ রা জুলাই রাস বিহারী বসুর কাছ থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঙ্ঘের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । উপস্থিত ভারতীয়গণ সানন্দে তার নেতৃত্ব স্বীকার করেন এবং তাকে " নেতাজী " নামে অভিহিত করেন।

সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হওয়ার পরই সুভাষ চন্দ্র ভারতের অভিযান পরিচালনার জন্য সামরিক বাহিনী পূর্ণ গঠন ও অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা শুরু করেন । ১৯৪৩ খ্রীঃ ২৫ শে আগষ্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহ ন করেন এবং সৈন্য বাহিনীর উন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানের দিকে মনোযোগ দেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর পূর্বে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল তেরো হাজার । তিনি পঞ্চাশ হাজারে পরিণত করেন । নেতাজী আজাদ হিন্দ বাহিনীর তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন এবং নারী পুরুষ উভয় ধরনের বাহিনী গঠন করেন । সৈন্যদের জন্য তিনি ঝাঁসি বাহিনী নামে একটি ব্রিগেড গঠন করেন । প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের নিকট আবেদন করেন ।

সেনাবাহিনীর পূর্ন গঠিত করার পর নেতাজী অস্তায়ী সরকার গঠনের কাজে ব্রতী হন । সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা অধিবেশনে তিনি আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের কথা ঘোষনা করেন । নেতাজীর মতে তার সরকারের প্রধান লক্ষ্য হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ চুড়ান্ত সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং ভারতের মাটিতে শাসনের অবসান ঘটানো । তিনি আশা করেন যে এই সরকার ভারতের মাটিতে স্থানান্তরীত হওয়ার পর স্থায়ী জাতীয় সরকারের স্থান গ্রহন করবে । অস্থায়ী সরকারের মূল ধ্বনি হল জয়হিন্দ ও দিল্লী চলো । জাতীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হল হিন্দুস্থানী । কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা জাতীয় পতাকার মর্যাদা পায় এবং রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের " জন গণ মন" গানটি জাতীয় সঙ্গীত রূপে নির্বাচিত হয় । শ্রীঘ্রই জাপান , জার্মানি , ইতালি ও অন্য ছটি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ সরকারের স্বীকৃত দান করে । ১৯৪৩ খ্রীঃ ২৩ শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার ইংল্যান্ড - আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ।

১৯৪৩ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে নেতাজী টোকিও শহরে অনুষ্ঠিত বৃহৎ পূর্ব এশিয়া শান্তি সম্মেলনে

যোগ দেন । এই সম্মেলনে ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রমের প্রতি সর্বাত্মক সাহায্যে প্রতিশ্রুতি দেন । জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ভারতের মুক্তি যুদ্ধে জাপানের সাহায্যে দানের কথা ঘোষণা করেন । জাপানের সহযোগীতার নির্দশন স্বরূপ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ১৯৪৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে সমর্পন করা হয় । এই সম্মেলনের পরেই নেতাজী ভারতের মুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন । জাতীয় বাহিনী গঠন এবং বৈদেশিক সাহায্য লাভ এই দুটির ভিত্তিতে আজাদ হিন্দ বাহিনী সশস্ত্র অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে । ১৯৪৪ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান কর্মকেন্দ্র রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করেন । কারণ ব্রহ্মদেশকে ভিত্তি করে ভারতের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করা সহজতর । এই সময় সুভাষ চন্দ্র সম্মিলিত জাপানী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম আক্রমণ করার প্রস্তাব করেন । জাপান এই প্রস্তাব আপত্তি জানায় কারণ জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সম মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না । কিন্তু সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বাহিনীকে জাপানী সৈন্যের সহায়ক বাহিনী রূপে ব্যবহার করার বিরোধী ছিলেন । তাঁর মতে , ভারতের মাটিতে মুক্তি যুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরাই প্রথম রক্তবিন্দু দান করবে । শেষ পর্যন্ত সুভাষ বসুও জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষ , কাওয়ারের মধ্যে আলোচনা ভিত্তিতে স্থির হয় যে আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং জাপানী বাহিনী যৌথ ভাবে আরাকান ফ্রন্ট আক্রমণ করবে এবং ইম্ফল অভিমুখে অগ্রসর হবে । মার্চের প্রথম দিকে অভিযান শুরু হয় এবং মার্চের শেষ দিকে ইমফলের পতন ঘটে । এপ্রিলের প্রথমদিকে কোহিমা অবরুদ্ধ হয় । এই সময় ঠিক হয় যে , বর্ষার পর আজাদ হিন্দ ফৌজ আসাম হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে । কিন্তু মে মাসের শেষ দিকে আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন কোহিমায় এসে উপস্থিত হয় তখন জাপানের সামরিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে । এই সুযোগে ইম্ফল ও কোহিমার ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যাপক সমাবেশ শুরু হয় । তবু আজাদ হিন্দ বাহিনী তাদের দখলীকৃত স্থানগুলো রক্ষার জন্য বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে । কিন্তু বর্ষার সমাগমে জাপানী সৈন্যরা অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরা রণাঙ্গন পরিত্যাগ করতে শুরু করে ।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা সত্বেও ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে তার অভিযানের গুরুত্ব অপরিসীম । ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে আজাদহিন্দ বাহিনীর যে পরোক্ষভাবে সাহায্য সক্রিয় ছিল তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় । ব্রিটিশ সরকার এই সময় থেকেই স্পষ্টভাবে উপলব্দি করে যে ভারতের উপর তাদের আধিপত্য বেশি দিন বজায় রাখা সম্ভব নয় । আজাদ হিন্দ বাহিনীর দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়েই নৌবাহিনী বিদ্রোহের পথ গ্রহন করে । ভারতের জন সাধারণও এই বাহিনীর কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে পড়ে । তাই সরকার যখন ঘোষণা করে যে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতি অনুগত্য ভঙ্গ এবং রাজদ্রোহের অপরাধে আজাদ হিন্দ বাহিনীর উচ্চ পদস্থ ব্যাক্তিদের বিচার করা হবে তখন সারা দেশে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে । এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ সারা দেশে গণ বিক্ষোভ দেখা যায় । সকলেই জাতীয়

বাহিনীর অফিসারদের মুক্তি দাবি করে ভুলাভাই দেশাই, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, কৈলাস নাথ কাটজু, আসফ আলি প্রমুখ আইনজীবিদের নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করে এবং বিচারাধীন অফিসারদের পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব এই কমিটি গ্রহণ করে। দিল্লীর লালকেল্লায় নাটকীয় বিচার কার্য সম্পাদিত হয় এবং কোর্ট মার্শালে বিচারাধীন সকল অফিসারই দোষী সাব্যস্ত এবং তাদের দন্ডাদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনমতের কাছে সরকারের নতি স্বীকার করতে হয় এবং সকল নেতাই সসম্মানে মুক্তি লাভ করেন।

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা মহারাষ্ট্রে হলেও এই আন্দোলন বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা অদিক ব্যাপকতা লাভ করে। ১৮৬০ খ্রীঃ পর থেকেই বাংলাদেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। নবগোপাল মিত্রের নেতৃত্বে হিন্দুমেলা সংগঠন ও ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে সঞ্জীবনী সভা সম্প্রদায়কে নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নুতুন চেতনার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। ফলে ১৯০২ খ্রীঃ কলকাতায় তিনটি ও মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। এই সব সমিতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল অনুশীলন সমিতি অনুশীলন সমিতির নামের সঙ্গে এই সংস্থার সভাপতি ব্যারিস্টার পি মিত্রের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকলেও ১৯০২ খ্রীঃ ২৪ শে মার্চ সতীশ চন্দ্র বসুর প্রচেষ্টার ফলেই বাস্তব রূপ গ্রহন করে এবং শরীর চর্চার সংস্থা রূপে আত্ম প্রকাশ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠের অনুকরণে এই সমিতির নাম করণ করা হয়। কিছুদিন পরে " যুগান্তর " নামে একটি দল গঠিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯০১ খ্রীঃ অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে তরুন বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠান এবং তিনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রায় সকল জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গেই অনুশীলন সমিতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ক্রমশ কলকাতার বাহিরে বাংলাদেশর বিভিন্ন স্থানে এই সমিতির শাখা গড়ে ওঠে এবং কলকাতার সমিতির প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়।

তবে ১৯০৫ খ্রীঃ পূর্বে অনুশীলন সমিতি ও বাংলাদেশের অন্যান্য সমিতিগুলো শরীর চর্চা, লাঠি খেলা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত ছিল এবং সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত ছিল না। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হলে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন নতুন রূপ গ্রহন করে। ১৯০৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের বিপ্লবীরা প্রথম নিখিল বঙ্গ সম্মেলন আহ্বান করেন এবং এই সম্মেলনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীদের মধ্যে সংহতি দৃঢ়তর হয় তবে বাংলাদেশর বৈপ্লবিক তৎপরতা প্রকাশ্য ও গোপন এই দুটি খাতে প্রবাহিত হয়। একটি গোষ্ঠী নিষক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে আন্দোলন পরিচলনার পক্ষপাতি ছিল। অপর দলটি ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র বিকল করার উদ্দেশ্যে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পথ

অবলম্বন করে । হিংসাত্মক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষ , বারীন্দ্র কুমার ঘোষ , ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত , অবিনাশ ভট্টাচার্য , উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান ভুমিকা গ্রহণ করেন । জনগণের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ , "ভবানী মন্দির " নামক একটি গল্প প্রকাশ করেন । অরবিন্দ বোসের " বন্দোমাতরম" এবং ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত " সন্ধ্যা " পত্রিকা ও এই বিষয়ে ভূমিকা পালক করে। পরে বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে বিপ্লবী সংঘগুলো রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করে। ১৯০৭ খ্রীঃ বাংলার বিপ্লবীদল সর্ব প্রথম গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে । এই সময় তারা পূর্ব বঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামিফিল্ড কুলারকে হত্যার চেষ্টা করে । কিন্তু তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় । ইতিমধ্যে রবীন্দ্র কুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো , উল্লাস কর দত্ত প্রভৃতি মানিক তলার মুরারী পুকুর অঞ্চলে বোমা প্রস্তুত করার কারখানা নির্মান করেন এবং তারা ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করে শাসন যন্ত্র বিকল করার সংকল্প গ্রহন করেন । অত্যাচারী প্রধান প্রেসিডিন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড তাদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হন । ব্রিটিশ সরকার কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে মজঃফরপুরে বদলি করে । ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামক দুজন তরুন বিপ্লবীর উপর কিংসফোর্ডের হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয় । কিন্তু তাদের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে মিসেস কেনিডি ও মিস কেনিডি নামে দুইজন নিরপরাধ মহিলা মারা যায় । পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রফুল্ল চাকী নিজের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং বিচারে তার প্রাণদন্ড হয় । অপর দিকে মুরারী পুকুরের বিপ্লবীদের আস্তানায় হানা দিয়ে পুলিশ অরবন্দি ঘোষ সহ ছিষট্টি জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে এবং আসামীদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত আলিপুরের বোমার মামলা শুরু হয় । এই সময় নরেন গোসাই নামক এক জন দুর্বল চিত্ত বিপ্লবী পুলিশের নিকট অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করায় ঐ মামলার অপর দুই আসামী কানাই লাল দত্ত ও সত্যেন বসু নরেন গোসাইকে জেলের মধ্যেই হত্যা করেন । ফলে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর ফাঁসি হয় । আলিপুর বোমার মামলায় ব্যারিস্টার চিত্ত রঞ্জন দাসের প্রচেষ্টায় অরবিন্দ ঘোষ খালাস পেলেও অপরাপর আসামীদের অনেকেরই যাবজ্জীবন দীপান্তর হয় ।

আলিপুর বোমার মামলার পর বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কিছু পরিমাণে নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সক্রিয় রাজনীতি থেকেঅরবিন্দের বিদায় গ্রহন সরকারের কঠোর দমন নীতি এবং অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায় । তাছাড়া এই সব বিপ্লবীদের প্রকৃতি গত পরিবর্তন দেখা দেয় । প্রথম দিকে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগসুত্র স্থাপনের চেষ্টা হলেও পরে এই সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় ।

বিপ্লবী কর্মপন্থা সংক্রান্ত ব্যাপারে ও পরিবর্তন ঘটে এবং বিক্ষিপ্তভাবে বোমা নিক্ষেপের পরিবর্তে

সার্থক বিপ্লবের জন্য কৃষ্ক শ্রমিক ও সৈন্য বাহিনীর মধ্যে সভা গঠনের দিকে দৃষ্টি হয় এবং বৈদেশিক সাহায্যে জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের কর্মসূচী তৈরী করা হয় । তা সত্ত্বে ও ১৯০৮ থেকে ১৯১৭ খ্রীঃ মধ্যে বিপ্লবীগণ প্রায় ৬৪ জন সবকারী কর্মচারীকে হত্যা বা হত্যাকরার চেষ্টা করেন তার মধ্যে ১৯০৮ খ্রীঃ বাংলার ছোটলাট ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা , পুলিশ সাব ইনসপেক্টর নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়কে হত্যা , ১৯০৯ খ্রীঃ সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা , ১৯১০ খ্রীঃ পুলিশ অফিসার সামসুল আলমের প্রাণনাশ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন " সাহিত্যের কর্মযোগী " সুতরাং তিনি রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন কিনা তা বড় প্রশ্ন নয় । আসল কথা হল বঙ্কিমের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তা দেশের রাজনৈতিক ভাবনায় কতটা সহায়ক হয়েছে ।

বঙ্গদর্শন এর প্রথম দিকে তাঁকে রাজনীতি সম্পর্কে বিমুখ দেখা যায় নি । তবে তার অনেক খানিথ ঐতিহাসিক তাড়নায় এবং স্বদেশ চিন্তার প্রনোদিত বাঙালীর " বাহুবল" " ভারত কলঙ্ক " ভারত বর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা" প্রচীন ভারতের রাজনীতি , বাংলার ইতিহাস , " বাংলার বলঙ্ক' প্রভৃতি বহু রাজনৈতিক রচনা । অনেক গুলো লেখা আবার সমাজতাত্ত্বিকচিন্তায় ও পরোক্ষভাবে স্বদেশ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ । " সাম্য " বঙ্গদেশের কৃষক এবং কমলাকান্তের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উক্তি এই শ্রেণীর অন্তর্গত । প্রথম শ্রেণীর লেখাগুলোতে যে মূল রাজনীতি ভাবনার ও চেতনার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র করে ছিলেন তা শিক্ষিত শ্রেণীকে স্বদেশ বিষয়ে সচেতন করে তোলার কথা পরাজিত বাঙালী ও ভারতবাসীকে কিছুটা উৎসাহ দানের ও কথা। অন্যান্য অনেক লেখাই জাতীয়তার উদ্বোধন হিসাবে রাজনীতি সম্পর্কিত কমলাকান্তের পত্রের পলিটিক্‌স বিশ্লেষণ , কুক্কুর জাতীয় ও বৃষ জাতীয় পলিটিকসের ব্যাখা একদিকে যেমন উপভোগ্য তেমনি অপর দিকে বাস্তব রাজনৈতিক বোধের প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য কীর্তি হিন্দু ধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা । বারে বারে তিনি হিন্দু ধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন । এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু সমাজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আনুগত্য জন্মগত সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত যোগের জ্ঞান বিজ্ঞানের সহায়তায় তিনি হিন্দু ধর্মের সমস্ত শাস্ত্রকে আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী পরীক্ষা করে , বিচার করে , যুক্তি পর যুক্তির সাহযোগীতায় উক্ত নিষ্কাম ধর্মকেই একমাত্র হিন্দু ধর্ম রূপে ব্যাখা ও কৃষ্ণকে আদর্শ মনুষ্যরূপে স্থাপন , জন্মগত বিশ্বাসকে যুগ সঙ্গত যুক্তির ধারাতেই পুষ্ট করে তিনি একটি নতুন দিকের উন্মোচন করেন। বঙ্কিমের এই প্রচেষ্টা সমকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল । রমেশ চন্দ্র দত্তের লেখা থেকে তা জানা যায় । তিনি বলেন যে আধুনিক যুগ গ্রাহ্য হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজ গঠনের প্রথম বঙ্কিমই অগ্রনী হন । সংক্ষেপে বলা যায় যে বঙ্কিমের মধ্যে দিয়ে হিন্দু ধর্মের পুন

জীবনের আভাস দেখা যায় । সমাজ সংস্কার অপেক্ষা সংরক্ষণের দিকে তাঁর বেশী ঝোঁক থাকলেও তিনি কট্টর গোড়াপন্থী ছিলেন না । বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জীবননিষ্ঠ এবং মানবতাবাদী সুতরাং তিনি মানবীয় , বৃত্তি সমুহের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের মধ্যে দিয়ে সর্বাঙ্গিন পুরুষার্থ লাভের কথা বলেছেন । ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণ চরিতের মাধ্যমে তিনি হিন্দু ধর্মের নানা দিক সর্ম্পকে সংগর্ভ আলোচনা করেন । বঙ্কিম কয়মনোবাক্যে হিন্দু ধর্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাস করতেন । সে জন্য তিনি বলেন , " সেদিন ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প ও ভারতের নিস্কাম কর্ম একত্র হইবে সে দিন মনুষ্য দেবতা হইবে ।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হলেও তার রাজনৈতিক আদর্শ ভারতীয় বিশেষভাবে বাংলার রাজনীতির উপর তার গভীর প্রভাব বিস্তার করে । তাঁর দেশপ্রেম , রাজনৈতিক দর্শন বহু রাজনীতিবিদকেই উদ্বুদ্ধ করে তোলে । তার সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি স্বদেশ প্রেমকে ধর্মরে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সম্মত হন । শ্রী অরবিন্ত , বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিন্তা ধারাকে স্বদেশ প্রেমের ধর্ম বলে বর্ণনা করেন । ডক্টর রবেশ চন্দ্র মজুমদার প্রায় অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেন , যে তিনি স্বদেশ প্রেমকে ধর্ম এবং ধর্মকে স্বদেশ প্রেমে পরিণত করতে সমর্থ হয় । কিন্তু স্বদেশ প্রেম ও দর্ম বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ সমর্থন ছিল সে কথা মনে করলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হবে।

তার মানব প্রেম সমাজ , কাল ও দেশের গন্ডী অতিক্রম করে এক বিশ্বজনীন মানবতাবাদে পরিণত হয় । প্রকৃত পক্ষে তার মানব প্রেম স্বদেশ প্রেম অপেক্ষা ও অনেক বেশী গভীর ছিল । তিনি পাশ্চাত্য দেশে অনুসৃত স্বাপত্যবোধ ও দেশ প্রেম সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না এবং ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে স্বদেশ প্রেমের নতুন ব্যাখা দিতে শুরু করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাও পছন্দ করতে পারেন নি । বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমস্ত প্রাণীকে সবভাবে ভালবাসা অসম্ভব সুতরাং স্বদেশ প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করা উচিত । তার নিজের ভাষায় " সকল ধর্মের উপর স্বদেশ প্রীতি" । তার স্বদেশ প্রীতির চিন্তাধারা ভারতের চরমপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে তুলতে অনেকাংশে সাহায্য করে বিশেষতঃ এই ব্যাপারে " আনন্দমঠ " ও তার অন্তর্ভুক্ত " বন্দেমাতরম" ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট গভীর অনুপ্রেরণা রূপে দেখা যায় । আনন্দমঠের সন্ন্যাসীগণ অর্থাৎ সন্তানদল চরমপন্থী আন্দোলনকারীদের নিকট আদর্শ রূপে পরিগণিত হতেন । ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে আনন্দমঠ ছিল প্রেরণার প্রতীক নিষ্কাম স্বদেশ প্রেমের দীক্ষায় স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ । সমগ্র আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রাণ বানী " বন্দেমাতরম " ছিল চরমপন্থীদের মহাসঙ্গীত এবং মাতৃমন্ত্র কন্ঠে নিয়ে তারা যে কোন দুঃসাহসিক কর্মে আত্মনিয়োগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না । আনন্দমঠের সন্তান দলের কাছে দেশই ছিল মা । এই গ্রন্থে মায়ের ত্রিমূর্তি প্রদর্শিত হয়েছে । অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ভারতবর্ষ " স্বৈরাচারী শাসনে মা হৃত সর্বস্বা , দেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছে

মা অন্ধকারাচ্ছন্ন কালী কালিমাময়ী 'মা হইয়াছেন ' দেশ প্রেমিক সন্তান দলের ধ্যাননেত্রে স্বপ্ন সাদন ও কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মায়ের এক ঐশ্বর্যময় মূর্তি বিদ্যা, বুদ্ধি , সামরিক বল , ধনেশ্বর্য এবং গণশক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে গড়া আগামী দিনের নতুন ভারতবর্ষ মা যা হইবেন ।অন্ধকারাচ্ছন্ন কালিমাময়ী মাকে হৃত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল আনন্দময়ীর সন্তানদের একমাত্র ধর্ম , লক্ষ্য , সাধনা , কামনা ও বাসনা ।এই লক্ষ্যেই ধাবিত হত তাঁদের সকল কর্ম প্রয়াস ।চরম পন্থীদের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের এই বর্ণনা গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং তারা কালী মূর্তির আরাধনার দ্বারা শক্তি ও সাহসকে উদ্দীপ্ত করে তোলার চেষ্টা করেন । ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে আনন্দ মঠ ব্যতীত অন্য কোন উপন্যাস তরুন বাঙালীদের উপর এরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি ।চরমপন্থী দলের অন্যতম প্রধান নায়ক অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৭ খ্রীঃ তার সম্পাদিত বন্দেমাতরম পত্রিকায় লেখেন , যে নতুন শক্তি জাতিকে পুনরুত্থান ও স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করতে সমর্থ হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রই তার উৎসাহদাতা এবং রাজনৈতিক গুরু ।অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে নব ভারতের স্রষ্টাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন । ১৯১০ খ্রীঃ ১০ই এপ্রিল বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত ।

" ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র " শীর্ষক প্রবন্ধে অরবিন্দ ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্রকে " ঋষি " অভিধায় ভূষিত করেন । তিনি বলেন , বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে বন্দেমাতরম মন্ত্রদান করেছেন ।"

এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য যেমন আমরা এই বরেণ্য মনিষীদের ভুলে না যাই , তাদের কৃত কর্মকে যেন যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করি পাশাপাশি ইতিহাস যেন আমাদেরকে এই মহিমান্বিত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে আমাদের উন্নত সমাজ , রাজ্য , দেশ গঠনে অনুপ্রাণিত করে ।ইতিহাসের পর্দায় স্বাক্ষ্য বহন করে , এখানে অর্থাৎ মাতৃমুক্তির আন্দোলনে শুধু একশ্রেণীর মানুষই নয় , খেটেখাওয়া মানুষ থেকে , শ্রমিক শ্রেণী , কৃষক শ্রেণী , শিক্ষক , প্রফেসর , ডাক্তার , সাহিত্যিক , বার্তাজীবি , বৈজ্ঞানিক , ব্যবসায়ী , উকিল , ব্যারিষ্টার সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েন , মাতৃমুক্তির আন্দোলনে । কতিপয় বিশ্বাসঘাতক হয়তো ছিল , তা খুবই নগন্য। যদিও তাদের ইতিহাস ঘৃণার স্মৃতিতে প্রোথিত রাখে । উৎকণ্ঠা ছিল "মা" কে তো বিদেশীর কাছে বন্ধক রাখা যায় না ।শৃঙ্খল বন্ধ করে ও রাখা যায় না তাই মাতৃমুক্তির আন্দোলনে মুক্তির শপথ গ্রহণকারী বীরদের শ্রদ্ধা জানিয়ে , এ কথা বলতেই হয় , যা আমার মুখের ভাষা নয় , বিচক্ষণ বরেণ্যদের উচিত, যুবকরাই পারে সমাজ সংস্কারক হতে , যুবকরাই পারে আগামীর মসৃণ রাস্তা তৈরী করতে । আদর্শ সমাজ , রাজ্য দেশ তৈরী করতে। সংগৃহীত তথ্য দিয়ে লেখা হয়ত নতুন প্রজন্মকে অতীতের বীরদের সম্বন্ধে জানতে উৎসাহ যোগাবে এবং যার থেকে অঙ্কুরোদগম হবে এক ঐতিহ্যশালী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম । বাঙালী জাতীর গর্ব ।